হরিপদ দত্ত

প্রবন্ধ সমগ্র

হরিপদ দত্ত সমকালীন বাংলা উপন্যাসের অগ্রগামী ঔপন্যাসিক। উপন্যাস ও গল্পের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি লিখেছেন বিস্তর প্রবন্ধও। সাহিত্য, সাহিত্যিক, সাহিত্যের বর্তমান-ভবিষ্যত, বাঙালি, বাংলাদেশ, রাষ্ট্র, সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা– এরকম নানা বিষয় নিয়ে রচিত এসব প্রবন্ধ। প্রবন্ধগুলো লিখিত হয়েছে বিষয়ের বিকল্প ভাবনা থেকে। অন্য প্রবন্ধকারদের চিন্তা, বিশ্লেষণ, দৃষ্টিকোণ এসবে ঠাঁই পায়নি। লেখকের মতে, 'চিন্তা আর বোধের মিল না-ই থাকতে পারে। প্রবন্ধগুলোর বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করতে হবে এমন দাবি আমার নয়। সিদ্ধান্তের বিচিত্রগামীতাই সাহিত্য, সমাজ ও রাষ্ট্রের গতিশীল রীতি। পুরাতন সত্যের ভেতর নতুন সত্য যে লুকিয়ে থাকে, তারই অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে লেখাগুলোর ভেতর। সমস্ত বিষয়ই মানুষকে কৌতূহল জাগায়। সেই কৌতূহলই নতুন সিদ্ধান্তের দিকে টেনে নেয়। প্রবন্ধগুলো সেই বিষয়টিকে পাঠকদের জানাতে চায়।' ঔপন্যাসিকের বাইরে প্রাবন্ধিক হরিপদ দত্তকে জানা যাবে এসব প্রবন্ধের মাধ্যমে। তাঁর নিজস্ব গদ্যরীতিতে প্রবন্ধের বিষয়গুলোকে তিনি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। পড়ে বিস্তৃত হয় আমাদের জানার জগত, বোধ ও উপলব্ধির জগত।

প্রচ্ছদ ■ চারু পিন্টু

প্রবন্ধসমগ্র

হরিপদ দত্ত

রোদেলা

প্রবন্ধসমগ্র
হরিপদ দত্ত

© লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৩

রোদেলা ২৩১

রোদেলা

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
১১/১ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
চারু পিন্টু

অক্ষর বিন্যাস ও মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স ডিজাইন
৩৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা মাত্র

PROBANDHASAMAGRO by Haripod Datta
First Published Ekushe boimela 2013
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100
E-mail : rodela.prokashani@gmail.com
Web www.rodela prokashani.com

Price: Tk. 400.00 only   US $: 10.00
ISBN: 978 984 8975 59 6   Code : 231

উৎসর্গ

সাবিনা ইয়াসমিন
প্রভাষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া,
স্নেহভাজনেষু

ভূমিকা

প্রবন্ধগুলো লিখিত হয়েছে বিষয়ের বিকল্প ভাবনা থেকে। অন্য প্রবন্ধকারদের চিন্তা বিশ্লেষণ দৃষ্টিকোণ এসবে ঠাঁই পায় নি। চিন্তা আর বোধেরমিল না-ই থাকতে পারে। প্রবন্ধগুলোর বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করতে হবে এমন দাবী আমার নয়। সিদ্ধান্তের বিচিত্রগামীতাই সাহিত্যের সমাজের রাষ্ট্রের গতিশীল রীতি। পুরাতন সত্যের ভেতর নতুন সত্য যে লুকিয়ে থাকে তারই অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে লেখাগুলোর ভেতর। কিছু নেই। সমস্ত বিষয়ই মানুষকে কৌতূহল জাগায়। সেই কৌতূহলই নতুন সিদ্ধান্তের দিকে টেনে নেয়। প্রবন্ধগুলো সেই বিষয়টিকে পাঠকদের জানাতে চায়। এখানে যেমন আছে রাষ্ট্রচিন্তা তেমনি আছে সাহিত্য চিন্তা। সব ক্ষেত্রেই আলো ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচিপত্র

কথাসাহিত্যে খণ্ডিত মানুষ	১১
ঔপনিবেশিক-কালের রেনেসাঁস ও কথাসাহিত্যে সাম্য	১৭
নজরুলের পদ্ম-গোখরো'র জননী	৪৫
বাঙালির রক্তে ঘর ও মাটি	৫০
বাঙালির মানস-বিচ্ছিন্নতার রূপরেখা	৫৬
পদ্মানদীর মাঝি'র কপিলার অন্তর্গূঢ় জগৎ	৬৪
পুতুলনাচের কুসুম চরিত্রের অন্তর্জটিলতা	৭৩
লালসালু : জমিলার অন্তর্লীন বিশ্ব	৮৩
লালসালু : ওয়ালিউল্লাহ্'র রাষ্ট্রচিন্তা	৯২
চাঁদের অমাবস্যা : ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের আত্মকুণ্ডলায়ন	১০০
তারাশঙ্করের হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : সীমানা ভাঙার শৈলী	১১০
বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের সংকট	১২৩
মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক জীবন	১২৯
শ্রমজীবীর শ্রেণী-সঙ্গীত	১৩৫
পলাশীর পতন ও বাঙালি মানস	১৪২
গণতন্ত্রের স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন	১৫৫
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নভূমি	১৬০
শরৎচন্দ্রের গফুর ও জাতিগত শুদ্ধিকরণ	১৬৮
শিল্পবাদী সাহিত্যের শত্রু-মিত্র	১৭৬
নববর্ষ	১৮৪
রাষ্ট্র চরিত্র ও একুশ	১৮৮
ওয়ালীউলাহ'র উদ্বাস্তু বাক্য	১৯২
কৃষ্ণপক্ষে তারুণ্যের সাহিত্য	১৯৭
বাংলা তারিখের অন্তর্ধান	২০০
স্বাধীনতার দুর্ভোগ	২০৫
মাস্টারদার কংকাল	২১০
উত্তরাধিকার	২১৫

উত্তর-উপনিবেশবাদ ও বাংলাদেশের উপন্যাস ২১৯
বাংলাদেশের ছোটগল্পের রূপান্তর ২২৭
বিভূতি ভূষণের নিশ্চিন্দিপুর : ঔপনিবেশিক ভূমিতল ২৩৪
বাঙালির সাম্রাজ্যহীন উপনিবেশ ২৪৪
একরাত্রি মধ্যবিত্তের ঠিকানা ২৫৩
মুক্তিযুদ্ধে আমাদের অর্জন ২৫৯
আমাদের সাহিত্যের ভাষারীতি ২৬৬
সাহিত্যে সাম্রাজ্য ও অশ্বখুরধ্বনি ২৭০
কার্ল মার্কসের কাছে ফেরা ২৭৩
বাংলাদেশে শিল্প-সংস্কৃতি চর্চা রাজধানী ও মফস্বল ২৭৭
বাংলা ভাষার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ২৮১
আমাদের সাহিত্যের আগামী দিন ২৮৫
বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের সাহিত্য চর্চা ২৮৯
বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের বাস্তবতা ২৯৩
শিল্পীর সংযোগহীনতা ২০৭
সাহিত্যের ময়না তদন্ত ৩০৩
সাহিত্যের নয়া জামানার জন্য ৩০৮
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর রাজনৈতিক প্রবন্ধের গদ্যশৈলী ৩১৩
জ্যোতিপ্রকাশ দত্তঃ বিকল্প গদ্যের কারিগর ৩২০
বাঙালির সাহিত্যে সমুদ্র ৩২৫
মিথ-পার্শ্বক্রিয়া : সমাজ ও সাহিত্যে ৩৩১

কথাসাহিত্যে খণ্ডিত মানুষ

মানুষকে নিয়েই কথাসাহিত্য; মানুষই কথাসাহিত্যের জৈব উপাদান। মানুষ একভাবেই এক অদ্বিতীয় সত্তা। সে অখণ্ড বিস্ময়কর এক জীব। তার শরীর-বিজ্ঞান যেমনি জটিল, রহস্যময় তেমনি মনোবিজ্ঞান। কথাসাহিত্যে যেসব মানুষ আসে চরিত্র হিসেবে, ঘটনার অনুঘটক হিসেবে, তারা প্রত্যেকেই পরিপূর্ণ মানুষ; ক্ষুদ্র ইতর প্রাণী নয়। ধনী-নির্ধন-ভদ্র-ইতর-মেধাবী-অশিক্ষিত যা কিছু পরিচয় বহন করুক না কেন সমাজ জীবনে, তারা কেউ ক্ষুদ্র জলবিন্দু নয়; মহাসমুদ্র। অনাধুনিক গ্রাম্য নির্বোধ যে মানুষ সমাজ শাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করে আছে; সে শূন্য চেতনার নয়। তার অন্তরেও অবিকশিত সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে বিচিত্র জটিল দ্বান্দ্বিক চরিত্রের বিশাল এক জগৎ। যে মানুষটি দৃশ্যত নির্বিরোধ সে-ও অসীম মানব সত্তার অধিকারী। মানব চরিত্রের ভেতর যে লেখক-শিল্পী মানুষের সেই অখণ্ড পূর্ণাঙ্গ রূপটির সন্ধান পান তিনিই বড় শিল্পী; জীবন-কথকের মহান কথক।

বিশেষ কোন চরিত্রের জীবনাচার, বিশ্বাস, বোধ কিংবা আত্মিক চেতনার সঙ্গে লেখকের আপন সত্তার মিল নাও থাকতে পারে। তাই বলে তার প্রতি অশ্রদ্ধা নিয়ে চরিত্র চিত্রণ করতে গেলে সেই মানুষের অন্ধকারটাই চোখে পড়বে, আলোটা নয়। কথাসাহিত্যে লেখক যদি কেবলই তার দোষ খোঁজেন এবং বিদ্রূপ করেন তবে সেই চরিত্রটির সমগ্রতার খোঁজ তিনি পাবেন না।

বহু চরিত্রেই লেখক যৌন কুয়াচার, ঈর্ষা, গ্লানি, লোভ এবং নিষ্ঠুরতাকে অতি সহজেই খুঁজে পাবেন। তার কাছে মনে হবে চরিত্রটি ইতর প্রাণীর চেয়ে বড় নয়। অথচ লেখকের জ্ঞান বা বুদ্ধিশক্তির অনুসন্ধানের বাইরে থেকে যাবে ঐ দুশ্চরিত্রের মানুষের ভেতরকার গোপন মহামানুষটি। এমনি অবস্থায় তিনি তার সাহিত্যে সৃষ্টি করেন যে মানুষ, সে খণ্ডিত এবং ভগ্নাংশ মাত্র।

মহৎ কথাসাহিত্য খণ্ডিত মানুষকে ধারণ করে না। সেই সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ মানুষকে স্থান করে দেয় তার ভুবনে। যখন একজন মেধাবী শিল্পী ভাল-মন্দ,

শুভ-অশুভ, যে কোন চরিত্রের সঙ্গে নিজের মানসিক ব্যবধান কমিয়ে আনতে সক্ষম হন, তখনই পাষণ্ড-নিষ্ঠুরের ভেতরও পূর্ণ একক মানবকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন তিনি।

যে কোন চরিত্র যে কোন মতবাদে বা আদর্শে বিশ্বাসী থাকতে পারে। শিল্পীর সঙ্গে সেই চরিত্রের বিরাট বেমিলও থাকতে পারে। কিন্তু প্রতিভাবান শিল্পীর দায়িত্ব হচ্ছে শিল্প নির্মাণকালে নিজের আদর্শের ভেতর নিঃশেষিত না হওয়া। যতক্ষণ তিনি চরিত্রটিকে চিত্রিত করবেন ততক্ষণ আপন লালিত বিশ্বাসের বৃত্তের বাইরে থাকবেন। আত্মবিচ্ছিন্ন বা আত্মবিভক্ত মানস নিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষকে ধরা যায় না।

জীব-জগতের বহু জটিল বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতি আধুনিক মানুষ আজ যেখানে শরীরের গঠন ও চেতনার স্তর নিয়ে এসেছে, তার জটিল এবং বহুমাত্রিক সত্তাকে আবিষ্কার করা আধুনিক কথাশিল্পীর দায়িত্ব। একজন উগ্র অতি আধুনিক মানুষের চরিত্রেও আদিম বর্বর যুগের আরণ্যক মৃগয়া-জীবনের অন্ধকারের স্মৃতি সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। একই সঙ্গে সেই মানুষটির সত্তায় থাকতে পারে ঘোর তমস ও অত্যাধুনিক সভ্যতার সর্বোচ্চ মহিমার মিশ্রণ। এই যে মানুষের দ্বৈত কিংবা বহুমাত্রিক অস্তিত্বের ঠিকানা, তার অনুসন্ধান করেন বড় শিল্পীরা।

সামন্তচিন্তা, বুর্জোয়াচিন্তা, সাম্যচিন্তা অর্থাৎ যে কোন চিন্তার চিন্তক হতে পারেন একজন শিল্পী। কিন্তু তিনি যখন সামাজিক ব্যক্তিকে চিত্রিত করবেন তখন নিজেকে মুক্ত করে আনতে হবে ছকে বাঁধা বিশ্বাস থেকে। তার সহানুভূতি থাকবে সমগ্র মানুষটির সত্তার প্রতি, খণ্ডিত ভঙ্গুর মানুষটির প্রতি নয়। পুরুষবাদ, নারীবাদ, ব্যক্তিবাদ, রাজনৈতিক আদর্শবাদ এবং অর্থনৈতিক মতবাদের ভেতর আপন শিল্প সত্তাকে আটকে রাখলে কোন লেখকই পরিপূর্ণ চরিত্রকে খুঁজে পাবেন না। তাকে ব্যক্তিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে যতক্ষণ তিনি তার সৃষ্ট চরিত্রের আবিষ্কারকের ভূমিকায় থাকবেন।

চরিত্রের প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব নয়, বরং বিচিত্র জটিল প্রকৃতির মানব চরিত্রের সঙ্গে তার সত্তার নিবিড়তা স্থাপন করতে হবে। একজন দুর্বৃত্ত এবং দরবেশ তার কাছে সমমাত্রার বিবেচনায় না এলে চরিত্র একপেশে হতে বাধ্য। মানুষ অতীন্দ্রিয় নয়, সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তাই সে বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আলো এবং অন্ধকার একাকার হয়েই মানুষের অস্তিত্বের সমগ্রতা।

আমাদের কথাসাহিত্যের চরিত্রগুলো প্রায়ই একরৈখিক। তাদের জীবনের বৈচিত্র্য এতটাই ক্ষীণ এবং অনাবিস্কৃত যে, বিশ্বসাহিত্যের বিচারে মনে হবে মানবজাতির অবিচ্ছেদ্য সদস্য হয়েও তারা ভিনগ্রহের নির্দ্বন্দ্ব প্রাণী। কোন কোন চরিত্র অস্তিত্বের জটিলতায় উঠে এলেও অস্পষ্ট কুয়াশার মতো এই ধারাবাহিকতা গল্প-উপন্যাসের জন্মকাল থেকে আজ অবধি সমান্তরালে ধাবমান। আমাদের প্রতিভাবান শিল্পীরা সামাজিক বাস্তবতা সৃষ্টি করেছেন,

ইতিহাস-ঐতিহ্যে পদচারণা করেছেন এবং মধ্যবিত্তের চেতনায় ঘা দেবার চেষ্টাও করেছেন। গদ্যশৈলী নিয়েও তারা চেষ্টার সফলতা দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন তা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ মানবচরিত্র সৃষ্টি। এর কারণ ঔপনিবেশিক মানস থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারা-না পারার বিষয়।

উপনিবেশ এবং গণতন্ত্রের সমাজ নিয়ে যে দ্বন্দ্ব তারই প্রভাব রয়েছে লেখকদের মানসে। যে রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা, মূল্যবোধ আমরা লাভ করেছি তার মডেল তৈরি করেছে ঔপনিবেশিক শক্তি। এবং এটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য আজও চলেছে খবরদারি। লেখক যদি তার নিজস্ব সামাজিক, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক, রাষ্ট্রিক ঐতিহ্যের স্কেলে বাঁধা থাকেন, কী করে তিনি নিজের মধ্যে সত্যানুসন্ধানের কৌতূহল জাগাবেন? কেননা লেখকের চারপাশে যে বৃত্ত তা তো উত্তর-উপনিবেশের নব্যধারার ফল। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ভাষা, স্থান এবং ছকে বাঁধা ঐতিহ্যের উর্ধ্বে যে মানবসত্তার সমগ্রতা, তার স্পর্শে যদি কথাশিল্পী তীব্র অনুভূতিশীল বা কৌতূহলী না হন, তবে তিনি মানুষের সমগ্রতাকে স্পর্শ করতে ব্যর্থ হবেন। তিনি বারবার কেবলই খণ্ডিত মানুষ নিয়ে কথাসাহিত্যের খেলা করে যাবেন।

আমরা কথাসাহিত্যের শিল্পীরা যেসব চরিত্র সৃষ্টি করি তাদের প্রত্যেকের রয়েছে জটিল অস্তিত্ব সত্তার অদৃশ্য বৃত্ত। চরিত্রের সেই রহস্যময় জগতে আমাদের বিচরণ করতে হবে। নাস্তিক, আস্তিক, সাম্যবাদী, গণতন্ত্রী, প্রতিক্রিয়াশীল যে কোন লেখকের কাছেই মহৎ শিল্প মানুষের পূর্ণাঙ্গতা দাবি করে। তাই শিল্পীর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের চেয়ে বড় সত্য হয়ে ওঠে রক্ত-মাংসের মানব চরিত্র। প্রতিটি লেখককেই তার নিজস্ব সমাজ নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। সেই সমাজ লেখকের অনুভূতি, বিশ্বাস, স্বাধীনতা, বিধিবিধান এবং শিল্পকে নির্ধারণ করে দেয়ার চেষ্টা করে এবং প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিক সেই লেখক তখন সমাজ সমষ্টিরই অংশ। কিন্তু লেখক হিসেবে তিনি আলাদা, স্বতন্ত্র।

লেখক যখন একটি দুর্বৃত্ত সমাজ-চরিত্র নির্মাণ করেন তখন যদি তার দৃষ্টিকে সমাজের গভীর তলদেশের আলো এবং অন্ধকারে টেনে আনতে সক্ষম হন, তবেই তিনি দেখতে পাবেন দুর্বৃত্ত সমাজের অভ্যন্তরেও লুকিয়ে আছে সভ্যতার অসীম সম্ভাবনা। দেখতে পাবেন পচা-গলা নরকের ভেতরও স্বর্গের আলো। ইউরোপীয় সাহিত্যে এ-সবের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। সেসব সাহিত্যে অভাব নেই পশুত্বের ভেতর মানুষ্যত্বের দ্যুতি। আমাদের ছোটগল্পে আর উপন্যাসে এমন দৃষ্টান্ত মেলে না। কোথাও এমন চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে লেখক যখন নিজের অজান্তে আপন সত্তাকে চরিত্রে আরোপিত করে ফেলেন তখনই চরিত্র খণ্ডিত হবার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। গল্পকারকে মনে রাখতে হবে তিনি একজন ব্যক্তিত্ববান শিল্পী মাত্র। চরিত্রের নিরপেক্ষ বহুমুখী বিকাশই তার ব্যক্তিত্বের কাজ। যে লেখক আপন অর্জিত সংস্কারের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হয়ে চরিত্র নির্মাণ করেন তিনি মানব চরিত্রের বৈচিত্র্য নির্মাণ

করতে ব্যর্থ হবেন। তাই একজন উদারবাদী বুর্জোয়া, কট্টর ধর্মীয় মৌলবাদী, ঘোরতর নাস্তিক, গোঁড়া কমিউনিস্ট, উগ্র জাতীয়তাবাদী লেখকের দ্বারা পূর্ণাঙ্গ মানব চরিত্র নির্মাণ অসম্ভব। কেননা তার দর্শন, মানুষকে দেখে খণ্ডিত রূপে।

আমাদের চলমান বিশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থায় একজন মানুষ পরিপূর্ণ মানুষে বিকশিত হতে পারছে না। মানুষ হিসেবে তার সত্তার বিকাশ অনুকূল পরিবেশ পাচ্ছে না। তাই মানুষ হয়ে উঠছে মিথ্যার দাস। ধনবাদী আগ্রাসন আর যন্ত্রসভ্যতার প্রভাবে আত্মশক্তির উচ্চতা হ্রাস পাচ্ছে এবং বাড়ছে যন্ত্রনির্ভরতা। মানুষ আজ রাষ্ট্রের প্রভু নয়, রাষ্ট্রই মানুষের প্রভু হয়ে তার সৃষ্টিশীলতাকে ক্ষয় করছে। যে যন্ত্র মানুষ আবিষ্কার করছে, সেই যন্ত্রই মানুষকে পরিণত করছে ক্রীতদাসে।

এই বৈরী সময়ে একজন শিল্পীকে প্রবল আত্মশক্তি আর আত্মবিশ্বাসী না হলে তার স্বাধীন শিল্প-ব্যক্তিত্বও অবিকশিত থেকে যাবে। এমন পরিবেশে সমাজ-রাষ্ট্রের চোখ দিয়ে মানুষকে দেখলে দেখাটা হবে অসম্পূর্ণ এবং বিকৃত।

কল্পনা করা যেতে পারে এমন একটি মানব চরিত্র যে জন্ম থেকে দীর্ঘজীবনে অপরিবর্তিত রয়েছে। কিন্তু মেধাবী শিল্পী যদি তার চরিত্রের জটিল অব্যক্ত গ্রন্থি উন্মোচন করেন তবে দেখতে পাবেন ইতরপ্রাণীর মতো অনুভূতিশূন্য মানুষটির ভেতরেও রয়েছে বিস্ময়কর অচেনা অন্য এক মানুষ। ধর্ম-ঈশ্বর-সমাজ এবং জৈবতাড়িত চরিত্রটি খোলা চোখে ধরা দেয় অতি সামান্যরূপে। ক্ষমতাবান লেখকেরা ওই তুচ্ছ সামান্য অসম্পূর্ণ মানুষটির ভেতর জীবনের সমগ্রতার সন্ধান পান।

মেধাহীন বা স্বল্প মেধার লেখকের সৃষ্টি যে মানব চরিত্র তা প্রচলিত সমাজের স্ট্যাম্প মারা চরিত্র। হোক সে বিত্তবান কিংবা মধ্যবিত্ত অথবা বিত্তহীন, মানব জীবনের সমগ্রতা সবার মাঝেই ধরা দেয়। উচ্চবিত্তের প্রতি ঘৃণা, মধ্যবিত্তের প্রতি ঠাট্টা-ইয়ার্কি এবং নিম্নবিত্তের প্রতি করুণা প্রদর্শন করাই লেখকের একমাত্র কাজ নয়। লেখক প্রতিটি শ্রেণীর ভেতর মানুষের সমগ্রতার অনুসন্ধানী। সেই সমগ্রতার ভেতর যেমনি আছে পাপ, তেমনি পুণ্য। একেবারে জড়াজড়িভাবে আছে নীচতা-হীনতা আর উদার মনুষ্যত্ব। মানুষের সেই সমগ্রতার সংবাদ জানতেন শেক্সপীয়র, গ্যাটে, চসার, দস্তয়োভস্কি, সার্ত্রে, তলস্তয়, আরো বহুজন। কী বিস্ময়কর শিল্প প্রতিভা ছিল আদি কবি বাল্মীকি কিংবা বেদব্যাসের। অন্ধকার বর্বর যুগে বসে তাঁরা মানব চরিত্রের যতটা সমগ্রতার সন্ধান পেয়েছিলেন তা আজও বিস্ময়ের।

এ কথা বাস্তব সত্য যে, বিশ্বমানের সাহিত্যিক মানব চরিত্রের সন্ধান আজো বাংলাভাষী কথাশিল্পীরা খুঁজে পাননি। ইউরোপীয়দের মতো সমৃদ্ধ মহাকাব্য আমাদেরও ছিল। ইউরোপীয়রা মহাকাব্যের মানুষকে আধুনিক কথাসাহিত্যে প্রতিস্থাপনে সক্ষম হলেও আমরা ব্যর্থ। আমাদের শিল্পসত্তা রোমান্টিক মানসে ডুবে গেল, ক্লাসিক মানসে উন্নীত হয়ে জীবন সমগ্রতার

সন্ধান পেল না। সমাজ সংকীর্ণতার প্রতি বাঙালি দেখালো আনুগত্য, সীমা লঙ্ঘনের ভয়-সংশয়ে রইল আবদ্ধ। যুক্তি, বুদ্ধি এবং সত্যানুসন্ধানে এগিয়ে গেল না। ভাবাবেগ-আচ্ছন্ন এই জাতি সাহিত্যের নামে তৈরি করে চলেছে সাহিত্যের স্থূলতা এবং খণ্ডিত মানবসত্তা। মানুষের ভগ্নাংশ। জীবনের ভগ্নাংশ।

আমাদের কথাসাহিত্যের জগৎ প্রবলভাবে আত্মকেন্দ্রিক। ভাববাদী কবিদের মতো কথাসাহিত্যিকেরাও দেহের ভেতর অচিন পাখি খুঁজতে খুঁজতে নিজের কাছে নিজেই অচিন হয়ে রইল। মানব অস্তিত্বের ভেতর তারা কেবলই দেখতে পায় পবিত্র প্রেম বা অপবিত্র গ্লানি। যা তারা ভয় পায় আত্মবিদ্রোহে। তাই তারা সামাজিক বাস্তবতার বাইরে যে আর এক বাস্তবতা রয়েছে, তা দেখতে পায় না। সমাজ বাস্তবতার ভেতর ঘুরপাক খাওয়া মানুষকে তারা দেখে বাইরে থেকে।

সেই মানুষের অন্তহীন যন্ত্রণা এবং মুক্তির পিপাসার সন্ধান না পেয়ে প্রগতিশীল লেখকেরাও নিম্নবর্গের মানুষের সাদামাটা বাস্তব জীবনকেই এঁকে গেলেন। উদাসীন শিল্পী হয়ে কেবল পর্যবেক্ষণ করেই দায় সারলেন। দরিদ্র মানুষের জীবন সংগ্রামের কঠিন বাস্তবতার অতিরিক্ত ভবিষ্যত সম্ভাবনাকে তারা খুঁজে পান বলেই তাদের সৃষ্টি 'নির্মোহ'। এই যে তথাকথিত 'নির্মোহ' 'নির্লিপ্ত' পলায়নী শিল্প-কৌশল প্রগতিবাদী লেখকের, তা আসলে তাদের শিল্প অক্ষমতার ফসল। তারা যেমনি চিনতে অক্ষম মধ্যবিত্তের জীবন সমগ্রতাকে, তেমনি নিম্নবর্গের।

লেখকদের এই ব্যর্থতার কারণ তাদের মানব চরিত্র সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা। বিচিত্র মানব সভ্যতা এবং মানুষের জৈব সাংস্কৃতিক জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলেই তারা শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মানুষের পূর্ণাঙ্গতাকে ধরতে অক্ষম। এই প্রগতিবাদী দাবিদার লেখকেরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কৌশলে অথবা বর্ণনা রীতির দ্বারা শুধুমাত্র সামাজিক অসঙ্গতিকে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু সমাজ সমস্যা, নিম্নশ্রেণীর মানুষ বা মধ্যবিত্তের পূর্ণাঙ্গ জীবন চিত্রণে অসফল। শোষিত মানুষগুলোর ক্ষুধা বা বঞ্চনাকে তারা দেখলেও অনুসন্ধান করেননি তাদের আটপৌরে উদরকেন্দ্রিক জীবনের অন্তঃগভীরে মনস্তাত্ত্বিক জীবন চেতনাকে। ক্ষুধা-বঞ্চনার সঙ্গে মিলেমিশে রয়েছে যে জৈব আর মানসলোক-মিশ্রণে তৈরি জগত, তার সন্ধান এসব লেখকের কাছে অজ্ঞাত। তাই নারীকে শুধু নারী, পুরুষকে পুরুষ, শোষককে শোষক, শোষিতকে শোষিত হিসেবে দেখে অখণ্ড মানব সত্তাকে খণ্ড-বিকৃত করা হচ্ছে।

অতি আধুনিক জীবনবাদী আত্মজিজ্ঞাসু বিজ্ঞানমনস্ক শিল্পীই পারেন মানব চরিত্রের গভীর জটিল রহস্যের উন্মোচন ঘটাতে। এর সঙ্গে প্রয়োজন কথাসাহিত্যের ভাষারীতির নবরূপায়ণ। একজন ব্যক্তিমানুষ সে যে-শ্রেণীরই প্রতিনিধি হোক না কেন, তার অস্তিত্বের বহুমাত্রিক অন্তঃস্থল অনুসন্ধানে যিনি সার্থক তিনিই সফল কথাকার। কেননা কথাসাহিত্য সমাজ ও সমাজস্থিত

মানুষের জটিল সূক্ষ্ম অস্তিত্ব রহস্যের ভূমিতেই দণ্ডায়মান। সেই অস্তিত্ব কেবল অর্থনৈতিক জীবনকে ঘিরে নয়, আশা-প্রত্যাশা, হিংসা-প্রেম, কাম-ভীরুতা, সাহস, প্রাকৃত-অপ্রাকৃত বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে ঘিরেও। এখানেই কথাসাহিত্যের চরিত্র মনস্তাত্ত্বিক জগতে বিস্ময়কর পরিপূর্ণ মানুষরূপে ধরা দেয়।

বাংলা কথাসাহিত্যের লেখকেরা যদি গোগোল, দিদরো, ফক্‌নার, তলস্তয়, জেমস জয়েস, টমাস মান, আলব্যেয়ার ক্যামু ইত্যাদি বিশ্বসাহিত্যের প্রতিভার সমন্বয়ে নিজস্ব মানস জগত তৈরি করতে সক্ষম হয় তবেই কেবল বহুমাত্রিক চরিত্র সৃষ্টিও অসম্ভব নয়। আবারও বলতে হয়, প্রাচীন মহাকব্যের কাহিনী ও চরিত্রের সূত্র ধরে ইউরোপে উদ্ভব ঘটে কথাসাহিত্যের। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর মহাকাব্যের দ্বারা 'রাবণ' চরিত্রের বহুমাত্রিকতা দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে বহুবাচনিক চরিত্র সৃষ্টির সুযোগ করে দিলেও আমরা তা অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়েছি।

কেবল ইউরোপীয় মুগ্ধতা আমাদের কথাসাহিত্যকে বিস্ময়কর সৃষ্টির কাছে পৌঁছে দিতে পারবে না। কেননা ওখানকার আধুনিক শিল্প-মতবাদ আলোর পাশাপাশি গোলকধাঁধাও সৃষ্টি করে। উত্তর-আধুনিকতার মতন মতবাদ কেবল সমাজকেই নয়, মানুষকেও খণ্ডিত করে। সেই মতবাদ জীবনকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়, মানুষের অখণ্ড অস্তিত্ব-সংগ্রামকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

জাদুবাস্তবতা, নৃতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা, ঐতিহ্যবাদ নিম্নবর্গের সাহিত্য ধারণা প্রকৃত অর্থে বিচ্ছিন্নতাবাদেরই নামান্তর। এসব সাহিত্যতত্ত্ব দিয়ে মানুষের অস্তিত্ব জগতের সমগ্রতা এবং জটিল চেতনা বিশ্বের পরিপূর্ণ রূপ লাভ অসম্ভব। এ যেন অন্ধের হাতি দেখার মতো। যদি আমরা কথাসাহিত্যে জীবন সমগ্রতাকে পেতে চাই তবে চরিত্রের বহুমাত্রিক চেতনার জগতে অনুপ্রবেশ ভিন্ন অন্য কোন পথ নেই।

ফেব্রুয়ারি ২০০৪

ঔপনিবেশিক-কালের রেনেসাঁস ও কথাসাহিত্যে সাম্য

আধুনিক যুক্তিবাদী এবং সৃষ্টিশীল বাঙালির উদ্ভব সম্ভব করেছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অভিঘাত। ভাববাদের সঙ্গে বস্তুবাদের চূড়ান্ত সংঘাতকে সেই অভিঘাত অনিবার্য করতে ব্যর্থ হলেও তার সম্ভাবনাকে সৃষ্টি করেছিল। একটি স্বাধীন ভূখণ্ডে রেনেসাঁস এবং ঔপনিবেশিক শক্তি শাসিত ভূখণ্ডে রেনেসাঁসের গতিপ্রকৃতি সঙ্গত কারণেই ভিন্ন। গ্রিকদের কাছ থেকে আরবীয়রা, আরবীয়দের থেকে স্পেন, ইতালি হয়ে ইউরোপ ভূখণ্ডের নতুন সমাজ-মানসজগতের উদ্ভব ঘটে স্বাধীন ইহজাগতিক সত্তার ভেতর।

অধীন বঙ্গ-ভারত সেই অর্থে রেনেসাঁসের ক্রিয়াকলাপ লাভে সক্ষম হয়নি। ঔপনিবেশিক বন্ধনের ভিতর শাসক গোষ্ঠীর দ্বারা অপরিশুদ্ধ হয়ে রেনেসাঁস আসে বলেই এ দেশে স্বাধীন ব্যবসায়ী শ্রেণী থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের পরিচর্যার ক্ষেত্র তৈরি হয়নি। ইংরেজি, গ্রিক, লাতিনসহ অপরাপর ইউরোপীয় ভাষার সূত্র ধরে পশ্চিম থেকে যে নতুন চিন্তার প্রবল অভিঘাত আসার কথা ছিল, তা বিকৃত হয়ে পড়ে ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণীর হাতে। বিজ্ঞান বা দর্শন চর্চার মতো শিল্পসাহিত্যের চর্চায়ও নীতিনির্ধারক হয়ে দাঁড়ায় শাসকেরা।

রেনেসাঁসের ভিতর দিয়েই আধুনিক মানুষ লাভ করে নিজত্ব এবং অস্তিত্ববোধকে। ইউরোপে এভাবে স্বাধীন ব্যক্তিত্ববান মানব সমাজের জন্ম হলেও আমাদের সমাজে তা ঘটেনি। যে অস্তিত্ববোধ রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা [illegible]পলোকে জন্ম দেয়, আমাদের উপনিবেশ-শাসিত দেশে তার কণ্ঠরোধ করার চেষ্টাটাই ছিল বড়! পরিকল্পিত-ভাবে তাই স্বাধীন বিজ্ঞান উদ্ভাবক এবং [illegible] বাণিজ্যিক শ্রেণীকে পেছনে ঠেলে শাসকেরা তৈরি করে জমিদারি এবং [illegible]পল্লিতে অর্থ বিনিয়োগকারীদের। তাই উচ্চতর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সামাজিক সংগঠন তৈরির বদলে বাঙালিরা তৈরি করল ধর্মীয় পুনর্জাগরণের সংগঠন। কি হিন্দু সমাজ, কি মুসলমান সমাজ।

তথাকথিত জাতীয় উজ্জীবনের নামে প্রথম হিন্দু সমাজ এবং শেষে তারই নির্ধারিত পথে মুসলিম সমাজ সৃষ্টি করে জাতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী মতবাদ। তাই এই দুই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস আর ধ্যানে এসে যুক্ত হয় পৌরাণিক ভারতভূমি এবং আরব-ইসলামী শাসনের স্মৃতি। এর ফলে ইউরোপের মতো এ-দেশে প্রবল ব্যক্তিত্বশালী স্বাধীন মুক্তচিন্তার এবং মুক্তবুদ্ধির নতুন নতুন জ্ঞানজিজ্ঞাসার একটি বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সৃষ্টি হতে পারেনি। এ-দেশে মাইকেল, বিদ্যাসাগর, রামমোহন, দ্বারকানাথ, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভার জন্ম হলেও, জন্মায়নি কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, মেকিয়াভেলি, ফিচিনো, রাফায়েল, লিওনার্দো, শেক্সপিয়র, পেত্রার্ক বা বোকাচিও-এর মতো বহুমাত্রিক প্রতিভা। তথাকথিত সেই রেনেসাঁস যুগের নিকট বা দূর-উত্তরকালে তাই বাংলায় বিস্ময়কর প্রতিভার প্রাজ্ঞ-বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর এত অভাব দেখা দেয়।

ইউরোপের আত্মজিজ্ঞাসু মানুষ যেখানে মনুষ্যত্বের ভিতর অতিপ্রাকৃত শক্তি বা ধর্মের কল্পনা করতে রাজি ছিলেন না, বিস্ময়কর সত্য এই যে, আমাদের হিন্দু-মুসলমান রেনেসাঁসবাদীগণ সেখানেই আত্মবিসর্জন দিলেন। এর অদৃশ্যে ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির মায়াজাল। রেনেসাঁসের ইহলোকবাদিতা যেমনি মানুষের অসীম সম্ভাবনাময় শক্তির অনুসন্ধানী, সেখানে আমাদের আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে হয়েছে ধর্মের কাছে। সেখানেই তো মানুষ দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বামন হয়ে যায়, অসহায় হয়ে পড়ে। মানুষের সামনে এসে দাঁড়ায় আধ্যাত্মিকতার মহাদানব। তাই সেই অতীত উন্মেষের যুগে আমাদের প্রাজ্ঞ অগ্রজগণ চোখ ফিরিয়েছিলেন বস্তুপ্রকৃতির বদলে অতিপ্রাকৃত কল্পনায়। স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুও হার মেনেছিলেন ঔপনিবেশিক প্রভুর কূটচালে এবং স্বদেশী শিক্ষিত শ্রেণীর কটাক্ষের কাছে।

প্রাচীন ভারতের জড়বাদী দর্শন ভবিষ্যতের অসীম সম্ভাবনার আলো জ্বালাতে চেয়েও ব্যর্থ হয়ে যায়। একদিকে সমাজে নির্দয় বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাবল্য, অন্য প্রান্তে ইতিহাসের নানা ক্রান্তিলগ্নে ভক্তিবাদের প্রসার আত্মজিজ্ঞাসু মনাবসমাজ গড়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। মুসলিম সমাজেও আরব-খিলাফতের স্মৃতি, পির-সুফি-সহজিয়া মতবাদ সমাজস্থিত মানুষকে এগিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে ধূসর, কুয়াশায় ঢেকে রাখে। যে রেনেসাঁস বাঙালিকে অন্ধকার প্রাচীন এবং মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য এবং অগ্রসরমান উন্নত ইহজাগতিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তুলে নেওয়ার কথা ছিল, তা অসমাপ্তই রয়ে গেল।

নয়া উপনিবেশবাদের জন্মের মধ্য দিয়ে বাংলায় প্রত্যক্ষ উপনিবেশবাদের সমাপ্তি ঘটে। আর এই নয়া উপনিবেশবাদ আরো জটিল, বহুমাত্রিক এবং ভয়ংকর। স্বশাসনে ফিরে এলেও বাঙালি পারে না নয়া উপনিবেশবাদের বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে। শাসকশ্রেণীর মগজে থাকে পুরানো প্রভুর প্রতি দাসত্বের আনুগত্য। রক্তে থাকে লুণ্ঠনের প্রেরণা। ঔপনিবেশিক পদবি 'বাবু'

আর 'সাহেব' আলস্য, কামকাতরতা, চটুলতা, লাম্পট্য, প্রতারণা, মিথ্যাচার, মানসিক, সাম্প্রদায়িকতা আর সাম্রাজ্যবাদের পা-চাটুয়ে স্বভাব তৈরি করে। এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ভেতরই সব পরিচালিত হয় এবং হচ্ছে। হবে [illegible] আরো দীর্ঘ সময়।

আমাদের সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, রাজনীতিকে বিবেচনা করতে গেলে ঔপনিবেশিক শক্তির আদর্শে তৈরি তথাকথিত স্বাধীন [illegible]নাকে বিবেচনা করতে হবে। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার চোখ দিয়েই তো আমরা বিশ্বকে দেখেছি, চিনেছি, নিজেদের জেনেছি। ইউরোপের মহান রেনেসাঁসকে উপনিবেশবাদীরা কী কৌশলে বিকৃত করে আমাদের উপহার দিয়েছে, তা অবশ্যই বড় বিষয়। আমাদের শিল্পসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি এর দ্বারাই নির্ধারণ করা যায়। পেছনের বিশ্ব-ইতিহাসে ফিরে তাকালে দেখতে পাব [illegible]মানদের হাতে পরাক্রম রোম সাম্রাজ্যের পতন কোনো দৈব বা কাকতালীয় ঘটনা নয়। সাম্রাজ্যের পতন সম্ভব করেছিল রোমানদের মানসজগতের পতন। ঠিক তেমনিভাবে ভারতবর্ষে আর্য্য বিজয়, তুর্কি-আরব বিজয় এবং ইংরেজ শাসনের পত্তন এই অঞ্চলের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক মানস ভূমির অধঃপতনের পথ ধরেই এসেছিল।

দুঃশাসন, গণপীড়ন এবং ধর্মান্ধতা কীভাবে সামাজিক মানুষের স্বাধীন জ্ঞানচর্চা ও পিপাসাকে হত্যা করে তার দৃষ্টান্ত ইউরোপের মধ্যযুগ। সেই যুগ ছিল অন্ধকারে ফিরে যাওয়ার যুগ। মানবসভ্যতার অভিভাবক নগরী অ্যাথেন্সের জ্ঞান মনীষার চর্চার কেন্দ্রগুলোতে তখন তালা পড়ে। আধুনিক সভ্যতার কারিগর গ্রিক জ্ঞান-গুণী পণ্ডিতেরা দেশ ছেড়ে বাধ্য হয়ে অভিবাসনে চলে [illegible] ইরান-সিরিয়া ইত্যাদি জনপদে। এভাবেই গ্রিক সভ্যতার বিলুপ্তপ্রায় অমূল্য সম্পদগুলো নতুন আশ্রয় খুঁজে নেয় আরবীয় মনীষায়। ইউরোপের [illegible] অন্ধকার যুগে আরবগণই জ্ঞানের বিচিত্র শাখা-প্রশাখাকে সযত্নে কেবল লালনই করেনি, বিকশিতও করেছে।

পরবর্তীকালে গ্রিক সভ্যতার মতো আরবীয় সভ্যতা যখন শাসকশ্রেণীর [illegible] পতিত হয় এবং ধর্মান্ধ ইমামদের তৎপরতায় সংকটে পড়ে, তখন জ্ঞান বিজ্ঞান নতুন অভিবাসনের সন্ধানে সীমান্ত পেরিয়ে চলে যায় ইউরোপে। প্রকৃত অর্থে ইউরোপীয় সভ্যতার রেনেসাঁস বা নবজাগরণ সম্ভব করেছিল যে আরবীয় সভ্যতা, তা স্থায়ীভাবে ঠাঁই করে নেয় ইউরোপের নানা ভূখণ্ডে। সেই নবজাগরণই বা রেনেসাঁসেরই ফসল আধুনিক হিউম্যানিজম বা মানবতাবাদ। এই মানবতাবাদের মানুষেরাই বড় হয়ে ওঠে অতিপ্রাকৃত শক্তি তথা ঈশ্বর কল্পনাকে ছাড়িয়ে গিয়ে। তখন ঐশ্বরিকতাকে ছাড়িয়ে মনুষ্যত্ব উর্ধ্বগামী হয়।

মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির নামই হচ্ছে মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্বের সাধনায় দৈব বা ঐশী শক্তির কল্পনা অবাস্তব। মানুষ যে ঈশ্বরের হুকুম তামিলকারী আত্মসমর্পণকারী যন্ত্র নয়, নিজেই নিজের ঈশ্বর; এ-কথা রেনেসাঁসই

শিখিয়েছে নব নব উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক এবং শিল্পতত্ত্বের দ্বারা। বিজ্ঞানের গ্যালিলিও, কোপারনিকাস; সাহিত্যে শেক্সপিয়র, বোকাচিও, অরিওস্তো; দর্শনে লরেঞ্জো, পিনেত্রো, মেকিয়াভেলি; শিল্পকলায় ডুয়েরার, রাফায়েল, লিওনার্দোর মতো মনীষীদের নাম বারবার উচ্চারণ করতে হয়। কেননা রেনেসাঁসের এসব জ্ঞানী-গুণীরা তাঁদের বিস্ময়কর মেধাশক্তি দ্বারা ইউরোপের অন্ধকার যুগের অবসান ঘটান। তাঁদের উদ্ভাবিত পদার্থবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান শিখিয়েছে, আধ্যাত্ম-শক্তি অর্জন নয়, বরং মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে বিকশিত করাই রেনেসাঁসের আসল কাজ।

এই রেনেসাঁসই ব্যক্তিমানুষের বিকাশ থেকে ক্রমে ধর্ম-বর্ণ-গোত্রকে অতিক্রম করে বিশ্বমানবে উন্নীত হওয়ার শিক্ষা দিয়েছে। কেবল তাই নয়, রেনেসাঁসই মানুষের সঙ্গে মানুষ এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের পরম আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করেছে। আর এই যে আত্মশক্তির ব্যক্তি-মানুষ, তার আত্মপ্রকাশ ঘটে বিজ্ঞানে-সাহিত্যে-শিল্পে। অন্য প্রান্তে বঙ্গ-ভারতে রেনেসাঁস ধর্মকেই বড় করে তুলেছিল মানুষের চেয়ে। সম্প্রদায় বা জাত-ধর্মকে বড় করতে গিয়ে সৃষ্টি করেছে মৌলবাদ তথা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ। কি হিন্দু কি মুসলিম সমাজে মানুষ ক্ষুদ্র হয়ে যায়, বড় হয়ে উঠে ধর্মবাদ। আত্মসমৃদ্ধির বদলে এ-দেশে হয়েছে আত্মকেন্দ্রিকতার চর্চা। বর্তমান কাল তারই দৃষ্টান্ত।

বিশ্বপ্রকৃতি ও বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-গোত্রভেদে মানুষের সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হলেই সম্ভব আত্মসমৃদ্ধি। প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থগিত বা বাতিল করে কেউ কখনো বিকশিত হতে পারে না। আমাদের দেশে বর্তমানে পরিবেশ-প্রকৃতির সঙ্গে সমাজের বৈরী-ধ্বংসাত্মক সম্পর্ক এবং নারীসহ দুর্বল সম্প্রদায়ের প্রতি হিংস্রতা এই সত্যকেই প্রমাণ করে। গ্রিক সভ্যতার বিশ্বপরিভ্রমণে দেখা যায় যে, তা গণ্ডিতে বন্দি হয়ে থাকেনি। পরিভ্রমণের দ্বারা বিকশিত করেছে আরবীয় সভ্যতাকে। তারপর ইতালি হয়ে ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড ইত্যাদি দেশে সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে।

রেনেসাঁসের এই সুদীর্ঘ কাল ও স্থান-পরিভ্রমণ প্রমাণ করেছে, ধর্ম যদি মানুষকে শাসন করে, ভয় দেখায়, লোভী করে তোলে স্বর্গ লাভের জন্য, তবে মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব। ধর্মীয় গোষ্ঠীবোধ যদি সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরে তবে মানুষ পরস্পর থেকে কেবল বিচ্ছিন্নই হয় না, হিংস্র পশুতে পরিণত হয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি থেকে শুরু করে জীবন ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সভ্যতাবিরোধী ধর্মীয়গোষ্ঠীবোধ মানুষকে পশুর স্তর অতিক্রম করতে দেয় না।

সেই ব্যর্থ কিংবা বিকৃত রেনেসাঁসই আমাদেরকে আধুনিক মানুষে উন্নীত হতে দেয়নি। তাই যুগধর্মের কাজ থেকে গেছে অসমাপ্ত। আমাদের ভূখণ্ডের সেই অবিকশিত যুগকে ধরে আমরা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের দিকে তাকাতে

পারি। মধ্যযুগের সীমারেখা টেনে যাঁরা উনিশ শতকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে আধুনিকতার স্তরে উন্নীত করেন তাঁদের শ্রম ও মেধার কাছে আমরা ঋণী। সাহিত্যের জন্য সেসব মনীষীদের কঠিন শ্রমের মধ্য দিয়ে তৈরি করতে হয়েছে ভাষা তথা ভাষার রূপরীতি।

'আমাদের অনুসন্ধান সেখানে নয়। আমরা দেখব সাহিত্যের আলাদা এক জগতকে। আমরা এটাও জানি, সাহিত্যকে আধুনিকতার স্তরে উন্নীত করার তাগিদে তাঁদেরকে ইংরেজি ছাড়াও ইউরোপের সমৃদ্ধ নানা ভাষা চর্চা করতে হয়েছিল। ইংরেজি ভাষাকে যেমনি নানা উপাদান সংগ্রহ করতে গ্রিক, লাতিন, ফরাসি, ইতালীয়, স্প্যানিশ প্রভৃতি ভাষার কাছে যেতে হয়েছিল ইংল্যান্ড নামক দ্বীপবাসীকে জ্ঞান চর্চায় উচ্চতর জগতের সন্ধান দিতে; বাংলা ভাষাও তাই। কিন্তু বিশ্বজ্ঞানের এই পরিভ্রমণের রোডম্যাপ বাঙালিদের তৈরি করে দিয়েছিল ইংরেজরা। সংকটের সৃষ্টি ওখানেই।

ঔপনিবেশিক প্রভুর নির্ধারিত আদর্শ ও রূপরীতির বন্ধনে বাঙালি বাঁধল তার সাহিত্যের আদর্শকে আধুনিকতার নামে। আধুনিকতা যে ইহজাগতিক বিরোধী তা কেউ স্বীকারই করল না। তাই বাংলা গদ্যের শুরুটাই হয়েছে রেনেসাঁসের বিদ্রোহকে পাশে ঠেলে। অথচ প্রচার করা হয়েছে রেনেসাঁসেরই নামে। জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ এবং আর্থসামাজিক শ্রেণী বিভাজনকে আঁকড়ে ধরে কেবল গদ্যই নয়, কবিতাও আধুনিক হতে চাইল। সেই পরাধীনকালের দাস মানসে তৈরি উপন্যাস লিখতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রতিভাধরকে লিখতে হয় 'আনন্দমঠ' বা 'দুর্গেশনন্দিনী'। স্বদেশী (মুসলমান) হয়ে যায় দুশমন, ত্রাণকর্তা হয়ে উঠে পরদেশী ইংরেজ। পরিপূর্ণ স্বাধীন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনুষ্যত্ববোধে উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হলেন বঙ্কিম– যা কিনা বিকৃত রেনেসাঁসের দান। উপনিবেশবাদী মানস ধারণ করে বঙ্কিমচন্দ্রকে সৃষ্টি করতে হয় জাতি বা ধর্মবিদ্বেষ। প্রতিপক্ষ হওয়ার কথা ছিল না মুসলিম লেখকদের। পরিণামে ঘটল তা-ই। মুসলিম লেখকগণ পালটা লিখলেন 'রায়নন্দিনী'।

বঙ্কিমকে যে ফাঁদে ফেলল শাসক ইংরেজ, বঙ্কিমও একই ফাঁদে টেনে নিলেন মুসলমান লেখকদের। ঔপনিবেশিক শাসনের ভেতর পিচ্ছিল পথ খুঁজে পেয়ে বাংলা ভূখণ্ডে রেনেসাঁসের নামে জাতি-বর্ণ-ধর্ম বিদ্বেষী হিন্দুত্ব পুনরুদ্ধার, আর ইসলামিক পুনর্জাগরণের দানবের জন্ম হয়। তথাকথিত সেই রেনেসাঁস নামের কলঙ্কই পরবর্তীকালে ধর্মে-ধর্মে হানাহানির ভিতর দিয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয় দেশ, মনুষ্যত্ব আর সভ্যতা হয় ধর্ষিত, সৃষ্টি হয় বর্বর যুগের ধর্মরাষ্ট্র। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ।

উপনিবেশের শাসকেরা বাঙালিকে ইংরেজি ভাষা শিখিয়ে নিজেদের অধীনস্থ ডেপুটি বানায়, নিজেদের পোশাক পরায়, জমিদার বানায়, শিকারের জন্য বন্দুক হাতে তুলে দেয়। ওরা বাঙালিকে কিছুতেই হতে দেয় না শিল্প উদ্যোগী ব্যবসায়ী, যন্ত্রশিল্পের উদ্ভাবক। দেয় না যান্ত্রিক জলযান নিয়ে

মহাসাগর জয় করে বিশ্ববাজারের অনুসন্ধানী হতে। তাই বাঙালির দর্শন চর্চা ধর্মীয় বিবরের কুহক সৃষ্টি করে চলে। মনুষ্যত্ববাদ, ইহলোকবাদ বা ধর্মনিরপেক্ষবাদকে বর্জন করে ধর্মভিত্তিক মানবতাবিরোধী জাতীয়তাবাদকে বড় করার চেষ্টায় মেধার অপপ্রয়োগ করে গেল বাঙালি। ওরা ইতিহাস চর্চার নামে গবেষণা করে 'বাংলায় হিন্দু রেনেসাঁস' বা 'মুসলিম রেনেসাঁস'। 'হিন্দু সাহিত্য' কিংবা 'মুসলিম সাহিত্য'। কী নির্মম কদর্য বাস্তবতা!

রেনেসাঁসের উদ্ভব যেখানে ধর্ম আর অন্ধকারের দুনিয়াকে অস্বীকার করে, সেখানে বঙ্গ-ভারতে তাকে পৈতা পরানো হয়, সুন্নতে-খাতনা করানো হয়। ধর্মাশ্রিত ঐতিহ্য সন্ধানে যে মেধার অপচয় হয়েছে অতীতে এবং বর্তমানে হচ্ছে এই দেশে, তা সভ্য সমাজের কাছে বিস্ময়ের বদলে হাস্যকর। রেনেসাঁসের নামে এখানে ঘটানো হয়েছে ধর্ম বা পরলোকবাদের পুনর্জাগরণ। ইউরোপের মৃতদেহ এ-দেশে এসে মৃতদের জগৎ থেকে প্রেতাত্মা হয়ে জেগে ওঠে। যে জাতি ধর্মীয় মৌলবাদের তত্ত্বে আত্মপরিচয় খোঁজে, অখণ্ড মানব অস্তিত্বকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে, আত্মপরিচয়ের নামে জাতীয় ভূখণ্ডকে খণ্ডবিখণ্ড করে, তার পরিণতি আজকের অন্ধকার এই দুঃসময়। অন্ধকারের এই কবর-যাত্রা কালের পর কাল ধরে চলতেই থাকে। 'বাঙালি' না 'বাংলাদেশী' এই আত্মঘাতী নির্বোধের তর্কে হয়তো কেটে যাবে হাজার বছর, মুক্তি আর ধরা দেবে না অন্ধকার প্রেতের দুনিয়া থেকে।

উপনিবেশবাদের ঔরসে জন্ম নেয় বাঙালির রাজনৈতিক দর্শন। হঠাৎ আলোর ঝলকের মতো উচ্চতর আদর্শ এখানে বারবার আসে, কিন্তু ঠাঁই পায় না। প্রেতের হুংকারে সেই আলো নিভে যায় বারবার। সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার খুঁজতে রেনেসাঁসবিরোধী অন্ধকারেই ডুবে মরে। হিন্দুরা খোঁজে পৌরাণিক যুগের কুয়াশার স্মৃতি, মুসলমানেরা হা-হুতাশ করে খিলাফতি জামানার স্মৃতি নিয়ে। অথচ সেসবে কোথাও নেই যুক্তিবাদিতা, বুদ্ধিবাদিতা বা বিজ্ঞান মনস্কতা। রেনেসাঁস যেখানে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগায়, সেখানে বাংলার দুই প্রধান জনগোষ্ঠীকে তথাকথিত সেই রেনেসাঁস শেখাল পরস্পরকে ঘৃণা করতে, একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে। এই বিচ্ছিন্নতার পথটা আরো দীর্ঘ, আরো দুর্গম অন্ধকারাচ্ছন্ন। পরস্পর অবিশ্বাস, ঘৃণা আর বিচ্ছিন্নতার প্রবল চাপ অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের বেলায় যা ঘটল, পাকিস্তানের বেলায়ও তাই।

এত যে ভাঙল, এত যে অবিশ্বাস ধর্মের প্রশ্নে, ভাষার প্রশ্নে, গোষ্ঠীর প্রশ্নে, এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে চায় না বাঙালি। ঐক্যবদ্ধ যুদ্ধে বিজয়ের পরপরই আবার বিচ্ছিন্নতা। দানব হয়ে জেগে ওঠে আত্ম-আবিষ্কারের জটিল প্রশ্ন। জনগণ নানা ভাগে ভাগ হয়ে যায় একই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের ভেতর। কেউ বাঙালি, কেউ বাংলাদেশী। হাস্যকর যে, ওরা একই দেশে অদৃশ্য সীমানায়

দুটো রাষ্ট্র বানিয়ে ফেলেছে। একটি বাঙালির, অপরটি বাংলাদেশীর। সীমানা বদলালে বলেই সংঘাত থামে না। অথচ প্রান্তবাসী আদি জনগোষ্ঠীর কথা কারো মনে থাকে না। জোর করে বারবার তাদের বানানোর চেষ্টা চলে বাঙালি বা বাংলাদেশী। তারই পরিণতি অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম।

হিন্দুরা যেমনি তুর্কি-ইরানি-আরবীয় ঐতিহ্যপ্রিয় মুসলিম সমাজকে জানার, বুঝার জন্য কৌতূহলী হল না, মুসলমানেরাও তেমনি প্রতিবেশী হিন্দুর শাস্ত্র-পুরাণাশ্রয়ী সমাজ সম্পর্কে অজ্ঞই রয়ে গেল। অন্ধের মতো শত শত বছর পাশাপাশি বসবাস করলেও পরস্পরকে জানাজানি হল না। স্থূল দৃষ্টিতে কেউ দেখল গো-মাংস, কেউবা দেখল মূর্তি-পূজা। কারো ধর্মের গভীরে কেউ অনুসন্ধানই করল না। হিন্দু-মুসলমানের এই আত্মকেন্দ্রিকতা নিজেদের সম্পর্কেও করে রাখল অন্ধবিশ্বাসে আবদ্ধ। মুসলমানেরা আরব দেশ থেকে আগত ধর্ম সম্পর্কে জানাজানিতে যতটা আগ্রহী, ঠিক ততটাই অনাগ্রহী মধ্যযুগের ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তি এবং বুদ্ধিবাদের বিস্ময়কর উত্থান সম্পর্কে জানতে; গ্রহণ করা তো দূরের কথা।

একই ঘটনা ঘটল হিন্দুদের বেলায়। রেনেসাঁসের নামে একদল ঢুকেছিল পৌরাণিক রূপকথার রহস্যময় জগতে। অন্যদল পিউরিটিয়ান, বেদ-উপনিষদ ঘেঁটে ব্রাহ্মণ্যবাদের পরিবর্তে তৈরি করল ব্রাহ্মবাদ। কোনো দলই ফিরে তাকানোর সময় পেল না ভারতীয় দর্শনের জড়বাদ তথা নিরীশ্বরবাদ জগতের দিকে। দেখা যাবে আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্যও কীভাবে একই সংকটের অন্ধকারে পথ হারিয়েছে। আজো শেষ হয়নি অন্ত হীন সেই বিবর যাত্রা।

এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই অতি আধুনিক যুগে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান গণতন্ত্র, মার্ক্সবাদ আর যুক্তিবাদ চর্চা করেও হিন্দুত্ব আর মুসলমানিত্বের জীর্ণ খোলস ছেড়ে মনুষ্যত্বের মহিমায় উজ্জ্বল হতে পারল না। পশ্চিমবঙ্গে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্টরা ২৪ বছর ধরে রাজ্য শাসন করেও জনগণের সঙ্গে জাত-পাত-ধর্মের মীমাংসায় আসতে পারল না আজো।

বাংলাদেশের সমস্যা ও সংকট আরো বহুমাত্রিক। ভাষাভিত্তিক আন্দোলন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী যুদ্ধের বিজয় আজ একাকার হয়ে গেছে উগ্র ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সঙ্গে। পেছনে তাকানো যাক। নানা রকম জটিল প্রশ্নের মীমাংসা স্থগিত রেখেই এ-দেশে ঔপনিবেশিক যুগের শেষ প্রান্তে সাম্যবাদী বিপ্লবের জোয়ার সৃষ্টি হয়। ব্যাপক গণবিচ্ছিন্ন আন্দোলন স্বাভাবিক কারণেই ব্যর্থ হয়ে যায়। হাস্যকর এবং দুঃখজনক এই যে, কমিউনিস্টদের পরিচয় হয় 'হিন্দু কমিউনিস্ট' আর 'মুসলমান কমিউনিস্ট' নামে। মাথায় টুপি আর গলায় পৈতাঅলা কমিউনিস্টগণ সেদিন দৃষ্টি দেওয়ার সময় পাননি বিপুলসংখ্যক মানুষের সাংস্কৃতিক অতি সূক্ষ্ম পার্থক্যের দিকে। 'হিন্দু কমিউনিস্টগণ' যেমনি দৃষ্টি দেওয়ার সময় পাননি বিপুলসংখ্যক মুসলমান

দরিদ্র কৃষক এবং শোষিত জনসাধারণের দিকে, ঠিক তেমনি 'মুসলমান কমিউনিস্টগণও' হিন্দু জমিদার জোতদার বিদ্বেষী হতে গিয়ে শোষিত মুসলমান প্রজাদের হিন্দুবিদ্বেষী করে তোলেন।

কলকাতাকেন্দ্রিক যতগুলো সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল উঁচু বর্ণের হিন্দুদের দ্বারা, তাতে যতটা অবহেলিত থেকেছে নীচু বর্ণের তথাকথিত হিন্দু সমাজ, তেমনি পরিত্যাজ্য হয়েছে মুসলমান সমাজ। নীচু বর্ণের হিন্দুদের উঁচু বর্ণের হিন্দুরা ঘৃণা করতে করতে সেই ঘৃণাকে টেনে নেয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র অশিক্ষিত মুসলমান সমাজের দিকে। অথচ রায় বাহাদুরদের পরম বন্ধু ছিল খান বাহাদুরেরা। রাজনৈতিক আন্দোলনের বেলায় বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অথচ এসব আন্দোলনের প্রেরণা বা উৎস শক্তিই ছিল মনুষ্যত্ব ও যুক্তিবাদী রেনেসাঁসের দর্শন।

তথাকথিত সেই বঙ্গীয় রেনেসাঁসের পথ ধরে বাংলা গদ্যের যে ঐতিহ্য গোড়াতে তৈরি হয়েছিল তা আজো নানা রূপ-চেহারায় একই রয়েছে। কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যিক-গদ্য যে ঔপনিবেশিক যুগে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে হিন্দু লেখকদের প্রতিবেশী মুসলমান সমাজের কথা মনেই ছিল না। ঠিক তেমনি তাঁদের দৃষ্টির ভেতর আসেনি নিজেদের ধর্মাশ্রয়ী নিম্নবর্ণের মানুষেরা। পরবর্তীকালে মুসলমান লেখকগণও পরিত্যাগ করে হিন্দু সমাজকে। ঔপনিবেশিক কূটচালে এভাবেই আটকে যায় হিন্দু-মুসলমান লেখকেরা।

কতকিছু উলট-পালট হল কালের অভিঘাতে। যায় উপনিবেশবাদ, আসে নয়া উপনিবেশবাদ। এরই জটিল এবং সর্বগ্রাসী রূপ হচ্ছে আজকের বিশ্বায়ন তত্ত্ব। কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্যে নানা ধারা ও রূপের মধ্যে অপরিবর্তিতই থেকেছে মূল কাঠামোটি। কলকাতা আর ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্যের দিকে তাকালে ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে যায় কলকাতার হিন্দু লেখক আর ঢাকার মুসলমান লেখকদের শুরুতে যেমনি, সমকালেও তেমনি মনেই থাকে না তাদের প্রতিবেশীদের জীবনও সাহিত্যে স্থান করে নিতে চায়। বাণিজ্যিক কারণে কলকাতার বাজার কাটতি লেখকেরা পার্শ্বচরিত্র হিসেবে মুসলমানদের তুলে আনেন কখনোসখনো। ওই লেখকেরা যে মুসলমান সমাজের কৃষ্টি-কালচার সম্পর্কে কতটা অজ্ঞ তা তাদের লেখা থেকেই বেরিয়ে আসে। কোন নামাজের কোন ওয়াক্ত, আজান পড়লে মুসলমান মেয়েরা পরিধানের বস্ত্র মাথায় টানে কিনা, কোরআন শরীফ ঘরের কোন স্থানে এবং কী রঙের কাপড়ে ঢাকা থাকে, সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই তাদের। কলকাতার হিন্দু মেয়ের সঙ্গে মুসলমান ছেলের বিয়ে-প্রেমের রসালো বর্ণনা দিয়ে লেখা গপ্পো ওরা ফাঁদে ঢাকার বাজারের দিকে তাকিয়ে।

ঢাকার অবস্থাটা ঠিক একই রকম। দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু নিয়ে দু'একটা সফল গল্প ছাড়া হিন্দু সমাজ ও তার সংকট নিয়ে লেখা চোখেই পড়ে না।

কলকাতার মতোই উদ্ভট হিন্দু-মুসলমান যুবক-যুবতীর প্রেম-বিয়ের দু'একটা গল্প-কাহিনী মিলে, যার ভেতর সমাজ-রাজনীতি বা চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাতের কোনো চিত্রই নেই।

বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান নিয়েই কেন বলি, ওই যে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহে লাখ লাখ আদিবাসী রয়েছে, তাদের কথা কোন লেখকের মনে রয়েছে? তাদের জীবনের সংকট, অস্তিত্বের ঘাত-প্রতিঘাত ক'জন লেখক জানেন, বুঝেন? লেখক-কবিরা সেসব জায়গায় ভ্রমণ বিলাসে গমন করেন। প্রকৃতির কোলে প্রাকৃত সমাজের যুবতীর শরীরের উপমা তাই কবিতা বা গদ্যে পাওয়া যায়। ভ্রমণকাহিনীতে আছে দেশি মদের কথা, নাচ-গানের কথা, নারীর স্বল্প বসনের কথা। যা নেই তা হচ্ছে, সেসব সমাজের চির বঞ্চনা, অস্তিত্বের সংকট, সাংস্কৃতির আগ্রাসন, নৃতাত্ত্বিক উন্মূল-নিষ্ঠুরতার বিশ্বস্ত সাহিত্যিক রূপ।

স্মরণ করা যায় বঙ্কিমচন্দ্রকে আবারো। বাংলায় ৫/৬ শত বছরের মুসলিম শাসন এবং হিন্দু সমাজে তাঁর অভিঘাতবাহী স্মৃতি তাঁকে ভয় দেখায়। মুসলিম সামন্ত শাসকদের প্রজাপীড়নটাই কেবল তাঁর মানস-কল্পনায় ভেসে বেড়ায়, হিন্দু সমাজে ইসলামের ইতিবাচক প্রভাবগুলো তিনি দেখতে পান না। সেই স্মৃতি তাঁকে মুসলিমবিদ্বেষী হয়ে 'আনন্দ মঠ' লিখতে প্রেরণা যোগায় এবং ঔপনিবেশিক জাদুমন্ত্র মোহ সৃষ্টি করে ইংরেজ শাসনের প্রতি। তিনি স্বপ্নাবিষ্ট হন পৌরাণিক যুগে, জাতীয় নেতৃত্ব সন্ধান করেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে রাজনৈতিক নায়ক শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে।

তাঁর উলটো দিকে মুসলমান লেখকগণও একই উদ্দেশ্যে, একই দৃষ্টিভঙ্গিতে ফিরে তাকান বখতিয়ার খিলজি, বীর খালিদ আর আরব মরুভূমির দিকে, সবুজ শস্যভূমির মাতৃভূমি চলে যায় আড়ালে। তারা আশ্রয় সন্ধান করেন বঙ্গ-ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাসের ভেতর। ঠিকানা হারিয়ে ফেলা অভিযাত্রীদের মতো ঐতিহ্যের আশ্রয় খোঁজেন ইরান-তুরান-আরবে।

ওই যে নিরুদ্দেশ শেকড়-ছিন্ন যাত্রা শুরু, তা আজো একই পথে পদচিহ্ন রেখে চলেছে দ্বিখণ্ডিত বাংলার লেখকরা। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মেধাবী কথাশিল্পী। ওয়ালীউল্লাহর বহুমাত্রিক ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টিকারী বাংলা গদ্য সাহিত্যের অবিনাশী অপ্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি। ইলিয়াসের স্যাটায়ারধর্মী গদ্যে নিজস্বতা আছে। সব মিলিয়ে উদারবাদী বাংলা-সাহিত্য নির্মাণের সফলতা তাঁদেরকে স্মরণীয় করে রাখবে দীর্ঘ সময়।

এত যে শক্তির অধিকারী এ-দু'জন কথাশিল্পী, সময় তাঁদের কাছে প্রত্যাশী ছিল বহুমাত্রিক সৃষ্টির। অথচ তাঁরা ফিরেও তাকালেন না ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের জীবন-যন্ত্রণা আর অন্তহীন রাজনৈতিক সংকট নিয়ে উপন্যাস কিংবা বড় গল্প লেখার দিকে। কেবল তাই নয়, বিশ্ব-আধুনিক যুগের

যারা স্রষ্টা, যাদের শ্রম এবং মেধা বদলে দিয়েছে মানুষের সমাজকে, সেই কারখানা শ্রমিকদের নিয়ে গল্প-উপন্যাস লেখার প্রয়োজনীয়তাও তাঁরা উপলব্ধি করলেন না। কারখানা শ্রমিকই বলি কিংবা দলিত বা নিম্নবর্গের মানুষের কথাই বলি, যেসব লেখকের কলমে-মেধায় এদের স্থান হয় না, কী করে তারা লিখবেন সাম্যবাদী সাহিত্য?

পরিতাপের বিষয় এই যে, আজ দলিত বা নিম্নবর্গের মানুষেরা জীবন বঞ্চনার পাশাপাশি সাহিত্য বঞ্চনার কারণেই বিদ্ধ হয়েছে হতাশায় এবং অভিমানে। এই সুযোগ নিয়েছে সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার বিদেশি সাহায্য সংস্থা এবং মিশনারিগুলো। তারা আদিবাসী কিংবা অন্ত্যবর্ণ শোষিত-নির্যাতিত-বঞ্চিত মানুষকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে বৃহৎ জনগোষ্ঠী থেকে। ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক বিদ্রোহ (শাঁওতাল, হাজং ইত্যাদি) পুনরায় যেন দানাবেঁধে না-ওঠে তারই কূটচালে ব্যস্ত। তাই দলিতদের দিয়েই তৈরি হয়েছে দলিত সাহিত্যতত্ত্ব বা আন্দোলন। উদ্দেশ্য মার্ক্সবাদী বিপ্লবকে ঠেকানো। বিপ্লব বিচ্ছিন্ন করতে হলে প্রয়োজন পড়ে মার্ক্সবাদী সাহিত্যকে প্রতিহত করা। এই তাত্ত্বিকেরা বিশ্বাস করেন অন্ত্যজ বা দলিতদের নিয়ে সাহিত্য রচনার একমাত্র অধিকার দলিতদেরই। এটির উদ্ভব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে। ব্ল্যাক লিটারেচার বা কালো মানুষের সাহিত্যের নামে সাহিত্যের মূলধারা থেকে এভাবেই সাম্রাজ্যবাদ বঞ্চিত-শোষিত মানুষের সৃষ্টিশীলতা এবং সংস্কৃতিকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। কেননা কালো বা দলিত সাহিত্যতত্ত্বে বিশ্বাসীরা মার্ক্সবাদী বিপ্লবকেও অস্বীকার বা খারিজ করে দেয়। এরা উদারবাদী সাহিত্যকদেরই মতো সাহিত্যে রক্তাক্ত বিপ্লব প্রবেশ করার বিরোধী। উদারবাদীদের মতোই সাহিত্য তাদের কাছে ক্যামেরার চলমান বা স্থির ছবি। কেননা রক্তাক্ত সংগ্রামকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে তারা।

বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, স্থিরকৃত বিকলাঙ্গ রেনেসাঁস ওই যে আত্মবিশ্বাস বর্জিত, উচ্চতর দর্শনশূন্য লেখক-শ্রেণীর জন্মের ঠিকানা তৈরি করে গেল, আজো সেই ভূমির মায়াজাল ছিন্ন করতে পারেনি এ-দেশের লেখকদের বিপুল অংশ। বিদেশি অধীনতার কালে যেমনি, আজ স্বশাসনের যুগে বসেও ওরা নিজস্ব সাহিত্যের ঐতিহ্যের ঠিকানা হাতড়ে মরে।

মাটি ও মানুষের ক্রমবিকাশের ইতিহাস থেকে শিক্ষা না-নিয়ে তারা সাহিত্যের ঐতিহ্য খোঁজে পৌরাণিক কাহিনীতে, ভক্তিবাদী আন্দোলনের পদাবলী গানে, পির-ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহে, পুঁথির বয়ানে: পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। হিন্দু আর মুসলিম, বৌদ্ধ আর প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে গড়ে-ওঠা যে সাহিত্যিক ঐতিহ্য, সেখানে তারা ঠিকানা খুঁজে পায় না। সাংস্কৃতিক শেকড়বিচ্ছিন্নতাই যেন ওদের ঠিকানা। ঔপনিবেশিক ক্রীতদাসের আনুগত্য, ব্যক্তিত্বহীনতা, হীনম্মন্যতা, ক্রোধ, হিংসা, শোক-হতাশা-দুঃখ আর

আত্মনিগ্রহ-মানসজাত বাঙালি সমাজ স্বাভাবিক কারণেই তাদের শিল্প-সাহিত্যের অভিযাত্রাকে উচ্চতর মনুষ্যত্ববাদে উন্নীত করতে ব্যর্থ হয়েছে—প্রতিটি প্রচেষ্টায়। রেনেসাঁসের সর্বশেষ স্তর যে সাম্যবাদ, সেখানে পৌঁছা তো স্বপ্নমাত্র। কথাসাহিত্যে ক্রমবিকাশমান সভ্যতার উচ্চতর দর্শন এবং শিল্পজাত মননক্রিয়ার কতটা ঘাটতি রয়েছে আমাদের সৃষ্টিতে তা বিশ্বসাহিত্যের পাশাপাশি রেখে বিবেচনা করলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। বিশ্বমানের আত্মজিজ্ঞাসু, জীবন সূক্ষ্মতার অন্বেষী, ভাষার অভিনব দক্ষতায় সৃষ্ট কথাসাহিত্য বাঙালির আয়ত্তের বাইরে রয়ে গেল আজো।

মানব অস্তিত্বের বহুমাত্রিক জটিল রহস্যকে উন্মোচন করা কথাসাহিত্যের প্রধান দায়িত্ব। এটি এমনি এক তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান, যেখানে বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা-প্রশাখা মানব অস্তিত্বের জটিল রহস্যকে ঘিরে বহমান। মনের জটিল দ্বন্দ্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অভিঘাতকে ক্রমাগত ভাঙতে ভাঙতে চূড়ান্ত দ্বন্দ্বের দিকে এগিয়ে যায়। মানুষের বহুমাত্রিক অস্তিত্বসত্তা যা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দেশ-কালকে অতিক্রম করে সর্বমানবিক সত্তার দিকে ধাবিত, মহৎ উপন্যাসের গভীর শৈল্পিক দর্শনের সংবাদ তারই ফল। সে বিচ্ছিন্ন নয় জাতি, ধর্ম, ভাষা, সাংস্কৃতিক বিভাজনের ভেতর। সংকীর্ণতার স্থান সেখানে নেই। রেনেসাঁসবাদী সাহিত্যের প্রস্থানভূমি সেখানেই নির্ধারিত। কেবল শেক্সপিয়রই নন, সেই বহুমাত্রিক শিল্পগুণের সংবাদ রাখতেন মায়াকোভস্কি, গোগল কিংবা তুর্কেনিভ।

মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ মহিমা অর্জনে ব্যর্থতা, সামাজিক সূত্রে পাওয়া মানস-পঙ্গুত্ব এবং সাম্য-সমাজভীতি আমাদের করে রেখেছে সংকীর্ণ বাঙালি এবং বাংলাদেশী। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে বিশ্ব মহামানবের সমুদ্র, তাতে আত্মপরিচয় হারানোর ভয়ে আমরা ধর্মের সংকীর্ণ খোলসে ঢুকে আত্মরক্ষা করতে চাই। আমাদের ধর্মীয় পরিচয় আচ্ছন্ন করে আছে সাহিত্যের মানসলোক। তাই সাহিত্যের ভিতর মানুষ বড় হয়ে উঠতে পারে না। মানুষকে ছাড়িয়ে উর্ধ্বে মাথা তোলে সমাজ, রাষ্ট্র আর ধর্মের ঐতিহ্য। এর প্রমাণ বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম যুগ। আধুনিক যুগের সূত্রপাতই ঘটানো হয়েছে ধর্মীয় সংকীর্ণতার ভেতর। লেখকের স্বাধীন সত্তার চেয়ে সেদিন বড় হয়ে উঠেছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শ শক্তি।

ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিতজনেরা তো মনুষ্যত্বকে বড় করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ওই ঔপনিবেশিক শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল শাসিত ন্যাটিভদের মানুষ হিসেবে ক্রমান্বয়ে খাটো করে ফেলা এবং ধর্মকে উঁচু করা। সেই শিক্ষায় শিক্ষিতরাই ছিল তৎকালে তথাকথিত রেনেসাঁসের ধারক। তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল সমাজের অন্য মানুষ থেকে উঁচু হয়ে ওঠা এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া। তাই সেই শ্রেণীর-সাহিত্যিকদের রচিত সাহিত্যে চরিত্রের বাইরের এবং অন্তরের বিচ্ছিন্নতা বড় হয়ে উঠেছে। কথাসাহিত্যের ভাষা বা গদ্য নিয়ে বিভাজনটা

গোড়াতেই সৃষ্টি হয়েছে। কোনটা মুসলমানি গদ্য, কোনটা হিন্দুয়ানি গদ্য এ নিয়ে চলে গবেষণা, তৈরি হয় অভিসন্দর্ভ। এ যেন সেই হিন্দি আর উর্দুর জাত-ধর্ম নির্ধারণের মতো। কেননা বিচ্ছিন্নতার জন্য ভাষারও প্রয়োজন পড়ে আলাদা হওয়া। ভাষাকেও ধর্মান্তকরণ করতে হয় তাই। এ না হলে মানুষ থেকে মানুষকে পাকাপাকিভাবে বিচ্ছিন্ন করার কূটকৌশল যে টিকে না। তাই আরবি আর সংস্কৃত হরফে আলাদা রূপ নেয় সহোদর হিন্দি আর উর্দু।

আমরা যে বর্তমানকালের অধীনে আছি তা উদ্দেশ্যহীন। একদিকে সম্পদ আর মনুষ্যত্ব লুণ্ঠনকারী রাষ্ট্রশক্তি, অন্যদিকে রয়েছে আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য বঞ্চিত ব্যক্তি বা সমাজজীবন। এই নানাবিধ অপশক্তির হাতে বহুপূর্বেই আমাদের জীবনদর্শনের পতন ঘটেছে। তাই যুক্তি ও বুদ্ধিবাদিতার বদলে সর্বগ্রাসী মিথ্যাটাই বড় হয়ে উঠেছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে। ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার পরও আমরা আত্মপরিচয়ের গ্লানিতে ডুবে যাই।

আজ বাঙালি ও বাংলাদেশী তত্ত্বের বিতর্ক এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে যে, আমরা জীবনকে সুন্দর করার পরিবর্তে সত্যকে ভুলে মিথ্যাকে দানবের মতো বড় করে তুলছি। আমাদের লজ্জা-শরম নেই যে বিতর্কটাকে আমরা অজ্ঞাত জন্ম-পরিচয়ের শিশুরস্তরে তুলে এনেছি। সাহিত্যের ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে একই তর্ক বিরাজমান। যে সাহিত্য তার ঐতিহ্যের মীমাংসা করতে ব্যর্থ, সেই সাহিত্যের কাছে মানুষ কতটুকু প্রত্যাশা করতে পারে?

আমরা স্মরণ করতে পারি পাকস্তানি যুগকে। সৃষ্টির চেয়ে বিচ্ছিন্নতা তৈরির চেষ্টা ছিল রাষ্ট্রের। শুধু সাহিত্যের ঐতিহ্য নয়, ভাষাকে বদলে দেওয়ারও এক উন্মাদ চেষ্টা চালানো হয়। আমাদের মাতৃভাষা এবং যুগ যুগ ধরে বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট বাংলা বর্ণমালাকে বর্জনেরও চেষ্টা চলেছিল। বর্তমানে ঐতিহ্যের প্রশ্নকে প্রকৃত অর্থে সেই প্রেত-মানসিকতাই তুলে আনতে চাইছে। এক কথায়, পাকিস্তানি স্মৃতিকাতরতাই এর মূলে। একান্তরে দেখতে পাই রাষ্ট্রীয় জীবনে ভাষা কতটা শক্তিশালী হয়ে ওঠে ধর্মীয় মৌলবাদকে ছাড়িয়ে। অচিরেই ভাষার পশ্চাৎপদতা ঘটে। ধর্মীয় মৌলবাদ পুনরায় স্বমহিমায় সামনে এসে দাঁড়ায়। এভাবেই পরাজয় ঘটে উপনিবেশবাদের তৈরি করে যাওয়া বিকৃত রেনেসাঁসের।

॥২॥

মানবতাবাদের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে সাম্য। বাংলা ভূখণ্ডে মুক্তবুদ্ধির চর্চা ধরেই সাম্যবাদ তত্ত্বের সঙ্গে শিক্ষিতজনের পরিচয় ঘটে। সাম্যবাদী সমাজ গড়ার চেষ্টাও কম হয়নি এ দেশে। রুশ, চীন, পূর্ব ইউরোপের বিপ্লব স্বপ্ন দেখিয়েছিল মানুষকে। ছয় ও সাতের দশকে নকশাল আন্দোলনের জোয়ার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সার্থক হল কি ব্যর্থ হল, এটি বিবেচনায় না এনেও

জোর দিয়ে বলা যায়, মানুষ সাম্য-সমাজে বাস করতে চেয়েছিল। এর পাশাপাশি তে-ভাগা আন্দোলন, নাচোল বিদ্রোহ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠারই প্রাথমিক প্রচেষ্টা। ফকির-সন্ন্যাসী সামন্তবাদী বিদ্রোহের সঙ্গে এ-সবের তুলনা চলে না। ফকির-পির-সন্ন্যাসীদের যে আন্দোলন তা কোনোভাবেই বিদ্রোহের ঐতিহ্য হিসেবে কাজ করেনি।

সাম্যবাদী আন্দোলন আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের মুক্তির তত্ত্ব। বাংলাদেশের মানুষের এ-ছিল বিজ্ঞানের সঙ্গে রাজনীতির মিশ্রণের মহান দৃষ্টান্ত, অথচ এ দেশের সাহিত্যে সাম্যবাদী আন্দোলনের ইতিহাস সার্থকভাবে রূপায়িত হয়নি। গণমানুষের চেয়ে তত্ত্ব এবং নেতা বড় হয়ে উঠেছে। বিপ্লবের চেয়ে আবেগ স্থান পেয়েছে বেশি। তবে সবচেয়ে বড় কাজ হয়েছে কবিতার ক্ষেত্রে। সাম্যবাদী কাব্যধারা আমাদের সাহিত্যের সবচেয়ে গৌরবের অংশ। নজরুল থেকে যে ধারার সূত্রপাত তা পরিণতি লাভ করেছে সুকান্ত, সুভাষ আর সমর সেনের মতো কবিদের হাতে। কিন্তু কথাসাহিত্যে কবিতার মতো সাম্যের জীবন্ত-সরব উপস্থিতি নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে স্বর্ণ মিত্র পর্যন্ত সাহিত্যের ধারাটি খুবই ক্ষীণকায়। অপরাপর লেখদের নকশাল আন্দোলনের উপর লেখা কথাসাহিত্য ও স্কেচধর্মী বা ফটোগ্রাফিক।

নকশাল আন্দোলন কিংবা নৃতাত্ত্বিক বিবরণের সাহিত্যের বড় দুর্বলতা হচ্ছে বিবরণ বা ঘটনার ঘনঘটা, কিন্তু চরিত্র বিকাশের সমগ্রতার অপূর্ণতা। সমস্ত চরিত্রই একরৈখিক। তাদের মধ্যে বাইরের দ্বন্দ্ব যতটা দেখা যায়, অন্তর্গূত দ্বন্দ্ব ঠিক ততটাই অনুপস্থিত। জীবনসমগ্রতার ঘাটতি পরিণতিতে পৌঁছতে দেয়নি এসব কথাসাহিত্যকে। একজন সংগ্রামী বা বিপ্লবী, একজন শোষিত-নির্যাতিত খেটে খাওয়া মানুষেরও বহুমাত্রিক রূপ থাকে। চরিত্রের দ্বান্দ্বিকতায়, ঘটনার অভিঘাতে সেসব ক্রিয়া-বিক্রিয়া প্রকাশ পায়। সেই সে পরিপূর্ণ মানুষ যে কেবল বিপ্লবীই নয়, কেবল শোষিতই নয়, পরাজিতই নয়, বিজয়ী নয়; তার চেয়েও আলাদা সে– এমন চরিত্র বাংলা সাহিত্যে নেই।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে দু একটা ব্যতিক্রম ছাড়া চল্লিশের দশট কেটে গেল নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানী স্বপ্নের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। পাকিস্তানী আদর্শের চাপ একদিকে, অন্যদিকে ভাষা আন্দোলন– এই দ্বিমাত্রিক চাপে তরুণ লেখকেরা কাটিয়ে দেয় দ্বিধা-দ্বন্দ্বে। প্রকৃত অর্থে সামাজিক বাস্তবতার দ্বান্দ্বিকতা তৈরি করেছিল ভাষা আন্দোলন। তার সার্থক প্রয়োগ ধারণ করতে পারেনি তৎকালের কথাসাহিত্য।

ষাটের দশকে যেখানে সমাজস্থিত মানুষ গণতন্ত্র চাইছিল, ছাত্র আন্দোলন চলছিল গণতান্ত্রিক শিক্ষার দাবিতে, তখন বিভ্রান্ত তরুণেরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ইউরোপীয় ধনবাদী সাহিত্যের নানা চটুলতায়। ইউরোপে পচে যাওয়া পরাবাস্তববাদের ভূত এসে ঘাড়ে চাপে এ দেশের তরুণের। মেধা ও ক্ষমতার অভাবে সেই প্রেতাত্মাকেও সঠিক ব্যবহার করতে পারেনি তারা। কেবল

যৌনতাই বড় হয়ে ওঠে গল্পকথায়, সমাজ বা নাগরিক বাস্তবতার নামে। ষাটের শেষদিকে জাতীয়তাবাদের উত্থানপর্বে রাজনীতিতে সমাজবাদ বা সাম্যবাদের আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। কিন্তু কথাসাহিত্যে সেসব সামাজিক বাস্তবতার অভিঘাত সৃষ্টি হল না।

সেসব সংকট এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভেতর সেই সময়ের বৃত্তে আমরা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মতো বড় মাপের কথাসাহিত্যিক পেয়েছিলাম। দেশ ভাগাভাগির সংকট কিংবা স্বপ্নের কালে আমরা পেয়েছি তাঁর 'লালসালু', 'কাঁদো নদী কাঁদো', 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাস এবং 'নয়নচারা' বা 'একটি তুলসী গাছের কথা'র মতো মহান সাহিত্য। ইউরোপীয় শিল্পরীতি পরাবাস্তববাদ, প্রতীকীবাদ, অস্তিত্ববাদ এবং নিয়তিবাদের মিশ্রণে এমন সার্থক শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন বাংলা সাহিত্যে খুব কমই আছে। পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সাহিত্যের আলোকে সৃষ্টি হলেও এসব সাহিত্যের মূল্য অনেক। সে যুগে অমার্ক্সবাদী লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ যা পারলেন, মার্ক্সবাদে বিশ্বাসীরাও তা পারলেন না। 'নয়নচারা' গল্পের দুর্ভিক্ষ, 'একটি তুলসী গাছের কথা' গল্পের সাম্প্রদায়িক কারণে দেশ বিভাগের যে অভিনব শৈল্পিক রূপ, তার তুলনা কোথাও মেলে না। সাম্যবাদের বাইরে বুর্জোয়া-ধনবাদী সাহিত্যও যে কত মহৎ হতে পারে তার দৃষ্টান্ত 'লালসালু'।

কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ যতটা না ভাষার দক্ষতা দেখাতে পেরেছেন ততটা পারেননি চরিত্রগুলোর বহুমাত্রিক গতিপ্রকৃতিকে তুলে আনতে। 'নয়নচারা' গল্পের আমু চরিত্রের যে বিস্ময়কর অভিব্যক্তি, অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের প্রকাশ পেয়েছে, সেখানে 'লালসালু'-এর মজিদ একমাত্র অস্তিত্বভীতির ক্রিয়ার ভেতরই বিচরণ করেছে। তার মনের দ্বন্দ্বের বিচিত্র গতিপ্রকৃতি এবং রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে অনুভবের ক্রিয়া বিচিত্রমুখী হতে পারেনি। সম্ভাবনা ছিল জমিলার। এত ক্ষুদ্র পরিসরে একটি নারী চরিত্রের মানসিক জটিল বিশ্বকে লেখক যে পরিস্থিতির আরো জটিল-ভয়ংকর আবর্তে ফেলেই তাকে অদৃশ্য করে দেবেন; তা ভাবা যায়নি। মনে হয় লেখকের ইচ্ছার বাইরেই জমিলা এমন এক জটিল আবর্তে প্রবেশ করে, লেখকের পক্ষে আর এগোনো সম্ভব ছিল না। জমিলা চরিত্রের এই ভঙ্গুর এবং অসমাপ্ত জগতের দায় বাংলা সাহিত্যকে বহুদিন আক্ষেপের সঙ্গে বইতে হবে।

আমরা স্মরণ করতে পারি 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের' কথা। সাম্যবাদী সমাজ তথা সাহিত্য সৃষ্টি এর উদ্দেশ্য হলেও তা যথাস্থানে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে। ওখানে যতটা হয়েছে রাজনীতির চর্চা, ঠিক ততটা হয়নি সাহিত্যের চর্চা। প্রতিভাবান লেখকের অভাবে সেই আন্দোলন মহান সাম্যবাদী সাহিত্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়নি। সাহিত্যের বদলে সাহিত্যের তত্ত্ব এবং রাজনীতি বড় হয়ে উঠেছিল। সত্যেন সেন তার দৃষ্টান্ত। তাঁর উপন্যাসে শ্রেণীচেতনা আছে, আছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগ-চেষ্টা, কিন্তু শৈল্পিক দুর্বলতাকে তিনি

আঁকড়াতে পারেননি। যে-গদ্য সাম্যবাদী সাহিত্যের ধারক তা ছিল তাঁর আয়ত্তের বাইরে।

অন্যদিকে শহীদুল্লা কায়সার সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ভেতর বিপ্লবী চেতনাকে সাহিত্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্য যতটা উচ্ছ্বাস ধারণ করে, ততটাই ব্যর্থ হয় শিল্পকে ধারণ করতে। তাঁর গদ্যশৈলীও সাদামাটা। চরিত্রের ভেতর-বাইরের দ্বন্দ্বকে জোর দিতে গিয়ে মনস্তাত্ত্বিক জটিল অংশকে লেখক সরিয়ে রেখেছেন একপাশে। চরিত্রগুলোর একপেশে আচরণ রক্ত-মাংসের মানুষের অস্তিত্বের জটিল অনুভবকে প্রকাশের সুযোগ দেয়নি।

এক্ষেত্রে সম্ভাবনা ছিল সোমেন চন্দের, যদি না অকালে তাঁকে হত্যা করা হত। তাঁর চমকপ্রদ গল্প 'ইঁদুর' এর প্রমাণ। সাম্যবাদী সোমেন চন্দ সময় না পেলেও সত্যেন সেন বা শহীদুল্লা কায়সার যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন। কিন্তু কঠিন বৈরী এবং প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রের ভেতরে থেকে তাঁদেরকে সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতিও করতে হত। বিশেষ করে সত্যেন সেনকে। পাকিস্তান রাষ্ট্র বিপরীত আদর্শের কারণেই প্রবল প্রতিপক্ষ ছিল সত্যেন সেনের। এই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানটি দুই দিকে তার প্রতিপক্ষের জন্য অস্ত্র খাড়া করে রাখে। প্রথমটি সাম্যবাদে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে, এবং দ্বিতীয়টি সংখ্যালঘু হওয়ার জন্য। দেশত্যাগের জন্য চাপ ছিল প্রচুর। অথচ সত্যেন সেন মাতৃভূমি পরিত্যাগের বদলে চলে গেলেন কারাগারে। নিরাভরণ বর্ণনাধর্মী ইতিহাসাশ্রয়ী সাহিত্য হলেও সত্যেন সেনের সাহিত্যের মূল্য আছে। মূল্য এই কারণে যে, সেখানে মানবতার মুক্তির কথা আছে।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ভিন্ন মাত্রার উদার শক্তিশ্রী লেখক। তাঁর প্রতিভার ঘাটতি ছিল না। সংকট ছিল দর্শনের। বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে খবরাখবর রাখতেন। সেসবের প্রবল প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেননি তিনি। তবুও বাংলা কথাসাহিত্যের গদ্যে অপভাষার প্রয়োগ (মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি থাকলেও) তাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। সেটা আবার মনীশ ঘটকের লেখক ভাষায় আঞ্চলিক গদ্যরীতির ধারাও নয়। একেবারে নিজস্ব। ঢাকার আদিবাসী এবং উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষাকে তিনি চরিত্রের মুখের ভাষা হিসেবে সাহসের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। তবে লেখক ভাষাটি উচ্চারিত। ভাষা হোক বা বিষয় ভাবনাই হোক, মনে হয় লেখক দলিত সাহিত্যতত্ত্বের প্রতি দুর্বল ছিলেন। তাছাড়া ইলিয়াসের অপভাষা প্রয়োগ নিয়ে কথা উঠতে পারে। কেবল অপভাষা প্রয়োগেই গদ্যের ফর্ম ভাঙে না। নতুন গদ্য যেমনি লৌকিক ভাষা নির্ভর, তার চেয়েও অধিক জীবন নির্ভর। যে জীবন আপাত সরল কিন্তু অত্যন্ত জটিল এবং এলোমেলো। প্রচলিত বুলি ব্যবহারে তাকে ধরা যায় না। এক্ষেত্রে কবি সুধীন দত্তের সংস্কৃত বহুল ভাষা রীতি সম্পর্কে প্রচলিত মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে, 'সুধীন দত্তীয় দৃষ্টান্ত চমক লাগিয়েছে, শ্রদ্ধা কুড়িয়েছে, কিন্তু অনুসৃত হয়নি।'

একজন অমার্ক্সবাদী লেখক হয়েও, শ্রেণী নির্বিশেষে ব্যক্তি-মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিল অলি-গলি চেনার সূক্ষ্মশক্তির অভাব থাকলেও, শ্রেণীকে চেনার-জানার চেষ্টা ছিল তাঁর। কিন্তু একদিকে দর্শন সংকট অন্যদিকে নিজের শ্রেণী অবস্থানের কারণে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বামপন্থী এবং নীচু তলার মানুষদের দেখাটা ছিল তাঁর খণ্ডিত। স্যাটায়ার বা হিউমারের বাড়াবাড়িতে তাঁর গদ্যে এক ধরনের স্থূলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর গল্প বা উপন্যাসে নানা ঘটনা এবং পরিস্থিতির ভিতর যেসব মানুষগুলোকে লেখক দেখেছেন তা সম্পূর্ণ দেখা নয়, ভগ্নাংশকে দেখা। কেননা মানুষ যখন নিজের প্রকাশ ঘটায় কোনো বাস্তবতার ভেতর, তখন তার কিন্তু অন্তর্লোকে ঢাকা থাকে জটিল অপ্রকাশ্য বহুধা বিভক্ত দিক। ওই যে মানুষের বহুমাত্রিক সত্তা তা ইলিয়াসের প্রধান প্রধান চরিত্রে অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে।

সমাজ বা পরিবারের ভেতর আমাদের নানা রকম বন্ধন থাকে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভেতর নির্দিষ্ট একটা ছক নিয়ে বিরাজ করে। হঠাৎ কেউ এমন একটা আচরণ করে বসল যা অন্যের কাছে অবিশ্বাস্য বা বিস্ময়ের। ওই যে অবিশ্বাস্য কাজটি যে করতে পারল সে কিন্তু মোটেই বিস্ময়কর কিছু করেনি। কাজটি হচ্ছে মানুষের জটিল বহুমাত্রিক সত্তারই ফল। মানুষের এমনি পূর্ণাঙ্গ চরিত্র ইলিয়াসের লেখায় মিলে না।

প্রতিটি মানুষই আলাদাভাবে মনোবিজ্ঞানের অসীম জটিল এক দুর্জ্ঞেয় জগৎ। উচ্চ-মধ্য বা নীচ– যে শ্রেণীতেই মানুষের অবস্থান থাকুক, মানুষের অস্তিত্বের বিশ্ব সরল নয়, বরং জটিল। আমরা ভাবতে পারি আর্নেস্ট হেমিংওয়ের সেই বৃদ্ধ মাছ শিকারি সান্তিয়াগোর কথা। একাকী গভীর সমুদ্রে ক্ষুধা, নির্জনতা, সমুদ্রের অসীমতা, অনিশ্চয়তা, আশা এবং হতাশার সঙ্গে অসম লড়াইয়ের ভেতর দ্বীপ থেকে উড়ে আসা একটি ভয়ার্ত ক্ষুদ্র পাখির সঙ্গে কী কী কথা হয় তার? পাখিটা কীসের প্রতীক? কী বলতে চায় অতিসাধারণ সান্তিয়াগোর মতো মানুষ?

আসলে মানুষের সামাজিক আর অর্থনৈতিক জীবনের ছকটা কেবলই বাইরের রূপ, ভেতরে থাকে জটিল মনস্তাত্ত্বিক আরো জটিল বিস্ময়কর দুনিয়া। বিশ্বসাহিত্যের মহান স্রষ্টা অস্ত্রয়ভস্কি তাঁর 'ইস্পাত' উপন্যাসে সেই মানুষেরই সন্ধান পেয়েছিলেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নিশ্চয়ই সেসব ঔপন্যাসিক-চরিত্রের খবর রাখতেন। কিন্তু তাঁর লেখায় তারা প্রতিস্থাপিত হয় না। হয় না যেমনি চরিত্রের আচরণের ভেতর, তেমনি অসাধারণ শব্দ-বাক্য বা ভাষা ব্যঞ্জনায়।

মানুষের অস্তিত্ব-বিশ্বের সমগ্রতা জীবনাচরণের ভেতর খুব ক্ষুদ্র অংশই প্রকাশ্য থাকে, বাকিটা থাকে অপ্রকাশ্য, যেমন চিন্তায়। সেই মানুষ হোক এশীয়, আফ্রিকান, ইউরোপীয় বা লাতিন। মানুষের অতিসূক্ষ্ম অস্তিত্ব-রহস্যের প্রকাশ কেবল সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবন ঘিরেই আবর্তিত হয়

না, সেই আবর্ত আপাত অপ্রকাশ্য জটিল মনোলোকেও বহমান। সেখানে হিংসা, নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, পশুত্ব ইত্যাদির পাশাপাশি বসবাস করে প্রেম, করুণা, মমতা, মানবিকতা। যেন চোখের জলের পাশাপাশি খুনের রক্ত। এই যে বহুমাত্রিক মনের অধিকারী মানুষ, তাদের আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন মাকারেস্কো, অরিওস্তোর মতো বিশ্বমানের প্রতিভাধর শিল্পীরা। তাদের শিল্প-সাহিত্যে কেবল একপেশে জীবন-দার্শনিকতাই মেলে না, উদ্ভাসিত হয় বিস্ময়কর শৈল্পিক মহিমা।

সমাজস্থিত মানুষকে ঘিরে থাকে বস্তুবিশ্ব। হোক সে মানুষ পলায়নবাদী মধ্যবিত্ত, ব্যক্তিস্বার্থ বা শ্রেণীর বন্ধন অতিক্রম করতে না পারা বামপন্থী, তাদের মনস্তাত্ত্বিক জটিল অস্তিত্বের সন্ধান না করে এবং সামাজিক বাস্তবটা এড়িয়ে গিয়ে কোনো লেখকই ক্রোধ বা উদ্দেশ্য হেতু বিদ্রূপ করতে পারেন না। গুরুত্বপূর্ণ কোনো চরিত্রকে পাগল বানিয়ে তার অনিবার্য গতিকে রুদ্ধ করে দিতে পারেন না। এতে প্রমাণিত হয়ে যায় লেখকের আত্মবিচ্ছিন্ন সংকট। দর্শনের সংকট। ফল দাঁড়ায় এই যে, লেখক সৃষ্ট চরিত্রগুলো হয়ে ওঠে খণ্ডিত-ভঙ্গুর। আরো স্পষ্ট হয়ে যায় লেখক কতটা দূরত্বে বসবাস করেন উচ্চতর সাম্যবাদী দর্শন থেকে। ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' এর দৃষ্টান্ত।

লাতিনীয় ফর্মের প্রেরণাজাত উপন্যাস আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা'-কে একটু তলিয়ে দেখা যেতে পারে। প্রশ্ন করা যেতে পারে উপন্যাসের চরিত্র তমিজ আর ফুলজান কী পরিণতিতে গ্রাম ছাড়ে? ওদের যাত্রা কোথায়? ওরা কি জীবন নিরাসক্ত পলাতক বাউল? লেখক তাদের সমাজ-সংসার বিচ্ছিন্ন করে কোথায় নিয়ে যেতে চান? এ যদি চরিত্রগুলোর আত্মজিজ্ঞাসা হত, তবে তাদের চেতনা জগতের অভিঘাত কোথায়? অথচ সম্ভাবনা ছিল চেতনার বহুবাচনিক জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সামনে তাঁদের দাঁড় করানো। কিন্তু এমনটা হতে দেননি লেখক। বুঝা যায় লেখক ঝুঁকি নিতে চান না বিশ্বাসী দর্শনের। ঘটনা এবং চরিত্রকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করলেন, চরিত্র তাঁর কাছে হার মানল। আরো প্রশ্ন জাগে বিবাহের বৈধহীনতার মধ্যে তমিজের ঔরসে জন্ম নেওয়া সন্তান নিয়ে ফুলজানের গৃহবিচ্যুতির ভেতর নিজের সত্তাকে লেখক কোথায় ঠেলে দেন? তমিজ বা ফুলজানের জন্য লেখক সুখ-নিরাপত্তার কোন পৃথিবীর নির্দেশ করলেন? অথচ তমিজ-ফুলজানের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে অবশ্যম্ভাবী জটিল দ্বন্দ্ব অর্থাৎ অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বহির্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারত। কিন্তু লেখক পথ খুঁজে পেলেন না। এটা কি মধ্যবিত্ত চেতনার ফল নয়? উপন্যাসে নানা শ্রেণীর চরিত্র নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে ভিন্নভিন্ন বৃত্ত তৈরি করেছে, কিন্তু উপন্যাসের রীতি অনুসারে কেন্দ্রস্থলে একীভূত হতে পারেনি উপন্যাসের চরিত্রগুলো।

মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকে যে লেখক মুক্ত নন তার প্রমাণ উপন্যাসের নানা জায়গায় নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। এমনি একটি দৃষ্টান্ত তমিজ আর

ফুলজানের যৌন মিলনের দৃশ্য বর্ণনায় মিলবে। 'ফুলজানের ঠোঁট থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসছে জ্যোৎস্না... ফুলজানের আলো-জ্বলা ঠোঁট...।' 'জ্যোৎস্না' আর 'আলো-জ্বলা ঠোঁট' কি মধ্যবিত্ত রোমান্টিক আবেগের শব্দ-জাল নয়? তৃণমূল মানুষ আর তার কাম-চেতনা কি প্রকৃতির আলো আর জ্যোৎস্নার এমন ব্যঞ্জনায় ধরা পড়ে?

বিদেশি চলচ্চিত্রের প্রভাব ইলিয়াসের লেখায় খুবই স্পষ্ট। ঘুমের আচ্ছন্নতায় তমিজের বাপের হেঁটে বেড়ানোর ঘটনাটির পেছনে ক্রিয়াশীল যা-ই থাকুক, এটি মধ্যবিত্ত মানসের ফল। স্মৃতিভ্রষ্টতা কিংবা জটিল কোনো মানসিক অভিঘাত এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে স্মরণীয় 'স্লিপ ওয়াকার' নামক ইংরেজি চলচ্চিত্র। ওখানে নায়ক (মধ্যবিত্ত) ঘুমের আচ্ছন্নতায় হেঁটে বেড়ায় বাগানে বা ঘরে এবং একরাতে সেই আচ্ছন্নতার ভেতর স্ত্রীকে খুন করে। তাছাড়া কাতলাহার বিলের ভেড়ার পালের সাঁতার তো সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের জ্যোৎস্না আর কুয়াশার নদী থেকে উঠে আসা একদল শিংহীন সাদা বর্করির পরাবাস্তবীয় কিংবা মীথলজিক্যাল মনোবিকার থেকে ধার নেয়া। সেই গ্রাম্য তমিজের বাপের নিরাসক্ত চরিত্র এবং স্ত্রীর মানসজগৎ মিলে যে আবহ তৈরি করে তা নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনেই স্পষ্ট। অপর এক চরিত্রের হাতের তালু থেকে আঙুল গজানোর কল্পনাটি ঠিক ইংরেজি সিনেমা 'ড্রিম মাস্টার'-এর প্রতিরূপ। ওখানে হাত গজায় মাথার খুলি থেকে।

এবার আমি বাংলা সাহিত্যে দরিদ্র আর দারিদ্র্যকে উন্মোচন করার প্রচলিত শিল্প-কৌশলের ঐতিহ্য সম্পর্কে বলতে চাই– যা ইলিয়াস অনুসরণ করেছেন। প্রচলিত দরিদ্রের সূত্রটি হচ্ছে, এরা প্রান্তবাসী, জাতীয় সম্পদ থেকে বঞ্চিত, অশিক্ষিত (আধুনিক ধনবাদী শিক্ষা), ক্ষুধার্ত এবং অসংস্কৃত। এদের প্রতি দু'ধরনের আচরণ বিপরীত শ্রেণী কর্তৃক প্রদর্শিত হয়। এক. করুণা, দুই. ঘৃণা। আমাদের লেখকেরা এই একপেশে সূত্রকে মেনে ও জেনে কলম ধরেন। বৈচিত্র্যহীন এই অনবরোধ যৌনতা, জীবন বৈশিষ্ট্যে ছয় রিপুর তাড়না, আচরণে প্রাক-আধুনিক সাংস্কৃতিক প্রেষিত। অথচ ক্ষুধা ভিন্ন উচ্চ বা মধ্যবত্তি শ্রেণীও একই আচরণিক বা সাংস্কৃতিক আবর্ত সীমানায় আবদ্ধ।

উপনিবেশবাদী পাশ্চাত্যবাদ কর্তৃক এই শ্রেণীবিভাজন তত্ত্বটি অখণ্ড মানবসত্তা থেকে দরিদ্রের সত্তাকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে। লেখকেরা এর শিকার। কেননা এরা সামাজিক তত্ত্বনির্মাণ করে না, কেবল প্রয়োগ করে অন্ধভাবে। প্রচলিত রীতিতে দারিদ্র্যকে সুনির্ধারিত ফ্রেমে ফেলে দেখাটা অবশ্যই একপেশে। কঠিন রূঢ়তার পাশাপাশি দরিদ্রের জীবনকে ঘিরে মননবৃত্তি চর্চার যে স্তরটি আছে, তাকে অস্বীকার করা যাবে কীভাবে? অনিয়ন্ত্রিত যৌনাচার এবং ক্ষুধার প্রতিক্রিয়ার আবহে সৃষ্ট শব্দ-বাক্য এবং

ভাষার ব্যঞ্জনা মানবসত্তার বহুমাত্রিক আত্মপ্রকাশের মাত্র একটি দিকেরই বহিরূপ। পশ্চিমী কিংবা উপনিবেশবাদী তত্ত্বীয় শিক্ষার বাইরে যেতে পারলেই আমরা দেখতে পাব প্রতিটি দরিদ্র বা শ্রমজীবী মানুষের অন্তস্থ গভীরে লুকিয়ে আছে বহুমাত্রিক এবং দ্বান্দ্বিক মানুষ। কাম বা ক্ষুধার ভিতর ও বাইরে এক রূপ, আরো ভিতরে অন্য দ্বন্দ্ব।

মানুষ হচ্ছে বিচিত্র জটিল প্রাণী। একই মানুষের ভেতর খণ্ডিত হাজারটা মানুষ বসবাস করে। প্রাণিজগতের সমস্ত বৈশিষ্ট্য একক মানুষ ধারণ করে। দেবতা, পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ এবং প্রকৃতিবিশ্বের সংমিশ্রিত আচরণের অধিকারী মানুষ। হিংস্র সন্ত্রাসী, উন্মাদ, কামুক, সাধু, ভদ্রলোক, বিপ্লবী, দয়ালু, শিষ্টজন– সারা জীবন, সারাক্ষণ একই আবর্তে বিচরণ করে না। সময়, পরিস্থিতি, পরিবেশ তাদের আচরণ বা অভিব্যক্তি (ভাববিনিময়) নিয়ন্ত্রণ করে। তাই তথাকথিত শিষ্টজন ২৪ ঘণ্টাই শ্লীল উচ্চারণ করে না যেমন, তেমনি তথাকথিত গ্রাম্য অশিক্ষিত চাষা, মুটে-মজুর অশিষ্টজনও অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে না। ঔপনিবেশিক শিক্ষায় আমাদের শিক্ষিতজনেরা ভাবে কেবলমাত্র দরিদ্র অশিক্ষিতরাই অশ্লীল শব্দ ও আচরণের ভিতর দিয়ে নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। লেখকেরাও তাদের সাহিত্যে এই বিশ্বাস ধরে কলম চালায়।

আসলে ধারণাটি ভ্রান্ত। যারা নিম্নবর্গ বা দলিত-দরিদ্রদের জীবন নিয়ে আজকাল সাহিত্য রচনা করেছেন তাঁদের আমি একটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপের তথাকথিত সুসভ্য-অভিজাত রক্ত সংমিশ্রণে-জাত শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানরা প্রতিদিনের জীবনে হাজারবার হাজারটা অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করে এবং অশিষ্ট অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। এখন সেই ধনী, শিক্ষিত এবং অতি আধুনিক মানুষগুলোকে কোন স্তরে ফেলবেন বাংলা ভাষার কথাসাহিত্যকেরা? লেখকরা কি জানেন শ্বেতাঙ্গ অর্থাৎ সভ্যতার অভিভাবক জনগোষ্ঠীর প্রতিদিনের জীবনাচরণে উচ্চারিত ভাষাকে বাংলা অনুবাদ করলে ঢাকার আদিবাসী কিংবা গ্রামবাংলার চাষা মজুরেরাও লজ্জায় মুখ লুকাবে?

এই যে বহুমাত্রিক জটিল মানবচরিত্র, তাদের জীবনের গতিপ্রকৃতি, প্রবণতা, অভিমুখ এবং সর্বোচ্চ সভ্যতাগামী প্রবণতাকে নির্দেশ করাই সৎ-খাঁটি লেখকের একমাত্র কর্তব্য। কথাসাহিত্যকরা মর্গের ডোম নন যে, কেবলমাত্র মানবদেহকে কেটে টুকরো টুকরো করে দেখাবেন আর বলবেন, এই হচ্ছে মানবদেহের গঠন। লেখকের আসল কাজ চলমান সমাজের কেবল ব্যাখ্যা নয়, ব্যক্তির আচরণ প্রদর্শন নয়; ব্যক্তি বা সমাজের গতিকেও নির্দেশ করা। ভয়ের কারণ নেই, হারানোরও ভয় নেই শোষক বর্গ থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, সুখ ভোগের নিশ্চিত জীবন ছেড়ে বিপ্লব করারও প্রয়োজন নেই লেখকের।

তবে কেন সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে তথাকথিত নির্মোহ, নিরপেক্ষ, পর্যবেক্ষক, বিশ্লেষক হয়ে থাকা? মনে রাখতে হবে জটিল বহুমাত্রিক মানবচরিত্র এবং সমাজ মধ্যবিত্ত লেখকদের ইচ্ছা পূরণের কিংবা আত্মরতির খেলার সামগ্রি নয়। নয় কেবল নৃ-তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান গবেষণার উপাদান।

যে লেখক বা কথাসাহিত্যিক মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধে নিরাসক্ত বা নিরপেক্ষ, তিনি তো পাঠকের কাছে নৃ-বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের ব্যাখ্যাকারের অতিরিক্ত কিছু নন। তিনি বড়জোর দক্ষ চিত্রকর, নিপুণ ফটোগ্রাফার কিংবা গবেষক, বুদ্ধিজীবী। কেননা এসবই হচ্ছে উদারবাদী রাজনৈতিক অপকৌশল। উদারবাদ তো পুঁজিবাদেরই ধূর্ত রূপ!

সাহিত্য মহৎ হয় সামাজিক দায়িত্ববোধে। সেই দায়িত্ববোধ বুর্জোয়া লেখক কিংবা উদার মানবতাবাদী শিল্পীরা এড়িয়ে চলে। অথচ পাঠক ভুল করে তাদের সাম্যবাদী লেখক হিসেবে চিনতে চায়। এসব লেখকদের আশ্রয়স্থল বড়জোড় সংস্কারবাদী বা সংশোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং চরম কামদল। কেউ কেউ আবার আশ্রয় নেয় সংসদীয় গণতন্ত্রকামী সমাজতন্ত্রী দলে। মহান বিপ্লবী বা সাম্যবাদী লেখকেরা মানবজীবন ও সমাজব্যাখ্যার পাশাপাশি চলার পথ বা গতিকেও নির্দেশ করেন। শুধুমাত্র মানুষের দুঃখকষ্ট, দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক সংগ্রাম, কাম, বাসনা, ঈর্ষা, গ্লানি, প্রেম-মমতাকে চিত্রিত করার মধ্যেই শিল্পের দায়িত্বকে নিঃশেষ করেন না, পরবর্তী গতিমুখকেও স্পষ্ট করে তোলেন। সমাজের স্ট্যাম্পমারা জীবনকে চিত্রায়িত করেন কেবলমাত্র সাম্যের ভয়ে ভীত লেখকরা। ওই সাম্যভীতিটা দানবের মতো মনে হয় পাশ্চাত্যবাদী লেখকদের কাছে। কেননা তারা পশ্চিমের দ্বারা নির্ধারিত নিম্ন, মধ্য বা উচ্চবিত্ত মানসের সূত্রটি চিরন্তন বলে মনে করেন।

আসলে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও অভিলক্ষ্য হওয়া উচিত উপন্যাসের পশ্চিমী বা উপনিবেশবাদী বেদবাক্যসম ফর্ম-সূত্রটিকে ভাঙা। আমাদের মাটি ও মনন, সংস্কৃতি ও নৃ-বিজ্ঞানজাত উপন্যাসের একটি ফর্ম আবশ্যক। অবশ্যই সে ফর্ম পাশ্চমী নয়, লাতিনীয় নয়, আফ্রিকী নয়– একেবারে বাঙাল। সেই অভিনব ফর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে নিম্ন, মধ্য বা উচ্চবিত্ত নির্ধারণের দেশিয় সূত্র। কেননা মানুষ জন্মসূত্রেই অখণ্ড, পূর্ণাঙ্গ তার সত্তা। প্রতিটি সত্তার মধ্যেই জটিল বন্ধনে জড়াজড়ি করে আছে উচ্চ-মধ্য-নিম্নবিত্ত মানস। একথা অপ্রিয় সত্য যে, বাঙালির মানস, বাঙালির বোধ, ভাবালুতা ইত্যাদি মানসিক ক্রিয়াগুলোকে দেখার, বুঝার বা ব্যাখ্যা করার সূত্রটি আমরা পেয়েছি ঔপনিবেশিক শিক্ষা বা দাসত্ব থেকে। পশ্চিমের অনেক কিছুই আমরা গ্রহণ করি বিবেচনা না করেই। ওরাই আমাদের সবকিছু নির্ধারণ করে দেয়। এই দাসত্ব থেকে মুক্তি জরুরি। তাই দৃষ্টিটাও বদলাতে হবে সমাজ ও মানুষকে সঠিকভাবে দেখার জন্য। জানার জন্য। ব্যাখ্যার জন্য।

দরিদ্র্য ও দারিদ্র্য কী বা কেমন? এ দেশের লেখক-শিল্পীরা ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও মানসজগৎ দিয়েই বিষয়টা দেখেন। ঔপনিবেশিক শাসক ইংরেজরা গঞ্জনার কঠিক দারিদ্র্যকে খোঁজেনি। ওটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে, উলটে-পালটে, টেনে-হিঁচড়ে উলঙ্গ করে দরিদ্র নেটিভদের দেখেছে। আনন্দ-তামাসা করেছে। মজাদার বিবরণী লিখে বিলেতে পাঠিয়েছে, গরিব বা গরিবী নিয়ে তত্ত্ব নির্মাণ করেছে এবং সে শিক্ষায় আমাদের দীক্ষা দিয়েছে। একজন ব্ল্যাক নেটিভ কতটা নোংরা-কদর্য-অসংস্কৃত-বর্বর-অসভ্য হতে পারে শরীর ও মনে, কিংবা ভাষায়-আচরণে, কাজে-কর্মে, ভাবে-বোধে, তা আমাদের বিশ্বাস করতে শিখিয়েছে।

যে ঘৃণা আর অবজ্ঞার চোখ দিয়ে ঔপনিবেশবাদীরা গ্রাম্য দরিদ্র 'বাঙাল' নেটিভদের দেখেছে, আমরাও সেই একই দৃষ্টি দিয়ে স্বজাতি দরিদ্রদের দেখি। দরিদ্র সমাজকে দেখলেও তার চেয়ে ভয়ঙ্কর যে দারিদ্র্যের রূপ, তার কারণ খুঁজতে চাই না। সেই কারণ ও প্রতিকারের কথা লিখলেই সাহিত্যের জাত গেল, ধর্ম গেল বলে চিৎকার ওঠে। কেন এই চিৎকার? ভয়। বিপ্লবের ভয়। সাম্যের ভয়।

দারিদ্র্যের ছবি আঁকব, মুক্তির পথকে দেখাব না, এর চেয়ে নোংরা সাহিত্যিক অসততা আর কী হতে পারে? এ ধরনের লেখকদের কাছে মুক্তির পথটা বড় বিপজ্জনক। তাই তারা ঔপনিবেশিক দৃষ্টি দিয়ে কদর্য দারিদ্র্যকে দেখে, তথাকথিত অসংস্কৃত দরিদ্র মানুষকে দেখে, কিন্তু এই নির্মম জীবন থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করে না। দায়িত্ব তুলে দেয় রাজনীতির হাতে। তাদের দারিদ্র্যের বর্ণনা পাঠ করলে স্পষ্ট বুঝা যায় নিজের মনের অজান্তেই তারা কতটা ঘৃণা আর অবজ্ঞা করে ঔপনিবেশিক প্রভুর ভাষায়, প্রভুর কলমে স্বজাতি-স্বদেশীর বর্ণনা দিচ্ছেন। বর্ণনায় কখনো করুণা করছেন, কখনো ঠাট্টা ইয়ার্কি করছেন। এ ধরনের মনুষ্যত্ববিরোধী শিল্পরীতিকে খাঁটি সাহিত্য হিসেবে মেনে নিচ্ছেন। অন্যকে মানতে বলছেন।

একটি সহজ উদাহরণ দেওয়া যাক। উপনিবেশবাদী পাশ্চাত্য শ্বেতাঙ্গ চিত্রশিল্পীর আঁকা চোর, ডাকাত, খুনী, শয়তান-দিয়াবল, ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানবদের চেহারা দেখতে কেমন? শিশুসাহিত্য থেকে শুরু করে বড়দের বইয়ে চিত্রশিল্পীরা ও কথাশিল্পীরা মিলে সেসবের যে আকৃতি, ছবি এঁকেছেন, [illegible] হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন, তা কি এশীয়, আফ্রিকী, লাতিনীয় বা [illegible] মানুষের চেহারা থেকে আলাদা? ভিক্ষুক, দরিদ্র, কৃষক, কুলি, মজুর [illegible] শ্রেণীর মানুষের গায়ের রং কী কালো নয়? চেহারা জন্তু-দানবের মতো [illegible] ক্রীতদাসেরা দেখতে কেমন? এই যে আধুনিক কার্টুন বা কল্পবিজ্ঞানের [illegible] বা অতি মানবদের চেহারাটা কি? উপনিবেশবাদী এই শিল্প ট্র্যাডিশন বা [illegible]তে আজো আমরা স্থির বিশ্বাসী। যদি ভাবতাম শিল্পকলা বা [illegible] এই রীতির উদ্ভব কোন মানসিকতা থেকে, তবেই অনেক কিছু স্পষ্ট [illegible]।

প্রশ্ন উঠতে পারে বাংলাদেশের সাহিত্যের ঐতিহ্য কী? এ নিয়ে দ্বিধা আছে, দ্বন্দ্ব আছে, বিতর্ক আছে। ঐতিহ্য সন্ধানী শিল্পী-সাহিত্যিকদের এই সংকট সৃষ্টি করেছে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণী এবং বিকৃত রেনেসাঁস। উচ্চতর মনুষ্যত্বের আদর্শ ধারণকারী রেনেসাঁস তো এখানে এসে ধর্মকে আশ্রয় করে গোত্র বদল করেছে। তাই জাতীয় পরিচয়ের মতোই সাহিত্যের ঐতিহ্যের সন্ধানে বেরিয়ে ছুটে যেতে হয়েছে ধর্মের কাছে, ধর্মীয় রাষ্ট্রের কাছে। এতেই প্রমাণিত হয় সাহিত্যের ঐতিহ্যের অসহায়ত্ব। সংগ্রাম-বিদ্রোহের ঐতিহ্য অনুসন্ধানেও কেউ আশ্রয় নেয় ফকির বিদ্রোহে, কেউবা সন্ন্যাসী বিদ্রোহে। অনেকেই কোনো-কোনো রাজা-বাদশা বা স্থানীয় সামন্ত শাসনের ইতিহাসের শাসক চরিত্রে স্মৃতি-সুখ-প্রশান্তির আশ্রয় খোঁজে। একজন খাঁটি গণতন্ত্রী, উদারবাদী, সমাজতন্ত্রী বা সাম্য-সমাজ প্রত্যাশী লেখকের কাছে এ ধরনের ঐতিহাসিক চরিত্র বা ঘটনা হতে পারে বড়জোর ঐতিহাসিক বাস্তবতার ক্ষুদ্র একটি অংশ, হতে পারে না জাতীয় কিংবা সাহিত্যের ঐতিহ্য।

আমাদের ভূখণ্ডে ফকির বা সন্ন্যাসীরা বিদ্রোহ করেছে। এদের বিদ্রোহ মোটেই সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ বা ধনবাদের বিরুদ্ধে নয়, বরং পক্ষে। এটা বুঝতে গেলে ভারতের বিজেপি, বজরং, শিবসেনা বা বিন-লাদেনের তালেবানদের দিকে তাকালেই চলে। বজরং, শিবসেনা সন্ন্যাসীদের ত্রিশূল বাহিনীর প্রয়োজন পড়ে বাবরি মসজিদ ভাঙার জন্য। তালেবানদের দরকার হয় বোমিয়ামের বৌদ্ধ মূর্তি ভাঙার। এরই নাম বুঝি জাতীয় ঐতিহ্য! আজকের যুগের শিবসেনা বা তালেবান তো অতীতের ফকির-সন্ন্যাসীদের নতুন সংস্করণ! ধারা যাক অতীত ভারতবর্ষে ফকির-সন্ন্যাসীরা লড়াইয়ে জয়লাভ করল। তখন তারা কী ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করত? নিশ্চয়ই সামন্ত ধর্মরাষ্ট্র! আমাদের সাহিত্যে ইতিহাসের অংশ হিসেবে আসতেই পারে ফকির-সন্ন্যাসীদের সংগ্রামের স্মৃতি। এসব ঘটনা হতে পারে সাহিত্যের বিষয়ভাবনা। সাহিত্যের প্রেরণা বা ঐতিহ্যের অংশ মোটেই নয়।

সময়ের বিবেচনায় বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে হাসান আজিজুল হক একজন উদার মানবতাবাদী শিল্পী। মোটেই সাম্যবাদী নন। তিনি তাঁর শ্রেণী-দৃষ্টিতে নিজের সময়কে সাহিত্যে তুলে এনেছেন, তা বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে ইতিহাসের অন্তর্গত হয়ে থাকবে। হাসান আজিজুল হক কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঘরানার লেখক। তাঁর সাহিত্যের বিষয়ভাবনা মধ্যবিত্ত আর দরিদ্র-প্রান্তিক কৃষক। সামাজিক বাস্তবতা এবং মানুষের অস্তিত্ব সংগ্রাম তাঁর সাহিত্যের অংশ। শ্রেণীতে নিজের অবস্থান এবং অবস্থান-জনিত কারণে যে মানস-চেতনায় তিনি আবদ্ধ, সেই শক্ত বৃত্তকে তিনি কখনো ভাঙতে চাননি বা পারেননি। এই লেখককে বুঝতে সহজ হয় তাঁর নিজের লেখার ভেতর। এক রচনায় তিনি বলেছেন, "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মধ্যবিত্তের সংসার সীমানা

ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন কি না সে প্রশ্নকে আমি নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি না।"

অথচ এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। হাসান এমনিভাবে বলতে চান এই কারণে যে, তিনি নিজেও সেই মধ্যবিত্তের মানসজগতেই আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন। বিশেষ করে লেখক ইলিয়াসের সাহিত্যের আদর্শে। সেই ইলিয়াস সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি আর এক ধাপ এগিয়ে যান, "মধ্যবিত্ত কমিউনিস্ট বা বিপ্লবীদের মতো তাঁকে (ইলিয়াস) মাঝে মধ্যে বিপ্লবের হুংকার ছাড়তে হয়নি। বিপ্লব যে সহানুভূতি, করুণার কাজ নয়, বৈপ্লবিক বকোয়াজির কাজও নয়, জনগণকে আদর্শ বিপ্লবী বানানোর কাজও নয়– সেটা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস খুব সাদা চোখে দেখতে পেয়েছিলেন। কোন জিনিসটাকে বদলানো দরকার তা তিনি সরাসরি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।"

ইলিয়াস সম্পর্কে হাসানের উক্তিটি স্পষ্ট। বিস্ময় এই যে, মার্ক্সবাদী মানিকের সঙ্গে অমার্ক্সবাদী ইলিয়াসের তুলনা কি চলে? ইলিয়াস তো বহুক্ষেত্রে মানিক থেকে ধার নিয়েছেন মাত্র। হাসান এখানে নিজে তো বটেই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসেরও বিপ্লব বা সাম্যভীতিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। কিন্তু কোনো পাঠকই হাসান আজিজুল হকের কাছে বিপ্লব প্রত্যাশা করছে না। পাঠকের প্রত্যাশা তাঁর লেখার ভিতর উচ্চ ব্যঞ্জনা। হাসানের কথাসাহিত্যে প্রয়োগ করা ঘটনা যদি বাস্তবতার বৃত্তের ভেতর ঘুরপাক খেতে থাকে, বৃত্ত ভাঙতে ব্যর্থ হয়, তবে উচ্চ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হবে কোথায়? কোনো গল্পের বাস্তব সত্যের আন্তঃপ্রবাহের বিষয়টি যদি থাকে লেখকের অজ্ঞাত এবং লেখক যদি ঘটনার পরিণতির দিক-নির্দেশনা করতে ব্যর্থ হন, তবে সৃষ্টিও উদ্দেশ্যহীন বর্ণনার মধ্যেই আটকে পড়ে।

হাসানের গল্পে ঘটনা আছে, নেই গতির নির্দেশনা। তিনি জনগোষ্ঠীর হাহাকার শুনতে পান, প্রতিবাদকেও দেখতে পান, কিন্তু সীমার বাধা অতিক্রম করে গতিতত্ত্বের অনিবার্য ভ্রমণে উৎসাহী হন না। এটি তার রাজনীতিক দর্শনের সংকট, আত্ম-সংকট। এই সংকট থেকে মুক্তির মানসে তাঁর শিল্প কৌশল বারবার আশ্রয় নেয় পলায়নবাদী প্রতীকে। প্রতীক অবশ্যই শিল্পের উচ্চতর ব্যঞ্জনা রীতি। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য যে প্রতীক তা সাহিত্যের আত্মাকে হত্যা করে। তাই তাঁকে নিজের গল্প সম্পর্কে এটা ওটা নানা কথা পত্র-পত্রিকায় লিখে পাঠককে শোনাতে হয় আত্মপক্ষ সমর্থন করে।

'গুনিন' গল্পের করমালীকে নিহত হতে হয় দৈবের হাতে বজ্রপাতে। লেখক করমালীর ব্যর্থ জীবনের দায় নিজের শিল্প চেতনার পরিবর্তে দৈবের হাতে তুলে দেন। আসলে করমালীকে বজ্রাঘাতে মরতে দেওয়া ছাড়া হাসানের পক্ষে বেশিদূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এখানে তার শ্রেণীচেতনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত বিপ্লব ভীত লেখক হতভাগ্য করমালীর চোখ দিয়ে যেন নিজেই দেখছেন, 'গাছ-পালা মাটি এবং অজস্র সাহসী মানুষসহ গ্রামটি ছোট

হতে হতে সেই গহ্বরে প্রবিষ্ট হচ্ছে।' হাসান আজিজুল হকের হাতে সাহসী মানুষও বিপ্লবী হওয়ার পরিবর্তে এভাবে নিঃশেষ হয়ে যায়।

খেয়াল করার বিষয় এই যে, দীর্ঘ সামরিক শাসন কবলিত দেশে হাসান তাঁর কলমকে সাহসী হওয়ার পরিবর্তে প্রতীকের খোলসে লুকিয়ে ফেলেন। আপন মধ্যবিত্তের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলতে চান না হাসান। অনেক কিছুই হারানোর ভয় থাকে। সামরিক শাসনাধীন তাঁর খালকাটা বিষয়ক গল্প 'সম্মুখে শান্তির পারাপার'। এ-গল্পে ক্ষুধার্ত মানুষটির চোখে খালকে কবর খোঁড়ার মতো মনে হয়। এখানে সামাজিক বাস্তবতার নামে কবর আর মৃত্যুর বদলে বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়কে সম্ভব করা থেকে দূরে সরে যান লেখক। 'অচিন পাখি' গল্পে প্রতীকী বন্দিদশা আছে, নেই মুক্তির উপায়। গল্পের নামকরণও নিরাসক্ত বাউলের মতো।

'মা মেয়ের সংসার' গল্পে মেয়ের গর্ভপাত ঘটে। মৃত সন্তান জন্ম নেয়। মা তখন বলে, 'জাউরা পুরুষ জাতটারে দেহাতাম... গু-মুতের মদ্যি যারা গলা পর্যন্ত ডুবোয়ে বসে থাকে, গু-মুতের স্বপ্ন দ্যাখে...।' আরো বলে, 'ওদের আছে, মওলানা মৌলবীগো, বড়লোক, ধনীগো সব আছে... আবার আল্লাও আছে।' মার্ক্সবাদ বিরোধী উত্তরাধুনিক তাবাদের সমর্থক এ যে নারীবাদী লেখকের উচ্চারণ। প্রশ্ন আসতে বাধ্য, এ ধরনের উচ্চারণ কি সম্ভব কোনো অশিক্ষিত নিম্নবর্গের চরিত্রের মুখে? একই উক্তির প্রথম অংশে আছে, 'ও বাঁচি থাকলি (মরা সন্তান) কাল আমি জাউরা পুরুষ জাতটারে দেহাতাম আমরা পারি ফুল ফোটাতি।' 'গু-মুতের স্বপ্ন', 'ফুল ফোটাতি', 'আবার আল্লাও আছে'– এ ধরনের তীব্র শ্লেষ মেশানো উক্তি কি আন্ত্যজ মানুষ থেকে আশা করা যায়? এ তো লেখক কর্তৃক আরোপিত শব্দব্যঞ্জনা এবং মধ্যবিত্তের ভাবালুতার উক্তি। কেবল স্ল্যাং উচ্চারণেই কি দলিত মানুষ বা চরিত্র সৃষ্টি করা যায়?

হাসান আজিজুল হকের গদ্যরীতি প্রথম থেকে শেষ (বর্তমান) অবধি দীর্ঘকাল পরিক্রমায়ও প্রায় অপরিবর্তিত বা স্থির হয়ে আছে। বরং বর্তমান গল্পগুলোতে গদ্য শিথিল হয়ে পড়েছে, ক্লান্তিতে এলোমেলো হয়ে গেছে। গতিতত্ত্বের সূত্র ধরে গদ্য নিজস্ব আবর্তসীমা লঙ্ঘন করে নতুন বলয়ে ঢুকতে পারেনি। গল্পের ইমেজ রাঢ় বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে পূর্ব বাংলার মাটির গন্ধের সঙ্গে একাকার হতে পারল না। বিচ্ছিন্নতা থেকেই যায়, মধ্যবিত্তের বিচ্ছিন্নতা। শব্দের ব্যঞ্জনার সঙ্গে বাক্যের ও ঘটনার সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী নতুন গতি চরম দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে সাহিত্য প্রতিরোধহীন শক্তিতে পরিণত হয়। সেই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পথ ধরেই চলমান সামাজিক বাস্তবতাকে অতিক্রম করে একজন সাম্যবাদী লেখক পারেন আগামীদিনের দিকে এগিয়ে যেতে। এমন শিল্পীই পারেন দৃশ্যমান বাস্তব সমাজের অভ্যন্তরের আপাত অদৃশ্য বহুমাত্রিক বাস্তবতাকে শনাক্ত করে সাম্যবাদী সাহিত্য তৈরি করতে। রুশ আর চীনা সাহিত্য

এর উদাহরণ। অন্যদিকে গল্প-উপন্যাসের চরিত্রের বহু-দ্বান্দ্বিক রূপকে নির্দেশ করে ক্ষমতাবান লেখকেরাই পারেন কালজয়ী শিল্প তৈরি করতে। অভিনব শিল্পকৌশল জানা থাকলে রাজনৈতিক শ্লোগানও বিস্ময়কর শিল্পে মহিমার অধিকারী হতে পারে। গোর্কীর 'মা' উপন্যাস এর দৃষ্টান্ত।

বিশ্বসাহিত্যের কালান্তর অভিমুখী সাহিত্যগুলো কেবল সমাজ বাস্তবতাই গ্রহণ করেনি, নিরপেক্ষতা আর নির্মোহের পরিবর্তে, বাস্তবতার পরিবর্তে, অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণেরও দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। সেসব মহান কথাসাহিত্যগুলোতে তাদের স্রষ্টাগণ মানুষকে আর সমাজকে কেবল গবেষণাগারে মৃতদেহকে কাটাছেঁড়া করে দেখার মতো কৌতূহলী পর্যবেক্ষণেই নিজেদের দায়িত্ব শেষ করেননি। উদাসীন নিষ্কাম বাস্তবতার সামনে বসে নিজে দেখা এবং অন্যকে দেখানোর মধ্যেই কথাসাহিত্যের কর্তব্য শেষ করেননি। তাদের শিল্প সর্বোচ্চ মানবতার কাছে দায়বদ্ধ। বাংলাদেশের কথাসাহিত্য সেই দায়িত্বটা গ্রহণ করেনি। একদিকে ক্ষমতার অভাব, অন্যদিকে শ্রেণী-স্বার্থ। এবং পেছনে ভয় তাড়া করে, সাম্যের ভয়। অনেকটা যেন সেই একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো। মাতৃভূমির স্বাধীনতা চাই, কিন্তু সাম্যসমাজ নয়।

তাই বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিকরা কেবল সমাজ বাস্তবতার গোলকধাঁধার মধ্যেই ঘুরপাক খেয়ে গেলেন। তারা কি দেখতে পাননি একাত্তরের জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা যুদ্ধ ডিসেম্বরে শেষ হয়ে গেলেও দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল গণমুক্তির লড়াই? এ লড়াই দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য, সমাজের স্থিতাবস্থা ভেঙে দেয় তা। অনিশ্চিত হয়ে পড়ে মধ্যবিত্ত লেখকের জীবন-জীবিকা। জীবনের প্রাপ্তি শূন্য থাকার ভয়টা বড় হয়ে ওঠে তখন। এমনি এক দৃষ্টান্ত হাসানের গল্প, যেখানে যুদ্ধ শেষে রাইফেল ডোবায় নিক্ষেপ করে গল্পের নায়ক। লেখক নিজেই আত্মরক্ষা করতে চান পালিয়ে গিয়ে যেন।

প্রকৃতপক্ষে ঔপনিবেশিক বন্ধন ছিন্ন করে বাংলাদেশ জড়িয়ে পড়েছে নয়া ঔপনিবেশিক এবং বিশ্বায়ন-বন্ধনের কঠিন জালে। এই বন্ধন কেবল জনগণকে নয়, লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীশ্রেণীকেও ক্ষুদ্র করে দিয়েছে আকারে। চেতনায় বড় হয়ে উঠা যেন অসম্ভব। যে জটিল বন্ধন মনুষ্যত্বকে রক্তাক্ত করছে, শিল্পসত্তাকে ছিন্নভিন্ন করছে, তা যেন অনতিক্রান্ত এক অভিশাপ।

ঔপনিবেশিক অধীনতার ভেতরই আমাদের গল্প-উপন্যাসের জন্ম। স্বাধীন যে মননশক্তি অর্থাৎ যুক্তি-বুদ্ধি-চিন্তার প্রয়োজন পড়ে কথাসাহিত্য নির্মাণের জন্য, আমাদের পূর্বসূরিরা তা পেয়েছিলেন ঔপনিবেশিক প্রভুর মগজ থেকে দান হিসেবে। তাই পরাধীন যুগে বসে আত্মজিজ্ঞাসার আর অস্তিত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারশক্তি অর্জনে ঘাটতি থেকে যায়। রাজনীতির ক্ষেত্রে এর পরিণতি সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ এবং সাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রসার। ক্রম অগ্রসরমান এই বিভেদের শক্তি পরিণত হয়ে যায় চরম মৌলবাদে। লেখক চেতনায় এর অশুভ প্রভাব পড়তে বাধ্য।

বাঙালিরা পারে নি কথাসাহিত্য তথা উপন্যাসের নিজস্ব ফর্ম আবিষ্কার করতে। শাসকশ্রেণীর সাহিত্যতত্ত্ব থেকেই তা ধার করতে হয়। দেখা যায় উপন্যাসের বা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভারও সৃষ্টি হয় দর্শনগত সংকট। ব্রাহ্ম-বিশুদ্ধবাদী রবীন্দ্রনাথের কাছে উপনিষদ বড় হয়ে ওঠে গল্প-উপন্যাসের মানুষের চেয়ে। শিক্ষার নামে তৈরি হয় যে হিন্দু কলেজ আর মুসলিম মাদ্রাসা, তা নাকি রেনেসাঁসের দান। তাই তো বাঙালির আধুনিক যুগ শুরু হয় প্রাচীন অন্ধকার যুগের স্মৃতি নিয়ে। মুক্ত মানুষের মুক্ত চিন্তা আর মনুষ্যত্বের চর্চার বদলে আজ সমাজে উঠেছে মৌলবাদের জয়গান। ব্যর্থ হয়ে যায় '৫২-এর ভাষা আন্দোলন আর '৭১-এর যুদ্ধের আদর্শ। ব্যর্থ সমাজ ব্যর্থ রাজনীতি নিয়েই আশ্রয় খোঁজে ধর্মের কাছে।

কথাসাহিত্যের গতিও তল থেকে আরো গভীর অতলে পথ খোঁজে। আশ্রয় খোঁজে বৈজ্ঞানিক অবাস্তব কল্পকথায়, যৌনতায়, মেধাহীন মধ্যবিত্তের বিনোদনের স্থূলতায়। তাই আমাদের উপন্যাসে পাওয়া যায় না জটিল বিবর্তনের ভিতর দিয়ে উদ্ভূত অতিআধুনিক সামাজিক মানুষকে। অলস, নির্দ্বন্দ্ব, উন্নাসিক, লোভী, কামকাতর, দুর্বৃত্ত, ভোগবাদী চটুল বিনোদনপ্রিয় আর স্বার্থপর মানবচরিত্রের কেবলই ভিড় বাড়ছে উপন্যাসে। এসব যারা সৃষ্টি করছে তারা অর্থ আর খ্যাতিলোভী লেখক। বস্তুবিশ্ব আর বাস্তবজীবনের আলো-অন্ধকার, বিবেক-জৈব তাড়না, পৌরুষ-অপৌরুষ তথা বহুধাবিভক্ত জটিল মনস্তত্ত্বের বহুবাচনিক মানুষের সন্ধান কবে মিলবে আমাদের কথাসাহিত্যে? ক্রমেই ভিড় বাড়ছে খণ্ডিত-ভঙ্গুর মানুষের, দুর্লভ হচ্ছে অখণ্ড একক মানুষ। অথচ আমাদের চারপাশে এসব মানুষেরা আছে, অতিআধুনিক কালের জটিল সামাজিক মানুষেরা। আমরা ওদের মনের খবর জানি না।

নাইবা পেলাম সাম্য অভিমুখী কথাসাহিত্য, কিন্তু বিশ্বমানের ক্লাসিক তৈরি করা তো আমাদের দায়। আমি যেসব মহান শিল্পীর নাম উচ্চারণ করেছি এই রচনায়, তাঁরা কি সবাই সাম্যবাদী সাহিত্যের স্রষ্টা? মোটেই নয়। উদার মানবতাবাদী বুর্জোয়া এসব কথা শিল্পীরা অসাধারণ মেধার প্রয়োগে তৈরি করেছেন মানুষের সমাজ ও ব্যক্তিমানুষকে নিয়ে শ্রমশীল কালান্তরগামী কথাসাহিত্য। আমাদের প্রত্যাশা তো এতটুকু পূরণ হতে পারত!

তলিয়ে দেখলে দেখা যায় বর্তমানে সাম্য চর্চকারী লেখকদেরও মূল সংকট দর্শনের। সোভিয়েত পতন, সমাজবাদের বিপর্যয় এবং পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদের ভয়ঙ্কর আস্ফালনের এই দুর্বিষহ দুর্বিনীতকালে লেখকেরা হারিয়ে ফেলেছেন আত্মশক্তি। অনেক ক্ষেত্রেই তারা সংশয়বাদী। অনেকের সামন্ত আর পুঁজিবাদবিরোধী লেখার ভিতরও খুঁজে পাওয়া যায় পুঁজিবাদী মোহময় জীবনের প্রতি গোপন মমতা। কোনো-কোনো চরিত্রের মুখে সাম্য সমাজের কথা ফুটে উঠলেও লেখকের অভিলক্ষ্য হয়ে উঠে বিপরীতমুখী। যে লেখকের অর্থনৈতিক বন্ধন পুঁজিবাদী শ্রেণীর সঙ্গে, প্রাপ্তি-প্রত্যাশাও সেখানে,

সেই লেখকের দ্বারা তো সর্বোচ্চ মনুষ্যত্বের কাছে পৌঁছানো অসম্ভব। নিজের অর্থনৈতিক অবস্থান, শ্রেণীগত ব্যক্তিস্বার্থ লালন-পালনকারী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং নিজস্ব চাওয়া-পাওয়াকে পদদলিত করে বিপ্লবী সাহিত্য নির্মাণ করা মোটেই সহজসাধ্য কাজ নয়।

ব্যক্তিজীবনের সীমানা তাই বড়ই দুর্লঙ্ঘ্য। পুঁজিবাদী শোষক, গণনির্যাতক, গণতন্ত্রবিরোধী মানবতার শত্রু ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার আনুকূল্যে, দানে-দয়ায় মহীয়ান হতে চায় যে শিল্পী-লেখক, সে কখনো প্রকৃত সাহিত্য রচনা করতে পারে না। সেই লেখক এতটুকুই লিখে সমাজবাস্তবতার নামে, যতটুকুতে ফ্যাসিস্টস্ট রাষ্ট্রের কোনো সমস্যাই হয় না।

গণমানুষের সাহিত্যের নামে এদেশে কেবল তৈরি হয়েছে বিবরণধর্মী সাহিত্য। এ-ধরনের সাহিত্যে শোষক-শাসকের চিত্র আছে, নাই মুক্তির দিশা। তাই শোষকশ্রেণী এসব সাহিত্যে চিন্তিত নয়। কেননা তারা এসব সাহিত্যে খুঁজে পাবে না নাজিম হিকমতের মতো সাহসী উচ্চারণ। তারা যখন দেখতে পায় উদারবাদ অথবা অতি-আধুনিকতার নামে এখানে চর্চা হচ্ছে উত্তরাধুনিকতার মতো ধূর্ত প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যের, তখন বরং স্বস্তিবোধ করে। কেননা জাদুবাস্তবতা, ঐতিহ্যবাদ, নৃতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা, সবই হচ্ছে জীবন সমগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্নতারই নামান্তর। অপরপক্ষে সমাজ ও ব্যক্তির অন্তরে শক্তিকে খুঁজে না-পেয়ে প্রগতিসাহিত্যের নামে সমাজকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা, কিন্তু সাম্য থেকে দূরে সরে যাওয়া জীবন বিচ্ছিন্নতার ভিন্ন আরেক রূপ। এক কথায় এরই নাম হচ্ছে উদারবাদী সাহিত্যিক প্রতারণা। পুঁজিবাদী সাহিত্যের ছদ্মবেশী দানব।

আমার এই লেখার মূল উদ্দেশ্য আমাদের কথাসাহিত্যে সাম্যের প্রবণতাকে খুঁজে দেখা। অপর উদ্দেশ্যটি হচ্ছে ধনতান্ত্রিক বিশ্বসাহিত্যের নিরিখে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের অবস্থান বিবেচনা করা। এটা এই কারণেই জরুরি যে, সাহিত্যে আমরা আঞ্চলিক মানকে পেছনে ফেলে এগুতে চাই। যেহেতু আমাদের বর্তমানকাল সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধির সর্বোচ্চ স্তর অতিক্রম করছে, সেহেতু সাহিত্যে এর প্রতিচ্ছবি অবশ্যই প্রতিস্থাপন করতে হবে। অসাম্য যেখানে দানবের রূপ নিয়েছে, মানুষের অস্তিত্বের সংকট যেখানে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, সেখানে বিনোদনের নামে সাহিত্য রচনার চেষ্টা প্রকৃত অর্থে মনুষ্যত্ব বর্জিত কাজ।

আমাদের সমকালীন সাহিত্যে মানুষের অস্তিত্ব সংকটের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ একেবারেই অনুপস্থিত। মহৎ কথাসাহিত্য যে উচ্চতর মননক্রিয়া দাবি করে, যে গভীর জিজ্ঞাসার ভিতর দিয়ে জীবনের গতিপ্রকৃতিকে নির্ধারণ করে, বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে তার উপস্থিতি নেই বললেই চলে। আমাদের কথাসাহিত্যিকদের মানুষ বা মানবচরিত্র সম্পর্কে ধারণা অতি সামান্য। মানুষ যে জীবজগতের অতি বিস্ময়কর এক প্রাণী, দুর্জ্ঞেয় মনোলোকের অধিকারী,

বহুমাত্রিক চেতনার আধার, তা না-জেনে কথাসাহিত্য রচনা অসম্পূর্ণই থেকে যায়।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের সমাজগত, রাজনীতিগত, প্রকৃতিগত, আঙ্গিকগত সংকটের ক্ষেত্রগুলো নির্ধারণ অতি আবশ্যক। সাহিত্য একটি অভিনব বিজ্ঞান বলেই তার রূপরীতির কোনো স্থির সীমানা নেই। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার যেমনি তার বহুমাত্রিক শক্তি-রহস্যের পরিচয় বহন করে, সাহিত্যের বেলায়ও তেমনি রূপরীতির নতুন ধারা তার বিচিত্র অভিমুখের পরিচায়ক। সাহিত্যের পুরাতন তত্ত্ব না-ভাঙা অবধি সেই অভিনবত্বকে ধরা যাবে না। আজকের সমাজে বা রাষ্ট্রে যে তমস যুগ চলছে তার অনড় খোলসকে বিচূর্ণ করার আকাঙ্ক্ষা যদি মুক্তিকামী মানুষের মনে খুঁজে পাওয়া যায় তবে সেখানেই পাওয়া যাবে সাম্যসাহিত্যের অভিনতুন ধারা। বিষয়টি দ্বান্দ্বিক বলেই অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই একদিন উদ্ভব ঘটবে সেই সাহিত্যের। সেই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে তথাকথিত উদারবাদী সাহিত্যের বিরুদ্ধে। ছদ্মবেশী এই পুঁজিবাদী উদারবাদ যেমনি সাম্যবাদের শত্রু, তেমনি সাম্যসাহিত্যেরও।

জুলাই ২০০৪

নজরুলের পদ্ম-গোখরো'র জননী

কাজী নজরুল ইসলামের 'পদ্ম-গোখরো' গল্পটি মোটেই সরলরৈখিক কোনো শিল্প আয়োজন নয়। গল্পটির কাহিনীবলয় এবং অন্তস্থ ভাবলোক এক জটিল গতিকেন্দ্রিক; তাঁর কবিতার জগৎ থেকে বহুদূরবর্তী ভিন্ন এক সৌরভুবন। মনে হয় নজরুল বিশেষজ্ঞরা এই আবর্ত-গতিকে চিহ্নিত করেননি। দু'টি সরীসৃপ যা আবার ভয়ঙ্কর, তাদের জগৎ আর রক্ত-মাংসের একটি নারীর জগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন বলয়। জৈব বৈশিষ্ট্যে যারা বিপরীতধর্মী, তারাই একই সমভূমিতে আবার পরস্পর সংলগ্ন। একজন হচ্ছেন জননীর চিরন্তন মূর্তি, অন্যেরা সন্তান।

এই সম্পর্কজনিত রহস্যের ভেতরের আলো-আঁধারির জগতে পৌঁছার পূর্বে আমাদের অনুসন্ধান চালাতে হবে দূরে– বহুদূরে বিলুপ্ত এক আদিসভ্যতার দিকে। নৃ-বিজ্ঞানের আদিপর্বে বিচরণ করলেই আমরা ধরতে পারব সন্তান কামনায় আত্মবিস্মৃত এক নারীর আর্তিকে। সেই আর্তি তাঁর মাতৃত্ব ও অস্তিত্বের ভূমিকে পর্যন্ত লণ্ডভণ্ড করে দেয়।

আদি মানব-সমাজে সাপের ভূমিকা অসীম শক্তির অধিকারী নৃপতির মতো। কি এশিয়া, কি আফ্রিকা বা ইউরোপ; মানব সংস্কৃতিতে সাপ বা সর্প বিশাল ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিল। আদিম সংস্কৃতিতে সর্প হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতিরূপ। গ্রিক বা মিসর কিংবা ভারতীয় পুরাণে সাপেরই যেন রাজত্ব। সে হচ্ছে ক্ষমতার প্রতীক। রূপান্তরে কখনো সে প্রজনন শক্তির প্রতীক, কখনো বা বাৎসল্যবোধের। সেই সর্পশক্তির যেমন রূপ আছে অপার পৌরুষে, তেমনি নারীত্বে। পুরুষের প্রজনন শক্তি এবং নারীর গর্ভভূমিতে সে স্বমহিমায় বিরাজমান।

পাথরের শিবলিঙ্গের যে রক্ষক মূর্তি, সে-ই কামাখ্যাদেবীর প্রজনন অঙ্গের গৌরব। গ্রিক দেবতাই নয় কেবল, মিসরীয় দেবীই নয়, ভারতীয় দেবতা ও দেবীর ক্ষমতার প্রতীক হচ্ছে সর্প। সেই প্রত্নস্মৃতির রহস্যময় অন্ধকার যুগ যুগ

ধরে বাঙালি রক্তে গোপনে বহমান। নানা ধর্মের অভিঘাত, হোক তা আর্য্য বা ইসলাম, সেই স্মৃতির অন্ধকার জগতে আলো জ্বালাতে পারেনি হাজার হাজার বৎসরেও। মাতৃতান্ত্রিক কিংবা পিতৃতান্ত্রিক সমাজাভিঘাতে এর রূপান্তর ঘটেছে; কালান্তর ঘটেনি। মানুষের মননজগতে এই সাপের রহস্যময়তার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে, বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। কিন্তু সবকিছুর ভেতরই সেই প্রত্নস্মৃতি অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপে বহমান। সেই প্রত্নস্মৃতি তো অপার রহস্যে ঘেরা আজো আমাদের সমাজে।

'পদ্ম-গোখরো' গল্পের জননীর রয়েছে দ্বৈত রূপ। সে যতখানি মানব-শিশুর গর্ভধারিণী মা, ঠিক ততখানি অগর্ভজাত সাপেরও মা। এই জননীসত্তার উৎস এক ও অভিন্ন। সেই প্রজননভূমি। মাতৃ প্রজননভূমির পারিপার্শ্বিকতা হচ্ছে যৌনতা বা কাম। কামের ফল সন্তান। পৌরুষের প্রতীক শিবদেবতাকে বেষ্টন করে থাকে যেমনি সর্প, তেমনি দেবী মনসা বা দুর্গাও সর্পবেষ্টিতা। এখানেও কাম।

গল্পটির শুরুতেই নজরুল পাঠককে লোকপুরাণের 'যক্ষের ধন' নামক প্রতিবেশে টেনে নেন। সেই অজ্ঞাত ধন-ভাণ্ডারটি আবিষ্কৃত হয় রসুলপুরের মীর সাহেবের মক্তব-শিক্ষক পুত্র আরিফের বিয়ের পর। স্ত্রী হয়ে জোহরা নামক যে নারী এ বাড়িতে আসে, তার মানসজগৎ নিয়েই গল্পটি গড়ে ওঠে। অন্য কেউ নয়, জোহরাই জীর্ণ প্রাসাদের দেওয়ালে অস্বাভাবিক ফাটলের ভেতর গুপ্তধনের সন্ধান পায়। রহস্যময় একটি পিতলের কলসিতে বাদশাহী আশরফির দেখা মেলে। কিন্তু কলসটি পাহারা দিত একজোরা সাদা গোখরো। আবার কিনা ওদের পানীয় হচ্ছে দুধ; যদিও এর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই।

সেই সাপজোড়াকে কেন্দ্র করেই জোহরার মাতৃত্বের পুনরুত্থান ঘটে। কেননা যমজ সন্তানের আঁতুড়ে মৃত্যু তার মধ্যে জন্মান্তর-বাদের মনোবিকার সৃষ্টি করে। 'জোহরার স্মৃতিপটে সেই শিশুদের ছবি জাগিয়া ওঠে। তাহার ক্ষুধাতুর মাতৃ-চিত্ত মনে করে, তাহার সেই দুরন্ত শিশুযুগলই যেন অন্য রূপ ধরিয়া তাহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছে।'

আঁতুড়ঘরে যমজ সন্তানের মৃত্যুর ভেতর জোহরার আত্মভূমিতে যে কম্পন সৃষ্টি হয়, সেই প্লাবন সবকিছু ভাসিয়ে নেয়। তা কি কেবলই মাতৃহৃদয়? অন্যকিছু নয়? সেই গভীর রহস্যময় নারী হৃদয়ের তলদেশের অন্ধকারে লুকিয়েছিল নিশ্চয়ই অবচেতন কাম-বাসনা। দেখা যায় জোহরা সর্পশিশুদের প্রতি যত্ন-আদর, ভালোবাসা, মমতা সবকিছুই আদিম সংস্কার-সংস্কৃতি তাড়িত। সেই সংস্কারের শেকড় তো বহুদূরবর্তী ইতিহাসের ধূসর দুনিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ।

কবি-লেখক নজরুল ইসলাম তাঁর গল্পের পাঠককে জানাচ্ছেন, কুতুবপুরের সৈয়দ বংশের মেয়ে জোহরা। সৈয়দরা পীরবাদ কিংবা সুফিবাদের সঙ্গে

অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছেন। প্রাচীন সেই দর্শনের নিদর্শন মেলে গ্রিক মহাবীর আলেকজান্ডার কর্তৃক জনৈক ভারতীয় বৈদিক-সন্ন্যাসীকে ধর্ম-তর্কের জন্য ওই সুদূর বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে তুলে নেওয়ার ঘটনায়। তার পরের ইতিহাস আরো দীর্ঘ, সেই ইরান থেকে বাংলা ভূখণ্ড পর্যন্ত এর বিস্তার।

তাই তো জোহরাকে জানতে হলে অবশ্যই আমাদের জানতে হবে তার জন্ম তথা পারিবারিক ইতিহাস। তার পিতা হচ্ছেন পীর। কেবল তাই নয়, জোহরার মাতামহ ছিলেন 'বিখ্যাত সর্পতত্ত্ববিদ'। লেখক তাই জোহরার সম্পর্কে বলেছেন, 'ইহার (জোহরা) মাঝে হয়ত সেই সাধনাই (সাপ সাধনা) পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে।' জোহরার মানসজগৎ গঠনে এসব তথ্য যে অত্যন্ত জরুরি হিসেবেই এসেছে, তা লেখক আমাদের জানাচ্ছেন। সাপের কুণ্ডল বা সর্পকুণ্ডলেরই রূপকার্থ হচ্ছে আত্মকুণ্ডল। আজন্ম লালিত সর্বসংস্কার নিশ্চয়ই জোহরাকে জানিয়েছিল পীরের কবর বা দরগায় কীভাবে সর্পরূপী জ্বিনরা বসবাস করে। যে সাপরূপী জ্বিন রক্ষা করে পবিত্র কবর, তার সঙ্গে বিশ্বাসীর আত্মসম্পর্ক থাকাটাই স্বাভাবিক।

অন্য প্রান্তে আমরা জানতে পারি 'পুত্র (জোহরার স্বামী) অপেক্ষা পিতা (শ্বশুর) একটু বেশি দুঃসাহসী।' আরো জানা যায়, জোহরার আবিষ্কার করা দেব ধনের গুণেই পরবর্তী সময়ে ব্যবসা করে তার স্বামী ধনী হয়ে ওঠে। এই যে অন্যের অর্জিত ধন বিনাশ্রমে ব্যবসার পুঁজি হয় যার হাতে, সে মোটেই আত্মশক্তিতে বলীয়ান নয়। কেননা সে সাপের প্রতি স্ত্রীর এই অদ্ভুত আচরণে অসন্তুষ্ট থাকলেও বাধা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

এই পুরুষটি কিন্তু তার স্ত্রীর গর্ভে মৃত কিংবা স্বল্পায়ু শিশুর জন্ম দেয়। মৃত সন্তানের এই পুরুষ-পিতা পরবর্তী সময়ে পুনরায় পিতা হওয়ার নিদর্শন স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। সর্পশিশুর প্রতি জোহরার ভালোবাসা কি স্বামীর মনুষ্য-শিশু জন্ম দেওয়ার অক্ষমতার প্রতি গোপন ঘৃণাজাত মনোবিকার? এমন প্রশ্ন সংগতকারণেই উঠতেই পারে। অস্বাভাবিক নয় প্রশ্নটি মোটেই।

জোহরা চরিত্রে জটিলতার বিষাক্ত সাপের মতোই ভয়ঙ্কর যে অভিঘাত সৃষ্টি হয়, তার মূলে কেবল ব্যর্থ মাতৃত্ব, এমন নয়। মাতৃত্ব এখানে প্রকাশ্য। কিন্তু কামপ্রবাহের গোপন অস্তিত্ব পূর্ণভাবেই জীবন্ত। সামাজিক ও ব্যক্তিক অভিঘাতে জোহরার সেই কামপ্রবাহটি অন্তর্বাহী বা অন্তর্লীন। এই মনোদৈহিক স্রোতটি বিদ্রোহী নয় স্বগতিতে, কিন্তু বাৎসল্যবোধের প্রশ্নে অবদমিত। মাতৃত্ব ও কামপ্রবাহজাত পরম দ্বান্দ্বিক শক্তি, তা মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড দেখিয়ে গেছেন।

কাজী নজরুল ইসলাম অবশ্য জোহরার চরিত্রে মাতৃত্বকেই স্পষ্ট করে তুলে 'স্নেহ-বুভুক্ষ তরুণী মাতার' মহিমা চিহ্নিত করেছেন। এখানে তিনি ধূসর এই প্রাক-আধুনিক লোকজ সংস্কৃতিজাত মননজগৎকে স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেছেন, 'জোহরার স্মৃতিপটে সেই শিশুদের (মৃত যমজ) ছবি জাগিয়া ওঠে।

তাহার ক্ষুধাতুর মাতৃচিত্ত মনে করে, তাহার সেই দুরন্ত শিশুযুগলই যেন অন্য রূপ ধরিয়া তাহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছে।'

মায়ের অন্তরালে লুকিয়ে থাকে যে নারীরূপ এবং কামচেতনার কুণ্ডলায়িত জগতের অভিরূপ; তার নির্দেশ নজরুলের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানজাত সত্যকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। অথচ লেখকদের উদ্দেশ্য তো চিকিৎসাবিজ্ঞানের বয়ান হাজির করাও নয়। জোহরাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন। অতৃপ্ত কাম ও আত্মনিগ্রহের বিষয়টি বিবেচনায় আনতে পারেন মনোবিজ্ঞানীরাও।

জোহরাকে ঘিরে গল্পে নানা ঘটনা ঘটে। পিতার বাড়ি বেড়াতে গেলে দরিদ্র পিতামাতা কর্তৃক কন্যার অলঙ্কার চুরি, পরিণামে নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে সাপের কামড়ে পিতার মৃত্যু এবং আরো জটিল অধ্যায় হচ্ছে পিতা কর্তৃক সাপ দুটোকে হত্যা। জোহরার মাতৃহৃদয় সাপ দুটোর মৃত্যুকে প্রতিকল্প করে তোলে আপন মৃত যমজ সন্তানের। তাই তার আর্তনাদের ভাষাকে নজরুল এভাবে রূপ দেন, 'আমার খোকারা কই? আমরা পদ্ম-গোখরো? আমার বাবা?'

নজরুল ইসলাম গল্পের শেষ বাক্যে এমন এক সমাজের সংবাদ পাঠককে জানান, যে সমাজের অস্তিত্বশক্তি হচ্ছে অন্ধকুসংস্কার, 'ভোর হইতে না হইতে গ্রামময় রাস্ট্র হইয়া গেল, মীর সাহেবদের সোনার-বৌ একজোড়া মরা সর্প প্রসব করিয়া মারা গিয়াছে।' এ যে লোকপুরাণের পুনর্গঠন, নজরুলের হাতে।

জোহরার অনুসন্ধানে এবার আমরা অন্য এক জগতে পৌঁছতে চাই। সে জগৎ হচ্ছে কল্পলোকের জগৎ। স্বপ্নলোকের কুহকের দুনিয়া। লেখক বলছেন, 'সে (জোহরা) ঘুমে-জাগরণে শুধু সর্পের স্বপ্ন দেখে। সে কল্পনা করে, তাহার স্বামী নাগলোকের অধীশ্বর, সে নাগমাতা, নাগ-রাজেশ্বরী!'

স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। এ হচ্ছে মানবমনের অবচেতন জগতের রহস্যঘেরা এক রূপ। ওই যে জোহরা নিদ্রার ভেতর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নাগ-রাজেশ্বরী ও নাগমাতারূপে এবং স্বামীকে মনে হয় তার সর্প বা নাগলোকের অধিপতি, এর রহস্য দুর্লংঘ নয়। নাগরাজ্য হচ্ছে মিথ বা লোকমানসজাত মায়াজগতের এক রূপ। বাংলায় লোকমানসের প্রবাহ খুবই জটিল ও দীর্ঘ। কালকে অতিক্রমণের শক্তি রাখে এই মিথ বা লোককল্পনা।

একেশ্বর বা তৌহিদবাদী হয়েও জোহরা যে এই মানসজগৎ থেকে মুক্ত নয়, এর পেছনে রয়েছে বাংলার আবহমান সংস্কৃতি। অন্যদিকে রয়েছে পৈত্রিক পীরবাদী তরিকা বা পথ। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে মাতৃত্বের বঞ্চনা, সন্তান শোক এবং খুব সম্ভবত অচরিতার্থ কাম জোহরাকে এমন এক স্বপ্নলোকে টেনে নেয়। বাস্তব জীবনে যা ব্যর্থ হয়ে যায়, যা হওয়ার বা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, তা স্থান খুঁজে নেয় স্বপ্নের দুর্জ্ঞেয় জগতে।

নিজেকে যখন জোহরা কল্পনা করে 'নাগমাতার' প্রতিরূপে, তখন তার ব্যর্থ মাতৃত্ব আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিঘাত সৃষ্টি করে। কিন্তু 'নাগ-রাজেশ্বরী' কল্পনাটি

কী? এ তো রাজ ঐশ্বর্যমণ্ডিত অফুরন্ত ভোগের কামসিক্ত দেহজ চৈতন্য। কাম অপ্রাপ্তিই এমন মানসিক জটিলতা সৃষ্টি করে মানুষের মনে। এ হচ্ছে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা।

গভীর রাতে জোহরা স্বপ্ন দেখে তার মৃত সন্তানরা মাতৃদুগ্ধের তৃষ্ণা নিয়ে তার কাছে ফিরে এসেছে। আর্তনাদে তার ঘুম ভাঙে। এবং বাস্তব জ্ঞান হারিয়ে ঘর ছেড়ে বের হয়ে আলো হাতে ছুটে আসে সন্তানদ্বয়ের কবরের পাশে। সে বেহুঁশ হয়ে যায়। কবর পাশে ঘুমিয়ে পড়ে এবং এক সময় জেগে দেখতে পায় বুকে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে সেই পদ্ম-গোখরো দু'টি।

এই ঘটনার নানা ব্যাখ্যা হতে পারে। এই সর্পযুগল কীসের প্রতীক, এ নিয়েও লেখকের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ যুক্তিতর্ক হতে পারে। আমরা যেতে পারি নিদানে। গল্পটির অন্তর্বলয়ে রয়েছে সন্তানকল্প দুটি সাপ এবং বহির্বলয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন জননী। নজরুল তাঁর গল্পের শিরোনামে কিন্তু পদ্ম-গোখরোরূপী সন্তানকেই প্রতিস্থাপিত করেছেন, জোহরারূপী গর্ভধারিণীকে নয়। পাপের প্রতীক এবং কামনাবাসনার জৈবরূপই তো সন্তান।

কিন্তু জোহরা কীসের প্রতিকল্প? কেবলই কি জননীর? এখানে এই প্রশ্নটাই গল্পের উন্মোচনসূত্র। তাই নজরুলের পদ্ম-গোখরো'র জননী হয়তো আরো জটিল, আরো বহুবাচনিক।

মার্চ ২০০৪

বাঙালির রক্তে ঘর ও মাটি

বাঙালি হচ্ছে মৃত্তিকাসংলগ্ন এক জাতি। তার অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সব চেতনা প্রবাহই ভূমিকেন্দ্রিক। সেই প্রাচীন বাংলা থেকে আজকের অতি আধুনিককালেও বাঙালিকে বিমুগ্ধ করে রেখেছে মাটি এবং তার ওপর স্থাপিত ঘর। ঘর ও মাটি কেবল জাতির আশ্রয় ও নিরাপত্তার কেন্দ্রবিন্দুই নয়, উদাসীন বাউল মনের প্রশান্তিও বটে। সংসারের বঞ্চনা, শূন্যতা, দুঃখকে বাঙালি যুগ যুগ ধরে ভুলে থাকতে চেয়েছে শান্ত গৃহকোণ আর একমুঠো নিজস্ব মাটিকে ভালোবেসে। কামনার ভেতর এ ভালোবাসা যেন নিষ্কাম বাসনা।

বাঙালির প্রাচীন সাহিত্য তো করুণ ও শান্ত রসে জবজবে ভেজা। গৃহকোণের সুখ আর গৃহত্যাগের হাহাকারে পূর্ণ হয়ে আছে সেসব সাহিত্য। সমাজে নানা কারণে তৈরি হয়েছে ভাববাদী আন্দোলন, সহজিয়া মতবাদ এবং নানা রকম অভিঘাত। সেসব অভিঘাতের ফলে মননজগতেও নাড়া পড়েছে এক এক কালে। তৈরি হয়েছে মঙ্গলকাব্য, গান, পালাগান, লোককথা, প্রবাদ-প্রবচন। সবকিছুই পূর্ণ হয়ে আছে উদাসীনতা অথচ মাটি ও ঘরের জন্য দুঃখবোধ।

তাই বাঙালি কবি-পালাকারের কণ্ঠে এতটা আর্তি ফুটে উঠেছে গৃহত্যাগী নিমাইয়ের জন্য। নিমাইকে সংসার-ঘর আর স্ত্রী পরিত্যাগ থেকে বিরত রাখার শক্তি বাঙালি অর্জন করতে পারেনি বলেই তার পথ চেয়ে চোখের জল ফেলে করুণ রাগিনীতে গাইতে হয় গান। বৈষ্ণবীয় চরম ভাববাদী আন্দোলন চেষ্টা করেছিল বাঙালিকে মাটিবিচ্ছিন্ন ও ঘরছাড়া করতে। বাঙালি সেই ভাবের উন্মাদনায় মিশেছে কিন্তু রাজি হয়নি ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসে যেতে। তাই সেই আন্দোলন মাঝপথেই নিঃশেষ হয়ে যায়। পীর-দরবেশকে অশেষ শ্রদ্ধা করলেও বাঙালি সংসার ফেলে দরবেশ হয়ে পথে নামেনি। অভিসার কিংবা যেখানেই থাক, বাঙালির শ্রীমতি রাধাকে ফিরতেই হয় মাটির কাছে, ঘরের

কাণে। সেই গৃহকোণ তার বিরহ বেদনার প্রশান্তি না হলেও, যেন দুঃখ ভোলার একমাত্র স্থান।

বাঙালি কিশোরী বাপের ঘর ছেড়ে স্বামীর ঘরে যায় চোখের জলে বুক ভাসিয়ে, পেছন ফিরে চায় ফেলে আসা ঘরের দিকে। তাই পল্লীগীতি, ভাটিয়ালীতে বাঙালি নারীর এত দুঃখ আর হাহাকারের বাণী মূর্ত হয়ে ওঠে। স্বামীর ঘরে বৃদ্ধা হয়ে যায় যে নারী, সেও তার পিতার ঘর ছাড়ার স্মৃতি দিয়ে করুণ রস সৃষ্টি করে নাতি-নাতনির কাছে। এ আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের যুগেও সে-কারণেই কবি জসীম উদ্‌দীনের জন্মের অনিবার্যতাকে প্রমাণ করে। কবি জসীম উদ্‌দীনই প্রকৃত অর্থে বাঙালির মর্মের কবি, দর্শনের কবি, আত্মপরিচয়ের কবি। বাঙালিকে জানতে হলে, চিনতে হলে, বুঝতে হলে জসীম উদ্‌দীনের কাছেই যেতে হবে। তার সঙ্গে বোঝাপড়া করে তারপর জীবনানন্দের বাড়ির দিকে হাঁটতে হয়।

আন্তর্জাতিক অভিঘাত, অর্থনৈতিক কষাঘাতে বাঙালিকে মাটি ছাড়তে হয়, ঘর ছাড়তে হয়, প্রবাসী হতে হয়। সেই প্রবাসযাত্রা যে কতটা বেদনার, বিচ্ছেদের, দুঃখের তা স্পষ্ট হয় যাত্রার সময়। প্রিয় মাটি আর গৃহকোণ ভেজে চোখের জলে। মাটি আর ঘরের এ বিচ্ছেদ মাতৃভূমি বিচ্ছেদের সমার্থক নয়। মাতৃভূমিটা বাইরের কাঠামো, অন্তঃপ্রবাহটা একখণ্ড নিজস্ব মাটি আর ছোট্ট ঘরখানা। মাতৃভূমিকে তা ছাড়িয়ে যায়। এই ঘর-মাটিবিচ্ছিন্ন বাঙালি যখন বুঝতে পারে প্রবাস জীবনটা হবে দীর্ঘ, ফেরাটা অনিশ্চিত, তখনই পেতে চায় ভিন দেশে একটি ঘর, নিজস্ব ঘর। যেহেতু উন্নত বিশ্বে ইচ্ছে করলেই যে কেউ যেখানে সেখানে মাটি কিনে ঘর বানাতে পারে না ব্যয়বহুলতা এবং আইনকানুনের কারণে, সেহেতু তারা সস্তায় কেনে পুরনো বাড়ি বা অ্যাপার্টমেন্ট। নিজের শারীরিক শ্রমশক্তিকে বন্ধক রাখে ব্যাংকের কাছে, লোন নিয়ে কেনে বাড়ি বা ঘর কেনে। যদিও জানে হয়তো জীবনে কোনোদিন স্থায়ীভাবে ফেরা হবে না দেশে, তবু দেশের নিজস্ব ঘর বা মাটি তা যতই তুচ্ছ হোক না কেন, হাতছাড়া করে না কেউ। শেষ চিহ্ন বা মাটির ঠিকানা এভাবেই রক্ষা করে প্রবাসী বাঙালি।

হিসাবে দেখা গেছে, অভিবাসী বাঙালির যত সংখ্যক থাকে নিজস্ব ঘরের ঠিকানা, অপরাপর এশীয়দের থাকে তার অর্ধেক। অথচ বিস্ময়কর সত্য এই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হাজার হাজার শ্বেতাঙ্গ পরিবার আছে যাদের নিজস্ব কোনো বাড়িঘর নেই। বংশ পরম্পরায় তারা ভাড়া বাড়িতে কাটিয়ে দেয় জীবন। ধনে-মানে শিক্ষায়-রুচিতে বাঙালিদের চেয়ে তারা হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ। এতে হয়তো বাঙালি সমাজতাত্ত্বিকেরা তথাকথিত মধ্যবিত্ত মানসিকতাকেও খুঁজে পাবেন। আসলে এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বাঙালির এই মাটি আর ঘরের জন্য ব্যাকুলতা তার শ্রেণীচেতনার ঊর্ধ্বে। সে এক ভিন্ন মাত্রা, ভিন্ন বাসনা। শ্রেণীচেতনার সূত্র এখানে মেলে না।

এই পলল মাটি আর প্লাবন ভূমির জনগণ চিরকাল ঝড়-বন্যার উপদ্রব-দুর্ভোগ সহ্য করে আসছে। ঝড়ে ভেঙেছে ঘর, বন্যায় ধুয়ে-মুছে গেছে ভিটেবাড়ি। বারবার হারাতে হয়েছে তাকে মাটি আর ঘর। নদীর ভাঙনে বিলীন হয়েছে ঠিকানা। তাই মাটি আর ঘর হারানোর ভয়-আতংক চিরকাল তাদের ঘিরে রেখেছে। হারানোর শোক-বেদনা আর দুঃখ-কষ্ট ভবিষ্যৎকে করেছে অনিশ্চিত। তাই বাঙালি মেয়ের বিয়ে দেয়ার সময় আজও পিতারা এমন ঘর খোঁজেন যা বানে ভাসে না, নদীর ভাঙনে বিলিয় হয় না। একটি নিশ্চিত বাড়ি-ভিটের শ্বশুরবাড়ি যেন পায় মেয়ে এ নিয়ে লোকছড়া, লোকগানও রচনা করেছে বাঙালি। বাঙালির মাটি আর গৃহের ব্যাকুলতার ভেতর যে চরিত্র-জগতের সন্ধান মেলে, এর মূলে রয়েছে প্রকৃতির এ অত্যাচার।

বাঙালির লোকধর্মকে তো সেই মাটি আর ঘর ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। দেবতার নামে ভূমিদান, গৃহদান থেকে শুরু করে মন্দির-মসজিদ কিংবা সন্ন্যাসী দরবেশকে যত দান করেছে এই জনগোষ্ঠী, তার বেশিরভাগই মাটি বা ভূমি। এছাড়া তো দেয়ার মতো তেমন কিছু ছিল না। এই ভূ-দানের ভেতর দিয়ে প্রাচীন এ জনগোষ্ঠী তাদের আধ্যাত্ম চেতনাকে চরিতার্থ করতে চেয়েছে। বিয়ের যৌতুক হিসেবে পিতা দিয়েছে কন্যাকে ভূমি। পুত্র স্বর্গলাভের আশায় পিতার পারলৌকিক ক্রিয়ায় ব্রাহ্মণকে দান করেছে ভূমি। পিতাও মৃত্যু মুহূর্তে সান্ত্বনা খুঁজেছে পুত্রের জন্য এক খণ্ড মাটির ঠিকানা করে দেয়ার ভেতর। এ নিয়ে এই জনগোষ্ঠী তৈরি করেছে নীতিকথা। শ্লোকের আকারে সেসব নীতিকথা আজও প্রাচীন মানুষের মুখে মুখে, স্মৃতি আর শ্রুতিতে টিকে আছে। লৌকিক আর অলৌকিক ভীতি এ জাতিকে কতটা মাটিনির্ভর করেছে তা অবশ্যই গবেষণার বিষয়।

কি আদিম গ্রাম, কি আধুনিক শহর, বাঙালি নিজের ভিটেমাটি বা গৃহকোণে রাত্রি যাপনের ভেতরই প্রশান্তি খোঁজে। এই গ্রাম থেকে সেই গ্রাম, এই শহর থেকে ওই শহর যেখানেই যাক বাঙালি, ফেরার পথ যতই কষ্টের হোক, রাত যত গভীর হোক, আপন ঘরে ফিরে সুখনিদ্রার সুযোগ হারাতে চায় না কেউ। মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে যত সুখের বিছানাই থাকুক, বাঙালি পিতার চোখে সুখনিদ্রা নামে না। ছটফট অনিদ্রায় রাত কাটে আর ব্যাকুলতা বাড়ে ঘরে ফেরার। এ নিয়েও আছে কত প্রবাদ ও প্রবচন।

বাঙালি হিন্দু মাটির নামে পূজা দেয়। ভিটের পূজা করে। ভূমিদেবতা আর গৃহদেবতার কল্পনা করে। পহেলা বৈশাখ কিংবা দীপান্বিতার রাতে (কার্তিক মাসে অমাবস্যা তিথিতে) গৃহ ও ভূমি পূজা এবং প্রদীপ জ্বালানোর পূজা করে শান্তি সুখ আর নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে। মুসলিম সমাজ নতুন ঘরে মিলাদ পড়ায় (আরবে এ প্রথা নেই) এবং লোকজ স্মৃতির জগতে বিচরণ করে। ওই বাঙালির সমাধি কিংবা কবর পূজার পেছনেও লোকবিশ্বাস জড়াজড়ি করে আছে। মৃত্যুর ভেতর দিয়ে মাটির আশ্রয়ে সুখ কল্পনা করে এ জনগোষ্ঠী। মৃত্যুর ভেতর দিয়ে এ যেন জেগে ওঠার তীব্র বাসনা!

হাজার হাজার বছর ধরে সুপ্রাচীন এই জনগোষ্ঠীর ওপর আঘাত, উপদ্রব, দুর্যোগ নেমে এসেছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক। ভেতর-বাইরে ওলটপালট ঘটেছে কত। কিন্তু ওই মাটি আর ঘরের টান কেড়ে নিতে পারেনি কোনো শক্তি। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম, খ্রিস্ট ধর্মের প্রবল ঢেউ আছড়ে পড়েছে এ মাটিতে। বাঙালি অভিভূত হয়েছে, প্রয়োজনে পুরনো ধর্ম ত্যাগ করেছে এবং গ্রহণ করেছে নতুন ধর্মের ততটুকুই, যতটুকু তার প্রয়োজন, বাকিটা করেছে বর্জন। তাই আর্যাবর্তের হিন্দুর সঙ্গে বাঙালি হিন্দুর মন-মননে মেলে না, মুসলমানের মেলে না আরবের, বৌদ্ধদের মেলে না হিমালয়ের পাদদেশের, খ্রিস্টানদের মেলে না জেরুজালেম কিংবা ইউরোপের রোমের সঙ্গে। সেখানেও বাঙালির হৃদয়জুড়ে, ভাবজগৎ জুড়ে রয়েছে মাটি আর গৃহ।

বাঙালির কাছে ঘরের সমার্থক হচ্ছে স্বর্গ-বেহেশত, লক্ষ্মীর আবাস, খানকা শরিফ, গৃহতীর্থ, আদম-হাওয়ার মহব্বতগঞ্জ, শিব-পার্বতীর শিবালয়। মাটির সমার্থক হচ্ছে খাঁটি, খাদ্যের ভাণ্ডার, শান্তির ঠিকানা, আদি পিতা আদমের শরীর, মওতের আশ্রয়, জন্ম-মৃত্যুর ঠিকানা।

কাব্য আর কবিতা যেন বাঙালি রক্তের হিমোগ্লোবিন। কবিতায় বাঙালি যা পারল, নাটক-উপন্যাসে তা পারল না। প্রাচীন, মধ্য কিংবা আধুনিক, অতি আধুনিক যে কালকেই ধরি না কেন, বাঙালি হৃদয় নিংড়ে লিখেছে কবিতা। সেসব কবিতায় কেবলই মাটি আর ঘরের জন্য ব্যাকুলতা। বোধকরি খাঁটি বাঙালিকে কবিতায়ই আবিষ্কার করা যায়, উপন্যাসে নয়। বিশ্বসাহিত্য বাঙালির কবিতাকে যতটা টেনে নেয়, গল্প-উপন্যাসকে ততটা নয়। এর কারণ, কবিতায় বিশ্ববাসী বাঙালিকে দেখে স্পষ্ট, গদ্য বা উপন্যাস-গল্পে হয়তো তাদের পূর্ণাঙ্গ রূপ খুঁজে পায় না। আর ওই যে বাঙালিকে খুঁজে পাওয়া যায় কবিতায়, সেখানেও রয়েছে মাটি আর গৃহকোণ। চর্যাপদের টিলায় সবরী বা ডোমনীর কুঁড়েঘর থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দ-জসীম উদ্‌দীনের কবিতায় তো কেবলই প্রশান্তির ঠিকানার সন্ধান, আশ্রয়ের সুখ ফুল্লরা, সাজু, বনলতার, 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া'র ঘর-মন-মাটি।

ইউরোপ যে অর্থে কৃষিনির্ভর গ্রাম্য জীবন পরিত্যাগ করে শিল্পনির্ভর নগর জীবনে প্রবেশ করে আধুনিক নাগরিক হয়েছে, বাঙালির আকাঙ্ক্ষা সেই অর্থে নগরে বাস করে নগরবাসী হওয়া নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে লাঞ্ছিত এ জনগোষ্ঠী ভাসমান জীবনকে ভয় পায়। তাই নগরে এসেও নিজের ঘর চায়, আবাসন চায়। যারা ভাড়া ঘরে থাকে, মাসে মাসে গ্রামে ফিরে যায় বারবার, তাদের কত না আক্ষেপ নিজের একটি ঘরের জন্য। 'পরের ঘর, ছ্যাবেরও (থুথু) ডর,' কিংবা 'মালিবাগের ডোবার মাটি, বাড়িওয়ালার বাড়ির থাইকা খাঁটি'। এই বাঙালি সন্তানদের নগর ভ্রমণের অর্থ কি?

এই যে শহরের লাশ গ্রামের মাটির কাছে ফিরে যায় ট্রাক বা অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে, তার পেছনে মাতৃভূমি-প্রেম যতটা, তার চেয়ে অধিক ভয়, নগরের

বারোয়ারী কবরখানায় মাটি হারানোর ভয়, নিশ্চিহ্ন হওয়ার ভয়। এখানে তো বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পুরনো কবর ভেঙে গড়া হয় নতুন কবর। বাঙালি মাটির কবর-গৃহেও সুখ চায়, নিরাপত্তা চায়। নগরবাসী বাঙালি গ্রামের সব জায়গা-জমিন নিঃশেষ করলেও রক্ষা করে ভিটেটুকু আর কবরস্থান। কেবল কি তার ভেতর থাকে নস্টালজিয়া? পূর্বপুরুষের স্মৃতি? ওই মাটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশংকা বাঙালি-রক্তে রয়েছে ভয়, তারই ঐতিহ্য বহন করে বাঙালির এই মানস-বাসনা। যেন শূন্য ভিটে আর পুরনো কবরই আপন অস্তিত্বের ঠিকানা।

গ্লোবালাইজেশন বা নব্য পুঁজিবাদ বাঙালির অস্তিত্বে দিয়েছে নাড়া। ভাঙছে তাদের ঘর-সংসার, ভাঙছে মন। যেন এক ভুতুড়ে আচ্ছন্নতায় পড়েছে জাতি। বাঙালির অর্থনৈতিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক শেকড় ধরে দিয়েছে টান। বিশ্বায়নের মানেটা কয়টা বাঙালি জানে, বুঝে, চেনে? বিশ্বায়ন মানেই রাষ্ট্রের সীমানা ভাঙা, তার স্বাধীন অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। তাই আজ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ভেঙে পড়ছে কর্পোরেট নামক মহাদানবের থাবায় পড়ে। বাঙালির ভাবজগতে এত বড় আঘাত ইতিপূর্বে আসেনি।

বাঙালির সঙ্গীতের ঐতিহ্য আজ হুমকির মুখে। সঙ্গীতের কথা, সুর, বাদ্যযন্ত্র সব আজ লণ্ডভণ্ড হওয়ার উপক্রম। দানবের চিৎকার আর নর্দন-কুর্দনে যে সঙ্গীত তার নাম ব্যান্ড সঙ্গীত! এটি বাঙালির উদ্ভাবন নয়, আবিষ্কার নয়, বিশ্বায়নের চাপিয়ে দেয়া দানব। দানবের চেহারা না নিয়ে এ-সঙ্গীত গাওয়া যায় না। মুগ্ধ বাঙালি, বিভ্রান্ত বাঙালি আজ যে তার মাটির কাছে ফিরছে, ঘরে ফিরে আসছে, তার প্রমাণ ব্যান্ড সঙ্গীতের ক্রম অবনতিশীল জনপ্রিয়তা। ক্ষণিকের মুগ্ধতা, মোহাচ্ছন্নতা কেটে গেলে এমনি করে বাঙালি বারবার ফিরে আসে মাটির ঠিকানায়। চিত্তের নিরাপত্তার জন্য ফিরে আসে রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের গানে, জীবনানন্দের কবিতায়। এরাই তো বাঙালির সাংস্কৃতিক আশ্রয়ের ভূমি আর গৃহকোণ।

উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কিংবা আপন শ্রমে-ঘামে লব্ধ একখণ্ড ভূমি আর একটি পর্ণকুটিরকে কেন্দ্র করেই বাঙালির সামাজিক ভিত্তির সূচনা। তাই গৃহই হয়ে ওঠে দেবস্থান বা শিবালয় কিংবা নামাজ ঘরের মতোই পবিত্র। তার আধ্যাত্ম সাধনা, শিল্প সাধনা, সাহিত্য সাধনা, সব সাধনারই সূত্রপাত সেই পর্ণকুটিরে। কবি জয়দেব কিংবা মহুয়া-মালুয়ার কবিরা তো এমনি গৃহকোণে বসেই শ্রীমতি রাধা আর মহুয়ার প্রেমে খুঁজেছেন প্রশান্তি। গীতগোবিন্দ হোক, চাই কি ভাটিয়ালী হোক, সব সুরের জন্ম এই গৃহকোণ; কোনো রাজপ্রাসাদ নয়।

গোরস্থানের বদলে বাড়ির পাশে কবর এবং মরমী সাধকের মৃত্যুশয্যার নিচের মাটি অর্থাৎ ঘরের মেঝেয় সমাধিস্থ হওয়ার বাসনা আর কিছুই নয়, আপন মাটি আর প্রিয় ঘরের প্রতি অন্তহীন মমতা। দিনে দিনে কিংবা রাতের

ভেতর নিরাপদে ঘরে ফেরার বাসনা নিয়ে আজও বাঙালি গ্রামান্তরে যায়। যদি না ফেরা সম্ভব হয় দিনে, তবে এমনি রাত বেছে নেয়া হয় যে রাতে জোনাক নামে। জোনাক রাতে দূর আত্মীয়ের বাড়ি থেকে বাঙালি ঘরে ফেরে হিসাব কষে। রাতের কোন প্রহর অবধি জোনাক থাকবে সে মতেই তার যাত্রাপথের গতি ধীর কিংবা দ্রুত হয়।

এই যে পল্লী বিদ্যুতের দখলদারিত্ব, তবু আজও শুক্লপক্ষ হিসাব কষেই তারা অনুমান করতে পারে আত্মীয়-কুটুম ঘরে আসবে। সেই মতে মনের দিক দিয়ে তৈরিও থাকে। আসলে সেই একখণ্ড মাটি এবং তার ওপর একটি ঘরের মায়াজাল হয়তো বাঙালি কোনোকালেই ছিঁড়তে সক্ষম হবে না। কখনও নয়।

অন্যের অট্টালিকার মখমলের বিছানার সুখনিদ্রার বদলে আপন ঘরের তৃণশয্যা যে কারণে বাঙালির কাছে প্রাপ্তি-প্রত্যাশা, সেই একই কারণে রাজবাড়ির পলান্নের চেয়ে মূল্য পায় আপন ঘরের শাকান্ন। এটা কি বাঙালির বঞ্চনার ফল বৈরাগ্য? মনে তো হয় না। ওই যে রক্তে মিশে আছে একমুঠো নিজের ভূমি এবং আপন হাতে তৈরি ছনের ঘরের সুখ-স্বপ্ন; এ যেন তারই প্রেরণা। এ না হলে বাঙালি কবি কি লিখতে পারতেন, 'নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা?'

বাঙালির রক্তে বিদ্রোহের বীজ লুকিয়ে আছে। হাজার বছরের বিপ্লব-বিদ্রোহের ঐতিহ্য আছে তার। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র তথা অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য রক্তাক্ত বিপ্লবের ঐতিহ্যও আছে এই জাতির। শুরু করে প্রবল উচ্ছ্বাসে, কিন্তু শেষ করতে পারে না। বারবার জেগে ওঠে, কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না। মনে হয় এর পেছনেও কাজ করে ওই ক্ষুদ্র ভূমি আর পর্ণকুটির হারানোর ভয়। প্রকৃতির সঙ্গে বোঝা-পড়া হয় না এ জাতির যেমনি, তেমনি রাজনীতির সঙ্গে। সমাজতন্ত্র এলে হারাবে নিজস্ব ক্ষুদ্র ভূখণ্ড, হারাবে ভূমি আর গৃহদেবতা– এ ভয়টা বুকে বড় বাজে। ভূখণ্ড, গৃহ আর ঈশ্বর, কাউকে বুঝি হারাতে চায় না বাঙালি। যেন এ আশ্রয়টুকু হারালে বাঙালি হয়ে যাবে সর্বহারা!

সেপ্টেম্বর ২০০৪

বাঙালির মানস-বিচ্ছিন্নতার রূপরেখা

মানুষের হিংস্রতার সূত্রপাত ঘটে প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে। শত্রু-মানুষই প্রথম প্রকৃতির আক্রমণকারী। অগ্নি-ক্ষুধা এবং নিরাশ্রয়কে পূর্ণ করতে সে হত্যা করেছে পশু আর পক্ষী, জ্বালিয়ে দিয়েছে, কেটে ফেলেছে বৃক্ষের-বন। মানুষের মনের বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাতও ঘটে প্রকৃতির সঙ্গে এই আদিম হিংস্রতার কারণে। ঠিক একইভাবে বাঙালিও তার মনের বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত ঘটায় প্রকৃতি-বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়ে। অনেক কিছু কারণের ভেতর বাঙালি যে আজ নিষ্ঠুরভাবে সীমানা ভেঙে উর্ধ্বগামী হচ্ছে, স্বার্থপরতার আকাশ ছুঁয়েছে, করুণা-ভালোবাসা-বিবেক-মনুষ্যত্ব এবং নীতিহীনতার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, এর পেছনে ক্রিয়াশীল এই প্রকৃতির সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক। সে উন্মাদ ক্ষুধা-কাতর এবং যৌন-কাতর পশুর মতো সনাতনী অস্ত্রের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক-হাতিয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বৃক্ষ-বন-নদী-নালা, বিল-ঝিল, টিলা-পাহাড়ের উপর।

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢাকা শহর দখলে। শুরু হয় বৃক্ষ নিধন, খাল, জলাশয়, বুড়িগঙ্গা দখল। রাজধানীর চারপাশের ফসলের জমিতে বানায় ইটভাটা। সঙ্গে শুরু হয় মানুষ খুন। ক্ষমতার লড়াই, বাড়িঘরের লড়াই। তার অগ্নিগ্রাসী ক্ষুধা নিবারণ করতে প্রতিদিন এই ক্ষুদ্র একটি দেশে লাখ লাখ পশু-পাখিকে জীবন দিতে হয়। এই হিংস্রতার রূপ যে কী তা অনুমান করা যায় হত্যাকারী-কসাই এবং ক্ষুধার্ত-মাংস ক্রেতার চোখের দিকে তাকালে।

প্রকৃতি আর প্রকৃতির সন্তানদের প্রতি বাঙালির এই বৈরী আচরণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। মনে হবে প্রকৃতি বুঝি বাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিপক্ষ। এই নীতি-বিবর্জিত-হিংস্রতাকে দমন করার যুক্তিও বুঝি হারিয়ে ফেলেছে এই জনগোষ্ঠী। প্রকৃতি-বিরোধী আগ্রাসন যে মানস-চেতনা জন্ম দিয়েছে জাতিটির অভ্যন্তরে, তা বর্তমানে ছড়িয়ে পড়েছে নিজেদেরই সমাজে। মানুষ হত্যা করছে

মানুষকে, নির্মূল করছে একে অন্যকে, পুরুষ ধর্ষণ শেষে খুন করছে নারীকে। এজন্যেই আজ মানুষ থেকে মানুষ, নারী থেকে পুরুষ এবং প্রকৃতি থেকে মানুষের বিচ্ছিন্নতা দ্রুত বেড়ে চলেছে। কিন্তু বাঙালি তো বিচিত্র সত্তার অধিকারী জনগোষ্ঠী। তার মনোলোকের গতি পৃথিবীর অপরাপর জনগোষ্ঠীর সাথে মেলে না। পৃথিবীর যেকোনো জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যের মোটামুটি সূত্রবদ্ধ পরিমাপ পাওয়া যায়। যায় না কেবল বাঙালির।

যে বাঙালির সম্পর্ক আজ প্রকৃতির সঙ্গে চরম বৈরিতায়, সেই বাঙালিই আবার প্রকৃতির স্নেহ আর ভালোবাসার কাঙাল। তার দুঃখ, অশান্তি, অপ্রাপ্তি, নিঃসঙ্গতা, বেদনার হাহাকার, চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাসের আশ্রয় যেন এই প্রকৃতি। পরম প্রশান্তির সন্ধানে চিরকাল বাঙালি ছুটে গেছে প্রকৃতির কাছে। প্রকৃতির ভেতরই সে খুঁজে ফিরেছে স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা আর নিঃস্বার্থ প্রেম। যার সঙ্গে এ জাতি সৃষ্টি করেছে অপার বিচ্ছিন্নতা, তার কাছেই ছুটে যায় আবার ভালোবাসার আশ্রয়ের জন্য। এই দ্বিচারিতা ঘটছে তার মনের অজান্তেই। কেন এমনটা ঘটছে? এ-প্রশ্নের উত্তরে ছড়িয়ে আছে এক বিস্ময়ের জগৎ। রহস্যের কুহক।

যতই আধুনিক হোক, বাঙালি জানে না কতটা সূক্ষ্মভাবে তার রক্তে বইছে সেই সুপ্রাচীন প্রত্ন-জীবনের স্মৃতি। বাঙালির শরীর ও মনে এ যেন বিজ্ঞানের সেই 'জিন' বাহিত আলো-আঁধারির জগৎ। সেই অরণ্য আর জল বেষ্টিত ভূ-ভাগের হাজার হাজার বছরের প্রাচীন জীবনের স্মৃতি থেকে বাঙালি কখনো মুক্তি পাবে না। এখানেই সে মানবজাতির অপরাপর অংশ থেকে একেবারে আলাদা-স্বতন্ত্রসত্তার অধিকারী। অতি-আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তির চিন্তা-চেতনায়ও লোকাচার-লোকমানসের অস্তিত্ব এর প্রমাণ।

বাঙালির সৃজন-শক্তি এবং প্রেরণার উৎসই হচ্ছে প্রকৃতি। বাঙালি, বাংলাদেশী-জাতীয়তার এই দ্বান্দ্বিক অবস্থানের ভেতরও রাজনীতির উপাদান অনেকাংশেই প্রকৃতিজাত। এই যে আমাদের একাত্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধটা ঘটে গেল তার উৎস যে কেবল অর্থনীতির বৈষম্য, তা নয়। প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা কিংবা অদৃশ্য হৃদয় বন্ধনও অনেকটা দায়ী। জাতীয় সঙ্গীতের কথা আর সুর তার প্রমাণিক নিদর্শন। বাঙালি যে গান বাঁধল আর গাইল তার চৌদ্দ আনাই প্রকৃতিজাত উপাদান। সেসব গানের ভেতর প্রকৃতিকে তারা আকাশের মতো অনন্ত-বিস্তারি করে নিজের আকারটা ক্ষুদ্র করে আশ্রয় খুঁজেছে প্রকৃতিরই সত্তার ভেতর। তার সমস্ত দুঃখ এবং সুখানুভূতিও নিবেদন করেছে প্রকৃতিরই বৃক্ষ-লতা, ফুল-পাতা, আকাশ-নদী, মেঘ-বর্ষা, রাত আর দিনের কাছে।

প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক, অতি আধুনিক সব কাব্যের শরীরই প্রকৃতির উপাদানে গঠিত। প্রাচীন কবি মীননাথকে বলি, মধ্যযুগের বড়ু চণ্ডীদাস, শাহ মোহম্মাদ ছগির, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস থেকে শুরু করে রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দ-জসীম উদ্‌দীন-শামসুর রাহমান-আল মাহমুদ কিংবা অতি হালের

তরুণদের কাব্য আন্দোলন; প্রকৃতিকে অস্বীকার করার উপায় নেই কারো। ইউরোপের শিল্প-বিপ্লব কিংবা তথাকথিত উত্তরাধুনিক কাব্য আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে যেসব কবিরা বিশুদ্ধ নাগরিক কবি হতে চেয়েছিলেন বা চাচ্ছেন তাঁরাও শেষে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছেড়ে প্রশান্তি-পরিতৃপ্তির আশ্রয় খুঁজছেন প্রকৃতিরই ভেতর। বাংলা কাব্যের এই যে বিশ্বভ্রমণ, ইতিহাস আর সমুদ্র অভিসার, তারপরও ক্লান্তি-শ্রান্তি ভুলতে আশ্রয় নিতে যেতে হয় সেই নাটোরের মেয়েটিরই কাছে, সেন বাড়ির বনলতার কাছে।

বাঙালির চিত্রকলাও অন্যসব ভুলে আজো আপন অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে প্রকৃতি থেকে প্রাণের রস সংগ্রহ করে। মূর্ত-বিমূর্ত যা-ই বলি না কেন, পরাবাস্তব শিল্প-চেতনাও প্রকৃতির বন্ধনকে ছিন্ন করতে পারেনি। জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের ছবিও তাই প্রকৃতির ক্যানভাস ছাড়া ভ্রূণায়িত হবার অন্য ভূমি খুঁজে পায় না। জন্মেই বাঙালি শিশু প্রথম রঙ-তুলির টানে আঁকে পাখি আর ফুল। প্রাচীন প্রত্ন-স্মৃতি কিভাবে যে সেই শিশু বহন করছে শরীরে, সে এক বিস্ময়।

প্রত্ন-জীবনের স্মৃতিবাহী রক্ত-হৃদয়ের অধিকারী এই জাতি প্রেম-ভালোবাসার প্রতীক-প্রতিমারূপে দেখে প্রকৃতিকে। নারী আর প্রকৃতিকে তো ওরা আলাদা করতেই জানে না। তাই বাঙালির যত কর্তৃত্ব, যত আধিপত্য সবই নারী আর প্রকৃতিকে ঘিরে। আজো বাঙালির যদি জুটে যায় সুযোগ, তবে নির্ভার নিরুদ্বেগ যৌন পরিতৃপ্তির জন্য ছুটে যায় নির্জন-আরণ্যক পরিবেশে। প্রাচীন অরণ্য-জীবনের স্মৃতির এ যেন কুহক।

গাছ-গাছালি ছাড়া তো এই জনগোষ্ঠীর বাড়িঘরকে ভাবাই যায় না। ছায়া আর ঝড়ের কারণেই যে বাড়ির চারপাশ ঘিরে গাছ লাগায় তারা এমন নয়। যেন কোনো অদৃশ্য তাড়না, অজ্ঞাত মনের ব্যাকুলতা গাছ-বাগান ঘেরা বাড়ির স্বপ্নে আচ্ছন্ন করে মন, নিজেরাও তা জানে না। 'বৃক্ষছায়া' শব্দটি তো প্রশান্তির প্রতীক। মৃত্যুর পর কবরও যেন সেই গাছের ঘন ছায়া খোঁজে। প্রিয় গাছটির ছায়ায় যেন কবর হয়, এই প্রত্যাশায় বাঙালি কবি মৃত্যুর বিচ্ছিন্নতা ভুলতে চান। কদমতলা, বকুলতলা, আমতলা, নিমতলা, কাঁঠালতলা নামের যে গ্রাম, সেখানে কত ভালোবাসা, কত প্রশান্তি যেন লুকিয়ে থাকে। কেবল কি তাই! বাঙালির রাজনৈতিক সভা, ধর্মসভা, সামাজিক বিচারসভার ইতিহাস তো স্মৃতি হয়ে আছে নিজেদের ঐতিহ্যে সেই গাছতলাকে ঘিরে।

আত্মহত্যার সবচেয়ে প্রাচীন রীতি হচ্ছে গাছে ফাঁস লাগানো। কবে থেকে এই রীতি বাঙালির সমাজ-জীবনে প্রচলিত, তা বলা খুবই শক্ত। নির্জন বনের গাছের ডালে ঝুলে মৃত্যুর ভেতর কোন প্রশান্তি খোঁজে এই জনগোষ্ঠী? অন্য উপায় তো অজানা নয়, তবে প্রকৃতির কাছে কেন এই নিষ্ঠুর আদিম কামনা? আবেগ তাড়িত, আত্ম-অভিমানী এই জাতির দুঃখের যেমনি শেষ নেই, তেমনি নেই মনস্তাপের। এই আধুনিক জীবনেও দুঃখকে অন্যের সঙ্গে তারা ভাগাভাগি করতে শেখেনি। শোক আর কষ্টটা যেন একান্তই নিজস্ব, ব্যক্তিক। যুক্তি দিয়ে,

বুদ্ধি দিয়ে দুঃখ ভুলতে যেন রাজি নয় কিছুতেই। তাই ব্যক্তিক এই দুঃখকে ভুলতে বাঙালি সমাজ-সমষ্টি ছেড়ে একাকী চলে যায় নির্জন পুকুর, বিল, ঝিল, মাঠ আর ফসল ক্ষেতের পাশে।

মাথার উপরের আকাশ আর চোখে ভাসমান প্রকৃতির কাছে যেন এই জনজাতির দুঃখ-কষ্ট ব্যাখ্যা করার কত না ব্যাকুলতা। হয়তো সেই নির্জর প্রকৃতির কাছে গেলেই সে খুঁজে পায় প্রিয় বিশ্বাসের দর্শনকে। সেই দার্শনিকতা হচ্ছে সংসার নিরাসক্তি আর অনিত্য জীবনের অসার ব্যাখ্যা। নিতান্তই গার্হস্থ্য জীবনে বিচ্ছেদের আশ্রয় যেন প্রকৃতির বিকল্প অন্য কিছু নয়। আজো মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে বিদায়বেলা বাবা-মা, কিংবা স্বামীর বাড়িতে বেড়াতে এসে ভাই-বাবা-মায়ের বিদায়ের সময় মেয়ে গাছতলায় দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল টেনে উদাস চোখ ফেলে তাকিয়ে থাকে পথপানে। বিচ্ছেদের দুঃখকে বুঝি সাক্ষী করে রাখে গাছের কাছে। ওই দিগন্ত রেখার কাছে। আকাশের কাছে। উড়ন্ত পাখির ডানায়।

শত বছর বংশ পরম্পরায় আধুনিক নগরে বসবাস করেও বাঙালি বিশুদ্ধ নাগরিক হতে পারে না। পারে না সে রোবটের মতো যন্ত্রমানব হতে। হতে সে চায়ও না। পরিবেশবাদীরা এই যে বৃক্ষ নিধনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন, বিল-ঝিল-জলাশয় বিলোপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন, তাদের এই মহৎ প্রচেষ্টার মূলে কি কেবল স্বাস্থ্য রক্ষা? আপাতদৃষ্টিতে ওই কারণটি বড় মনে হলেও অতি সূক্ষ্মভাবে কাজ করে নির্জন প্রকৃতির ভেতর দার্শনিক সুখ। এখানেই ইউরোপের পরিবেশবাদীদের আকাঙ্ক্ষা আর বাঙালির প্রত্যাশার পার্থক্য। ইউরোপের যা শারীরিক সুখ, বাঙালির তা মানসিক। ১ লা বৈশাখ, ২১ ফেব্রুয়ারি বা বসন্ত উৎসবে নগরবাসী বাঙালি যে ইটের কঙ্কালের খাঁচা ভেঙে পার্কে আর লেকের পাড়ে আশ্রয় নেয়, সেখানে যতটা আছে রাজনীতি কিংবা সংস্কৃতির ঐতিহ্য, তারচেয়েও বেশি আছে দূরে বহুদূরে ফেলে আসা গ্রাম্য কৃষি-জীবনের স্মৃতি।

ওই যে ঈদের ছুটিতে শহরের প্রাসাদ ছেড়ে ধনীদের গ্রামের পর্ণকুটিরে ছুটে যাওয়া, তার কি কোনো ব্যাখ্যা থাকতে নেই? কেন গ্রামের প্রায় পরিত্যক্ত বাড়ির গাছের তলায় কোরবানীর আয়োজন করা হয়? এর উত্তরে তো ফলটা মেলে একই রকম।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক চাপে আজ বাঙালি ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে তার ঠিকানা, ক্ষুদ্র হচ্ছে ঘার-আবাসন। স্বাধীন-মুক্ত জীবনযাপন ক্রমেই ক্ষুদ্র সীমানায় আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। স্বরচিত এই পরাধীনতা বাঙালি-জীবনের অপ্রতিরোধ্য ভয়ঙ্কর এক অভিশাপ। বাড়ির উপর বাড়ি, দেয়াল ঘেঁষে বাড়ি বাঙালিকে বাঙালি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। ক্ষুদ্র পরিসরের ঘরে বাঙালির হাঁটা-চলাও নিষিদ্ধ এক শেকল-পরা জীবন। শহুরে বাঙালি যেমনি আবাসনের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আজ আর কৃষ্ণচূড়া গাছ

দেখতে পায় না, তেমনি গ্রামের মানুষও উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখতে পায় না দূরের মাঠ বা বাঁশবন। শুধু দেয়াল আর দেয়াল। ঘর আর ঘর। বারান্দা-ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েও চোখে আটকে যায় হাইরাইজ বিল্ডিংয়ের কঠিন কংক্রিটের সিঁড়ি বা লিফটের দেয়াল।

তাই তাদের চেনা-জানা মানুষের সংখ্যাও কমে গেছে, আত্মীয়তা-আত্মীয়ও ক্রমহ্রাসমান। বন্ধুর বাড়ির রাস্তাও প্রায় বন্ধ। বাঙালির আত্মাও বুঝি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে খাটো হয়ে যাচ্ছে। সেই নিঃস্বার্থ, সহমর্মিতা, প্রেম-ভালোবাসার সমাজ আজ বাঙালির নেই। নিচুতা, অবিশ্বাস আর স্বার্থপরতায় ডুবে গেছে পারিবারিক জীবন। নাগরিক জীবনের আলো-বাতাস শূন্য অন্ধকার খুপড়ি সব কেড়ে নিয়েছে। বসবাসের ক্ষুদ্র কুঠুরি এমনি আলো-আঁধারির সুড়ঙ্গ যে, সেখানে নিত্যদিনের সহবাসী মানুষটিকেও চেনা যায় না। জিজ্ঞেস করতে হয়, 'ঘরে কে?' নিজের জন্য নিজেই উত্তর তৈরি করতে হয়, 'অ তুমি?' এত ক্ষুদ্রতার ভেতর, এত চেনা-অচেনার গোলকধাঁধায় কখনো পড়তে হয়নি বাঙালিকে।

তারপরও বাঙালি আলো চায়, প্রকৃতি চায়। অথচ জানালা খোলার পর দেখে ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িটির দেয়ালে লেপ্টে আছে অন্ধকার। তা জেনেও খোলা হয় কাঁচের কপাট। বাইরের কুয়াশার মতো অন্ধকারে হয়তো দেখা যাবে দূর-জানালার ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে আছে টবে লাগানো একটি গাছের ম্লান পাতা। আলোহীন অথবা সূর্যের অল্প আলোর ভেতর বেঁচে থাকতে পারে এমন টবের গাছই আজ খুঁজতে হয় মানুষগুলোকে। ছাদের উপর পুঁইলতা কিংবা ফুল-ফলের গাছের জীবন সংগ্রাম তো প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন বাঙালি জীবনেরই প্রতীক। মাটি হারাবার দৃষ্টান্ত।

প্রকৃতি-বিচ্ছিন্নতা বাঙালিকে বিকৃত করে দিয়েছে। ব্যক্তির আত্ম-সংযম এবং সমষ্টির প্রতি দায়বোধ আজ আর বাঙালিকে প্রবলভাবে নাড়া দেয় না। সবকিছুই নির্মূল করতে চায় সে। মূল্যবোধ থেকে শুরু করে সবকিছু। ভোগের স্পৃহা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানে নীতির কোনো বালাই নেই। অর্থ আর খ্যাতির মোহ এতটাই বেগবান হয়েছে যে সবাই চায় সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে। লজ্জা কিংবা আত্ম-মর্যাদাকে বিসর্জন দিয়ে মিডিয়া বা গণ-মাধ্যমের ঘাড়ে চড়ে দেশবাসীর দৃষ্টিকে জবরদখলের কী হাস্যকর প্রতিযোগিতা! যেন জোর করে চেনাতে চায় নিজেকে! বাঙালির এই প্রতিযোগিতা বড়ই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। সে স্বজাতিকে নির্মমভাবে হারাতে চায়, আধিপত্য করতে চায় ক্ষুদ্র দেশ-সীমার ভেতরের ভূমিটুকুকে মুঠোয় নিয়ে।

বাইরের পৃথিবীর প্রতিযোগিতার যোগ্য নয় সে। তাই বন্ধ করতে চায় চারদিকের জানালা-দরজা ধর্মের পর্দা দিয়ে। এই ধর্মীয় সংকীর্ণতা তাকে শিখিয়েছে– প্রকৃতি-বিশ্ব এক মায়াজাল, তাকে ছিন্ন করতে হবে, অস্বীকার করতে হবে, ঘৃণা করতে হবে। কেননা সবকিছুই অনিত্য, সৃষ্টিমাত্রই অদৃশ্য

শক্তির বশ্য এবং সেদিকেই ধাবমান। ঈশ্বর শিখিয়েছেন প্রকৃতির গাছ-পালা, নদী-নালা, পশু-পাখি সবই মানুষের ভোগের বস্তু, এমন কি নারী জাতিও। যতদিন ছিল বাঙালি এই ধর্মীয় সংকীর্ণতা-শূন্য, ততদিন প্রকৃতি-বিশ্ব ছিল তার কাছে বিস্ময়, প্রকৃতির ভালোবাসার মধ্যেই সুখ-শান্তি খুঁজতো সে। আজ বাঙালি প্রকৃতির শত্রুপক্ষ। সবচেয়ে বিস্ময় এই যে, বাঙালি আজ প্রকৃতি-প্রেমের ভেতর পৌত্তলিকতার গন্ধ খোঁজে। তার মনের পথে-ঘাটে ধর্মের জঞ্জাল জমছে দ্রুত। প্রতি মুহূর্তে সে প্ররোচিত হচ্ছে প্রকৃতিকে ঘৃণা করতে। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী বিধর্মীকেও।

দেশে যত বাড়ছে নৈরাজ্য-সন্ত্রাস, ততই বাড়ছে ধর্মের দাপট। এ যেন ধর্ম আর অধর্মের হাত ধরাধরি করে উত্থান। এরা যেন পরস্পরের পরম মিত্র। তাই তো বসন্ত উৎসব, পহেলা বৈশাখ বা বৈশাখী মেলার ভেতর দেখতে পায় তারা পরজাতির ভাবলোক। বাঙালির যত ধর্মীয় সংকীর্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই দূরত্ব বাড়ছে প্রকৃতির সঙ্গে। সৃষ্টিশীল মানুষের সংখ্যা আনুপাতিক হারে দ্রুত কমছে বাঙালি সমাজে। মানুষ বাড়ছে, পতঙ্গের মতো। কিন্তু কমছে মনুষ্যত্ব।

মনের আকারে, চিন্তার প্রকারে পতঙ্গের মতোই ক্ষুদে হয়ে যাচ্ছে বাঙালি। ৫০ বছর পূর্বে তিন কোটি বাঙালির ভেতর যে মেধা আর মননের মানুষ পাওয়া যেত, আজ ১৪ কোটির ভেতর তার দশমাংশও মেলে না। বিপরীত ক্ষেত্রে ঝড়ের গতিতে বাড়ছে স্বার্থবাদী-হিংস্র মানুষের সংখ্যা। ওরাই আধিপত্যবাদী, ওরা নীতিহীন মনুষ্যত্ববর্জিত। সমাজকে, রাষ্ট্রকে, ব্যক্তিকে যেমনি দখল করে নিয়েছে, তেমনি প্রকৃতিকেও ওরাই।

বাঙালির বড় হবার কথা ছিল। অনেক বড়। চিন্তা-মননে-কর্মে সৃষ্টিতে বড় হবার অঙ্গীকার নিয়েই একাত্তরে দেশ স্বাধীন হয়েছে। কই, বাঙালি তো বড় হলো না, বরং ক্রমহ্রাসমান তার আকৃতি, সৃষ্টিশীলতার আকৃতি। স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে সর্বক্ষেত্রেই বাঙালির বড় হবার চেষ্টা ছিল। কি রাজনীতি, কি সংস্কৃতি; অর্থনৈতিক মুক্তির চেষ্টা-রত জাতি নিজেকে উঁচু করার চেষ্টায় ছিল রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে নিয়ে।

কিন্তু স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে আচমকাই এই জাতি দেখতে পেল চারদিকে ক্ষমতা আর কর্তৃত্বের দুয়ারগুলো খোলা। ক্ষমতা আর কর্তৃত্বকে বহন করবার শারীরিক-মানসিক যোগ্যতা কিন্তু তখনো অর্জিত হয়নি তাদের। এমন কি এখনো নয়। লুণ্ঠনকারী পাকিস্তানিরা চলে গেলেও ফেলে রেখে যায় ক্ষমতা আর কর্তৃত্বপরায়ণতার লাঠি। সেই লাঠিই হলো সর্বনাশের হেতু। ক্ষমতার লোভ, ভোগের স্পৃহা ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। ক্ষমতা আর সম্পদের কর্তৃত্ব নিয়ে শুরু হলো আত্মঘাতী লড়াই। পেছনে পড়ে রইল গণতন্ত্র আর মনুষ্যত্ব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা।

বাঙালির গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ঐতিহ্যের ঘটলো রূপান্তর। ৩২ বছরে বাঙালির পরিচয় হলো লুটেরা, সন্ত্রাসী, ক্ষমতালিপ্সু জাতি হিসেবে। বাঙালি

নিজেই গিলে খেয়েছে তার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ধর্মনিরপেক্ষতা, দেশপ্রেম আর ত্যাগের মহিমা। মিথ্যাচার আর মাতৃভূমির প্রতি দখলদার বহিশক্রসুলভ আচরণ বাঙালিকে সভ্যতার সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে এনেছে আজ। দেশের প্রতি তার আচরণ ধর্ষক-লুটেরা দস্যুর চেয়ে আলাদা নয়। ওই যে মাতৃভূমির প্রতি তার এই দৃষ্টিভঙ্গি, তা সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির সমপর্যায়ে নেমে এসেছে। দেশের সম্পদ, মানুষ ও প্রকৃতির অত্যাচারী প্রভু হিসেবে বাঙালির আবির্ভাব তাকে করে ফেলেছে বিবেকবর্জিত। যে মূল্যবোধের রক্ষা ও সংরক্ষণের দাবিতে বাঙালি স্বাধীন হলো, তাদেরই কিনা পদদলিত করল সে।

সর্বগ্রাসী এক পতনের যুগ অতিক্রম করছে এই জাতি। সর্বক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রকট হয় উঠেছে। আর এই বিচ্ছিন্নতার মূলে রয়েছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ভেতর দিয়ে ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠা। স্বাধীনতা বাঙালিকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বিশাল-বিশাল দায়িত্ব তুলে দেয়। যে ছিল যুগ যুগ ধরে শাসিত, সে হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করল শাসকের দণ্ড হাতে। যে ছিল কপর্দকশূন্য তণ্ডুল ক্রেতা, সে হয়ে গেল মহাজন-বিক্রেতা। যার হবার কথা ছিল কেরানী, সে হয়ে গেল দেশ পরিচালনার নীতিনির্ধারকের বিরাট দায়িত্বের আমলা। যার ভাগ্যে ছিল গ্রাম্য স্কুলের পণ্ডিতি, সে চলে গেল বিদেশে রাজপ্রতিনিধি হয়ে।

এই যে বিশাল দায়িত্বভার পড়ল বাঙালির ঘাড়ে, সেই বাঙালি তো এসব ভার বহনের শারীরিক বা মানসিক শক্তি-যোগ্যতা অর্জন করার সময়ই পায়নি। অযোগ্যের এই মহাদায়িত্ব তাই রূপ নেয় দৈত্য-দানবে, দুর্নীতিতে। দায়িত্বে সর্বপ্রকার ব্যর্থতা, অযোগ্যতা বাঙালিকে বানায় আত্মম্ভরী, দস্যু-খুনি, আত্মজা-ধর্ষক তথা নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী নরপশু। দেশের শাসক হতে গিয়ে যে হলো দেশ দখলকারী, তার হাজার বছরের অর্জন সব ধ্বংস হয়ে গেল মাত্র ৩২ বছরে। শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান তথা সভ্যতার যে অর্জন ছিল পূর্বে, স্বাধীনতা-উত্তর তাও সে পারল না রক্ষা করতে। সেসব অর্জনকেও করেছে কলঙ্কিত, নতুন অর্জন তো দূরের কথা। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাঙালির অর্জন হচ্ছে লুণ্ঠনকৃত সম্পদের পর্বতসৃষ্টি আর ধর্মান্ধতা। সাম্প্রদায়িক বৈরিতা।

প্রকৃতিকে বাঙালি জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক মৈত্রির নয়, বৈরিতার। ধ্বংসাত্মক অত্যাচারীর, হত্যাকারীর। মনে হবে এই জাতি আত্মঘাতী, আপন সভ্যতা বিনাশক শক্তি। তাই প্রশ্ন জাগে, আতঙ্ক জাগে মনে, জাতিটির পরিণতি কি? মাত্র ৩২ বছরে যে ধ্বংস করে দেয় তার হাজার বছরের ঐতিহ্য, তার শেষ কোথায়? কোন ভয়ঙ্কর অপেক্ষা করছে জাতিটির জন্য, তা কে বলবে? কেননা বহুমাত্রিক সত্তার অধিকারী বাঙালি প্রকৃতিকে যেমনি করছে ধ্বংস, তেমনি আবার তার ভালোবাসার জন্যও করছে হাহাকার। বাঙালির এ মানস বড় বিস্ময়! বড় বিচিত্র এই দ্বি-চারিতা!

বাঙালির সবচেয়ে গৌরবময় অর্জন হচ্ছে একাত্তরের যুদ্ধ বিজয় এবং স্বাধীনতা। সেই অর্জনকে তারা কলঙ্কিত করেছে নিজেরা। ব্যর্থ করে দিয়েছে

যুদ্ধের উদ্দেশ্যকে। যুদ্ধে নিহত ত্রিশ লাখ লোকের আত্মদানকে অপমানিত করেছে এই জাতি। বর্তমানে সেই যুদ্ধের অর্জনের সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক মোটেই মিত্রের নয়, বরং শত্রুর। এত বড় কলঙ্ক এই জাতি অর্জন করতে পারে, ভাবা যায়নি।

বাঙালি তার স্বাধীন ভূখণ্ডের সঙ্গে যেমনি মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি করেছে, তেমনি ইতিহাসের সঙ্গে। ইতিহাস যে কারো দাসত্ব করে না, এই শিক্ষাটাই এ জাতির অজ্ঞাত। নারী যেমনি পুরুষের ভোগ্যপণ্য, কাম চরিতার্থতার ক্ষেত্র, বাঙালির কাছে যেন তার মাতৃভূমিও তাই। কর্ষণে, ধর্ষণে, শোষণে, রক্তক্ষরণে দেশটাকে তারা করে ফেলেছে বসবাসের অযোগ্য। এই ক্ষত-বিক্ষত দেশটা ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমাতে এখন তারাই উন্মাদ। স্বাধীনতা-উত্তর মাত্র ৩২ বছরে একটি জাতি কি করে নিজ হাতে তার প্রাণপ্রিয় দেশকে ঘৃণা, অবজ্ঞা, ভয়, আতঙ্ক, বিবস্ত্র, বিভবশূন্যতায় ঠেলে দিতে পারে, বাঙালি তার দৃষ্টান্ত।

আপন জন্মভূমি লুণ্ঠন করতে গিয়ে বাঙালি নিজেকেই করেছে লুণ্ঠন। এই আত্মলুণ্ঠন বাঙালিকে বিশ্বের কাছে করেছে অযোগ্য-নীতিহীন জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। কথা ছিল যার গণতন্ত্র অর্জনের, কথা ছিল সাম্যসমাজ গঠনের, সে কিনা লুটেরা সেজে দূরে সরে গেল আধুনিক সভ্য বিশ্ব-মানব সমাজ থেকে। সভ্য দুনিয়া বাঙালিকে দুর্নীতিবাজ জাতির কলঙ্ক দিয়ে ঠেলে দিয়েছে দূরে। এক অন্ধকার গুহায় আজ প্রবেশ করেছে জাতিটি।

বাঙালির সেই গুহা-বিশ্বে আজ আর বড় মাপের মানুষের দেখা মেলে না। মনে হয় সমস্ত প্রকার সৃষ্টিশীলতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এই জাতি। জাতির মানসলোকে বিন্দু বিন্দু আলোও খুঁজে পাওয়া যায় না। এই মানস বিচ্ছিন্নতা তাদের কোন গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছে, কে জানে।

যদি এ-জাতিকে টিকে থাকতে হয় তবে তাকে দূর করতে হবে বিচ্ছিন্নতা। ছিন্ন হয়ে যাওয়া মানসিক বন্ধনের পুনর্মিলন ঘটাতে হবে। বিশ্ব-প্রকৃতি এবং জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের সঙ্গে বিশ্বাস ও সহমর্মিতার বন্ধনে হতে হবে আবদ্ধ। মাতৃভূমির প্রকৃতির সঙ্গে বৈরিতার সম্পর্কের ঘটাতে হবে অবসান। ন্যায়-সত্য আর মনুষ্যত্বের সঙ্গে পুনর্স্থাপন করতে হবে ছিন্ন হয়ে যাওয়া সম্পর্কের। বাঙালি কি হারানো সেই মানস ঐতিহ্যের সন্ধান পাবে? এই প্রশ্নটাই আজ চরম সত্য।

নভেম্বর ২০০৪

পদ্মানদীর মাঝি'র কপিলার অন্তর্গূঢ় জগৎ

সাহিত্যের বড় কাজের অন্তঃস্থ গভীরে সমকালের গর্ভে ভ্রূণায়িত থাকে বহুদূরবর্তী আগামীকাল। প্রায় সত্তর বছর পূর্বে ১৯৩৬ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মানদীর মাঝি' নামের যে উপন্যাস রচনা করেন তার পাত্র-পাত্রী কুবের, কপিলা, মালা, হোসেন মিয়ারা তো বটেই, সেই হারানো সময়েরও বিস্ময়কর পুনর্নির্মাণ দেখা যায় এই সমকালে। তৃতীয় বিশ্ব এবং তার জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বকে আজ ছিন্ন-ভিন্ন করে দিচ্ছে জাতি-সত্তার সার্বভৌম অস্বীকারকারী বিশ্বায়নের মহাদানব। জাতীয়রাষ্ট্র থেকে উন্মূল হয়ে মানুষ হয়ে যাচ্ছে আত্মপরিচয়হীন এবং উদ্বাস্তু। একদিকে মহা শক্তিধর হোসেন মিয়া, অন্য প্রান্তে ছিন্নমূল কপিলা-কুবের। অনিশ্চিত অভিযাত্রায় অসহায় মানুষের অন্ধকার ঠিকানা ওই ময়না দ্বীপ। সমকালের ইউরোপ-আমেরিকার প্রতীক সেই অচেনা ভূমি। হোসেন মিয়া তো মুক্তবাজার অর্থনীতিরই প্রতীক-শক্তি।

ওই বৃত্তের ভেতর মানিকের সেই কপিলার দেখা পাই আমরা দুটি বিপর্যয়ের পটভূমিতে। একটি প্রাকৃতিক, অন্যটি মানবসৃষ্ট অর্থাৎ সামাজিক। প্রকৃতির কাজ বন্যা। সামাজিক বিপর্যয়টির উৎস হচ্ছে দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভাঙন। এই দ্বৈত অভিঘাতের ভিতর দিয়েই কপিলা চরিত্রের উত্থান এবং অভিযাত্রা। কপিলা হচ্ছে পুরাণ বর্ণিত স্বর্গের কামধেনু বা গাভী। সেই গাভী সন্তান ধারণ বা প্রসব ব্যতীতই দুধদান করতে সক্ষম অফুরন্ত দিন। নামের ভিতর দিয়েই এই যে কপিলা চরিত্রের মীথলজিক্যাল বৈশিষ্ট্য, তাতেই তার রহস্যময়তা ঘনীভূত হয়। কাম-কুণ্ডলায়িত অন্ধকার আর জীবন তৃষ্ণার আলো যেন সহবাসী।

কপিলা হচ্ছে পদ্মাতীরের চরডাঙ্গা গ্রামের দরিদ্র জেলে বৈকুণ্ঠের ছোট মেয়ে। কুবেরের স্ত্রী মালার সে ছোট বোন। বন্যায় গ্রাম ডুবে গেলে বিপন্ন শ্বশুরের সংসারের খোঁজ নিয়ে যেতে কুবেরের আগমন। কুবেরের স্ত্রী যেখানে

মালা পঙ্গু, কপিলা সেখানে ভয়ানক দুরন্ত। "পঙ্গু মালাকে বিবাহ করিয়াছিল [illegible] হয়তো কপিলার দুরন্তপনা অতবেশী চোখে পড়িয়াছিল কুবেরের, অন্ধকারে যে বাস করে মৃদু আলোতে তার চোখ ঝলসাইয়া যায়, চোখ জোরালো আলোতে সে হয় অন্ধ।"

এভাবেই লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গোড়াতেই পাঠকদের সঙ্গে কপিলার জানাজানির পর্ব সেরে নেন। কপিলার চরিত্রকে দুর্জ্ঞেয় রহস্যঘন-জটিল করে তোলার জন্য লেখক আরো অনেক সংবাদ পরিবেশন করেন। কপিলার বিয়ে হয়েছে, দু'বছর পূর্বে সে যে মেয়েসন্তানের জন্ম দেয়, আঁতুড় ঘরেই তার মৃত্যু ঘটে। শীতকালে স্বামীর সঙ্গে কলহ করে বাপের বাড়ি ফিরে এলে তার স্বামী শ্যামাদাস নতুন বৌ ঘরে তোলে। ফালগুনে স্বামীর ঘরে ফিরে গেলে কপিলা বিতাড়িত হয়। এসব ঘটনার ভিতর দিয়ে যে কপিলাকে লেখক মানিক আমাদের সামনে তুলে ধরেন, তার মানস জগতকে জটিল আবর্তের ভেতরেই অনুসন্ধান করতে হবে। মনস্তাত্ত্বিকতার পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক আচরণও এক্ষেত্রে গুরুত্ববাহক।

বন্যায় ডুবে যাওয়া ঘরের মাচা আর চালে আশ্রয় নেয়া মানুষগুলোর কষ্টের শেষ নেই। এই অবস্থায় কপিলাকে দেখতে পেয়ে জানতে চায় কবে সে স্বামীর বাড়ি থেকে এসেছে। কপিলার উত্তর, "আমার কথা থোও।" কুবের ঘটনাটা জানে না বলেই মুখে হাসি রাখলে কপিলা রেগে গিয়ে বলে, "হাসলা যে মাঝি?"

এই দুটি বাক্যের ভেতর দিয়ে কপিলার মনোজগতে প্রবেশ করতে হবে পাঠককে। কপিলার প্রথম উত্তরে হতাশা আর আত্মগোপনের চেষ্টা এবং দ্বিতীয় উচ্চারণে আত্মমর্যাদায় আঘাতের কারণে প্রতিরোধের চেষ্টা। অথচ সেই কপিলাই তার ভাইবোনদের সঙ্গে কেতুপুরে কুবেরের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। লক্ষ্য করার বিষয় বটে, কপিলা এখানে অন্য এক নারী। স্বামীর বাড়ি থেকে বিতাড়ন কিংবা আঁতুড়ে মৃত সন্তানের শোক থেকে মুক্ত সে। "কপিলা খুব সাজিয়াছে... স্বামী ত্যাগ করিয়াছে বটে, বয়েস তো কাঁচা... মেয়েটা [illegible] আটখানা হইয়া উঠিয়াছে।"

কুবেরের বাড়ি কেতুপুরে আসার পূর্বের কপিলা, আর আজ কেতুপুরে বেড়াতে আসা কপিলা যেন আলাদা নারী। কুবেরের স্ত্রী মালা জন্ম খোঁড়া, সে [illegible] জানে না। যেন জড় পদার্থ। সেই মালার সামনে কপিলা যেন বর্ষা [illegible] পদ্মার মতোই তলহীন, উত্তাল রহস্যময়ী অনন্ত দরিয়া। বোন, বোনের [illegible], অন্তত কুবেরের সংস্পর্শে। মাছ ধরার জন্য সন্ধ্যাবেলা কুবের নৌকায় বসে গণেশ আর ধনঞ্জয়ের জন্য অপেক্ষায় থাকে। নির্জন পদ্মাতীরে পদ্মার অন্ধকারে কারো আকস্মিক হাসিতে কুবের ভয় পেয়ে যায়। তখনই [illegible] কপিলার আবির্ভাব। কুবের বলে, "খাটাসের মতো হাসিস ক্যান [illegible] মাইয়া?" কপিলার রহস্যময় দুর্বোধ্য উত্তর, "ডরাইছিলা, হ? আরে [illegible] পরক্ষণেই সে জানতে চায়, "আমারে নিবা মাঝি লগে?"

বর্ষা প্লাবিত অশান্ত দরিয়া পদ্মায় কুবেরের সঙ্গে ওই যে কপিলা সহগামী-সহযাত্রী হতে চায়, ওখানে কোনো দার্শনিকতা নেই। সংসারের সংকীর্ণ অলি-গলির বাইরে বাধাহীন বন্ধনশূন্য জীবনের স্বপ্ন দেখে কপিলা। সে একা নয়– সঙ্গে থাকবে কুবের। তাই সে যখন কুবেরের হাত ধরে টানাটানি করে তখন মনে হয় "শান্ত নিরীহ কুবেরকে কোথায় যেন সে লইয়া যাইবে।" "অবাধ্য বাঁশের কঞ্চির মতো" কপিলাকে তাই কুবের বলে, "বজ্জাতি করস যদি, নদীতে চুবানি দিমু কপিলা... পাঁক মাইখা মরস কেরে কপিলা? মাইনষে কইব কী?"

কপিলা রহস্যময়ী। কুবেরের জানার কথা নয় কী আছে তার মনে। বন্যার জল সরে গেলে কপিলার বড় ভাই তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসে। কপিলা যায় না। এভাবে বর্ষা গিয়ে আসে শরৎকাল। পূজার মৌসুম। চরডাঙা থেকে আবারও আসে তার ভাই। এবারও কপিলা গেল না– অথচ তার ছোট ভাই-বোনেরা ফিরে আসে। যে কপিলা কুবেরের "কোনদিন গোঁফ ধরিয়া টান দিয়া, কোনদিন একটা চিমটি কাটিয়া, হাসি চাপিয়া চোখের পলকে উধাও হইয়া– ঘুম আসিবার আগেই কপিলা তাহাকে স্বপ্নও আনিয়া দেয়–" এবং কেতুপুরের পূজায় ঠাকুর দেখতে গিয়ে সন্ধ্যেবেলা বাবুদের কর্মচারী শীতলের সঙ্গে রঙ্গ-তামাশা করে, সেই কপিলা কুবেরকে ঈর্ষায় পোড়ায়। বাড়ি ফেরার পথে অন্ধকার তেঁতুলতলায় কুবের তার শাড়ির আঁচল চেপে ধরে জানতে চায়, "শীতলের লগে অত কথা কিসের তর, আঁই?" এক পর্যায়ে কুবের তাকে জড়িয়ে ধরলে কপিলা শান্ত হয়ে থাকে এবং করুণ স্বরে বলে, "মনডা ভাল না মাঝি, ছাড়বা না? মনডা কাতর বড়।" কেন ওর মন কাতর তা জানতে চাইলে উত্তর আসে, "সোয়ামীরে মনে পড়ে মাঝি!"

এই যে এক এক পরিস্থিতিতে কপিলার রূপ-রহস্য একেক রকম, এর কী তাৎপর্য থাকতে পারে? হয়তো এখানে মন আর শরীর সমভাবেই ক্রিয়াশীল। দীর্ঘদিনের যৌনতৃষ্ণা যতটা সত্য, কামশূন্য ভালোবাসাও ঠিক ততটাই। যে স্বামী তাকে তাড়িয়ে দিয়ে নতুন বৌ ঘরে তুলেছে তার জন্য কিসের মায়া কপিলার? এ কি কুবেরের সঙ্গে ছলনা? বোধ করি ছলনা নয়। পেছনে ফেলে আসা স্বামী নামক পুরুষটিকে ঘিরে তার তো রয়েছে অতীত, যে তার গর্ভে জন্ম দিয়েছিল মৃত সন্তান। স্মৃতির ভেতর ফেলে আসা দিন তাকে দুঃখ দেয়। কেন না কপিলা তো শরীর কিংবা হৃদয়-জাত উপবাসী প্রেম অন্য কোনো পুরুষের কাছে তুলে দিতে পারেনি। কুবেরের সঙ্গে তার যা কিছুই ঘটে তা তো পরিণতিতে পৌঁছে না। উপবাসী শরীর বা মন অপূর্ণই থেকে যায়। অপূর্ণতার এই মনোবিকারের প্রাপ্তি-প্রশান্তির পরিসমাপ্তি ঘটে না।

একথা মনে করার কারণ নেই যে, কপিলা কেবলই আদিম প্রবৃত্তির অন্ধকারেই ক্রমাগত হেঁটে বেড়ায়। স্বামীর জন্য আক্ষেপ তার কেবল শরীরী চেতনার ফল নয়– মনোজগতের তরঙ্গাভিঘাতও। আবার যদি আমরা কপিলার

[illegible]ন্দ্বের বিষয়টি ভাবি যা উপন্যাসে অপ্রকাশ্য, তবে কপিলার সামনে বোন মালা পরম সত্য হয়ে দাঁড়ায়। মালার প্রতিবন্ধী জীবনের প্রতি করুণা তার স্বামী কুবেরকে দখলের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কপিলাকে বিবেকের তাড়নায় তাড়িত করেছিল। তাই সে স্বামীর জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে কুবেরের কাছে।

আমরা দেখতে পাব কুবেরের সঙ্গে কপিলার ময়না দ্বীপে যাবার [illegible]তির সঙ্গে পূর্বের অবস্থাটা বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে আছে। ঘটনাটা ঘটে পুনরায় কপিলার স্বামীর কাছে ফিরে যাবার পর। কপিলা কি স্বামীর ঘরে সেই ঘটনার ভিতর দিয়ে কুবের সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল? কেবল [illegible] তাড়না যে কপিলাকে কুবেরের সঙ্গে ময়না দ্বীপে যাত্রার জন্য প্রেরণা সৃষ্টি করেছে এ ধারণা ভুল। কুবের পঙ্গু স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করছে, অথচ শ্যামাদাস কপিলাকে তাড়িয়ে দিয়ে পুনরায় বিয়ে করেছে।

এখানে বিশ্বাসে-বিবেচনায়-মানবিকতায়, ক্ষমতায় দুই পুরুষ দুই পৃথিবীর [illegible]। দেহজ লালসা যে কপিলার কাছে প্রধান নয়, তার প্রমাণ কুবেরের [illegible] শ্যামাদাস পৌরুষে অনেক বড়। তার আচরণ শরীরী বর্ণনা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন। প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় শ্যামাদাস যে কুবেরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ একথা কপিলাও জানে। জানে বলেই তার সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জানাচ্ছেন, "লম্বা-চওড়া প্রকাণ্ড জোয়ান মানুষ, ঘাড়-ছাঁটা বাবরি চুল মাথায়, বোঁচা নাকটার নিচে একজোড়া উদ্ধত গোঁফ....মনে হয় বিশ্ব জগতে কারো সে তোয়াক্কা রাখে না।"

কুবেরকে কেন্দ্র করে প্রতিটি ঘটনায় কপিলা যে দুর্বোধ্য আচরণ করে [illegible] অর্থ উদ্ধার করা যায়। কুবেরকে মেয়ে গোপীর পায়ের চিকিৎসার জন্য মহকুমা শহর আমিন বাড়ির হাসপাতালে যেতে হয়। রাসু-গণেশ ফিরে এলেও কুবেরের সঙ্গে থেকে যায় কপিলা। "কপিলাকে লইয়া এখন সে (কুবের) কী করিবে, যাইবে কোথায়? কী মতলব করিয়াছে কপিলা? থাকিবার ওর কী [illegible] ছিল?...কপিলার মন বুঝিবার ক্ষমতা ভগবান কুবেরকে দেন নাই?" হাসপাতালে একসঙ্গে রাত কাটালেও ভয়, লোক-লজ্জার কারণে কুবের যেখানে [illegible], কপিলা সেখানে উল্টো। অথচ নিষ্পাপ রাত কেটে যায়। এভাবে কপিলা বারবার হার মানায় কুবেরকে।

গ্রামে ফিরে, দুর্নামের ভয়ে কুবের কপিলাকে পরামর্শ দেয় যেন সে বলে রাত কাটিয়েছে ওরা হাসপাতালে, গোপীর সঙ্গে। অথচ কপিলা বলে, "দূর অ, [illegible] কথা আমি কই না মাঝি।" এখানে সত্যের চেয়ে বড় কপিলার অপরিণামদর্শিতা, সামাজিক বিধি-বিধানের প্রতি গভীর অনাস্থা।

এই কপিলা, তার রূপ পাল্টে যায় স্বামী শ্যামাদাসের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে। যে স্বামী তাকে তাড়িয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে এবং সেই বৌ'র মরণের পরে কপিলাকে পুনরায় ঘরে ফিরিয়ে নিতে আসে, তার সামনে কপিলা অন্য মানুষ। কুবেরের কথা যেন সে ভুলে যায়। যে গোপীর জন্য হাসপাতালে

কাঁদে, তার কথা জানতেই চায় না। কুবেরকে দেখিয়ে সে "ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া স্বামীর কানে কানে কী সব গোপন কথা বলে, তারপর হাসিয়া চলিয়া যায়, পিসীর ঘরে ঢুকিবার আগে মুখ ফিরাইয়া চোখের একটা দুর্বোধ্য ইঙ্গিতও করে।"

এই যে কপিলা, তাকে আমারা কি বলব? বলব কি অসংস্কৃত, গ্রাম্য, আদিম, অমার্জিত নারী? স্বামী এসেছে বলে যে কপিলা চুলে জবজব করে নারিকেল তেল দেয়, স্বামীর সামনে গায়ে মাখার জন্য কুবেরের হাতে শূন্য তেলের পাত্র উপুর করে দিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে, সে কি শ্যামাদাসের শারীরিক আর অর্থনৈতিক ক্ষমতার প্রতীক হয়ে কুবেরকে ছিন্ন-ভিন্ন করতে চায়? সেদিন সন্ধ্যায় তো কপিলা পদ্মার ঘাটে আসে না কুবেরকে তামাক পৌঁছে দিতে। অথচ পরদিন কপিলাকে সঙ্গে করে শ্যামাদাস বাড়ি চলে যায়। কপিলার যেন এটা জয়যাত্রা। কুবের যা পারে না কপিলা তা পারে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামাদাস আর কুবেরের মাঝখানে কপিলাকে দাঁড় করিয়ে দুটো পুরুষ আর একটি নারীর যে মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন তৈরি করেন, তার অন্তঃস্থ গভীরে লুকিয়ে থাকে ত্রি-মাত্রিক দ্বন্দ্ব। কপিলার প্রত্যাশা, কুবেরের বাসনা আর শ্যামাদাসেনর ইচ্ছার ভিতর দিয়ে যে স্রোত তৈরি হয় তার গতিমুখ বড়ই জটিল। যে স্বামী অবিচার করেছে কপিলার উপর, তাকে তাড়িয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন, সে কিনা স্ত্রীর মৃত্যুর ভিতর দিয়েই পুনরায় কপিলার কাছে ফিরে আসে। যার কাছে কপিলার ভালোবাসার মূল্য নেই, যে কেবল কপিলার শ্রমশক্তি এবং কাম-ভোগের উপকরণ নারী-শরীরের প্রয়োজনে ফিরে আসে, কপিলার সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্ক নেই। কিন্তু তার উপবাসী শরীর যা অচরিতার্থ থাকে কুবেরের কাছে, স্বামী ফিরে আসায় যার ভাঙ্গা ঘর জোড়া লাগার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়, কপিলা তো সেদিকেই ছুটে যাবে।

শ্যামাদাসের সঙ্গে বিয়ের মধ্যদিয়ে কপিলা যে কাম-সম্ভোগের জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, বিচ্ছেদের মধ্যদিয়ে তার সেই জাগ্রত তৃষ্ণা অপূর্ণই থেকে যায়, কুবেরের সংস্পর্শেও। যদি চরিতার্থ হতো কুবেরকে কেন্দ্র করে সেই কাম- চেতনার, তবে পুনরায় শ্যামাদাসের আগমনে কপিলার আচরণ কেমন হতো অবশ্যই তা ভাববার বিষয়। কপিলা কি নির্দ্বিধায় ফিরে যেত স্বামীর সঙ্গে?

অনিবার্য একটি দ্বন্দ্ব তৈরি হতো উপন্যাসটিকে ঘিরে। কিন্তু আমাদের অপেক্ষায় থাকতে হবে এর পরিণতি পর্যন্ত। কুবেরের প্রতি কপিলার বারবার উচ্চারিত তির্যক বাক্য 'হায়রে পুরুষ!' কোন সত্যকে নির্দেশ করে? সত্যটি হচ্ছে কপিলার বিবেচনায় কুবের আত্মদ্বন্দ্বে পতিত পরিস্থিতি মীমাংসায় ব্যর্থ এক পুরুষ। দু'জনের চরিত্রের বৈপরীত্ব বিশাল। কপিলা প্রবল অপ্রতিরোধ্য বেগমান স্রোত, আর কুবের হচ্ছে অন্তর্মুখ অন্তস্রোত। একটি দৃশ্য, অন্যটি অদৃশ্য।

কপিলা চরিত্রের অন্তর্গূঢ় রহস্য বুঝতে গেলে কুবেরকেও সামনে রাখতে হবে। কুবেরকে জানতে হবে ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে। ওই যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের সমালোচকেরা কুবের চরিত্রের ভেতর মানিকের মধ্যবিত্ত তথাকথিত মানসিকতা খুঁজে পেয়েছেন সেই তত্ত্বের সঙ্গে বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। কুবের তো চিরকালের বাঙালি সত্তার প্রতিভূ। বাঙালি-মানস না বুঝলে কুবেরকে জানা অসম্ভব। বাঙালি জীবনে নদীর অস্তিত্বে যতটা আছে দার্শনিকতা, তার চেয়ে বেশি রয়েছে জীবন-বাস্তবতা। ইউরোপীয় শ্রেণীর চরিত্র বিচারের দর্শন এখানে অবাস্তব। কী সম্পর্ক নদীর (পদ্মা) সঙ্গে কুবেরের? "নদীকে সে বড় ভালোবাসে, নদীর বুকে ভাসিয়ে চলার মতো সুখ আর নাই....নদীর বুকে জীবনের সঞ্চালন, এসব কিছুই যদি না থাকে, শুধু এই বিশাল একাভিমুখী জলস্রোতকে পদ্মার মাঝি ভালোবাসিবে সারা জীবন। মানবী প্রিয়ার যৌবন চলিয়া যায়, পদ্মা তো চির যৌবনা।"

কুবেরের চোখে এবং অন্তরে এই পদ্মারই তো প্রতীক কপিলা। এখানে কোথায় ভাববাদী দার্শনিকতা? পদ্মার যৌবন আর বিশালত্বের ভেতরই তো পদ্মাপারের মাঝিদের বস্তুবিশ্ব। তাই দেখা যায় বর্ষা ফুরিয়ে গেলে পদ্মার ইলিশের মরসুমও ফুরিয়ে আসে। জেলে পাড়ায় অভাব আর ক্ষুধার পদধ্বনি আসে। কুবেরের কাছে মনে হয় শ্যামাদাসের সঙ্গে কপিলা চলে গেলে ঘরের লক্ষ্মীও চলে যায়। বন্যার প্রভাবে খাদ্যাভাব দেখা যায় চারদিকে, কুবেরের সংসারে। বুঝি বর্ষা ফুরানো পদ্মার রূপ ধরে কপিলা সব নিয়ে দূরে সরে গেছে। এখানে পদ্মা কুবেরের কাছে যতটা রোমান্টিকতা, তার চেয়ে বেশি রিয়ালিজম। সেই যে স্বপ্নের বহুদূরবর্তী বস্তুবিশ্বের কপিলা, তাকে কুবের লক্ষ্য করে শ্যামাদাসের বাড়িতে। নিজের দারিদ্র্য এবং তার স্বচ্ছল জীবনের আবর্তের জটিলতার ভেতর। যেন মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা।

হাসপাতাল থেকে গোপীকে আনার অছিলায় কুবের কপিলার জন্য ব্যাকুল হয়ে শ্যামাদাসের বাড়ি আকুরটাকুর গ্রামে প্রবেশ করে। শ্যামাদাসের সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ, "লক্ষ্মী-শ্রী, মাখানো সম্পন্ন গৃহস্থের ঘর-সংসার" কুবেরকে অন্তর পোড়ায়। কপিলার অপ্রত্যাশিত আচরণে এবং "আইছ ক্যান কও দেহি?" প্রশ্নে ভেঙে বিচূর্ণ হয়ে যায় সে। এ কোন কপিলা? তার প্রত্যাশার বিপরীত নয় কি? নির্বোধের মতো কুবের কি প্রত্যাশা করেছিল তাকে সামনে পেয়ে কপিলা বিরহ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠবে? সে বুঝতে পারে "কপিলার নাগাল সে কেন পারিয়া উঠিবে? পদ্মা নদীর বোকা মাঝি সে, এক হাটে কপিলা কিনিয়া তাহাকে আরেক হাটে বেচিয়া দিয়াছে।"

এই যে মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় কুবেরের সঙ্গে কপিলার , তার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ হয় কুবেরকে নিকৃষ্ট জন্তু পাঁঠার ঘরে শুইতে দিলে। "গরু-ছাগল ভাবস আমারে তুই, খেলা করস আমার লগে? তরে চিনা গেলাম কপিলা, পরনাম (প্রণাম) কইরা গেলাম তরে", আত্মীয় বাড়িতে নিজের অপমান অবহেলা হেতু

কুবেরেক এই উক্তিতে অসঙ্গতি নেই সত্য, কিন্তু বাস্তবতা তো ভিন্ন। প্রশ্নটা শ্রেণীর, ধনী-দরিদ্রের। কুবের হত-দরিদ্র, শ্যামাদাসের বিত্ত আছে। সেই বিত্তের কাছে কপিলাও বশীভূত। তাই সে কুবেরকে বলে, "মাথা খাও, দিদিরে (মালাকে) কথাটা কইও। কইও কপিলা পরের ঘরের বৌ, পরের শাসনে কপিলার মুখে রাও নেই। অতিথ কই থাকবে, অতিথ কী খাইব, কপিলারে কেডা তা জিগায়? দুষী কইরো মাঝি, শাইপো....।"

'পরের ঘরের বৌ' আর 'পরের শাসন'–এই নিষ্ঠুর বাস্তবতার উপলব্ধি কপিলা চরিত্রে আগামী ভবিতব্য কোন ঘটনার ইংগিত করে? যে স্বামীর সংসারে সে কেবল দাসী কিংবা যৌন-সঙ্গী, সেখানে কপিলার জীবন যে চলে না, পরিণতিতে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। যদিও তার মুখের বচন রূপকথার নায়িকার মতো যার উৎস মধ্যবিত্তের নগর নয়, গ্রামীণ প্রাকৃত জনপদের জীবন বাস্তবতায়। কিন্তু কপিলার স্বামীর প্রতি চূড়ান্ত পর্বের প্রতিশোধ প্রাচীন কল্পনার নয়, ব্যক্তিস্বাধীনতার আধুনিক দৃষ্টান্ত।

কপিলা স্বামী আর শাশুড়ির আচরণিক প্রথার প্রতি অবাধ্য হয়েও অনুগত এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সমাজ বশ্য এক বাঙালি নারী। কিন্তু একথাও সত্য উপন্যাসের পরিণতি সেই পরাধীন জীবনের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্রোহ। যে কুবেরকে সামান্যতার ভেতর, তুচ্ছতার ভেতর তার শ্বশুর-পরিবার কপিলার চোখের সামানেই অপমান করে, পরিণতিতে তার সঙ্গেই কপিলা সমুদ্র পারি দেয়। প্রশ্ন করা যায়, ঘটনাটি কি তাৎক্ষণিক ঘটে যাওয়া? নাকি অজ্ঞাত পরিকল্পনা?

কপিলা তো রহস্যময়ী পদ্মা নদীরই প্রতিরূপ। আর কুবের? "পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়া যারা ভাবুক কবি, ডাঙায় যারা গরিব ছোট লোক...।" নদী তো বাঙালি জীবনে গভীর দার্শনিকতার সত্তা, অন্যদিকে ডাঙার জীবন বাস্ত বতার ক্ষুধা আর দারিদ্র্যে পূর্ণ। এই বৈপরীত্বের প্রতীক হচ্ছে কুবের। সেই কুবেরের কাছে কপিলা তাই চির রহস্যের জগৎ। তাই স্বামীর সংসারে তার প্রতি কপিলার নিষ্ঠুরতা, দুর্বোধ্য নির্মম খেলা কুবের ভুলে যায়। "কপিলার লীলা চাপল্য....তেল ভেজা চুল" কুবের ভুলতে পারে না। "আবার তাই যাইতে চায় কুবের কপিলার কাছে, এখনি যাইতে চায় শস্যহীন শুকনো মাঠগুলি উর্ধ্বশ্বাসে পার হইয়া চরডাঙায় কপিলা যেখানে চুল বাঁধিতেছে।"

এই যে কপিলা, সে তো অলৌকিক স্বপ্ন নয়, বস্তুবিশ্বে, কুবেরের মানবীয় স্বপ্ন, মানুষ্যত্বের তৃষ্ণা। জীবন যেখানে "শস্যহীন শুকনো মাঠ" যেখানে থেকে রক্ত-মাংসের কপিলাই তো পারে কুবেরকে নব জীবনের স্বপ্নের কাছে পৌঁছে দিতে। কপিলার এই শক্তি, এই মহিমা মোটেই মায়াজাল নয়, মানুষের সুখ-কল্পনা আর প্রাপ্তিরই বাস্তবতা। সেই বাস্তবতার স্রষ্টা তো কপিলা। কপিলার বাপের বাড়ির পুকুরে কুবেরের সঙ্গে তার যে সুখ-স্বপ্নের খেলা চলে, সেখানেই কপিলা-চরিত্রের রহস্য উন্মোচন হয়ে যায়।

"কলসীর মতোই আলগোছে কপিলা ভাসিয়া থাকে, তেমনি ত্রাসের ভঙ্গিতে স্তন দু'টি ভাসে আর ডোবে।" এই যে কপিলার শরীরী অস্তিত্ব তার মাঝেই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও আছে। কুবের যখন বলে, "তর লাইগা দিবারাত্র পরানডা পোড়ায় কপিলা", –তখন "কপিলা চোখ বুজিয়া বলে, "ক্যান মাঝি, ক্যান? আমারে ভাব ক্যান? সোয়ামীর ঘরে-না গেছি আমি?.... গাঙের জলে নাও ভাসাইয়া দূর দ্যাশে যাইও মাঝি, ভুইল আমাদের।"

করুণা নয়, মধ্যবিত্তের ভাবাবেগ নয়, শোক-আক্ষেপ নয়, কপিলা কুবেরের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বুকে জ্বালাতে চায় সাহসের আগুন, সংস্কার ভাঙার দুর্বার স্রোত চায় জাগাতে। "হায়রে পুরুষ!" এর ভেতর এমন একজন সাহসী পুরুষের ঘুম ভাঙকে চায় কপিলা, যে তাকে সমাজ আর স্বামীর ঘরের দেয়ালটা ভেঙে উদ্ধার করার শক্তি রাখে। কপিলার ছলা-কলা তো রহস্যময় পদ্মারই মতো।

কুবেরের মেয়ে মালার বিয়ে, মালায় প্রতি রাসুর প্রচণ্ড আকর্ষণ, রাসুর প্রতিশোধ স্পৃহা, চতুর হোসেন মিয়ার ষড়যন্ত্রে চুরির মাল কুবেরের ঘরে আবিষ্কার-ঘটনার চূড়ান্ত গতি নির্ধারণ করে। সব ঘটনাই যেন ঘটে কপিলার রহস্যময় চরিত্রের গুপ্তগুহার দরজা উন্মোচনের জন্য। তাই কুবেরের মেয়ের বিয়েতে কপিলার আগমন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। অথচ কপিলা যেন আজ আলাদা নারী। গাম্ভীর, হাসিশূন্য।

আসলে গোপীর বিয়ের ভিতর দিয়ে কপিলার অসুখী দাম্পত্য জীবন গোপনে তার বুকে বিষ ছড়িয়ে রাখে। কুবেরের তা জানার কথা নয়। কুবের মেয়ের বিয়ের পর হোসেন মিয়ার নৌকায় শ্রম দিয়ে রাতে কেতুপুর ফেরে। এই গভীর নির্জন রাতে নদীর ঘাটে সাদা কাপড় পরা কাউকে দেখতে পেয়ে কুবের চমকে যায়। ভূত-প্রেত নয়। কপিলা। কপিলার দুঃসংবাদ দেয় কুবেরকে। পীতম মাঝির চুরি হয়ে যাওয়া ঘটি পাওয়া গেছে কুবেরের ঢেঁকি ঘরে। পুলিশ খুঁজছে তাকে। কুবের বুঝতে পারে এ কাজ রাসুর। ভয়ার্ত কুবের হোসেন মিয়ার পাতা ফাঁদে পা ফেলে– সেই ময়না দ্বীপ। ওখানে গেলেই কুবের জেল-জুলুম থেকে পাবে মুক্তি। কেবর সে-ই নয়, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবাইকে হোসেন মিয়া ময়না দ্বীপে পৌঁছে দেবে। একলা কি যাবে কুবের? না, কপিলাও সঙ্গে যাবে। "আমারে নিবা মাঝি লগে? হ কপিলা চলুক সঙ্গে। একা সমুদ্রে কুবের পাড়ি দিতে পারব না।"

উপন্যাসের বয়ান শেষ করে দেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরও কপিলা চরিত্রের অন্তর্গূঢ় রহস্য কোথায় যেন জট পাকিয়ে থাকে। সারা উপন্যাসের ব্যাপ্তির ভেতর ছড়িয়ে থাকে যে রহস্যময়ী নদী পদ্মা, তার বিদায় ঘটে। মহা সমুদ্রের বুক দীর্ণ করে ভেসে উঠে দ্বীপ, অজানা দ্বীপ, ময়না দ্বীপ। রূপান্তর ঘটে কপিলার, প্রতীক হয়ে যায় ময়না দ্বীপের।

সেই দ্বীপ তো স্বপ্ন; তৃতীয় বিশ্বের শোষিত-দরিদ্র মানুষের মুক্তির স্বপ্ন। এই দ্বীপ সমকালের বিবেচনায় হোসেন মিয়ার নয়া উপনিবেশ নয়;

ঔপনিবেশিক মহাশক্তির চিরস্থায়ী আবাস ভূমি। ময়না দ্বীপ যদি হয় তৃতীয় বিশ্বের মানুষের স্বপ্ন, তবে হোসেন মিয়ার পরিচয় কী? সে হচ্ছে আজকের মহাশক্তিধর গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন। এই বিশ্বায়ন ভেঙে দিয়েছে কেতুপুর নামক দরিদ্র বাংলাদেশের সীমানা, ছিন্ন করেছে মানুষের শেকড়।

মানুষের চোখে সুখ স্বপ্নের পশ্চিমা ধনীদেশ ময়না দ্বীপ। কেতুপুর ছেড়ে মানুষ সমুদ্রে ভাসে সেই স্বপ্নপুরীর সন্ধানে। ওখানে কী আছে? "মুসলমান মসজিদ দিলি, হিঁদু দিব ঠাহুর ঘর– না মিয়া, আমার দ্বীপের মদ্যি ও-কাম চলব না।"–এটি হোসেন মিয়ার উক্তি, পশ্চিমা অতি আধুনিক বিশ্বের কণ্ঠস্বর। তৃতীয় বিশ্বের মানুষ ওখানে হারায় জাতীয় পরিচিয় আর ঐতিহ্য। "যেখানে যত ভাঙাচোরা মানুষ পায় কুড়াইয়া নিয়া জোড়াতালি দিয়া নিজের দ্বীপে (হোসেন মিয়া) রাজ্য স্থাপন করিতেছে– প্রজাবৃদ্ধির"–এই প্রজা তো ক্রীতদাস, সেবক, শ্রম বিক্রেতা তৃতীয় বিশ্বের (কেতুপুরের) মানুষ। সস্তা কৃষি শ্রমিক, কারখানা শ্রমিক ছাড়া প্রথম বিশ্ব টিকবে কেমন করে? তাই স্বপ্ন জাগাতে হয়, "হ, কপিলা চলুক সঙ্গে।"

কপিলা তো সেই স্বপ্ন, কুবেরের অসুখী, অতৃপ্ত, ক্লান্ত জীবনের স্বপ্ন। ওখানে দেহজ লালসা যতটা বাস্তব সত্য, তার চেয়ে চরম সত্য হচ্ছে অস্তিত্ব আর মনোলোকের প্রশান্তি। এই প্রশান্তির ঘাটতি ছিল যতটা কুবেরের, তার চেয়ে কপিলার। তাই কপিলা-কুবের মানব-অস্তিত্বের সংকট মুক্তির প্রতীকী বাস্তবতা।

একথা স্পষ্ট বলা যায়, সারা উপন্যাসে কপিলার শারীরিক রহস্যময়তা যতটা সরবে উপস্থিত, ঠিক ততটা তার অন্তপ্রবাহে ছিল জীবন-বঞ্চনা অর্থাৎ সুখ-অপ্রাপ্তি। একথা তো সত্য নয় যে, ময়না দ্বীপে যাত্রার মধ্যদিয়ে কপিলা স্বার্থবাদীর মতো আপন বোনের সংসার ভেঙে কুবেরকে দখল করে নিয়েছে। কেননা কুবেরের বিচ্ছিন্ন পরিবারে হোসেন মিয়া পুনরায় সংযোগ ঘটাবে অবশিষ্ট মানুষগুলোকে ময়না দ্বীপে টেনে নিয়ে। কপিলার এই অজানা সমুদ্রযাত্রা জীবন বঞ্চনারই ফল।

কিন্তু এই অভিযাত্রা কি কপিলাকে সুখী করবে? অপ্রাপ্তির পূর্ণতা কি ঘটবে? এই জটিল প্রশ্নের ভেতর কপিলা দুর্জ্ঞের এক স্বপ্নই হয়ে থাক পাঠকের কাছে। মানব চরিত্র যে কতটা দুর্লঙ্ঘ্য, অন্ধকারে কুন্ডলায়িত, রহস্যাবৃত, কপিলা তারই প্রতীক।

ডিসেম্বর-২০০৪

পুতুলনাচের কুসুম চরিত্রের অন্তর্জটিলতা

প্রায় সত্তর বছর পূর্বে ১৯৩৬ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পুতুলনাচের ইতিকথা' প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির ঘটনার বিস্তারকাল মাত্র ১০ বছর। খালের ধারে বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় হারু ঘোষের বজ্রাঘাতে মৃত্যুর সময় তার পুত্রবধূ কুসুম ছিল ' তেইশ বছরের বাঁজা মেয়ে।' গ্রাম ছেড়ে চিরকালের মতো বাপের বাড়ি চলে যাবার সময় কুসুমের বয়স ৩০ থেকে প্রায় ৩৩ বছর। সময়ের সাক্ষ্য কুসুম নিজেই শশী ডাক্তারকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল বিদায়ের পূর্বে, 'দশ বছর খেলা করেও সাধ মেটেনি?' মোটকথা, প্রায় শতাব্দি কালের প্রাচীন অথচ চির নবীনা রহস্যময়ী কুসুম আমাদের সামনে অতীত ইতিহাস নয়, বরং চলমান সমকাল। কুসুমকে জানতে বুঝতে হলে কালকে বিবেচনায় রাখতেই হবে। আরো বিবেচনায় আনতে হবে, বাংলাসাহিত্যে আজতক যত জটিল নারীচরিত্রের আগমন ঘটেছে, তারা সংখ্যায় খুবই অল্প। সেই অল্পের ভেতর কিনা কুসুম আবার অনেকটা স্বতন্ত্র বা একাকী।

সেই কুসুমের সঙ্গে তার স্রষ্টা মানিকের বয়সের বেশ মিল আছে। কুসুম ২৩, মানিক ২৮। সেই ২৩ বছর বয়সের কুসুমকে নিয়ে শশী ডাক্তারের মতো লেখক মানিকও জটিল খেলা খেলেছেন। পরিণতিতে শশী হেরে যায় কুসুমের কাছে। আর মানিক? মানিক কি আপন সৃষ্ট চরিত্রের হাতে ক্ষত বিক্ষত? প্রশ্নটা চমকের মতো শোনালেও এর জটিল জট খোলা সহজ যে নয়, উপন্যাসটির নামকরণে এর প্রমাণ মেলে। কুসুমকে বুঝতে হলে ওটাও জরুরি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিণতিতে সাম্যবাদী দর্শনে তথা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক আদর্শে নিজেকে সমর্পিত করেছিলেন। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' কমিউনিস্ট নয়, অকমিউনিস্ট মানিকের হাতে তৈরি। উপন্যাসটির নাম নির্বাচনে মানিককে দার্শনিক হতে হয়েছে, ভাববাদী দার্শনিক। 'মানুষ চায় এক , হয় আর এক...পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে

খেলাচ্ছেন', উক্তিটি কুসুমের জন্মদাতা অনন্তর। কিন্তু আড়ালে রয়েছেন স্বয়ং মানিক; ঠিক খেলোয়াড় ঈশ্বরেরই মতো। উপন্যাসটির পরিণতি কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা অনন্তর কথায়ই ইংগিত মেলে। আরো ইংগিত মেলে কুসুম নামক নারী চরিত্রটির পরিণতি। তাছাড়া কুসুমকে জানতে হলে খুবই জরুরি গাওদিয়া গ্রামকে জানা।

গাওদিয়ার ভৌগোলিক আর সামাজিক বাস্তবতা আজকের নয়; প্রায় শতবর্ষ পূর্বের। কুসুমের জন্য লেখক মানিককে এমনি গ্রাম নির্বাচন করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। কেমন সেই গ্রাম? এই গ্রামে আছে জমিদার। আছে মুহুরি, পেনসন প্রাপ্ত হেড পিয়ন, স্কুল মাস্টার, শহরের বড় চাকুরে, গ্রাম্য দোকানদার। কলকাতার সঙ্গে নৌ যোগাযোগও আছে। আধুনিক চিকিৎসার ছোট্ট হাসপাতাল রয়েছে। পাকা ভাঙা প্রাচীন বাড়িরও সংবাদ মেলে। আর কী আছে গাওদিয়ায় ? আছে ভয়ংকর বিষেল সাপ। লেখক মানিক সারা উপন্যাসে অসংখ্যবার সাপের উপস্থিতিকে চিত্রিত করেছেন। কুসুমকে বুঝতে গেলে এই সাপের বিষয়টিও বুঝতে হবে। কুসুম তো সেই নারী যে সাপকে ভয় পায় না। অন্ধকারে অবলীলায় সে হাঁটে সাপের সম্ভাব্য জায়গা মাড়িয়ে।

সাপ তো কুসুমের মনোজগতের প্রতীক। অতৃপ্ত কামচেতনার এক দুর্জ্ঞেয় জগৎ। হারু ঘোষের ছেলে পরান তার স্বামী। "পরান বাপের মতো চালাকও নয়, গোয়ারও নয়।" মানিক আমাদের জানিয়েছেন কুসুম সন্তান ধারণে অক্ষম– বাঁজা। কিন্তু একথা বলেন নি তার স্বামী নির্বীর্য্য– অপৌরুষ। অথচ উপন্যাসে তার গতিপ্রকৃতি এবং পরিণতিতে কুসুমের হাত ধরে শ্বশুরবাড়ি আশ্রয় কোন পরিচয় বহন করে? শশীর সামনে কুসুমের আবির্ভাব তার চরিত্রের জটিল দিক নির্দেশনা করেন লেখক উপন্যাসটির শুরুর দিকে। "ঘরের ভিতর হইতে হয়তো দু'চোখের গাঢ় স্তিমিত ছায়া সঞ্চয় করিয়া কুসুম হঠাৎ বাহির হইয়া আসিবে।" "অথবা কুসুম ভিজা কাপড়ে উঠানের রোদে পায়ে দাগ কাটিয়া পুবের ঘরের ছায়ার মধ্যে ডুবিয়া যায়।"

লেখক মানিক শশীর সামনে কুসুমের এই "ছায়া" ব্যঞ্জনার ভেতর দিয়ে এক জটিল মনোজগতের সন্ধান দিতে চান। ননদ মতিকে কেন্দ্র করে যে আবর্ত সৃষ্টি হয় কুসুমের মনে সেখানে তার ঈর্ষা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেন্দ্র হচ্ছে ছোটবাবু অর্থাৎ শশী ডাক্তার। মতির সঙ্গে এ নিয়ে বিবাদও ঘটে কুসুমের। মতিকে শাসন করে কুসুম, "এত বড় ধেড়ে মেয়ে তুই, লজ্জা নেই তোর? ছোটবাবুর তুলনার তুই ছোটলোক ছাড়া কী?"

ননদ মতি যদি ছোটবাবুর তুলনায় "ছোটলোক" হয় তবে কুসুম কী? লেখক মানিক তো ওকে সুযোগ পেয়েই বারবার গ্রাম্য অমার্জিত বলেন। কিন্তু দেখা যায় লেখকের সাথেও তাঁর হাতে সৃষ্ট চরিত্রের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। ডাক্তারের ফি-কে কেন্দ্র করে কুসুমের সঙ্গে শশী ডাক্তারে কথা কাটাকাটি হয়। এই সুযোগে কুসুম শশীর মর্মমূলে আঘাত হানে। শশীর পিতা যে অসৎ পথে অর্থ

উপার্জন করে বড় লোক হয়েছে, সেই টাকায় শশীকে শহরে রেখে ডাক্তার বানিয়েছে, কুসুমের বাবা যে শশীর বাবার চেয়ে, "ঢের বেশি ভদ্রলোক", ইংরেজি অক্ষর না চেনা শশীর বাবার চেয়ে শিক্ষিত এবং ইংরেজিতে পত্রের ঠিকানা লিখতে সক্ষম, সে বিষয়টি কুসুমের আত্মশক্তির হাতিয়ার। তাই শশীর কাছে মনে হয়, "নিজের চারিদিকে সে যে শিক্ষা ও সভ্যতার খোলসটি সযত্নে বজায় রাখিয়াছিল, কুসুম, তাহাতে ফাটল ধরাইয়া দিয়াছে।"

আসলে কুসুম যে শশীকে এমনি আঘাত করে তার উদ্দেশ্য এই নিষ্কাম, নিষ্ক্রিয়, নিস্প্রভ যুবকের ভেতর প্রেমকে জাগিয়ে তোলা। কুসুম শশীকে জাগাতে চায় বলেই দিন চারেক পরে শশীর কাছে ক্ষমা চাইতে যায়। কুসুম শশীর ঘরের জানালার নিচের সাধের গোলাপ চারাটি পায়ে মাড়িয়ে দেয়। এই গোলাপ গাছ বুঝি তার প্রতিদ্বন্দ্বী। কেননা শশীর তো চোখ নেই কুসুমের অন্ত রের গোলাপ বাগান দেখার। মিথ্যে বলে কুসুম, চার রাত তার ঘুম হয়নি এবং ভয় দেখায় বাপের বাড়ি চলে যাবে বলে। তাতেও কুসুম তরঙ্গ জাগাতে পারেনি শশীর মনের গাঙে।

মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী হবার পূর্বের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভেতর যে ভাববাদ ক্রিয়াশীল ছিল তাতে আরো অধিক অভিঘাত সৃষ্টি করে কলকাতায় আগত কিংস কার্নিভাল নামক পুতুল নাচের দলটি। তিনি এক দার্শনিকতার আবর্তের ভেতর রচনা করেন 'পুতুলনাচের ইতিকথা।' স্বাভাবিক কারণেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্র শশী আধুনিক চিকিৎসায় শিক্ষিত হয়েও ইহজাগতিকতাকে স্পর্শ করতে পারেনি। ভাববাদ তাকে উঁচু আদর্শবান মানুষের মতো বড় হতে দেয়নি। তার ব্যক্তিত্ব ছিল অবিকশিত, মনের গড়নে স্বাপ্নিক। সংকীর্ণ গণ্ডিতে ভেঙে দাঁড়াতে পারেনি বলেই শশীর জীবনটা ছিল নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে পরিপূর্ণ। নিরানন্দ, নিতৃষ্ণ জীবন নিয়ে শত চেষ্টায়ও সে গ্রাম ত্যাগ করতে পারেনি। যেন সে নিজেই নাচের পুতুল। রশি বাঁধা পুতুল মুক্তি পায় না, অন্যের অদৃশ্য রশির টানেই কেবল অভিনয় করে, মোকাভিনয়। "কত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যে শশীর জাগে.... মনের কবিত্ব, মনের কল্পনা....মনের সৃষ্টিছাড়া অবাস্তবতা, মনের পাগলামিকে... জঙ্গল ভেদ করিয়া টিলার উপর উঠিবার কী দরকার ছিল শশীর? সূর্যাস্ত দেখিবে...।"

এই তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শশী ডাক্তার। কুসুম তাকে নিয়েই স্বপ্ন দেখে। যে শশী সূর্যোদয়ে জীবনকে খোঁজার যুক্তি পায় না, সূর্যাস্তের ভেতর সে-ই দার্শনিক হয়ে যায়। সে-ই কিনা মনে করে, "গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও যাইবার শক্তি নাই। নিঃসন্দেহে এজন্য দায়ী কুসুম....বিদ্যুতের আলোর মতো উজ্জ্বল যে জীবন শশী কল্পনা করিত...শশীর নীড় প্রেম সীমাহীন... এক অত্যাশ্চর্য অস্তিত্বহীনা মানবী.... কুসুম যেন তাহাকে মিথ্যা করিয়া দিয়াছে-সেই মহামানবীকে।"

অথচ কুসুম গোড়ায় বুঝতে পারেনি শশী ডাক্তারের সেই কল্পলোকের 'মহা মানবী' সে নয়। শশী ডাক্তার বুঝতে পারে কুসুম তার অস্তিত্বের শেকড়ে নাড়া

দিয়েছে। কেননা দ্বিতীয় বারের মতো এক ভোরবেলা কুসুম যখন তাকে জানালা দিয়ে ডেকে ঘুম ভাঙায়, সেদিনও তার গোলাপ চারা মাড়িয়ে দেয়। অনুযোগ করলে কুসুম উত্তর দেয়, "ইচ্ছে করেই দিয়েছি ছোটবাবু, চারার জন্য এত মায়া কেন?"

তারপর তাল-বনে ডেকে নিয়ে কুসুম যা বলে "তাতে জীবনে আজ প্রথম শশী কুসুমের প্রকৃতির একটা আশ্চর্য দিক আবিষ্কার করিয়া অভিভূত হইয়া গেল....কুসুমের সংস্পর্শে সে বছরের পর বছর কাটাইয়া দিয়াছিল, একদিনও সে কি টের পাইল না কুসুম কী চায়? একটি নারী মন ভুলাইতে চাহিতেছে এতটুকু বুঝিতে কি সাত বছর সময় লাগে মানুষের?" এমনি এক শশী ডাক্তারকে নিয়েই তো কুসুমের পুতুল নাচের পালা। তাই এক জোনাক পড়া রাতে শশীকে বিস্মিত করে কুসুম বলে, "এমনি চাঁদনি রাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটবাবু।" কুসুম আরো বলে, "আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?" শশীর জবাব ছিল, "শরীর! শরীর! তোমার মন নেই কুসুম?"

পুতুলনাচের ইতিকথার অন্তস্থঃ আন্দোলন, শশী ·কিংবা কুসুমের মনোলোকের গভীর রহস্য, এই দুই উক্তির পর আর অতলস্পর্শী থাকে না। কুসুমের সম্পদ হচ্ছে শরীর যা রক্ত-মাংস আর বস্তুবিশ্বের চরম সত্য, অন্যদিকে শশী ডাক্তারের কাছে বড় হচ্ছে এমন এক মনের পৃথিবী যা আছে তার অতিকল্পনায় বাস্তবের সঙ্গে এর কোন মিলই নেই। কিন্তু বিস্ময় এই যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অতৃপ্ত কাম চেতনার এই নারীকে দিয়ে তার স্বামীর সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্ব সংঘাতই করলেন না। দ্বন্দ্বটা ছিল অনিবার্য। পরিবর্তে মানিক কুসুমকে দিয়ে রান্নাঘরের ভাত কিংবা ডাল পুড়তে দিয়েছেন হাঁড়িতে এবং উঠোনে তা নিক্ষেপও করিয়ে ছেড়েছেন।

খেয়াল করার বিষয় এই যে, ভালোবাসা নিবেদন করার পরও কুসুম শশী ডাক্তারের প্রতি 'ছোটবাবু' কিংবা 'আপনি' সম্পর্কের কঠিন দেয়াল ভেঙে 'শশী' কিংবা 'তুমি'র সমতলে পৌঁছতে পারেনি। বিষয়টিকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের 'শ্রেণী' সূত্রের ভেতরও টেনে নেয়া যায় না। কেননা অর্থনৈতিক বিবেচনায় কুসুমের বাপের বাড়ি শশীদের চেয়ে কম নয়।

তাৎপর্য বেড়ে যায়, যখন জানা যায় কুসুমের পিতার কাছে তার শ্বশুর বাড়িও 'বন্ধক'। এখানে ক্ষমতার প্রশ্ন আসতে পারে কুসুমেরই পক্ষে। তাছাড়া শশী ডাক্তারের আয়-রোজগারেও স্বাধীন ব্যক্তিত্বের পরিচয় নেই। অর্থের পিশাচ পিতার নাম তুলেই শশীকে রুগীদের কাছ থেকে পাওনা তুলতে হয়, আপন ব্যক্তিত্বের দ্বারা নয়। শ্রেণীটা দাঁড়াতে পারত শশী আর কুসুমের শিক্ষার পার্থক্যে। কিন্তু সেখানে আধুনিক শিক্ষা শশীকে সংস্কার থেকে রক্ষা করতে পারেনি। অথচ পরকীয়া প্রেমের সংস্কার মুক্ত হবার কথা ছিল শশীর, কিন্তু উল্টো হলো কিনা কুসুম।

কুসুম তো সেই নারী, যে প্রায় জোর করেই হাসায় নিরানন্দ বৈচিত্র্যহীন মনের শশীকে। বুঝি কুসুম নিজের অস্তিত্বকে শশীর অন্তরে শত চেষ্টায়ও প্রোথিত করতে পারছে না। "গ্রামের রুক্ষমূর্তি আর কলেরা রোগীর কদর্য সান্নিধ্য, এই সমস্ত পীড়নের মধ্যে কুসুমের খাপছাড়া হাসিটুকু ভিন্ন মনে করিবার মতো আর কিছু শশী খুঁজিয়া পায় নাই।" কুসুম তো সেই শশীকে ভালোবাসতে চায়, যে সংকীর্ণ গ্রাম ছেড়ে নতুন করে জীবন আরম্ভের স্বপ্ন দেখে, আত্ম-মুক্তির প্রত্যাশা করে। ব্যক্তিজীবনে বিপুল সমারোহ আনতে চায় যে শশী, অথচ তাকে পাবার নৈতিক শক্তি যে কোনদিন অর্জন করতে পারেনি, সে মানুষটাকেই দখল করতে চায় কুসুম। অথচ শশীর কাছে সে অবাক মানুষ, যাকে সে ভালোবাসতে পারে না। আসলে গ্রাম্যতার ভিতরও শশীর কাছে কুসুম তার নানা আচরণের ভিতর দিয়ে কঠিন দুর্বোধ্য। রহস্যময়। খ্যাপাটে পাগলাটের সরল বিচারেও চেনা যায় না তাকে।

কুসুমের পিতা মেয়েকে নিতে এলে কুসুম পাকা অভিনয় করে। আছাড় পড়ে মাজা ভাঙার অভিনয়। ঔষধের ছলে বৃষ্টিতে ভিজেই সে শশীর কাছে আসে। আত্মরক্ষার ছলে শশী ডাক্তার নীতিবাক্য বিলোয়, "আমরা ছেলে মানুষ নই, ইচ্ছে করলেই একটা কাজ কি আমরা করতে পারি?.... আমি গাঁয়েই থাকব না বৌ। আজ বাদে কাল চলে যাব বিদেশে, আর কখনো ফিরব না।" কারণটা না বোঝার কথা নয় কুসুমের। সে বৃষ্টির মধ্যেই বাড়িতে উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এমন ভঙ্গিতে যে, কোমরে চোট খেয়েছে তা মনেই হয় না। তাই শশীর কাছে কুসুম আরো জটিল আরো দুর্বোধ্য হয়ে উঠে। শশী ডাক্তারকে পাশে পাবার জন্য তার এই যে দুর্দমনীয় তাড়না, এক অন্ধ অনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রণা, সেই কঠিন শিলাস্তর ভেদ করে মাঝে-মধ্যে উঁকি দেয় চরম ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের হীরক দ্যুতি।

হাসপাতালে যাবার পথে শশী ডাক্তার কুসুমের স্বামী অসুস্থ পরানকে দেখতে যায়। পরান বাড়ি না থাকায়, শশী বসতে রাজি না হওয়ায় কুসুম তাকে বলে, "দু'দণ্ড আয়েস করতে বসলে মনে খুঁতখুঁতানি ধরে, এ রোগ ভালো নয় ছোটবাবু। চাকর তো নন কারো, অ্যাঁ?" কিন্তু সময় নষ্ট করার মন নেই শশীর। রোগীরা অপেক্ষায় আছে। তাই শশী তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে বলে, "খামকা রাগ করো না বৌ। সময়ে কাজ না করলে নষ্ট হয়...তুমি রইলে আমিও রইলাম।"

এর উত্তরে কুসুম শশী ডাক্তারকে যেন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণঘাতী অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে, "সে তো ন বছর ধরেই আছি। এক আধ দিন নয়।" কুসুমের এ কথায় ক্ষণকালের জন্য শশী আত্মহারা হলেও পর মুহূর্তে আত্মরক্ষার কৌশল খোঁজে, "এ তো গ্রাম শশী, খড়ের চালা দেওয়া গ্রাম্য গৃহস্থের এই গোবর-লেপা ঘর, যে রমণী কথা বলিয়া চলিয়া গেল, গায়ে তার ব্লাউজ নাই, কেশে নাই সুগন্ধি তেল, তার জন্য বিবর্ণ মুখে এত কষ্ট

পাইতে নাই। ওর আবেগ তো গেঁয়ো পুকুরের ঢেউ। জগতে সাগর তরঙ্গ আছে।"

আসলে কুসুম যাকে নিয়ে খেলা করতে চায় সেই শশী তো আধুনিক হয়েও প্রবল ভাবেই আত্মকেন্দ্রিক, বৃহত্তর জীবন প্রাপ্তিতে অযোগ্য ব্যক্তি এবং অসুখী পুরুষ। সে কেবলই স্বাপ্নিক, স্বপ্ন পূরণের প্রবল ইচ্ছাশক্তিশূন্য এক যুবক। দ্বিধান্বিত চিত্তের শশী ডাক্তারের "জীবনকে বৃহত্তর ব্যাপ্তি দিবার পিপাসা সর্বদা জাগিয়া থাকে।" এবং "ঘর গোছানোর নামে যেমন ঘরখানা জঞ্জালে ভরিয়াছে, জীবনটা তেমনি বাজে কাজে নষ্ট হইল।" এমনি স্বভাবের যে শশী ডাক্তার নিজেকে নিজেই চিনতে অক্ষম, সে কী করে জানবে কুসুমকে? কুসুম তো তার মাঝে পৌরুষকেই জাগাতে চেয়েছিল, অস্তিত্বে আঘাত দিয়ে।

কুসুমের স্বামী পরান শশী ডাক্তারের চিকিৎসায় আস্থা হারিয়ে ওই বাজিতপুরে যায় চিকিৎসার জন্য, তার পেছনে নিশ্চয়ই কুসুমের হাত রয়েছে। কুসুম শশী ডাক্তারকে প্রচণ্ড আঘাত করল, এটা তার খেলা নয়, প্রতিহিংসাও নয়, শশীর সামনে আপন অস্তিত্বকে দুর্লংঘ্য করে তোলা। কেবল তা-ই নয়, সুদীর্ঘ নয় বছর তাকে নিয়ে শশী ডাক্তারের অবহেলা, অবজ্ঞার পুতুল নাচের খেলা দেখেছে, নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে, ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তাই সচেতন হতে চায় কুসুম।

একদিন খোলা নির্জন মাঠে মিশে যাওয়া কায়েতপাড়ার রাস্তায় পরস্পরের সাক্ষাত ঘটে। শশী বলে, "তোমায় দেখে দাঁড়িয়েছিলাম বৌ, ভাবছিলাম কাছে যাব।" এর উত্তরে কুসুম যা বলে তাতেই তার চরম ব্যক্তিত্ববাদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, গ্রাম্যতার ভেতর নাগরিক চেতনা। কুসুম বলে, "আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, আমি কাছে যাব?" তারপর আরো ঘনীভূত হয় পরিবেশ। শশীর প্রশ্ন, "আমার সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল যেন কমে যাচ্ছে বৌ?" কুসুমের উত্তর, "আকাশের মেঘ কমে নদীর জল বাড়ে– নইলে কি জগৎ চলে ছোটবাবু?"

এবার কুসুমের স্রষ্টা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠককে জানাচ্ছেন, "কুসুমের সম্বন্ধে শশীর মনে ভয় ঢুকিয়াছিল।" পরক্ষণই বলছেন, "তাতে ভয়ের কী আছে শশী জানে না।" এই যে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শশী ডাক্তার গ্রাম্য অশিক্ষিতা কুসুমকে বুঝতে অক্ষম, তাতে কুসুমের অন্তর্লোকের অদৃশ্য চেতনাকে চিহ্নিত করা যায়। এই চেতনার জগৎ যতটা বৃহৎ তার চেয়েও জটিল। অন্তত দুর্লংঘ্য শশীর জন্য।

এই বিবেচনায় বাংলা সাহিত্যের মানিক বিশেষজ্ঞরা যা-ই বলুন, আমার বিশ্বাস শিক্ষিত শশীর চেয়ে অশিক্ষিত কুসুম মানব চরিত্রের বিচিত্র জটিল সৃষ্টজীব মানুষ হিসেবে অনেক দূরবর্তী, অস্পর্শ। শশীর সম্পদ বা অর্জন ভাববাদিতা, কিন্তু কুসুম দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কঠিন বাস্তবতার ভেতর পরম সত্য। শশীর চেতনার জগৎ ক্ষুদ্র এবং সহজভেদ্য, কিন্তু কুসুম দুর্ভেদ্য। উপন্যাসটি যতই এগোচ্ছে পরিণতির দিকে শশী ততই ক্ষুদ্র হয়ে আসছে এবং

খাম হয়ে আসছে কুসুম। কেননা শশী, "সমস্ত পথ একবারও সে চর্টের আলো ফেলিল না, অন্ধকারে হাঁটিতে লাগিল।" শশীর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের চরিত্র, আলোকের পঙ্গুত্বের চেতনা শক্তিহীন। তাই, "মনটা কেমন করে ওঠে শশীর। হয়তো পরশু, হয়তো তার পরদিন কুসুম গাঁ ছাড়িয়া যাইবে, আর আসিবে না।"

অথচ শশী যা পারল না, কুসুম তা পারল। কর্তব্য এবং দায়িত্ব শশীকে গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে বাধা দেয়। কিন্তু কুসুম চিরকালের জন্য গাওদিয়া ছেড়ে যায়। শশী চেয়েছিল কুসুমকে হারিয়ে দিয়েই গ্রাম ছাড়বে, কিন্তু কুসুমই তাকে হারিয়ে দিয়ে ছেড়ে গেল গ্রাম। যে গ্রাম্য বন্ধন শশীর জন্য দুর্লংঘ্য, কুসুমের জন্য তা সহজসাধ্য। কেননা স্বামীর সংসারের দীনতা থেকে উদ্ধারের পথ আছে পিতার সংসারের স্বাচ্ছন্দ।

শশী ডাক্তারের জীবন-দর্শন তথা অস্তিত্বের পতনকে অনিবার্য করে গেল কুসুম গ্রাম পরিত্যাগের মধ্য দিয়ে। শশীর অনুরোধেই চিরবিদ্যায়ের সাক্ষাতের জন্য নির্জন তালবনে আসে কুসুম। সে উৎফুল্ল, আঁচলে চাবির গোছা। খেলাচ্ছলে বাজে। ভালোবাসার কাতরতা পূর্ণ মুখ কোথায় যে আজ হারিয়ে গেল।

"একি আশ্চর্য কেন, কুসুমকে সে বুঝিতে পারে না,... হয়তো এই তাহাদের শেষ দেখা, এজীবনে হয়তো আর এত কাছাকাছি তারা আসিবে না, আর আজ একটু কাঁদিল না কুসুম?" অথচ চলে যাবার সংবাদ না দেয়ার জন্য কুসুমকে অনুযোগ করলে শশীর প্রতি কুসুম প্রচণ্ড রেগে যায়। শশী যখন জানতে চায় সে কুসুমের পর হয়ে গেছে কিনা, এর উত্তরে কুসুম বলে, "তালবনের ঝোপের মধ্যে বসে পরের সঙ্গে আমি কথা বলি নাকি? ঠিক অতটা সস্তা নই ছোটবাবু।" শশীর কাছে সেই 'সস্তা' শব্দটি কুসুমের গ্রাম্য অভদ্রতা বলে মনে হয়। মনে হয় কুসুমের এ উক্তি বড় স্পর্ধা আর অহংকারের, "দশ বছর খেলা করেও সাধ মেটেনি?"

কুসুম বিশ্বাস করে শশী ডাক্তার তাকে নিয়ে পুতুল নাচের খেলা করেছে যেন। সেই অদৃশ্য রশির টানে কুসুম আর নাচবে না। যে বৈচিত্র্য-শূন্য পুরুষকে কুসুম আবিষ্কার করেছে শশীর মাঝে, তাকে নিয়ে স্বপ্ন পূরণ অসম্ভব। তাই কুসুম আজ উৎফুল্ল, ভারশূন্য। বুঝি সে মুক্তি পেয়েছে অর্থহীন এক পুতুলখেলা থেকে।

কুসুম বুঝতে পারে আজ যদি সে দুর্বল হয়ে পড়ে, চোখের জল ফেলে, তবে এই দশ বছরে যা ঘটেনি তা-ই ঘটে যাবে– শশী ডাক্তার তাকে করুণা করবে, ভালোবাসার নামে জড়িয়ে ধরবে। অথচ শশী নিজেই বুঝতে পারেনি তার ভেতরটা যে উলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। "কুসুমের যে শরীরটা আজ অপার্থিব সুন্দর মনে হইতেছিল তার সমস্তটা শশী জড়াইয়া ধরিতে পারিল না কুসুমের একটা হাত ধরিয়া ফেলিল।" বুঝি কুসুম আত্মকেন্দ্রিক একজন

বৃত্তাবদ্ধ পুরুষকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার এই সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল। তাই সে বলে, "কতবার নিজে যেচে এসেছি, আজকে ডেকে এনে হাত ধরা-টরা কি উচিৎ ছোটবাবু? রেগে-টেগে উঠতে পারি তো আমি?" এই প্রতিক্রিয়ায় শশী যেন অসহায় হয়ে পড়ে, রীতিমতো ভয়ার্ত। সে আত্মসমর্পণ করতে চায় কুসুমের কাছে, "আমার সঙ্গে চলে যাবে বৌ?....যেখানে হোক চলে যাই চল, আজ রাত্রে।"

কুসুম জানে শশী ডাক্তারের দ্বারা একাজ অসম্ভব। তাই তার উত্তর, "কেন যাব? ...আপনি বুঝি ভেবেছিলেন যেদিন আপনার সুবিধে হবে, ডাকবেন, আমি অমনি সুড়সুড় করে আপনার সঙ্গে চলে যাব? কেউ তা যায়? ...তা যেতাম ছোটবাবু। স্পষ্ট করে ডাকা দূরে থাক, ইশরা করে ডাকলে ছুটে যেতাম...মানুষ কি লোহার গড়া যে চিরকাল সে এক রকম থাকবে? বদলাবে না?...আজ হাত ধরে টানলেও আমি যাব না।"

কুসুম শশীকে একেবারেই করুণা পাত্র করে তোলে, ব্যক্তিত্বহীন, অন্তঃসারশূন্য মানুষে পরিণত করে, যেন শশী শেকড় ছিন্ন অস্তিত্বহীন শূন্যতার যাত্রী। তাই সে বলে, "অনেকদিন অবহেলা করে কষ্ট দিয়েছি বলে আজ রাগ করে তার শোধ নিতে চলেছ?" কি অসীম ক্ষমতায় আজ শিক্ষিত শশীকে অশিক্ষিত কুসুম তুচ্ছ ভিখেরীতে পরিণত করেছে। শশী কুসুমের কাছে এতটাই ভিখেরী, এতটাই অবিশ্বাসের পাত্রে পরিণত হয় , যার ফলে তাকে বলতে হয়, "কী বলছেন ছোটবাবু? আমার জন্য আপনার মন কাঁদবে?... আপনার কাছে আমি কত তুচ্ছ...দু'দিন পরে মনেও পড়বে না আমাকে।"

যে কুসুম শশীর জন্য একদিন পাগল ছিল ঘর ছাড়তে, সেই কুসুম আজ যে যুক্তি দাঁড় করায় তা কি ওর অন্তরের কথা? আসলে সে মুক্তি চায় আপন হাতে তৈরি ভালোবাসার এক কল্পিত মৃত নক্ষত্রের অন্ধকার থেকে। তার শরীরের কাম-চেতনা, মনের তৃষ্ণা যে মহাশূন্যের কুহকে এতদিন নিপতিত ছিল, তা সে পরিণতিতে বুঝতে পারে। যতই বলুক তাকে নিয়ে শশী ডাক্তারের যে ক্ষমতা আর সাহস নেই রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যাবার, তাও তার কাছে অস্পষ্ট নয়। তাই তাকে কুহক মুক্তির জন্য বলতেই হয়, "লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায়...সাধ-আহ্লাদ আমার কিছু নেই...সব ভোতা হয়ে গেছে ছোটবাবু...কাছে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।"

আসলে কি কুসুম মরে গেছে? মাত্র ৩০ বছর বয়সে কোন নারী মরে যেতে পারে? শশীর সঙ্গে সম্পর্কে ভঙ্গের ভিতর দিয়ে তো কুসুম আত্ম-আবিষ্কারই ঘটালো। তা না হলে কী করে সে বলে, "আপনি দেবতার মতো ছোটবাবু।" এই যে শশীর ভেতর কুসুম অদৃশ্য এক দেবতাকে অনুভব করে, সেই কুসুম তো রক্ত-মাংসের মানুষ। দেবতা আর মানুষের সহাবস্থান কি চলে? শক্তিতে,

ক্ষমতায়, মহিমায় এই যে বৈপরীত্ব সেখানে মানুষ আর দেবতার সম্পর্ক দাতা-গ্রহীতার, প্রেমিক-প্রেমিকার নয়।

আর যদি কুসুমের এ উক্তির ভিতর লুকিয়ে থাকে বিদ্রূপ, তবে শশীর জন্য এ হচ্ছে বিস্ফোরণ, সে ছিন্ন-ভিন্ন হতে বাধ্য। আসলে শশী যে এই গ্রাম্যজীবনে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছে, অবশিষ্ট নেই কিছুই, কুসুম তা সবার পূর্বে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়, অথচ কুসুমের প্রত্যাখানের ভিতর দিয়েই শশী নিজের প্রকাণ্ড জড় পৃথিবীকে চিনতে পারে অনেক পরে। 'গাঁয়ের মেয়ে', 'পরের বৌ', 'কুসুমের ভয়ানক উপবাসী ভালোবাসা', 'আপনার থেকে প্রেম জাগা ও পুনরায় লয় পাওয়া', এসব ভাবনা হচ্ছে শশী ডাক্তারের অতিকল্পনা, উন্নাসিকতা। শশী ঠিকই উপলব্ধি করে "কুসুমকে আর কোনদিন সে ভালোবাসাইতে পারিবে না।" এত অবহেলার পর কেন এই ব্যাকুলতা?

শশী যে সংস্কারের দাস, সমাজের নীতি-ধর্ম বশীভূত, পরের ঘরের বৌকে নিয়ে পলায়নের সাহস নেই, এই সত্য আবিষ্কারের ভিতর দিয়েই কুসুমের নিজের মুক্তি ঘটে। কুসুমকে গ্রামে রাখার জন্য তার যে 'কাঙালেপনা' সে যে কেবলই আত্মরতি, কুসুম তা জানে। সব বুঝে-শুনে কাজ করার ওই যে উপদেশ দিয়েছিল কুসুমকে শশী তার উত্তরে সে বলেছিল, "তা না হলে অনেক আগেই গলায় দড়ি দিতাম ছোটবাবু।"

কুসুম জীবনের মূল্য বোঝে বলেই ব্যর্থ প্রেম তাকে আত্মহননে প্রলুব্ধ করে না। সে বাপের বাড়ি ফিরে যায় স্বামীকে সঙ্গে করে। আজ পুরুষ তার অনুগামী, মোটেই প্রভু হয়ে নয়; প্রভুত্ব তো কুসুমেরই হাতে। তার শক্তি আছে, আছে ক্ষমতা। সেই শক্তি উন্মুল করে দেয় শশীকে। শশীর জীবনে পৃথিবীর প্রতি বিতৃষ্ণার জন্ম দিয়ে যায় কুসুম, কুসুমের জন্য অন্য পৃথিবী আছে বলেই সে গাওদিয়া ছাড়তে পারে, শশী পারে না, পৃথিবীর দুয়ার তার জন্য বন্ধ। যেন অন্ধকার অতলস্পর্শী এক বিবরে শশীকে নিক্ষেপ করে বহু দূরে চলে যায় কুসুম।

ইহ জীবনে শশী মুক্তির আলো খুঁজে পাবে না। এ তার প্রাপ্য, সে তো অচেতন পুতুল। তাই সে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চায় জনসেবাপরায়ণ গ্রাম্য জীবনের ভেতর। তার কাছে ভিন্ন উপায় থাকে না বলেই এই জীবন, "মাধ্যাকর্ষণের মতো, যা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়।" সত্যি কি মানবজীবন স্থির কিংবা অপরিবর্তনীয়? জীবনে কি চিরন্তন? বদলায় না? এ যুক্তি হচ্ছে খাপছাড়া নিক।

সূর্যোদয়ে যে শশী জীবনের অর্থ খোঁজেনি কোনদিন, তালবনে চিরদিন সূর্যাস্ত দেখেছে দার্শনিকের বিস্ময় নিয়ে, কুসুম তার সেই পৃথিবীকেও মিথ্যে করে দিয়েছে। কেননা, "মাটির টিলাটির উপর উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।"

আমাদের বিস্ময় এখানেই যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁজা কুসুমের ভেতর বাঙালি নারীর চিরন্তন মাতৃত্বের আকৃতিকে নির্দেশ করেন নি। মা হবার প্রত্যাশা কিংবা না-হাবার আক্ষেপ কখনো কেন জেগে উঠেনি কুসুমের অন্তরে? একি তবে মানিকের ব্যক্তিজীবনের প্রভাব? অল্প বয়সেই মানিকের মায়ের মৃত্যু ঘটে। মাতৃহীন সংসারে মাতৃস্নেহের বঞ্চনা কি তিনি কুসুমের ভেতর প্রতিস্থাপন করেছিলেন?

মানিকের শশী চরিত্রে মহত্ত্ব আছে, এ চরিত্রের প্রতি তিনি দুর্বলও বটে। শশী ডাক্তারকে তিনি শহর থেকে টেনে নিয়ে এসেছেন গ্রামে। গ্রাম্য মানুষের প্রতি ভালোবাসারও ঘাটতি ছিল না শশীর। বুজরুকি কিংবা অলৌকিক শক্তির ভান করে আফিম খেয়ে ইচ্ছা-মৃত্যু ঘটে যার, তার সঞ্চিত ধনে একখানা হাসপাতালও গড়ে শশী। ব্যাপারটি যেমনি শ্রমশূন্য, তেমনি মেধাশূন্য, অনেকটা দৈব প্রাপ্ত ধনে গড়ে ওঠে সেবালয়।

সমাজকে বদলাতে গেলে যে রাজনীতি আর অর্থনীতির সূত্র দরকার, শশীর তা জানা ছিল না। সে যতটা আধুনিক জীবনবাদী, ঠিক ততটাই ভাবুক দার্শনিক, অদৃষ্টবাদীও। সংসার আসক্তির সঙ্গে মিশে আছে তার বৈরাগ্য। সে বিশ্বাস করে নদীর স্বাধীন দুর্বার স্রোতের মতো মানবজীবনের গতিস্রোত নয়। "মানুষের হাতে কাটা খালে তার গতি, এক অজানা শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিতে।"

এমন যে শশী, তার সঙ্গে কুসুমের জটিল চরিত্রের রহস্যময় খেলা চলে। কুসুম সরল রৈখিক কোন চরিত্র নয়। তার মনোলোকের বহুমাত্রিক অভিব্যক্তির জটিলতা বোধ-করি বাংলা সাহিত্যে অন্য কোন নারীর মধ্যে খুঁজে পেতে কষ্ট হবে। মানুষ যে দুর্জ্ঞেয় চরিত্রের জটিল দ্বান্দ্বিকতার ভেতর আপন অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে, চেতনার বহুমাত্রিক সত্তার ভেতর বিচরণ করে, তার দৃষ্টান্ত কুসুম। তার সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির চালিকাশক্তি যে অদৃশ্য কেউ নয়– পুতুলের মতো, নিজেই তার চালক, বাংলাসাহিত্যে নারী চরিত্রে একমাত্র কুসুমকেই সেই জগতে খুঁজে পাওয়া যায়।

কুসুমের প্রেমে অচরিতার্থতা আছে, কিন্তু জীবনকে অনর্থ করতে চায় না বলেই গাওদিয়া ছেড়ে তার পিত্রালয় যাত্রা। শিক্ষিত পুরুষের ভেতর সে যে ভীরুতা, স্বার্থপরতা দ্বিধাদ্বন্দ্বকে আবিষ্কার করে, সেখানেই তার মহিমা। কুসুম যে কেবল শশী ডাক্তারকেই লণ্ডভণ্ড করে দেয় এমন নয়, শশী ডাক্তারের প্রতি পক্ষপাতপুষ্ট লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও রাজনৈতিক মতাদর্শিক দৃষ্টি বদলের জন্য নতুন জিজ্ঞাসায় নিক্ষেপ করে।

ডিসেম্বর ২০০৫

লালসালু : জমিলার অন্তর্লীন বিশ্ব

মানব চরিত্রের বহুস্তরীভূত দুর্জ্ঞেয় মনস্তাত্ত্বিক অন্তহীন-অতলান্তিক জগতের গভীরে প্রবেশ করেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ 'লালসালু' উপন্যাসের জমিলাকে পেয়েছেন। পরিবেশ-বিশ্ব হচ্ছে গ্রাম, কাল বিবেচনায় কিশোরী, কিন্তু যে অস্তিত্ববিশ্বে তার উপস্থিতি তা যতটা জটিল তার চেয়েও অতলস্পর্শী, বিস্তৃত। ওয়ালীউল্লাহর স্ব-কাল তো বটেই, আমাদের সমকালের পর্বতপ্রমাণ উপন্যাসস্তূপের ভেতরও তন্ন-তন্ন করে খুঁজে জমিলার অন্তর্জগতের তুল্য তুলনা মেলে না। জমিলার মনঃসমীক্ষণ ধূসর মায়াবী নয়। অপ্রত্যক্ষ চেতনাজগৎও নয়, বরং প্রত্যক্ষ বাস্তবতার জীবনসত্য।

ঔপনিবেশিক যে শিল্পতত্ত্ব আমাদের মধ্যবিত্ত দাসস্য-দাস মগজে ঢুকে গেছে, সেই ব্যঞ্জনায়ও জমিলা বৃত্তমুক্ত। জমিলা অন্তর্চারী হয়েও অন্তর্চারী নয়, বহির্মুখ হয়েও বহির্বিমুখ নয়। জমিলার সৃষ্টা ওয়ালীউল্লাহ তাঁর পূর্বসূরি জগদীশ গুপ্ত, ধূর্জটি প্রসাদ কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে মনঃসমীক্ষণ বা চেতনাপ্রবাহ শিল্পরীতিকে বাংলা সাহিত্যে রূপায়িত করেছিলেন, তারই পরিপূর্ণ শরীর নির্মাতা। গদ্য-ভাষায় তো তিনি একাকী নিঃসঙ্গ। মানব অস্তিত্বের গভীর একতা, সমাজকাঠামোর জটিল গ্রন্থির অন্ধকার, সমকালের রাজনীতির অন্ধকার-যাত্রা, ব্যক্তি এবং সমাজের দুর্লংঘ্য সংকট ছেঁকেই ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর নিজের জন্য গদ্য নির্মাণ করেছেন। তাঁর গদ্যে শব্দপ্রয়োগ এবং বাক্যের অন্ত সংস্থাপন যেন বলে দেয়, ওখানে অন্য লেখকের প্রবেশাধিকার নেই। মূলত তাইতো।

আমাদের হতচকিত হতে হয় একথা ভেবে যে, সারা উপন্যাসে জমিলার উপস্থিতির জগৎটা যত ক্ষুদ্র তার চেয়ে অণু পরমাণুসম তার কথোপকথন। মাত্র একবার কি দু'বারই তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। বুঝি সে জন্মবোবার অভিনয় করে। এমনও অনুমান করা চলে যে, লেখকের অভিলক্ষ্য জমিলা ছিল

না; ছিল না বলেই উপন্যাসে তার আবির্ভাব আকস্মিক। হয়তো অভিলক্ষ্য ছিল খালেক ব্যাপারির প্রথম পক্ষের বিবি আমেনা।

নিঃসন্তান আমেনার কাঙ্ক্ষিত মাতৃত্বদান নিয়ে চলে মজিদের জটিল রিরংসার কুয়াশার খেলা। "পালকির পর্দা ফাঁক করে নামার জন্য আমেনা বিবি যখন এক পা বাড়ায় তখন সূচের তীক্ষ্ণতায় তার দৃষ্টি বিদ্ধ হয় সে পায়ে। সাদা মৃসণ পা, রোদ-পানি বা পথের কাদামাটি যেন কখনো স্পর্শ করেনি। মজিদের গলায় কারুকার্য আরো সূক্ষ্ম হয়..তার (মজিদের) কণ্ঠে যদি সাপের গতি থাকে তবে তার মনেও এক উদ্যত সাপ ফণা তুলে আছে ছোবল মারবার জন্য। আমেনা বিবির বোঁজা চোখ মজিদের ভালো লাগে না, কিন্তু পালকি থেকে নামবার সময় তার যে সাদা সুন্দর পা-টা দেখেছিল, সে পা-ই তার মনে সাপকে জাগিয়ে তুলেছে। সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারবার জন্য। তার জিহ্বা লিকলিক করে, উদ্যত দীর্ঘ গলা বেয়ে উঠে আসে বিষ। সুন্দর পা দেখে স্নেহ-মমতা না উঠে নেমে আসে বিষ।"

মজিদের পরামর্শে খালেক ব্যাপারি স্ত্রী আমেনাকে তালাক পর্যন্ত দেয়। কিন্তু সঙ্গত কারণেই মজিদ আর এগোতে পারে না। হয়তো আমেনাকে কেন্দ্র করে তার গোপন লালসা চরিতার্থ হবে, কিন্তু মেয়েটাতো বাঁজা। সন্তান-কামনা সে পূর্ণ করতে পারবে না। অন্যদিকে তার ক্ষমতার জাগতিক শক্তি খালেক ব্যাপারির সঙ্গে বাধবে বিরোধ। মজিদ জানে এ বিরোধ আত্মঘাতী, আত্মধ্বংসী। তারপরই বৌ হয়ে আসে জমিলা। ওয়ালীউল্লাহ্ জমিলা বা মজিদের জন্য ক্ষেত্র তৈরি করেই নেন। "বউ হয়ে যে মেয়েটি ঘরে আসে সে যেন ঠিক বেড়ালছানা। বিয়ের আগে মজিদ ব্যাপারিকে সংগোপনে বলেছিল যে, ঘরে এমন একটি বৌ আনবে যে খোদাকে ভয় করবে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হয়, সে খোদাকে কেন, সবকিছুকেই ভয় করবে, মানুষ হাসিমুখে আদর করতে গেলেও ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে।"

শিল্পী ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর জীবনজিজ্ঞাসা, আত্মসংবেদন এবং মনস্তত্ত্ব চেতনাকে স্বনিয়ন্ত্রণে রাখতে চান বলেই জমিলার মানবীয় আচরণের অন্তঃ বা বহির্স্তর গোড়াতেই নির্মাণ করে নেন। খুবই জরুরি হয়ে পড়ে মজিদের জৈবিক চেতনা এবং জাগতিক প্রত্যাশার বিরুদ্ধে একটি দুর্লংঘ্য পর্বত সৃষ্টির। পেছনে অস্তিত্বের তাড়না, সামনে ঘন অন্ধকার, মাঝখানে মজিদ এবং জমিলা। অনিবার্য যে বিপর্যয় তা অজ্ঞাতই থাকে মজিদের চেতনায়। তাই জামিলাকে চিনতে পারে না সে। "কারণ দিন কয়েকের মধ্যে জমিলার আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে। প্রথমে সে ঘোমটা খোলে, তারপর মুখ আড়াল করে হাসতে শুরু করে। অবশেষে ধীরে ধীরে তার মুখে কথা ফুটতে থাকে।"

বাস্তবে মুখের কথা অব্যক্তই থাকে। হাসিতো মজিদের অস্তিত্ববিরোধী। তার জীবন আবর্তিত হয় যে মাজারকে কেন্দ্র করে সেখানে করুণা প্রার্থনা, ভাবগম্ভীরতা, রহস্যময় ভয়াল নীরবতা আর দুঃখ ব্যাখ্যা ভিন্ন অন্য অভিব্যক্তির

স্থান নেই। 'কত জীবনের দুঃখ-বেদনা বরফ গলা নদীর মতো হু হু করে ভেসে
আসে আর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসের দমকা হাওয়া জাগে, কিন্তু এখানে হাসির
ফোয়ারা ওঠে না কখনো।' তাছাড়া রয়েছে মজিদের ফেলে আসা দুঃখ-দারিদ্র্যের
নিরন্নের ভয়াল যন্ত্রণার অতীত জীবন– যেখানে হাসি ছিল নিষিদ্ধ।

কিন্তু জমিলার হাসির রহস্যটা কী? সেই রহস্যই জীবনের মহাসত্যের অন্ত
স্থল এবং ক্রিয়াশীল জীবন বাস্তবতার পরম সত্য; অন্তত মজিদ ও জমিলার
কাছে। জমিলা তার হাসির কারণ ব্যাখ্যা করে শাশুড়ি সম বয়সের জা রহিমার
সামনে। ওই যে সত্য প্রকাশের আগে জমিলা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে
অন্যমনস্ক হয়ে যায়, তার ব্যাখ্যা বড় জরুরি ক্রোধ, ঘৃণা, আক্ষেপ, তাচ্ছিল্য
এবং মজিদের প্রতি অস্বীকৃতির বিষ যেন বুকের ভেতর উথলে ওঠে জমিলার।
হাসির বিষয় তো বিয়ে করতে আসা মজিদ আর তার প্রথমা স্ত্রী রহিমার বয়স।
বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাদের প্রথম দেখে জমিলা ভেবেছিল মজিদ বুঝি বরের
পিতা এবং মহিলা তার মা।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, জমিলার আবির্ভাবই ঘটে জটিল এক
ঘূর্ণাবর্তের ভেতর। মানুষের অন্তহীন জাগতিক বাসনা এবং তাকে চরিতার্থ
করার জন্য মনের মধ্যে আকস্মিক যে দুর্দমনীয় উন্মাদনা জন্ম দেয়, তেমনি
এক ফাল্গুনের সকালে হঠাৎ দমকা হাওয়ার সৃষ্টি হয়। মজিদের মনে জাগিয়ে
তোলে অতৃপ্ত বাসনা, অপূর্ণ কামনা। একদিন সে তো ছিল চির ভগ্যান্বেষী দুস্থ
দুঃখী ব্যক্তি মাত্র। আজ সে সম্পদ-ক্ষমতার শক্ত শিকড়গাড়া এক উঁচুগাছ।
কিন্তু ভবিষ্যৎ কী তার? সেই ঝড়োহাওয়া তাকে অন্য চেতনায় নিক্ষেপ করে।
সন্ধ্যার পর ঝড় থেমে গেলে হঠাৎ সে ঘরের ম্লান আলোয় দেখতে পায় মাছের
পিঠের মতো মাজারে স্থাপিত লালসালুর একটা কোণ উল্টে আছে। "অনাবৃত
অংশটা মৃত মানুষের খোলা চোখের মতো দেখায়। কার কবর এটা?...যেন
জানে না কে চিরশায়িত এর তলে। মৃত লোকটিকে সে চেনে না এবং চেনে না
বলেই আজ তার পাশে নিজেকে বিস্ময়করভাবে নিঃসঙ্গবোধ করে। এ
নিঃসঙ্গতা মহাকালের মতো আদি-অন্তহীন।"

মজিদের এই একাকিত্ব, অসহায়ত্ব এবং নিঃসঙ্গতাই জমিলা নামক একটি
কিশোরী-রমণীর আবির্ভাব উপন্যাসে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কবরের অনাবৃত
অংশটি মৃত মানুষের খোলা চোখের রূপ নিয়ে তার অনিস্তত্বহীনতাকে ইংগিত
করে। তাই সে নিঃসঙ্গ হতে চায় না, অস্তিত্বহীন হতে ভয় পায়। তার মনে সন্ত
ানের কামনা জেগে ওঠে। সেই সন্তানের জন্যই প্রয়োজন জমিলাকে। সে হবে
মজিদের শস্যভূমি। বীজ বপন করবে এবং উৎপাদন করবে শস্য। কেননা,
কবরের অনাবৃত অংশ তাকে মৃত্যুর কথা জানিয়ে দেয় বলেই মজিদের মধ্যে
সন্তান কামনা ছাড়াও জীবন উপভোগের কথা প্রস্ফুটির হয়। "জীবনকে সে
উপভোগ না করতে পারলে কিসের ছাই মান-যশ-সম্পত্তি? কার জন্য শরীরের
রক্ত পানি করা আয়েশ-আরাশ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা?"

উপন্যাসে জমিলার অপরিহার্যতাকে বুঝতে গেলে আমাদের বহু দূরবর্তী অন্য আর এক ধূসর দুনিয়ায় দৃষ্টি দিতে হবে। উপন্যাসটির যত্রতত্র অসংখ্যবার উচ্চারিত হয়েছে 'মাছের পিঠের মতো মাজার।' মাছ হচ্ছে প্রজননের প্রতীক। এর অন্য একটি মীথ আছে। আরবসাগর পাড়ি দিয়েছিলেন যে প্রাচীন পীর-আওলিয়াগণ, তাদের বাহন ছিল তৎকালের মাছের আকার নৌকা। তীরে দাঁড়িয়ে মনে হতো অলৌকিক শক্তির অধিকারী পীর-আওলিয়াগণ বুঝি সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাছের পিঠে দণ্ডায়মান হয়ে (মাহীসওয়ার) ভারতবর্ষে আসছেন ধর্মের বাণী প্রচার করতে।

লালসালুর গূঢ়ার্থটা কী? কী ব্যাখ্যা তার রুপালি বর্ণের ঝালরের? প্রচলিত ব্যাখ্যার মধ্যে ভিন্নতা আছে। এক ব্যাখ্যায় আছে লালসালু হচ্ছে জিহাদ বা ধর্ম প্রতিষ্ঠার যুদ্ধের রক্তের প্রতীক এবং এর সাদা রঙ ঝালর হচ্ছে শাণিত চকচকে তরবারীর প্রতীক। কেননা, পীর-আওলিয়াদের জীবনের সঙ্গে যুদ্ধও ছিল অনুষঙ্গ। পরবর্তী সময়ে বঙ্গ-ভারতের মাটিতে দীর্ঘকালের বিবর্তন অভিঘাতে পীর-সহজিয়া মতবাদে ঘটে রূপান্তর।

সেই রূপান্তরিত রূপটি কী? লোক পুরাণের প্রভাবে বিবর্তিত কোনো কোনো মতবাদে আছে কবর বা সমাধী (সাধকের) হচ্ছে মৃত্যুর ভেতরে নীরব-নিঃশব্দ জাগরণের চিরন্তন প্রতীক। লালসালু হচ্ছে জন্ম রহস্য, ঋতুর রক্ত। সাদা ঝালর হচ্ছে পুরুষের শক্তি বা সন্তানবীজ। মোটকথা কবর বা সমাধী হচ্ছে মৃত্যুর ভেতরে মৃত্যুহীন জগতের মহারহস্যময়তা। মৃত্যুর অন্ধকার থেকে নবজীবনের কাছে ফিরে আসা।

আমাদের বিশ্বাস মজিদের এসব মারফতি বা সহজিয়া তত্ত্ব অজানা ছিল না। এসবের ভেতরই তার দ্বান্দ্বিক সত্তা আবর্তিত হতো। তাই অচরিতার্থ সন্ত ান তৃষ্ণা বা আত্ম-অস্তিত্ব কামনা তাকে দুর্দমনীয় বাসনার জগতে টেনে নেয়। এই বাসনার রূপায়ণশক্তি হিসেবে জমিলার আগমন। অবশ্যই জমিলা এই সত্যতে জানত। সে জানত মজিদের ঘরে এসেছে সে সম্ভোগ এবং সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বা শস্যভূমি হিসেবে। তাই আকাঙ্ক্ষাও একই বৃত্তে ঘূর্ণায়মান। সে তো মজিদের গুপ্ত সাধনার সঙ্গী নয়, কামনা চরিতার্থতার অনুগামী মাত্র। একজন যন্ত্র, অপরজন যন্ত্রী।

"মুসলমানের মাইয়ার হাসি কেউ কখনো হুনে না, তোমার হাসিও যানি কেউ হুনে না।" মজিদের এই কঠিন আদেশের পরেও জমিরা হাসে। পরক্ষণেই শাশুড়ির বয়সী জা রহিমার গম্ভীর মুখ দেখে চোখে তার অভিমান ঠেলে পানি আসে। জমিলা কাঁদে। জমিলার হাসি যেমনি চমকে দেয় রহিমাকে, কান্নাও তাই। এতে কী স্পষ্ট হয়? জমিলার হাসি বা কান্না যে গভীর অর্থের ভেতর ঘুরপাক খায়, তা যে সাধারণ মনের অভিব্যক্তি নয়, তা বুঝতে দেরি হয় না। হাসি তো আনন্দের নয়, বরং দুঃখের এবং কান্নাটা বন্দিদশার।

জমিলার মনোবাস্তবতা মজিদ যতটা সরলরৈখিক ভেবেছিল, তা নয় মোটেও। আত্মসন্ধানে পা ফেলে মজিদ বুঝতে পারে, "সে (জমিলা) যেন ঠিক বেড়ালছানা" নয় মোটেই। "মেয়েটি যেন কেমন! তার মনের হদিস পাওয়া যায় না।" একটি ঘটনা জমিলার ভেতর বিস্ময়কর প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়ায়। মাজারে আগত জনৈকা সন্তানহারা বৃদ্ধার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ জমিলাকে স্তব্ধ করে দেয়। সে কিনা সন্তানের মৃত্যুর জন্য খোদাকে দোষারোপ করে। মজিদ তাকে খোদার মহিমা বর্ণনা করে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। জমিলা সবই শোনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। মজিদের মনে হয় "তার (জমিলার) চোখ যেন পৃথিবীর দুঃখবেদনার অর্থহীনতায় হারিয়ে গেছে।"

জমিলার অন্তর্জগতের ঘোর রহস্য যেন অন্তহীন দুর্বোধ্য। কেননা সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদে জবজবে ভেজা সে-রাতে দূরের ডোমপাড়া থেকে অবিশ্রান্ত ঢোলকের বাজনার শব্দ ভাসে। মজিদের ঘুম আসে না। সে তার বালিকা-বধূ জমিলার গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে। তার বিশ্বাস মৃত্যুর ভেতর দিয়ে নির্মম এই দুনিয়ায় হঠাৎ নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়া জমিলার মন হয়তো আদর পেয়ে সান্ত্বনার স্পর্শ পাবে। এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে। মধ্যরাতে ঢোলকের আওয়াজ থেমে গেলে, নীরবতার অভিঘাতে মজিদের তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘুম কেটে গেলে সে দেখতে পায় বিছানায় জমিলা নেই। শেষে আলো জ্বেলে পাশের বারান্দায় মজিদ আবিষ্কার করে ' রহিমার প্রশান্ত বুকে মুখ গুঁজে জমিলা অঘোরে ঘুমাচ্ছে...তার ঠোঁটটা একটু নড়ে উঠল– যেন মাই (মাতৃস্তন) খেতে খেতে থেমে গিয়েছিল, আলো দেখে হঠাৎ স্মরণ হল সেকথা।'

কী ব্যাখ্যা হতে পারে এই ঘটনা আর জমিলার অন্তর্জাগতিক ক্ষুধার? এখানে আমরা যৌনতার পরিবেশের দ্বৈতসত্তাকে আবিষ্কার করতে পারি। জমিলা কিশোরী, যৌনতা তার নবলব্ধ অভিজ্ঞতার কৌতূহল। মৃত্যুর অভিঘাতে পতিত একটি কিশোরীকে মজিদ কেবল গায়ে পিঠে হাত বুলায়। আদিম সেই স্বতঃসিদ্ধ জগতে টেনে নিয়ে মৃত্যুভেজা হৃদয়কে উদ্ধার করতে পারে না মজিদ। অন্যদিকে কাম সম্ভোগ বঞ্চিত জমিলার কাছে সেই মুহূর্তে সদ্য বিচ্ছেদ হওয়া মাতৃস্নেহের আশ্রয় ছিল প্রশান্তির বিকল্প স্থল। তাই রহিমার বুকে মুখ গুঁজে জমিলা ফ্রয়েডিয় মনোব্যাখ্যার সেই মাতৃস্নেহের অতল গভীরে অপাপসিক্ত স্তন-দুগ্ধ পানের জটিল যৌন অনুভূতির জগতে আশ্রয় নেয়।

জমিলার মানস জগতের সহস্র গলিপথে অনুসন্ধিৎসু পরিভ্রমণে বেরিয়ে যে প্রশ্ন ভাবিত করে তা হচ্ছে, কেন লেখক জমিলাকে সর্বক্ষণ বাকরুদ্ধ করে রেখেছেন? অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যমে মুখের ভাষার বদলে গাম্ভীর্যকে প্রধান করে তুলেছেন? এই জটিল শিল্প কৌশলের আড়ালে কোন সত্য লুকিয়ে আছে? জমিলা তো বোবাপ্রকৃতি নয়, রক্তমাংসের মানুষ। তবে কি লেখক মূকাভিনয়ের আড়ালে মজিদের নির্মম পরিণতির জন্য জমিলাকে বিধ্বংসী অস্ত্রশক্তি হিসেবে

গোড়া থেকেই দুর্জ্ঞেয় করে তৈরি করে নিয়েছিলেন? কেননা বিধ্বংসী অস্ত্র তো বিস্ফোরণের পূর্বে প্রাণশূন্য মৃতের মতোই শব্দ ও শক্তিহীন থাকে। লেখক বলছেন, 'জমিলা যেন ঠাটাপড়া মানুষের মতো হয়ে গেছে।' মজিদ তো জমিলাকে সেই বিবেচনায়ই ঘরে তুলেছিল, যে খোদাকে ভয় করবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে, ভয়টা যদিও উপলক্ষ খোদা, লক্ষ্য হচ্ছে মজিদ নিজে।

খোদাভীতির লক্ষণ হচ্ছে নামাজ কায়েম করা। কিন্তু ঘুমকাতরতার কারণে প্রায়ই এশার নামাজ পড়া তার হয়ে ওঠে না। জমিলার ঘুম তো কাঠের মতো শক্ত। সহজে তা ভাঙে না। ঘুম ভাঙলেও তন্দ্রা কাটে না। সত্যি কি ব্যাপারটি জমিলার ঘুমকাতরতা? নাকি বিধিবিধানের প্রতি অবজ্ঞা? কেননা মজিদের ধমকে সে ভড়কে গেলেও নামাজের জন্য তৈরি হয় না। "মহব্বতনগরে তার (মজিদ) দীর্ঘ রাজত্বকালে...কেউ তার হুকুম এমনভাবে অমান্য করেনি কোনদিন। আজ তার ঘরের একরত্তি বউ...তার কথায় কান না দিয়ে এমন নির্বিকারভাবে বসে আছে....হঠাৎ এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝে উঠতে পারে না তাকে কীভাবে দমন করতে হবে।"

ক্ষুদ্র-তুচ্ছ শক্তিশূন্য এক নারীর অভ্যন্তরে মজিদের হঠাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী আবিষ্কার এই বাস্তবতাকে ঊর্ধ্বগামী করে যে, মজিদ আত্মপরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে জমিলার নীরব বিদ্রোহ ক্রমেই বিস্ফোরণের দ্বারপ্রান্তে এগিয়ে যাচ্ছে। মজিদ তো শূন্যকুম্ভ আত্মশক্তিহীন, খোদাভীতি তার একমাত্র অস্ত্র। সেই অস্ত্রও জমিলার সামনে কেঁপে ওঠে। তাই মজিদ নিরস্ত্র অসহায়ের গর্তে পতিত হয়ে থাকে। ভোরবেলা কোরানপাঠ শেষে অন্দরে এসে সে দেখতে পায়, জমিলা আয়নার সামনে বসে সিঁথি কাটছে। "মনে হয় ঘোলাটে আয়নায় নিজেরই প্রতিচ্ছবি দেখে চকচক করে মেয়েটির চোখ। সে চোখে বিন্দুমাত্র খোদার ভয় নেই, মানুষের ভয় দূরের কথা।"

স্বামী নামক দোর্দণ্ড প্রতাপের পুরুষের নয়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোন শক্তির প্রতিচ্ছবি নয়, আয়নার ভেতর জমিলা দেখছে নিজেরই প্রতিকৃতি। জমিলার এই নিজত্ব, এই আত্মআবিষ্কার দুর্বিনীত আত্মশক্তিতে মজিদের শক্তি উন্মূল হতে থাকে। "রূপ দিয়া কী হইব? মাইনষের রূপ ক-দিনের?" জমিলার প্রতি এই প্রশ্ন আসলে তার আত্মক্ষয়ের নিদর্শন। সে আত্ম-আশ্রয় খোঁজে এই বলে, "খোদারে কি ডরাও না?....যার-তার ঘরে আস নাই তুমি! এই ঘর মাজার– পাকের ছায়ার শীতল।...'ক্ষিপ্রগতিতে জমিলা স্বামীর পানে তাকায়। শত্রুর আভাস পাওয়া হরিণের চোখের মতোই সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ।...সে যেন খাঁচায় ধরা পড়েছে।" এ যেন ভিন্ন এক জমিলার অভিব্যক্তি। সেই জমিলার পরমুহূর্তেই চৈতন্য জগতে যে রূপান্তর ঘটে তার দৃশ্যটা এই, "দপ করে জমিলার চোখ জ্বলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁট কেঁপে ওঠে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়, দাউ দাউ করা শিখার মতো সে দীর্ঘ হয়ে ওঠে।" কিন্তু পরমুহূর্তেই সেই আগুন নিভে শান্ত হয়ে যায়।

জমিলা আরো জটিল, আরো নিশ্ছিদ্র নিস্তল হয়ে যায় শিরনির দিন। বাইরে জিকির চলছে। হাওয়াশূন্য সন্ধ্যা। মোমবাতির শিখা নিষ্কম্প। শালসালুতে ঢাকা মাজারটি মহাসত্যের প্রতীকরূপে নিশ্চল। শিরনির খিচুড়ির ডেকচিতে বলক দেখছে জমিলা এবং কান পেতে শুনছে জিকিরের ঢেউয়ের গর্জন। "সে ঢেউ তাকে (জমিলা) আচম্বিতে এবং অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আঘাত করে। তারপর আঘাতের পর আঘাত আসতে থাকে। একটা সামলিয়ে উঠতে না উঠতে আরেকটা। সে আর কত সহ্য করবে।...গনগনে আগুনের পাশে কেমন চওড়া দেখায় তাকে...পানিতে ডুবতে থাকা মানুষের মতো মুখ তুলে আবার শরীর দীর্ঘ করে জমিলা, থই পায় না কোথাও।...এদিকে ঢেউয়ের পর আরো ঢেউ আসে, উত্তাল উত্তুঙ্গ ঢেউ... পর্বতপ্রমাণ অজস্র ঢেউ ভেঙে ছত্রখান হয়ে যায়, তারপর সে দ্রুতপায়ে হাঁটতে থাকে। উঠান পেরিয়ে বাইরের দিকে।

কে ওখানে?...অস্পষ্ট অন্ধকারে ঘোমটাশূন্য তার মুখটা ঢাকা চাঁদের মতো রহস্যময়... ।

জিকিরের শব্দতরঙ্গের অভিঘাতে লণ্ডভণ্ড জমিলা বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রতিঘাতে ছিন্নভিন্ন। তার মুখ চাঁদের মতো রহস্যময়। এই রহস্যের ভেতরই জমিলার অন্তস্থ জগতের অনুপুংখ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। যে অগ্নিপরীক্ষার মহা অগ্নিগর্ভে জিকিরের শব্দতরঙ্গ নিক্ষিপ্ত করে তাকে, সেখানে সে কখনো ভয়ার্ত, কখনো আত্মরক্ষায় স্থিরকল্প। তাই সে বাড়ির বাইরে ঘুপচি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মুক্ত পৃথিবী এবং শব্দতরঙ্গশূন্য নীরব প্রশান্তির আকাশ খোঁজে। মহারহস্যময় ঐশ্বরিক পৃথিবীর বাইরে বন্ধনহীন মিথ্যাশূন্য সত্তার মুখোমুখি হতে চায়। কেননা, ক্ষণকাল পূর্বে তার মনে হয়েছিল "দুনিয়া যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে আছে, আকাশে যেন তারা নেই।"

মজিদকে বুঝি অন্তনিঃসহায় করে জমিলা। সে বুঝতে পারে তার প্রতি জমিলার বিশ্বাস একেবারেই ভঙ্গুর। তাই সে রহিমাকে জিজ্ঞেস করে, "বিবি, কারে বিয়া করলাম? তুমি বদদোয়া দিছিলা নি?" যাকে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলে জমিলা সেই মজিদ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জমিলাকে শিক্ষা দিতে চায় খোদাভীতির। ঘরের বিবি রাতের অন্ধকারে বাড়ির বাইরে বেআব্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল জিকির অস্বীকার করে। পরপুরুষ তাকে দেখে ফেলেছে। মজিদকে সে বে-ইজ্জত করেছে এবং মৃত পীরকে করেছে নারাজ।

জমিলাকে মজিদ আত্মশক্তিহীন ভীরু আত্মসমর্পণকারী মানুষে পরিণত করতে চায়। রাতে তারাবি নামাজ পড়ে মাজারে গিয়ে মাফ চাইতে আদেশ করে। ভয় আর বিশ্বাসের শেকলটা জমিলার কোমরে শক্ত করে বাঁধার জন্য মজিদ এক মিথ্যে গল্প ফাঁদে। এক রাতে নিজের বেখেয়ালে ওজুছাড়া ঢুকেছিল মাজার ঘরে। হঠাৎ শত-সহস্র সিংহের গর্জনে ভড়কে যায় সে। রক্ত পানি হয়ে যায়। খেয়াল হলে ওজু করে পাক শরীরে পুনরায় মাজারে ঢুকলে সে আর সিংহের গর্জন শুনতে পায়নি।

সে-রাতে যখন জমিলা দীর্ঘ সময় জায়নামাজে ওঠাবসা করে তখন রহিমা মজিদের 'হাড়সম্বল কালো কঠিন পা, মৃতের মতো শীতল শুষ্ক তার চামড়া' নরোম হাতে টিপে টেপে পরিচর্যা করে। সময় কাটে। এক সময় তন্দ্রার ভাব কাটিয়ে মজিদ ও-ঘরে পা বাড়ায়।

সে দেখে জায়নামাজের ওপর সেজদার ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে আছে জমিলা। মজিদ ক্রোধে গরম হয়ে ওঠে। নামাজ পড়তে গেলে যার ঘুম পায় তার যে খোদাভীতি নেই, সে যে শয়তানেরর অনুগামী, মজিদের তা অজানা নয়। হ্যাঁচকা টানে জমিলাকে বসিয়ে দেয় মজিদ। ভয়ে নয়, ক্রোধে থরথর কাঁপছে জমিলা। মজিদ তাকে টেনে নিয়ে চলে মাজার ঘরের দিকে। অনেক চেষ্টায়ও জমিরা হাত ছাড়াতে না পেরে হঠাৎ মজিদের মুখে থুতু ছিটিয়ে দেয়।

এ-ছিল মজিদের কাছে অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য। যার অসীম ক্ষমতার কাছে পরাজিত খালেক ব্যাপারি আপন বিশ্বাসী স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়, খোদাভাব উন্মাদ লোকেরা চুম্বনে-চুম্বনে যার পা ভিজিয়ে দেয়, তার প্রতি এই ক্ষুদ্র নারীর এত ঘৃণা, অশ্রদ্ধা? মজিদ ক্রোধে জ্বলে জ্বলে জমিলাকে জোর করে তুলে নিয়ে মাজার ঘরে বসিয়ে দেয়। অন্ধকার মাজার ঘর।

"এখানে যেন মৃত্যুর অন্ধকার, সে অন্ধকারে সূর্য নেই, চাঁদ-তারা নেই....খুন হওয়া মানুষের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে অন্ধের চোখে দৃষ্টির জন্য যে তীব্র ব্যাকুলতা জাগে তেমনি একটা ব্যাকুলতা জাগে অন্ধকারের গ্রাসে জ্যোতিহীন জমিলার চোখে।" চমকে উঠে জমিলা তাকায় মজিদের দিকে। মজিদের কণ্ঠে দোয়া-দরুদ। হঠাৎ জমিলা আর্তনাদ করে ওঠে। তারপর নিশ্চুপ। মজিদ দড়ি দিয়ে একটি খুঁটির সঙ্গে জমিলাকে বেঁধে ফেলে এবং বলে, "কাইল তুমি দেখবা দিলে তোমার খোদার ভয় আইছে, স্বামীর প্রতি ভক্তি আইছে, মনে আর শয়তানি নাই।"

যে কোন মুহূর্তে একটা আর্তনাদ শোনা যাবে, এই প্রত্যাশায় মজিদ জেগে থাকে। অথচ নীরব-নিস্তব্ধ। তারপর হঠাৎ ঝড় আসে। তীব্র হাওয়ার ঝাপটা। আকাশে মেঘের গর্জন। শিলাবৃষ্টি। মজিদ যেন ছিন্নভিন্ন, ভয়ার্ত, খোদার কৃপাপ্রার্থী। সেই মাজার ঘরে জমিলা বন্দি, যেখানে পীরের প্রভুত্ব, পৌরুষ আর স্বামিত্ব চিরজাগ্রত। মজিদ খালেক ব্যাপারির বাঁজা স্ত্রীকে মাজারের সাতপাঁকে বাঁধতে চেয়েছির সন্তান কামনায়। প্রভুত্ব, পৌরুষ আর স্বামিত্বের প্রতীক মাজারকে তিন পাঁক বেঁধেই ব্যর্থ মহিলা তালাক পেয়ে বাপের ঘরে ফিরে গেছে। কিন্তু মজিদ যে মাজারের ছায়ায় আপন প্রভুত্ব আর স্বামিত্বকে কল্পনা করে ওখানেই বন্দি জমিলা। খোদা, মাজার আর মজিদ এই ত্রয়ী শক্তির হাত থেকে মুক্তি নেই জমিলার।

কিন্তু একি? ঝড় থেমে গিয়ে ভোর হলে একি দেখে মজিদ? "ঝাপটা খুলে মজিদ দেখল লাল কাপড়ে আবৃত কবরের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে জমিলা, চোখ বোজা, বুকের কাপড় নেই,... মেহেদি দেয়া তার

একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে। পায়ের দুঃসাহস দেখে মজিদ মোটেই ক্রুদ্ধ হয় না....মজিদের ভেতরেও কী যেন একটা ওলটপালট হয়ে যাবার উপক্রম করে, একটা বিচিত্র জীবনে আদিগন্ত উন্মুখ হয়ে ক্ষণকালের [illegible] প্রকাশ পায় তার চোখের সামনে, আর একটা সত্যের সীমানায় পৌঁছে [illegible]বেদনার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করে মনে মনে।”

এভাবেই এক আত্মবিস্ময়ের ভেতর মজিদের মহাপতন ঘটায় জমিলা। এক জটিল দুর্বোধ্য মনোদ্রোহী চেতনার ভেতর মজিদকে অতলের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে সে। মজিদের অস্তিত্বচেতনা, নিকষকালো আকাঙ্ক্ষা আর পুঞ্জীভূত মিথ্যাকে বিচূর্ণ করে দেয় জমিলা। তার অন্তঃসারশূন্য শক্তি কল্পনায় যে অপ্রতিরোধ্য ক্ষয় সৃষ্টি হয় তা কেবল ব্যক্তি মজিদকেই লণ্ডভণ্ড করেনি, ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রশক্তিকেও।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র আবির্ভাব সে সময়েই, যে সময়াধার বন্দি ছিল ধর্মাশ্রয়ে দেশ-ভাগের নিকষ অন্ধকারে। একদিকে চলছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভেতর দেশ-বিভাগ, নতুন দেশের অলীক স্বপ্নে স্বতন্ত্র সাহিত্য নির্মাণ এবং অন্য প্রান্তে ভাষা আন্দোলন। এই ত্রয়ী অভিঘাত ওয়ালীউল্লাহ্‌কে স্রোতে ভাসায়নি, বরং অন্তঃস্রোতে ডুবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অর্ধশতাব্দীকাল পরেও ধর্মান্ধতা পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশকে কোথায় ঠেলে নিয়ে যাবে। পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী লেখকরা আজো যা ভাবতে ব্যর্থ, ওয়ালীউল্লাহ তা জেনেছেন ষাট বছর পূর্বে। লেখকের স্ব-কালের রাজনীতি উপন্যাসে অন্তঃস্রোত হিসেবে কতটা সংকেতময়, মৌলবাদ কতটা ভয়ংকর বিষাক্ত সাপের মতো রাষ্ট্রকে কুণ্ডলবন্দী করে অনির্দিষ্টকালের দিকে ছিল ধাবমান, তার বাস্তবতা আজকের বাংলাদেশ।

তৎকালের অন্য লেখকদের পথকে তাই অস্বীকার করে ওয়ালীউল্লাহ সৃষ্টি করলেন প্রতীকি নারী জমিলাকে। জমিলা তো অতীত আর বর্তমানের এই বহির্বাস্তব ও আর অন্তর্বাস্তবের বাংলাদেশ। লালসালুর মজিদের উন্মূল বাস্তবতা লেখকের আকাঙ্ক্ষা; জমিলার থুতু নিক্ষেপ আর ‘পায়ের দুঃসাহস’ লেখকের অন্তঃস্থ বাসনা।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে ওয়ালীউল্লাহ্‌ যেমনি মাত্র একজন এবং একাকী, ঠিক তেমনি জমিলাও। কিন্তু আমাদের আক্ষেপ অন্যপ্রান্তে। উপন্যাসে জমিলার আবির্ভাব যেমনি ছিল অনিবার্য, তেমনি তার অন্তর্দ্বন্দ্বের পাশাপাশি বহির্দ্বন্দ্বও ছিল অপরিহার্য। কেবল তা-ই নয়, জমিলার বিস্তৃতি এবং তীব্রতাও উপন্যাসের কাহিনী এবং অন্তঃস্থ অভিঘাতকে আরও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ করে তুলতে পারত। ভয়ংকর এক জটিল বিশ্ব নির্মাণ করতে পারত জমিলা । লেখক তা হতে দেননি। জমিলা তাই রহস্যাবৃত, সেই আলো-আঁধারির মাজার রহস্যের মতোই। উপন্যাসবৃত্তে তার উপস্থিতির পরিধির হ্রস্বতা পাঠকের কাছে তাই অতৃপ্ত তৃষ্ণা।

[illegible] ২০০৪

লালসালু : ওয়ালিউল্লাহ্'র রাষ্ট্রচিন্তা

রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবোত্তর এবং আসন্ন চীন বিপ্লবের কালে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারতের বিভক্তি ছিল ক্রম অগ্রসারমান মানব সভ্যতার জন্য ভীতি সঞ্চারক এক ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক অন্ধকার বাস্তবতা। পূর্বাঞ্চলের বাংলা বিভক্তি গণমানসে দু'ধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। একদিকে আগুনের মতো লাকপকে আশা-প্রত্যাশা, অন্যদিকে নিকষকৃষ্ণ হতাশা-নিরাশা। সমসাময়িক রাজনৈতিক জটিল জালে আবদ্ধ পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন অধিকাংশ কবি-লেখকের মানস জগৎ ছিল কুহেলিকায় আচ্ছন্ন।

বিস্ময়কর সত্য এই, একমাত্র সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ই ধরতে পেরেছিলেন কোন ধরনের ছদ্মবেশী একটি ধর্মান্ধ নতুন রাষ্ট্র জন্ম নিচ্ছে বা নিয়েছে এই অঞ্চলে। ১৯৪৮ সালে 'লালসালু' নামক যে উপন্যাস প্রথমে প্রকাশ পেল, নিশ্চয়ই এর গঠন প্রক্রিয়া চলছিল তারও অনেক আগে থেকে। আরো একটি কাকতালীয় ব্যাপার এই যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জন্মের মাস ও তারিখ অখণ্ড রাষ্ট্র বিভক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অর্থাৎ ১৫ আগস্ট, সালটি ছিল ১৯২২। লালসালুর লেখক কতটা দূরদর্শী হলে স্পষ্ট চিনতে পেরেছিলেন কি ধরনের রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছে এই মাটিতে। লালসালুর আড়ালে কিংবা প্রতীকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আর গণতন্ত্রী মানুষের তাজা রক্তের রঙে রঞ্জিত রাষ্ট্র হলো পাকিস্তান।

ধর্মকে আশ্রয় করা সেই রাষ্ট্র তো কেবল ১৯৪৭ সাল নয়, ১৯৭১ সাল এবং পরবর্তী দীর্ঘকাল পর্যন্ত মুক্তিকামী মানুষের রক্তে রঞ্জিত লালসালু। বারবার রাষ্ট্র ভাঙে, রূপ বদল হয় তার, কাল বয়ে চলে মহাকালের দিকে, কিন্তু লালসালু প্রপঞ্চ তো অদৃশ্য হয় না। সামরিক-বেসামরিক মজিদীয় দুঃশাসনে শোষণে রক্তক্ষরণে বাংলাদেশ নামক আজকের 'মহব্বতনগর' গ্রাম ভীত-তটস্থ। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ সেই রাষ্ট্রকে চিনতে পারলেন জন্মমাত্রই। অথচ

অন্য কারো বোধবুদ্ধিতে পৌঁছল না কেন? সে এক বিস্ময় বটে। আপেক্ষও কম নয়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে যুক্তিহীন, মেধাহীন নানা অভিযোগ আছে লালসালুকে ঘিরে। বলা হয়েছে রাষ্ট্র ভেঙে নতুন রাষ্ট্র জন্ম নিচ্ছে, চলছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কোটি মানুষ দেশান্তর হচ্ছে, অন্যদিকে সাম্যবাদী আন্দোলন হচ্ছে, তেভাগার লড়াই চলছে, অথচ সেসব অবজ্ঞা করে তিনি লিখলেন পীরের গল্প 'লালসালু'। তাঁকে অভিযুক্ত করা হয় তিনি রাজনীতি থেকে হাজার মাইল দূরে, সেই অভিঘাত নাকি তাঁকে স্পর্শ করেনি। যারা ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে এসব অভিযোগ পূর্বে করেছেন এবং যারা বর্তমানেও করে থাকেন, তারা তাঁর সৃষ্টিকে চিনতে ব্যর্থ। দীর্ঘদিন পর তাঁর প্রকাশিত ইংরেজি উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ পড়েও কি তাঁকে চেনা যায় না?

একথা অনেকেরই জানা যে, ওয়ালীউল্লাহ্ সমাজতন্ত্রী নন। এর প্রতি তাঁর আগ্রহের পরিচয়ও মেলে না। কিন্তু তিনি ছিলেন আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের মনোযোগী পাঠক। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের রাজনৈতিক উদারতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তি এবং বুদ্ধিবাদের তিনি ছিলেন একজন অনুসন্ধানী, অনুসারী শিল্পী। অন্য কোন ইউরোপীয় লেখকের সঙ্গে তুলনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা দেখবো তিনি কতটা রাষ্ট্রনীতিমনস্ক। উপন্যাসের শুরুতেই লেখক এমন একটি জনগোষ্ঠী এবং জনপদের বর্ণনা দিচ্ছেন, যা আমাদের শিহরিত করে। সঙ্গে সঙ্গে যেন তিনি চিত্রকল্প অঙ্কন করেছেন একটি ঝিমধরা সর্পিল গতির রেলগাড়ি, লণ্ঠন জ্বালানো রেল স্টেশনের উপকরণ দিয়ে। নিশ্চয়ই এসবের দার্শনিক অর্থের বদলে বাস্তব অর্থ আছে। হতে পারে এসব প্রতীক, কিন্তু তাৎপর্য অতলস্পর্শী। সেখানে আমরা কি খুঁজে পাই না চল্লিশ দশকে জন্ম নেয়া একটা দেশকে? কেমন সেই দেশ? খাদ্যশূন্য, মানুষের মনে মিথ্যে আগুনে-আশা, ওরা গৃহহীন হচ্ছে, উন্মাদের মতো ছুটছে? "শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশটাকে পর্যন্ত যেন সদা সন্ত্রস্ত করে রাখে। ঘরে কিছু নেই। ভাগাভাগি, লুটালুটি আর স্থান বিশেষে খুনাখুনি করে সর্বপ্রচেষ্টার শেষ। দৃষ্টি বাইরের পানে, মস্ত নদীটির ওপারে, জেলার বাইরে– প্রদেশেরও জ্বালাময়ী আশা; ঘরে হা-শূন্য মুখথোবড়ানো নিরাশা...দূরে তাকিয়ে যাদের চোখে আশা জ্বলে তাদের আর তর সয়না...তাই তারা ছোটে, ছোটে।"

১৯৪৭ কিংবা '৪৮ সালের এ-কোন দেশের এই নির্মম বাস্তবতার বর্ণনা দিচ্ছেন ওয়ালীউল্লাহ? কোথায় সেখানে মানুষের স্বপ্ন পূরণ? ক্ষুধার্ত স্বপ্নভঙ্গ জনতা যেন ছুটছে খাদ্য, নিরাপত্তা, প্রশান্তির সন্ধানে অনিশ্চিৎ এক দেশের ঠিকানায়। রাজনীতি আর সময়ের ট্রেন তাদের কোথায় পৌঁছে দেয়? ওখানে পৌঁছার জন্য প্রতিযোগী মানুষের অবস্থাটা কি? "ইতিমধ্যে আত্মীয়-স্বজন....হারিয়ে যায়। কারো জামা ছেঁড়ে, কারো টুপিটি অন্যের পায়ের তলায়

দুমড়ে যায়। কারো বা আসল জিনিসটা অর্থাৎ বদনাটা আলগোছে হারিয়ে যায়।...নিশুতি রাতে যে দেশে এসে পৌছেছে সে দেশ এখন অন্ধকারে ঢাকা...তাতে শস্য নেই...যা আছে তা যৎসামান্য। শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের চেয়ে আগাছা বেশি। ভোরবেলায় এত মক্তবে আর্তনাদ ওঠে যে, মনে হয় এটা খোদাতালার বিশেষ দেশ।"

অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বে যে অন্ধকার দেশের বর্ণনা দিয়েছেন ওয়ালিউল্লাহ তার সঙ্গে আজকের এই সমকালের আত্মঘাতী নরঘাতক দেশ ধ্বংসকারী ধর্মান্ধদের হাতে পতিত বাংলাদেশের অমিলটা কোথায়? সেদিন কোন দেশের ঠিকানা দিয়েছিল জাতীয় নেতারা? কোন প্রতারণার বাণী শুনিয়েছিল জনগণকে? ১৯৪৭-এর দেশকে চিনে ফেলেছিলেন ওয়ালীউল্লাহ। এ ইহজগত বঞ্চিত, পরজগতের স্বপ্ন তাড়িত নতুন দেশ তাঁকে ফাঁকি দিতে পারেনি। নিশ্চয়ই তিনি জানতেন দেশ ও জাতির গন্তব্য কোথায়! আমরা জানি সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ নাস্তিক কিংবা সংশয়বাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন যুক্তি ও বুদ্ধিবাদী। আধুনিকতার প্রতি একনিষ্ঠ। তাঁর স্বপ্ন ছিল বিজ্ঞানমনস্ক একটি জাতির, একটি দেশের। ধর্মশিক্ষায় শিক্ষিতদের প্রতি তাঁর প্রত্যাশা ছিল আধুনিকতার। "কেতাবে যে বিদ্যা লেখা তা কোন এক বিগত যুগে চড়ায় পড়ে আটকে গেছে। চড়া কেটে সে বিদ্যাকে এত যুগ অতিক্রম করিয়ে বর্তমান স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে এমন লোক আবার নেই। অতএব কেতাবগুলোর বিচিত্র অক্ষরগুলো দূরান্ত কোন এক অতীতকালের অরণ্যে আর্তনাদ করে।"

লেখক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন পাকিস্তান নামের আড়ালে এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে যা ছিল মুক্তিকামী চিরবঞ্চিত মানুষকে মুক্ত করার বদলে অনুগত দাস বানাবার চেষ্টায় রত। তিনি দেখছিলেন নতুন রাষ্ট্রকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে প্রবল এক ঘূর্ণী আবর্ত। ক্ষুধার্ত-বেকার মানুষ ছুটছে শহরে। ভাঙছে গ্রাম। অস্তিত্বের অভিঘাতে শেকড় ছিন্ন হচ্ছে মানুষের। মানুষ হচ্ছে ঠিকানাহীন। "এরা তাই দেশ (গ্রাম/জন্মের ঠিকানা) ত্যাগ করে...জাহাজের খালাসি হয়ে ভেসে যায়, কারখানার শ্রমিক হয়, বাসাবাড়ির চাকর, দফতরির এটকিনি, ছাপাখানার মেশিনম্যান, টেনারিতে চামড়ার লোক। কেউ মসজিদের ইমাম হয়, কেউ মোয়াজ্জিন।" কেন এই পেশা বদল? শুধু কি ধর্ম? তা নয়, আসল সত্য অস্তিত্ব রক্ষা। কেননা ওয়ালীউল্লাহ স্পষ্ট দেখছেন "দেশময় কত সহস্র মসজিদ। কিন্তু শহরের মসজিদ, শহরতলির মজসিদ– এমন কি গ্রামে গ্রামে মসজিদগুলো পর্যন্ত আগে থেকে দখল হয়ে আছে।" কোথায়ও ঠাঁই নেই। যেন ধর্মরাষ্ট্রও উদ্দেশ্যহীন নিরুপায়।

এই রাষ্ট্র তো মানুষকে সর্বহারা করে দিচ্ছে। মানুষের অস্তিত্বকে লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। মানুষকে করে তুলছে ধর্মাশ্রয়ী। আত্মশক্তি ধ্বংস করে সমাজকে করুণাপ্রার্থী করছে দৈব শক্তির। এই ধর্মরাষ্ট্র ক্ষুধার্ত মানুষকে বানাচ্ছে প্রতারক। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মানুষ অন্ধকারে মিথ্যার ভেতর ডুবে যাচ্ছে।

লালসালুর মজিদ তো যা করেছে তা জেনেশুনেই। এছাড়া তার পথ ছিল না। সে জন্মমাটি বিচ্ছিন্ন ভাসমান, শেকড় সন্ধানী এবং অস্তিত্ব ছিন্ন। রাষ্ট্রযন্ত্র তার আদর্শের অনুগামী, সে তো সেই রাষ্ট্রের হাতেই তৈরি। একটি ধর্মরাষ্ট্র যখন তার মহৎ অস্তিত্বের শেকড় টেনে উপড়ে ফেলে, তখন সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাছে প্রতারকের আত্মসমর্পণ ভিন্ন মজিদের কোন বিকল্প ছিল না। পীরের কল্পিত মাজারের স্রষ্টা কি মজিদ? নিশ্চয়ই নয়। মজিদের আড়ালে রয়েছে ছদ্মবেশী ধর্মরাষ্ট্র। আসল দুর্বিনীত দুর্বৃত্ত তো সেই রাষ্ট্র, যে কি না মজিদের স্রষ্টা দ্রষ্টা।

'লালসালু' উপন্যাসের স্রষ্টা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় মেলে সেই ধর্মরাষ্ট্রটির উদ্ভবের পেছনে যাদের ব্যাপক সমর্থন এবং সহযোগিতা ছিল সেই ইংরেজি শেখা নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীটিকে শনাক্ত করণের ক্ষেত্রে। সমাজের নয়, গণমানুষের নয়, নিতান্তই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ আত্মোন্নতিকল্পে সেদিন তারা ধর্মরাষ্ট্র তৈরির জন্য ছিল ব্যাকুল। "এক সরকারি কর্মচারী সেখানে (পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চল) হয়তো একদিন পায়ে বুট এঁটে শিকারে যায়। বাইরে বিদেশি পোশাক, মুখমণ্ডলও মসৃণ কিন্তু আসলে ভেতরে মুসলমান। কেবল নোতুন খোলসপরা নব্য শিক্ষিত মুসলমান।" নব্য শিক্ষিত বধ্যবিত্তকে এমন নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কেবল তৎকালেই নয়, পরবর্তী সময়েও বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে ওয়ালীউল্লাহ ভিন্ন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই মধ্যবিত্তের উন্মোচন ওয়ালীউল্লাহই ঘটিয়েছেন তাঁর উপন্যাস 'চাঁদের অমবাস্যা' এর স্কুল শিক্ষকের ভেতর।

এই যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সে তো ছদ্মবেশী। সে তো উপনিবেশের তৈরি জীব। ভেতরের কাঠামো আধুনিক শিক্ষার ফলেও রয়েছে অটুট, কেবল বদলেছে বাইরের অবকাঠামো। শিক্ষা সে গ্রহণ করে আখের গোছানর জন্য, বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মানুষ হবার জন্য নয়। জনগণের মুক্তির জন্য রাষ্ট্রবিপ্লব যখন আসন্ন তখনই সে খোলস ছেড়ে আসল ধর্মীয় স্বরূপটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ধর্মান্ধতা তথা মৌলবাদ বিকশিত হয় এই ছদ্মবেশী শ্রেণীরই দ্বারা।

ওই যে মজিদ কর্তৃক মোদাচ্ছের পীরের কল্পিত মাজার আবিষ্কার তা তো রাষ্ট্র কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত-বিভাজনের ভেতর দিয়ে রাষ্ট্রটির জন্ম তার ভিত্তি এই মাজার অর্থাৎ ধর্ম। ওয়ালীউল্লাহ্ স্পষ্ট দেখছিলেন রাষ্ট্রটির আদর্শের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার কিছুতেই খাপ খাচ্ছে না, বরং এখানে ধর্মীয়শিক্ষার জন্য ভূমি যথেষ্ট উর্বর। কেননা "ন্যাংটা ছেলেও আমসিপারা পড়ে, গলা ফাটিয়ে মৌলবীর বয়স্ক গলাকে ডুবিয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে পড়ে। গোঁফ উঠতে না উঠতে কোরান হেফ্‌জ করা সারা। সঙ্গে সঙ্গে মুখে, কেমন একটা ভাব জাগে, হাফেজ তারা, বেহেশতে তাদের স্থান নির্দিষ্ট।"

এই যে রাষ্ট্রব্যবস্থা তার দৃষ্টি তো রহস্যের পর্দায় আটকানো। সে দেখতে পায় না মানুষ কতটা ক্ষুধার্ত, কর্মহীন, দরিদ্র। সে কেবলই দেখতে পায়

মানুষদের মধ্যে খোদাভীতি নেই, ওরা বিপথগামী। তাই রাষ্ট্র তো মজিদের আড়ালে দায়িত্ব নিয়েছে তাদের বেহেশতে পাঠানোর আর ধার্মিক বানানোর। "লোকগুলো অশিক্ষিত, কাফের। তাই তাদের মধ্যে আলো ছড়াতে এসেছে। বলে না যে, দেশে শস্য নেই, দেশে নিরন্তর টানাটানি, মরার খরা।" ধর্ম ব্যবসার এবং ধর্মের নামে দেশ শাসনের সে-কি ভয়ংকর অভীপ্সা-অভিলাষ।

এমনি একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার ভেতর থেকে যে শ্রেণীটি স্বার্থ উদ্ধারের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়, তা মোটেই নির্বোধ নয়। সব কর্মকাণ্ড করে চলে সজ্ঞানে। ব্যক্তিস্বার্থ আর গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারের নামে প্রতারণা ছাড়া তার ভিন্ন অবলম্বন নেই। কেননা দেশটা যে ক্ষুধা আর অশিক্ষায় পূর্ণ। তাই এর রাজনীতি মৌলবাদী হতে বাধ্য, ধর্মের কাছে সমর্পিত হতে বাধ্য, ঠিক মজিদও জানত ধর্মের নামে "দুনিয়ায় সচ্ছলভাবে দু'বেলা খেয়ে বাঁচবার জন্যে যে খেলা খেলতে যাচ্ছে সে খেলা সাংঘাতিক।" তাই ১৯৪৭ সালে যে রাষ্ট্রের জন্ম হলো তার আপাতঃ মৃত্যু ঘটে ১৯৭১ সালে। কিন্তু কবর থেকে সে জেগে ওঠে অচিরেই। তাই আজো এগিয়ে চলেছে সেই দিন। একইভাবে বরং ভয়ংকরভাবে। "নিরাকপড়া শ্রাবণের সেই হাওয়া শূন্য স্তব্ধ দিনে তার (মজিদের) জীবনের যে নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল, মাছের পিঠের মতো সালুকাপড়ে আবৃত নশ্বর জীবনের প্রতীকটার পাশে সে জীবন পদে পদে এগিয়ে চলল।"

অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ যে রাষ্ট্রজীবনকে দেখতে পেয়েছিলেন তা আজো অটুট। কেবল অটুটই নয়, বরং পূর্বের চেয়েও শক্তিমান। এই রাষ্ট্র মজিদের মতোই প্রত্যাশা করে জনগণের গভীর আনুগত্য। প্রত্যাশা করে, "সে খোদাকে ভয় পায়, মাজারকে ভয় পায়, স্বামী মজিদকে ভয় পায়।" কে সে? ওই কিশোরী বৌ জমিলা। জমিলা তো প্রকৃত অর্থে শেকলপরা দরিদ্র গণমানুষেরই প্রতীক। ওই মজিদ সাত ছেলের বাপ দুদু মিঞাকে যে প্রশ্ন করে, ওই প্রশ্ন তো ধর্মরাষ্ট্র অহরহ খবরদারি গলায় করে যাচ্ছে জনগণকে। কোন সে প্রশ্ন? রক্তহিম করে দেন ওয়ালীউল্লাহ, তাঁর পাঠক ভড়কে যায়। "কলমা জান মিঞা?" "কলমা জানস ব্যাটা?" "ব্যাপারির মক্তবে তুমি কলমা শিখবা", "কী রে ব্যাটা, খৎনা হইছে?" "তোল লুঙ্গি, আজই নামাজের পর আমিই তোর খৎনা দিমু।"

ওয়ালীউল্লাহ্‌র রাষ্ট্রচিন্তা যেমনি শানিত, তেমনি অন্ধকারভেদী। তিনি জানতেন মজিদের প্রতীকে প্রতারক আধিপত্যবাদী শাসক শ্রেণীর শক্তির উৎস হচ্ছে ধর্ম। জনগণ শাসিত হয়, অত্যাচার ভোগ করে, শোষিত হয়, কিন্তু দৈবশক্তির প্রতি অনুগত না থেকেও অন্য পথ খুঁজে পায় না। কেননা, "মজিদের শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ঐ সালুকাপড়ে আবৃত মাজার থেকে। মাজারটি তার শক্তির মূল।" বিস্ময় এই যে, পুরাতন রাষ্ট্রের পতন ঘটে গণবিপ্লবে। সেই বিপ্লব অল্প দিনের ভেতরই আগুনের বদলে ছাই হয়ে যায়।

নতুন রাষ্ট্র ফিরে যায় পেছনে। জনগণ নয়, মাজার বা ধর্ম হয় তার শক্তির উৎস। এত আয়োজন, এত সংঘাত, এতটা জাতিধর্ম বিদ্বেষের ভেতর দিয়ে যে রাষ্ট্রের জন্ম হয়, তার স্বরূপ ধরতে তৎকালের, এমন কি সমকালের শিল্পীরা পর্যন্ত ব্যর্থ, তা কিন্তু ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন ওয়ালীউল্লাহ। তাই তাঁকে সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ সালে অন্যকিছু না লিখে লিখতে হয় 'লালসালু'। শনাক্ত করতে হয় শিক্ষিত সেই ভদ্রলোকদের, যাদের পোশাক এক, আর ভেতরটা আরেক।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ একক আধিপত্যের মজিদের বিশ্বের সঙ্গে প্রতিপক্ষের অনিবার্য দ্বন্দ্বকেও শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধর্মীয় মৌলবাদের প্রতিপক্ষ যে গণতন্ত্রীরা ছাড়াও স্বগোত্রীয়, তা লেখক জানতেন বলেই অন্য এক শক্তিমান পীরের আবির্ভাবকে অনিবার্য করে তোলেন উপন্যাসে। ধর্ম ব্যবসায় স্বার্থের দ্বন্দ্ব যে সংঘাতে পৌঁছে তাও আমরা দেখতে পাই। আমরা শুনতে পাই মজিদের প্রথম পক্ষের বিবি রহিমা স্বামীকে প্রশ্ন করে, "এক পীর সাহেব আইছেন না গেরামে, তানি নাকি মরা মাইনষেরে জিন্দা কইরা দেন?" ভয়ংকর এই প্রশ্ন, ভয়াবহ এই সংবাদ। অন্তত রাষ্ট্রের জনগণের জন্য। কেননা মজিদের রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার এবার সামনে দাঁড়িয়ে। এই দ্বন্দ্বটা আমরা কি সমকালে দেখতে পাচ্ছি না? মৌলবাদ তো কেবল প্রগতিবাদের বিরুদ্ধেই যায় না, প্রয়োজনে স্বগোত্রীয় অন্য মৌলবাদের সঙ্গেও সংঘাত সৃষ্টি করে ক্ষমতার আর স্বার্থের প্রশ্নে। ধর্ম যেন স্বার্থের দাস।

সমকালের ধর্ম শিক্ষার প্রবল স্রোতে ভেসে যাচ্ছে রাষ্ট্রের মৌলিক শিক্ষার কাঠামো। দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার। "আপনার সন্তানকে স্কুলে পাঠান"। গণশিক্ষার ওই পোস্টার ঢেকে দিয়েছে আর একটি পোস্টার "আপনার সন্তানকে মাদ্রাসায় পাঠান।" ওই যে 'লালসালু' উপন্যাসে আধুনিক শিক্ষার জন্য ব্যাকুল যুবক হেরে যায় মজিদের কাছে, নিজে ক্ষুদ্র হয়ে হার মানে ধর্ম আর মাজারের কাছে, আধুনিক জ্ঞান চর্চার স্কুল তৈরি আর হয় না। তার চিত্র কি মেলে না বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে? কেননা মজিদের শক্তি তো কেবল মাজার নয়, ধনী খালেক ব্যাপারীও? ধনের সঙ্গে যেমনি আত্মীয়তা আছে মাজারের , ধনীর, সঙ্গে ঠিক তেমনি মজিদের। দু'জনের উদ্দেশ্য অভিন্ন, শ্রেণীগত স্বার্থও এক।

একটি ধর্মরাষ্ট্রের বাস্তবতা কী? সেখানে সত্যি ধনের স্রোত আর ধর্মের স্রোত সমান্তরালে বহমান। তাই তো ওয়ালিউল্লাহকে বলতে হয়, "জীবন স্রোতে মজিদ আর খালেক ব্যাপারী কী করে এমন খাপে খাপে মিলে গেছে যে, অজান্তে আপোষে দু'জনের পক্ষে উলটো পথে যাওয়া সম্ভব নয়। একজনের আছে মাজার, আরেকজনের জমি-জোতের প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে না জানলেও তারা একা-ট্টা, পথ তাদের এক।" কী বিস্ময়করভাবে আমাদের সমকালীন বাস্তবতাকে রূপ দিতে পেরেছিলেন দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

ওই যে মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস, যে কি-না গ্রামে ইংরেজি স্কুল খুলতে চায়, তাকে যে প্রশ্ন করে মজিদ, সেই প্রশ্ন তো একটি ধর্মরাষ্ট্রেরই কণ্ঠস্বর। কী সেই প্রশ্ন? "তুমি না মুসলমানের ছেলে, দাড়ি কই তোমার?" স্বাভাবিক প্রশ্ন। তাই যার পক্ষে রাষ্ট্র নেই, সমাজ নেই, তার স্কুল তৈরির চাঁদার রূপান্তর ঘটে পাকা মসজিদ তৈরির চাঁদায়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কেবল যে ধর্মরাষ্ট্রের স্বরূপই উন্মোচন করলেন তা তো নয়, সঙ্গে সঙ্গে তার বিনাশও কামনা করেছেন। জমিলার হাতে মজিদের পতন ইতিহাসের অনিবার্য ফল হলেও, অন্য অর্থে ঘটনাটি আপেক্ষিক। সভ্যতার ক্রমবিকাশকল্পে উপন্যাসে আপন প্রাত্যাশাকে লেখক চরিতার্থ করেছেন মাত্র। মজিদের পতনই যে রাষ্ট্রের পতন এটা পরম সত্য, কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থার বাস্তবতার কি পতন ঘটলো উপন্যাসে? এক মজিদের বদলে অন্য মজিদের আবির্ভাব যে ইতিহাসের বাস্তবতা, ওয়ালীউল্লাহ তা জানতেন। সে কারণেই উপন্যাসের শেষাংশে বিধ্বস্ত মজিদের ভেতর গভীর এক মনস্তত্ত্বের জটিল বিশ্ব নির্মাণ করেছেন লেখক। "মজিদ অদূরে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে। মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরেও কী যেন একটা ওলট-পালট হয়ে যাবার উপক্রম হয়, একটা বিচিত্র জীবন আদিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ পায় তার চোখের সামনে, আর একটা সত্যের সীমানায় পৌঁছে জন্মবেদনা অনুভব করে মনে মনে।"

মজিদ সম্পর্কে লেখক আমাদের পরিণতিতে কী বলতে চান? কোন সে বিচিত্র জীবন পতনকালে তার সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়? কোন সত্যের সীমানায় পৌঁছে সে জন্মবেদনার অনুভব করে? জটিল থেকে জটিলতর প্রশ্ন। মজিদ কি খোলস মুক্ত হতে চেয়েছিল? সে কি মিথ্যাকে অতিক্রম করে পরম সত্যের বাস্ত বতায় বিশুদ্ধ হতে প্রত্যাশা করেছিল? কিন্তু তাকে পরমুহূর্তে ধানক্ষেত্রের ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে, "খোদার উপর তোয়াক্কল রাখ," কথাটা উচ্চারণ করতে হয়। করতে সে বাধ্য। উপায় নেই।

মজিদ বিদ্যুৎ ঝলকের মতো সত্যকে উপলব্ধি করেও অন্ধকার থেকে মুক্তি পেল না। লেখক জানেন, যে জগতে মজিদের অস্তিত্ব একাকার হয়ে গেছে তা থেকে তার মুক্তি নেই। ওই মুক্তিটা নেই বলেই সাতচল্লিশের ধর্ম আর ধর্মবিদ্বেষের জটিল বন্ধন একাত্তরের যুদ্ধটাও ছিন্ন করতে পারল না। রাষ্ট্র ফিরে গেল সাতচল্লিশে; একাত্তরের সেই রাষ্ট্র। একাত্তরটা ছিল মজিদের মতোই "আদিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ।"

মুক্তির পথ যে ছিল না এমন নয়। একাত্তরের রাষ্ট্রটা সে পথে হাঁটল না। মুক্তির সেই পথটার নাম সমাজতন্ত্র। নতুন সে পথে যে হাঁটতে রাজি নয়, তাকে তো ফিরে যেতে হবে পেছনে। কেননা চল্লিশ দশকে চীনের বিপ্লবের অভিঘাতে কম্পমান বঙ্গ-ভারতের অভিযাত্রা তো ছিল আলো ছেড়ে অন্ধকারে। আলোর পথে না হেঁটে, হাঁটল ধর্মবিদ্বেষ আর বিভক্তির নর্দমার পথে। তো, সেই ঐতিহ্যের অংশ বাংলাদেশ কেমন করে এগিয়ে যাবে সূর্য মুক্তির পথে? ওয়ালিউল্লাহ জানতেন সেই নতুন পথে হাঁটা সহজ নয়। অস্তিত্বের সন্ধানে

[illegible]দের পক্ষে যে পথে হাঁটা অসম্ভব, তার রাষ্ট্র হাঁটবে কেমন করে সেই মহান আদর্শের পথে? তাই হাঁটতে আজো রাজি নয় কেউ, নয় এই উপমহাদেশ, নয় আতঙ্কের আগ্রাসী এই পৃথিবী। সভ্যতার এই অন্ধকার অবশ্যম্ভাবী অন্ধযাত্রাকেই শনাক্ত করেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তার 'লালসালু' উপন্যাসে।

আগস্ট ২০০৫

চাঁদের অমাবস্যা : ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের আত্মকুণ্ডলায়ন

চাঁদের জোছনা প্রকৃতির এক সৃষ্টি-বিস্ময়। এর রয়েছে প্রতীকী ব্যঞ্জনা। নির্জনতা, রহস্যময়তা, স্বপ্নময়তা, অতীন্দ্র আলো-আঁধারি, ভয়, বিস্ময়, দৃষ্টিবিভ্রম কিংবা পরাবাস্তবীয় চৈতন্য জগতের ব্যঞ্জনা সৃষ্টির করে চাঁদ। মহানৈঃশব্দতা এর মায়াপ্রপঞ্চ। বিপরীত দিগন্তে অমাবস্যা তো অন্ধকারের অতলস্পর্শী কুণ্ডলায়ন। অমঙ্গল, মৃত্যু, বীভৎস, ভয়ংকর, দুর্জ্ঞের ইত্যাদি ব্যঞ্জনা ধরা দেয় এই অন্ধকারে। বস্তুবিশ্বের এই ব্যঞ্জনাবৃত্তের ভেতর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ লিখেছেন তাঁর উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা'।

জোছনা আর অন্ধকার। এই দ্বৈত অভিজ্ঞানের পরস্পর সম্পর্ক দ্বন্দ্বমূলক। এই দ্বান্দ্বিকতা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সত্তায় সৃষ্টি করে নানা অভিঘাত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিঘাতের অস্তিত্ব সংকেটে পতিত ইউরোপ (ধনবাদী) তার অস্তিত্ব রক্ষা কিংবা স্থিরাবস্থা বজায় রাখতে গিয়ে অভিনতুন কিছু নন্দনতত্ত্ব জন্ম দেয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তারই ধারক।

বাংলা উপন্যাসের প্রচলিত প্রথারীতির বাইরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উপন্যাস হচ্ছে 'চাঁদের অমাবস্যা'। এই উপন্যাসের মমার্থ বুঝতে গেলে ওয়ালীউল্লাহর পূর্ববর্তী গল্প-উপন্যাসের সহায়তা অনিবীর্য। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয় 'নয়নচারা' গল্পের বই। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, বিশ্বযুদ্ধ এবং মহাদুর্ভিক্ষ 'নয়নচারা' গল্পের বিষয়ভাবনা। ইউরোপ (পূর্ব) এবং এশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিঘাত ভীত করে ইংরেজ শাসককে। তাই ভারতবর্ষে ধর্মীয় বিভাজন দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিরোধ জরুরি হয়ে পড়ে।

দীর্ঘস্থায়ী শোষণের স্বার্থে বঙ্গ-ভারতের ধর্মীয় সংঘাত এবং ধর্ম-ভিত্তিক রাষ্ট্রভাবনার এক অলীক স্বপ্ন জন্ম দেয় উপনিবেশের ধারক ইংরেজ শক্তি। তাই পরিণামে ঘটে রাষ্ট্রের খণ্ডায়ন। এমন দু'টি রাষ্ট্র জন্ম দেয়া হয় (হিন্দুস্থান-পাকিস্তান) যে রাষ্ট্র তার জনগণের একটি বড় অংশকে হত্যা-নির্যাতনের দ্বারা উচ্ছেদ ও বিতাড়ন করে ধর্ষক আর দখলদারি দস্যুর ভূমিকার অবতীর্ণ হয়। এ

যেন দুই দস্যুদলের গ্রাম দখলের মতো। 'একটি তুলসি গাছের কাহিনী' গল্পের ভেতর সেই দস্যু রাষ্ট্রশক্তির সভ্যতা বিবর্জিত কর্মকেই চিত্রায়িত করেছেন ওয়ালীউল্লাহ।

১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয় 'লালসালু' উপন্যাস । যদিও এই উপন্যাস ব্যক্তি-মজিদ এবং তার অস্তিত্ব বলয়ে আবর্তিত হয়েছে, কিন্তু অন্তরাল সত্যটি হচ্ছে মজিদের প্রতীকের আশ্রয়ে মিথ্যাচারে পূর্ণ শূন্যে ভাসমান একটি ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তান। ধর্মকে আশ্রয় করে অন্তঃসারশূন্য একটি শ্রেণীর উত্থান, তার অবৈধ সম্পদ সংগ্রহ ও শাসক শক্তিতে পরিণত হওয়া এবং পরিশেষে পতন, ইতিহাসেরই অমোঘ পরিণতি।

জমিলা সেখানে প্রতারিত, বঞ্চিত জনগণের প্রতীক। মজিদ জমিলাকে শাসন করে ধর্মের ভয় দেখিয়ে। পাকিস্তানে রাষ্ট্রও জনগণকে শোষণ করে ধর্মের নামে, সব অধিকার কেড়ে নেয় স্রষ্টার ভয় দেখিয়ে। 'লালসালুর' মজিদের পতনের মধ্য দিয়ে ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানের অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য পতনকেই (১৯৭১) ইঙ্গিত করা হয়েছে। মজিদের অস্তিত্ব সংকট আসলে সাম্প্রদায়িক ধর্শরাষ্ট্রেরই অনিবার্য সংকট-পরিণতি। কেননা মজিদের মতোই ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রেণীটির সম্পদশালী হওয়ার পেছনে ছিল ধর্মের নামে লুণ্ঠন।

মজিদের কল্পিত মাজার একদিন যে সত্যের চরম আঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে তা সে জানত। তাই তার রক্ষাকল্পে চেয়েছিল সন্তান বা উত্তরাধিকার। তেমনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধারকরাও জানত মিথ্যার ভেতর চিরদিন এ রাষ্ট্র টিকবে না। তাই সেই শ্রেণীটি চেয়েছিল এমন এক নতুন প্রজন্ম আসুক যারা টিকিয়ে রাখবে এই ধর্মরাষ্ট্ররূপী মাজার।

সম্ভবত 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটি 'লালসালু'র অন্য একটি বৃত্ত। সেই বৃত্তের ভেতর রয়েছে রাষ্ট্রিক অনতিক্রম্য সংকট যা ব্যক্তির অন্তরালে বহমান। আমাদের বিবেচনায় আসতে হবে উপন্যাসটির রচনাকাল। সেই ১৯৬৪ সাল। পেশিশক্তির অধিকারী সেনাবাহিনী আপন রাষ্ট্র পাকিস্তান দখল করে ফেলেছে। গণতন্ত্র পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে। সাম্প্রদায়িক ভয়াবহ দাঙ্গা চারদিকে। দানবের উল্লাস। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানকে ঘিরে গণমানুষের স্বপ্ন ঢাকা পড়েছে অমাবস্যার অন্ধকারে।

ঔপনেবিশক যুগের সেই গ্রাম। মোটকথা নতুন রাষ্ট্রের বয়স ১৬-১৭ বছর হলেও গ্রামের রূপান্তর ঘটেনি চোখে পড়ার মতো। বরং বলা চলে সাদা উপনিবেশের বদলে এসেছে কালো উপনিবেশ– পাকিস্তান, পাঞ্জাবিদের পাকিস্তান। ধর্মই রাজনীতির চালিকাশক্তি। একটা কথা বলে নেয়া ভালো। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কিন্তু এই উপন্যাসটি বাংলাদেশের কোনও গ্রামে বসে লিখেননি। ফ্রান্সের ইউরিয়াজ নামক একটি ছোট গ্রামে বসে লেখা। গ্রামটি পাইন-ফার গাছে বেষ্টিত। আমাদের সাহিত্য সমালোচকরা এখানেই বিভ্রান্তিতে পড়ে যান। তারা ফ্রান্সের এই গ্রামকে বাংলাদেশের গ্রামের চোখ দিয়ে দেখেন।

আসলে অরণ্য-প্রকৃতি ইউরোপের গ্রামের সঙ্গে বাংলাদেশের গ্রামের কোনো তুলনাই চলে না ওসব গ্রামকে ঘিরে শস্যভূমি থাকে না। গৃহপালিত পশুও নয়। শস্যভূমি বা খামার বহু দূরে, অতি আধুনিক জীবনযাত্রার আধুনিক মানুষের বাস ওখানে। হয়তো ওরা কাজ করে আধুনিক কারখানায় বা দূরের শস্যখামারে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সঙ্গে। সেই গ্রাম ওয়ালীউল্লাহর 'চাঁদের অমাবস্যা'র জন্য রেখেছিল নির্জন বনভূমি এবং বনজোছনা। ইউরিয়াজ নামের ইউরোপীয় গ্রামের পরিবেশে বসে লেখা বলেই লেখকের পক্ষে জোছনা আর চাঁদের এই বিস্ময়কর রহস্যময়তা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। দূর দেশের অপরিচিত জোছনা লেখকের কাছে আনন্দের বদলে ধরা দিয়েছে নির্জনতার আধিভৌতিক রহস্য নিয়ে।

তাই উপন্যাসটির শুরু চাঁদের রহস্যময় আলো নিয়ে। চাঁদের এই আলো তো আতঙ্ক শিহরণ তোলে, সৃষ্টি করে নিঃসঙ্গতার অবচেতন যন্ত্রণা। অস্তিত্ব হয় রক্তাক্ত। উপন্যাসটির তলদেশে পৌঁছার আগে আমরা চাঁদের আলোর বিচিত্র ব্যঞ্জনাগুলোকে পর্যবেক্ষণ করব। কেননা এই চাঁদের আলোই উপন্যাসটির ঘটে যাওয়া ঘটনার বহির্বাস্তব এবং অন্তর্বাস্তবের সংকেত ভূমি। 'শীতের উজ্জ্বল জ্যোৎস্না রাত.. চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো...অফুরন্ত জোৎস্নালোকে কোথাও গা ঢাকা দেবার স্থান পায় না...ওপরে ঝলমলে জ্যোৎস্না, কিন্তু সামনে নদী থেকে কুয়াশা উঠে আসছে, মাঠ-ঘাট কুয়াশায় ঢেকে যায়, ওপরে চাঁদের গোলাকার অস্তিত্বের অবসান ঘটে...জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত ধবধবে মাঠে কেউ নেই...চতুর্দিকে জ্যোৎস্নার অপরূপ লীলা-খেলা...।' এমনি অগণন জ্যোৎস্নার চিত্রকল্প রয়েছে উপন্যাসটির প্রথম অনুচ্ছেদে।

আমাদের দৃষ্টির সতর্কতার প্রয়োজন। ওই যে উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক খোঁজার প্রবণতা, তা থেকে হতে হবে মুক্ত। 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের বৃত্তাকারে ঘূর্ণায়মান মূল যে চারটি চরিত্র অমরা পাই তারা প্রত্যেকেই একে অন্যের পরিপূরক। একজন বৃত্তচ্যুত হলে অন্য সবাই মহাশূন্যে হারিয়ে ফেলবে পথ। এই চারজন কারা, কার কী গতি-বলয় তা জেনেই আমাদের রহস্যময় জ্যোৎস্নায় অনুসন্ধান চালাতে হবে।

কে সেই মুরব্বির দাদাসাহেব? তিনি তো ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম সামন্তপ্রভুর অবশেষ। সুরত তার 'দীর্ঘ প্রশস্ত মানুষ, প্রৌঢ় বয়সেও মুখভরা একরাশ দাড়ি। তবে চুল-গোঁফ সুন্নত অনুযায়ী ছোট করে ছাঁটা'। সরকারি চাকরি থেকে অবসার নেয়া মানুষটির মাজহাব-শরিয়তের ব্যাপারে রয়েছে সতর্কতা। চাকরি জীবনে অসুখী জীবন কেটেছে ইংরেজ শাসনে বন্দি দেশে। আশ্চর্য এই যে, লোকটি দাসত্ব মেনে নিতে রাজি স্বধর্মীর, বিধর্মীর নয়। তাই 'পরাধীনতার অবমাননা যতটা তাকে কষ্ট দেয় নাই, ততটা দিয়েছে মনিবের বিধর্মীয়তা'।

বোঝা যায় তিনি হচ্ছেন তাদের প্রতিনিধি, যারা ইংরেজি শিখে স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছিলেন এবং স্বপ্ন ছিল বিশ্ব ইসলামের। তাই সুদূর

িধর্মী রাষ্ট্র আমেরিকায় জনৈক তেজী ধর্মসিক্ত ব্যক্তির আবির্ভাব এবং দেশবাসীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য আহ্বান দাসাসাহেবকে চমকিত করে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের বদলে দরিদ্র কৃষ্ণাঙ্গ হাবসিদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি জেনে তিনি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। কেননা তার স্বপ্নে রয়েছে দূরবর্তী এক দুনিয়া। তিনি বলেন, 'কোথায় না খোদাভক্ত খোদাভীত খোদাপ্রেমিক দীনদয়াময় বীর্যবান মুসলমান ধর্মের পতাকা উত্তোলন করে নাই?'

কিন্তু ওয়ালীউল্লাহর দাদাসাহেব একরৈখিক চরিত্র নন তার মধ্যেও রয়েছে দ্বৈতসত্তা। 'দয়াবান নিষ্ঠাবান সচ্চরিত্র মহৎ খলিফা উমর বা রশীদ মামুনের কথা তুললে ইয়াজিদ-হাজ্জাজ বিন ইউসুফ-মুতাওয়াক্কিলের নৃশংসতাম, হীনতা, বিশ্বাসঘাতকতার কথা ঢেকে রাখা যায় না। কখনও কখনও দাদা সাহেব গভীর দুঃখের সঙ্গে ভাবেন, দ্বিতীয় দলই যেন সংখ্যাগরিষ্ঠ।'

যিনি দ্বিতীয় দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাবেন তার ছোটভাই কাদেরের স্বভাব-চরিত্র কেমন? উগ্র, দুর্দান্ত, তেজী, স্কুল পরিত্যাগকারী কাদের সম্পর্কে দাদাসাহেবের মূল্যায়ন– সে সংসার নিরাসক্ত দরবেশ! অথচ নিষ্কর্মা, অসামাজিক। 'তার মনের পরিচয় পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু তার বাইরের চেহারা স্বভাবত নিদ্রালস।' বিবাহ-বিরোধী কাদের মত পাল্টে বিয়ে করে। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক উত্তাপহীন। কাদের চরিত্রের জটিলতা ঘনীভূত হয় অদৃশ্য রহস্যময় এক বুজুর্গকে জড়িয়ে। আসলে কে সে? মধ্যরাতে যার ডাক শুনে ঘর ছেড়ে কাদের বেরিয়ে যায়, সে কি অশরীরী? 'কাউকে দেখতে পেল না....
সাক্ষাতও হল না। তারপর সে হাঁটতে থাকল।....পরদিন সকালে যখন সে ঘরে ফেরে, তার মুখ ফ্যাকাসে, রক্তহীন, কিন্তু চোখে অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি।'

আসলে কে সে? বুজুর্গের আড়ালে কোন রমণী নয় তো? আর কাদের বড়শি নিয়ে পুকুধারে কেন সারাদিন বসে থাকে? একটি বাঁজা যুবতী-বৌ এবং তার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এসবের কি কোনও যোগসূত্র আছে?

কাদের হচ্ছে নব্যস্বাধীন রাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রজন্ম। সে হচ্ছে ধর্মাশ্রয়ী ধূর্ত ছদ্মবেশী শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধি। সেই শ্রেণী তো শ্রমবিমুখ, অলস, বর্ণচোরা, আধিপত্যকামী, গণতন্ত্রবিরোধী, দেশ লুণ্ঠনকারী এবং গণনির্যাতনকারী শক্তি। কাদের তো হত্যাকারী, সম্ভোগবাদী, কামকাতর, দরবেশী মুখোশপরা সমকালের নীতিহীন শাসকশ্রেণীর প্রতিভূ।

নিহত যুবতীটি কে? সে হচ্ছে দিনমজুর হতদরিদ্র মাঝির স্ত্রী, কিন্তু বাঁজা। প্রকৃত অর্থে এই যুবতী হচ্ছে তৎকালের বাংলাদেশের প্রতীক। যে নিষ্ফলা, যাকে করা হয়েছে সম্ভোগের উপকরণ, যে প্রতারিতা প্রেমের নামেতে। ধর্মরাষ্ট্রের প্রতিভূ কাদের তাকে ভোগ করে এবং হত্যাও করে। এ যেন ধর্মাশ্রয়ী, গণতন্ত্র হরণকারী সামরিক শাসকশ্রেণীর রক্ষিতা এই পূর্ববাংলা।

অন্যাদিকে কী পরিচয় যুবক স্কুলমাস্টার আরেফ আলীর? পরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে সামান্য বেতনের চাকরিজীবী দুর্বলচিত্তের '৫০-৬০ দশকের বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি নয় কি আরেফ আলী? আর এই যে চরিত্রের ভেতর প্রতীকী জগৎ, তাকে নিয়েই 'চাঁদের অমাবস্যা' ক্রিয়াশীল।

আরেফ আলী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। শ্রেণী হিসেবে তাদের উত্থান-পতন এবং স্বপ্ন-বাসনাকে চরিতার্থ করার ভূমি হচ্ছে গ্রামসদৃশ্য একটি দেশ– বাংলাদেশ। 'লালসালু' উপন্যাসে এই মধ্যবিত্তকে ওয়ালীউল্লাহ শনাক্ত করেছেন এভাবে, 'বাইরে বিদেশি পোশাক, মুখমণ্ডলও মসৃণ। কিন্তু আসলে মুসলমান। কেবল নোতুন খোলসপরা নব্যশিক্ষিত মুসলমান।' কী আশ্চর্য! একথা কেবল মুসলমানের বেলায়ই সত্য নয়, হিন্দুর বেলায়ও। উনিশ শতকি নব্যশিক্ষিত হিন্দুসমাজও তাই। হিন্দু কি মুসলমান, এ হচ্ছে শিক্ষিত বাঙালির স্বরূপ। ভেতরের গোপন চেহারাটি।

এই যে শ্রেণী, যার অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই, যার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে ১৯৪৭ (কিংবা ১৯৭১) সালের ব্যর্থ রাষ্ট্র আর শোষক রাষ্ট্রের দাপটে, সঙ্গত কারণেই তার মানসজগৎ গঠিত হয়েছে অবাস্তব মায়াবি জোছনার ছায়ায়। 'শীতের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাত। তখনও কুয়াশা নামে নাই। বাঁশঝাড়ে তাই অন্ধকারটা তেমন জমজমাট নয়। সেখানে আলো-অন্ধকারের মধ্যে যুবক একটি যুবতী নারীর অর্ধউলঙ্গ মৃতদেহ দেখতে পায়।'

যুবক শিক্ষক আরেফ আলী অর্থাৎ নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত আশাভঙ্গ শ্রেণীটির জীবন শুরু হয় ঠিক এই বিস্ময়, ভয়, কুয়াশা আর দার্শনিক পরাবাস্তব চাঁদের আলোর রহস্যের ভেতর দিয়ে। ওয়ালীউল্লাহ্ ভয়ার্ত শ্রেণীকে এভাবেই সামনে দাঁড় করান যেখানে মৃত নারীটি হয়ে উঠে নিহত মাতৃভূমির প্রতীক। 'তখন সে (শিক্ষক) উদভ্রান্তের মতো ছোটাছুটি করছে...কেবল একটা দুর্বোধ্য নির্দয় তাড়না বোধ করে বলে দিশেহারা হয়ে অবিশ্রান্তভাবে মাঠে-ঘাটে ছোটাছুটি করে, অফুরন্ত জ্যোৎস্নালোকে কোথাও গা-ঢাকা দেবার স্থান পায় না, আবার ছায়াছন্ন স্থানে নিরাপদও বোধ করে না।'

আসলে নব্যশিক্ষিত শ্রেণীটির সামনে আত্মবিকাশের কোনও পথ খোলা থাকে না। একদিকে ধর্মে আশ্রয়, অন্যদিকে সামরিক একনায়কতান্ত্রিক অগণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানুষের মুক্তির সব দুয়ারই থাকে বন্ধ। জীবন পদে পদে ভয়তাড়িত। জীবনকে আঁকড়ে ধরে দুঃস্বপ্ন। তাই যুবক শিক্ষকের কাছে জোছনা রাতের নদীর কুয়াশাকে মনে হয় অতিপ্রাকৃত জগৎ। 'কুয়াশা না আর কিছু, হয়তো সে ঠিক বোঝে না। হয়তো একদল সাদা বকরি দেখে, যার শিং-দাঁত-চোখ কিছুই নেই।'

যুবকের মনের ভেতরের অচেনায় অন্ধ জন্তুটি হচ্ছে চরম নৈরাশ্যের অনতিক্রম্য জটিল বাস্তবতা। এমনটিও আমরা কল্পনা করতে পারি, সেই মৃত অর্ধউলঙ্গ যুবতী হচ্ছে সেই যুবকের পাথর চাপাপড়া অতৃপ্ত-অপ্রাপ্য-অচরিতার্থ

কাম-চেতনা। কেননা তার অর্থনৈতিক এবং পারিবারিক জীবন তো সুস্থ যৌনজীবন প্রাপ্তির সম্ভাবনাকেও অবরুদ্ধ করে রেখেছে। যে চেতনা-জগতের ঘোরে পড়ে যুবক শিক্ষক নির্জন রাতের জোছনার মায়াবি আকর্ষণে বাঁশবনে প্রবেশ করে তা ব্যাখ্যাতীত নয়।

'আলো-আঁধারের মধ্যে একটি যুবতী নারীর মৃতদেহ। অর্ধ-উলঙ্গ দেহ, পায়ের কাছে একঝলক চাঁদের আলো।' নারীর মৃতদেহ আর চাঁদের আলোর বিপরীতার্থক চরম দ্বান্দ্বিক বাস্তবতাটির ব্যাখ্যা হতে পারে যুবকটির অসুখী জীবনের মায়াজাল। পরক্ষণেই যখন সে হত্যাকারী কাদেরকে সামনে দেখে তখন তার অবস্থাটা দাঁড়ায়, 'মুখে চাঁদের আলো তবু তার (কাদেরের) চোখ দেখা যায় না।' দেখার কথাও নয়, কেননা কাদের তো রাষ্ট্রক্ষমতা দখলদারের অন্ধ দানব শক্তির প্রতিভূ।

আমাদের অনুসন্ধানের জগৎ আরও দূরবর্তী গভীরে। দেখা যায় স্কুলশিক্ষক যুবক হত্যাকারী কাদেরকে নির্দ্বিধায় পাপ গোপন করতে সহায়তা করে। সে তার আজ্ঞাবাহীর মতো বাঁশবনে ঢুকে যায় লাশ তুলে নিতে। 'একটি দুর্বোধ কিন্তু দুর্লংঘ্য আদেশে অন্ধের মতো সে এগিয়ে যায়।' যুবতীর লাশটি দু'জন বয়ে নিয়ে যায় নদীতে এবং ডুবিয়ে দেয় তা গভীর পানির তলায়। এখানে স্কুলশিক্ষকের আচরণ ক্লীব দাসস্যদাস মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এই শ্রেণীয় তো শাসক-শোষক শ্রেণীর কৃপাধন্য সহায়ক শক্তি। ঘটনার পর স্কুলশিক্ষকের অন্তরে যে পীড়ন-আন্দোলন তৈরি হয় তা মধ্যবিত্তের দ্বান্দ্বিক চরিত্রের জট পাকানো চেতনার নিদর্শন।

সামরিক শাসনের ভেতর রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি অনুগত সুখ-শান্তি সন্ধানী মধ্যবিত্ত তো ছিল পলায়নবাদী। ঠিক যেন বাস্তব সত্যের ভেতরও অসত্যের সন্ধান করে। আত্মবিশ্বাস-শূন্য চেতনার ভেতর সব সত্যই অবাস্তব হয়ে যায়। যুবক শিক্ষকের কাছে এক সময় তাই মনে হয়, যে বিস্ময়কর ঘটনাগুলো ঘটে গেছে তা বুঝি অবাস্তব। ' সে আবার এমন একটি গুহায় প্রবেশ করেছে যেখানে জনমানব পশুপাখির আওয়াজ পৌঁছায় না। তখন বাইরে যেন জীবনের অবসান ঘটে, সারা পৃথিবী নির্জনতায় খাঁ খাঁ করে।'

এই নির্জনতা, জীবনের অবসান অর্থাৎ শ্রেণীগত নির্দ্বন্দ্ব সমাজব্যবস্থার অন্ধকারেই যেন এই শ্রেণীটির আশ্রয়-সুখ। কেবল তাই নয়। এক সময় যুবক শিক্ষকের মনে হয় হত্যাকারী হলেও কাদের দায়াবান-বিবেকবান-মহৎ চরিত্রের অধিকারী, কেননা সে উলঙ্গ নিহত মেয়েটিকে সামাজিক লজ্জা ও নিন্দার হাত থেকে রক্ষার জন্য নিখোঁজ করে দিয়েছে নদীর অতলে। মেরুদণ্ডহীন মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের এই মানস শোষক-শাসকের প্রতি, ক্রীতদাসের প্রভুর প্রতি মহিমা-মুগ্ধতারই দৃষ্টান্ত।

কাদেরের সঙ্গে অসহায় দরিদ্র যুবতী বৌটির যে প্রেমহীন যৌনসম্পর্ক গড়ে ওঠে তার পেছনের মোটিভ উপন্যাসে অস্পষ্ট রয়ে গেছে। বাঁশঝড়ের

বাইরে অপ্রত্যাশিতভাবে যুবক শিক্ষকের অস্তিত্বের আলামত পেয়ে যুবতীর মুখের আওয়াজ বন্ধ করার জন্য কাদের গলা টিপে ধরেছিল– তাতেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তার মৃত্যু ঘটে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মেয়েটির মুখের আওয়াজের উদ্দেশ্য কী ছিল? এ কি কাম-উত্তেজনার শীৎকার বা রমণকালীন ধ্বনি, নাকি ইচ্ছাবিরোধী যৌন নির্যাতনজনিত যন্ত্রণার আওয়াজ? কেননা পাঠক জানতে পারে না কাদেরের সঙ্গে যুবতী মেয়েটি স্বেচ্ছায় নাকি পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়েছিল যৌনসম্পর্ক গড়তে? সে তো দরিদ্র ঘরের বৌ। সমাজ বা রাষ্ট্র তার প্রতিপক্ষ। যুবতী তো প্রাণ দেয় কাদেরের পরিবারকে নিষ্কলঙ্ক রাখতে, তথাকথিত ধার্মিকতার সুনাম রক্ষা করতে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এই তো নিয়তি। ওরা তো জন্মজন্মান্তর শোষিত হয়ে আসছিল হিন্দু জমিদার জোতদারদের দ্বারা। তাদের মুক্তির মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়েছিল ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তান। ওখানে নয়া প্রভু– ধর্মে কেবল আলাদা। জাতিতে এক– শোষক। ওরা তো তাদের সেবাদাস, যৌনদাসী মাত্র।

দোদল্যমান চরিত্রের মেরুদণ্ডহীন মধ্যবিত্ত শিক্ষকের এমনটা মনে হতেই পারে, যুবতীর মৃত্যুর জন্য সে-ই দায়ী, কেন না বাঁশঝারে সে উপস্থিত না হলে দুর্ঘটনাটি ঘটাত না। এই পাপবোধ থেকেই মৃতদেহ বহনের কাজে সে কাদেরকে সহায়তা করেছিল। তাছাড়া অপরাধ গোপন এবং শাস্তি থেকে রক্ষারও এটি একমাত্র উপায়। কেননা এতে মূল অপরাধী ও তার নাম গোপন থাকবে।

এখানে রাষ্ট্রশক্তির কোন কৌশল স্পষ্ট হয়ে উঠে? রাষ্ট্রশক্তি সর্বদাই দালাল-সহযোগী হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে পাশে টানে। তাদের শেকল-পরায় যেন প্রান্তিক-শ্রেণীর ক্ষোভে-বিদ্রোহে এই শ্রেণীটি অংশগ্রহণ না করতে পারে। এ কথাা চরম সত্য যে, শোষকশ্রেণী চিরকাল আপন দুষ্কৃতির প্রমাণ ধ্বংস করতে শ্রেণী হিসেবে মধ্যবিত্তের সহায়তা নিয়ে থাকে।

মধ্যবিত্তের মানসজগতের গঠন এতই এলোমেলো বিশৃঙ্খল যে তার কোনও সুস্পষ্ট-সুনির্দিষ্ট গতিপথ নেই। ন্যায়-অন্যায়ের আত্মদ্বন্দ্বেও সে যে পরিশেষে ন্যায়ের পক্ষে আসতে চায় তা তার আত্মভীতি ও আত্মযন্ত্রণা লাঘবের প্রয়োজনে। অর্থাৎ সব প্রক্রিয়াই ভয়জাত। তাই যুবক শিক্ষক হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি ফাঁস করে দিয়ে আত্মরক্ষা করতে চায়, কিংবা যন্ত্রণার মানস আন্দোলন থেকে চায় প্রশান্তির মুক্তি।

আমরা যুবতী নারীর মুখের শব্দ বা চিৎকারের ব্যাপারটি নিয়ে আরও গভীরে যেতে পারি। উপন্যাসে বলা হয়েছে, 'বাঁশঝাড়ের বাইরে মানুষের আওয়াজ শুনতে পেলে কাদের ভেবেছিল হয়তো যুবতী নারীর স্বামীই তার স্ত্রীর সন্ধানে এসেছে। এবার যুবতী নারী চিৎকার করে উঠলে সে নিদারুণ ভয়ে দিশেহারা হয়ে যুবতী নারীকে চুপ করার জন্য তার গলা টিপে ধরে। প্রাণের

জন্য যুবতী নারী যতই ধ্বস্তাধ্বস্তি করে ততই দিশেহারা কাদের তার হস্তবন্ধন শক্ত করে। শীঘ্র যুবতী নারীর জীবনাবসান ঘটে।'

এই বর্ণনা আমাদের নানা প্রশ্নের সামনে দাঁড়া করার। যে যুবতী নারী প্রায় প্রতি রাতে নির্জন এই বাঁশবনের ভৌতিক পরিবেশে একটি পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয় স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে, সে ভীতু নয়, বরং সাহসী। ভিন্ন মানুষের আলামত পেয়ে সে চিৎকার করবে, এমনটা হতে পারে না। তাছাড়া এই অবস্থায় নিশ্চুপ থাকা যে জরুরি এই সাধারণ বুদ্ধিটা তার ছিল অবশ্যই।

মনে হয় কাদেরের সঙ্গে তার সম্পর্কটা স্বেচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়ে। সে তো দুর্বল-দরিদ্র মাঝির বৌ। প্রতিরোধের ক্ষমতা নেই। হয়তো সে চেয়েছিল চিৎকার দিয়ে অপরাধী কাদেরের চরিত্রকে দুনিয়ার সামনে উন্মোচন করে দিতে। চিৎকারটা তার ভয়ের নয়, বরং নারীমাংস লোভীর হাত থেকে আত্মরক্ষার একটা কৌশল। তাছাড়া ব্যাপারটি বুঝতে পেরেই দিশেহারা কাদের নিজের অপরাধ গোপন করার জন্য মেয়েটিকে খুন করে। খুনটা দুর্ঘটনা নয় মোটেই, এটা প্রমাণ হয় নদীতে লাশ ফেলে দেয়ার মোটিভ থেকে।

যুবক শিক্ষক আরেফ আলী যে ব্যক্তিত্বহীন, পরাশ্রয়ী দুর্বল প্রাণীমাত্র তা লেখক স্পষ্ট করে দিয়েছেন, 'যুবক শিক্ষক মেরুদণ্ডশূন্য ব্যক্তি।' যতটা না ন্যায়বোধ, তার চেয়ে তাড়না ছিল তার আত্মরক্ষার জন্য ঘটনাটি ফাঁস করে দেয়া। কিন্তু পরিণাম যে ভয়ংকর তাতেই সে ভীত। যার আশ্রয়ে জীবন কাটছে তার, সেই বৃদ্ধ দাদাসাহেবের করুণা থেকে বঞ্চিত হতে হবে তাকে, হারাতে হবে স্কুলের চাকরি। তার পায়ের নিচের পৃথিবী অর্থাৎ অস্তিত্ব হয়ে যাবে বিলীন।

সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি ন্যায়-অন্যায় বোঝে, কিন্তু স্বাথ হারাবার ভয়ে থাকে শংকিত এবং আত্মসমর্পিত। যে শ্রেণীটি তাদের লালন-পালন করে তাকে আঁকড়েই বাঁচতে চায় মধ্যবিত্ত। এ তার শ্রেণী-ধর্ম, শ্রেণী-দর্শন। শ্রেণীর এই বৃত্ত ভাঙা সহজসাধ্য নয় মোটেই।

নীতি-আদর্শহীন একটি মধ্যযুগীর ধ্যান-ধারণার ভেতর মানুষ আকারে-প্রকারে কতটা খাটো হয়ে যায়, তার প্রমাণ যুবক শিক্ষক। সত্যের সামনে দাঁড়াতে যে মেরুদণ্ডের প্রয়োজন, রাষ্ট্রব্যবস্থা তো তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। তাই যুবক শিক্ষকের– 'বিবেক বলে, কথাটি প্রকাশ করা তার কর্তব্য, কিন্তু কাজটি তার কাছে দুষ্কর মনে হয়। সে দুর্বল মানুষ। মানসিক দ্বন্দ্বটি অসহ্য হয়ে উঠলে সে একটি পলায়নপথ আবিষ্কার করে; স্বপ্নরাজ্যে সে আশ্রয় গ্রহণ করে।'

এই যে স্বপ্নরাজ্য এবং শিক্ষকটির নিজের সঙ্গে নিজের সংঘাত, সে সেখানে নিজেকেই নিজে রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত করে। আত্মপ্রবঞ্চকের মতো হত্যাকারী কাদেরের দোষমুক্তির ভেতর আপন মুক্তি খোঁজ। কেননা শেকড়হীন এই মধ্যবিত্ত জানে আশ্রয়দাতা পরিবারের সদস্য কাদেরের উন্মূলের ভেতর

নিজেও অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে গাছের সঙ্গে পরগাছার ভূ-লুণ্ঠনের মতো। সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কাদের যখন তাকে ভয় দেখায়, তখন যুবক শিক্ষক বুঝতে পারে পালাবার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। সে তো দরিদ্র শিক্ষক। দাদা সাহেবের মতো ধনী ও আশরাফ ব্যক্তির দয়ায় 'সুখের আস্বাদ পেতে শুরু করেছে। তার ব্যক্তিগত দারিদ্র্যই যে শুধু ঘুচছে তা নয়। সে তার বিধবা মা এবং তার মুখাপেক্ষী দুটি ভাইবোনকেও খাওয়াতে-পরাতে পারছে।' এতে স্পষ্ট হয়ে যায়, দারিদ্র্য যে কত শক্তিশালী-ক্ষমতাবান। দানবশক্তি দারিদ্র্যের তুলনায় যুবক শিক্ষক ধূলিকণার মতো। আকারে তো বটেই, প্রকারেও।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পরক্ষণেই ভয়ংকর এক সত্যকে উন্মোচন করেন আমাদের সামনে। মিথ্যার কাছে, অন্যায়ের কাছে মধ্যবিত্ত কীভাবে নির্লজ্জের মতো আত্মসমর্পণ করে তা লেখক যুবক শিক্ষকের চেতনার ভেতর দেখিয়ে দেন। 'হোক তার (কাদেরের) অতি গুরুতর অপরাধ বা যুবতী নারীর সঙ্গে তার সম্পর্কের কারণ পশুবৎ বাসনা। হোক সে নির্মম-নির্দয় মানুষ, তবু সে যুবক শিক্ষকের কোনও ক্ষতি করে নাই। তাছাড়া কাদের তার বন্ধু না হোক, সে তার শত্রুও নয়; তার প্রতি সে হিংসাদ্বেষ বা প্রতিহিংসার ভাব বোধ করে না। কাদেরের সঙ্গে লড়াই করে তার কী লাভ হবে, কারই বা সে মঙ্গল করবে?' শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির অন্তঃস্থ গভীরের অন্ধকার এবার এভাবেই উত্তপ্ত ধোঁয়ার মতো চারদিক ছড়িয়ে পড়ে।

উপন্যাসটির পরিণতি কী ঘটবে তা প্রথম অনুচ্ছেদে চাঁদের আর মৃত নারীর অভিব্যক্তিই প্রকাশ করে দেয়। অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দায়ভাগ যে বিত্তহীন (নিহত নারী) আর মধ্যবিত্তকে (স্কুল শিক্ষক) কাঁধে তুলে নিতে হয় 'চাঁদের অমাবস্যা' তার দৃষ্টান্ত। হত্যাকারী অপরাধী পায় নিস্কৃতি, পরিণতি ভোগ করে মেরুদণ্ডহীন মধ্যবিত্ত স্কুলশিক্ষক।

থানা-পুলিশ-আদালতের উদ্দেশ্যে দৌড়ায় শিক্ষক আরেফ আলী। পুলিশের সামনে সত্য উন্মোচনে ব্যর্থ হয় সে, মিথ্যাটাই সত্য হয়ে পেঁচিয়ে ধরে তাকে।' সে ছুটতে শুরু করে। হাঁটার ভঙ্গিতে চললেও আসলে সে দৌড়াতেই থাকে। টিনের সুটকেসটি সশব্দে হাঁটুতে বাড়ি খায়।' এ যেন সত্য আর ন্যায়বিচার প্রত্যাশার নামে পবিত্র-পাপীর বধ্যভূমির দিকে ছুটে যাওয়া। আপন শির কর্তনের তরবারি রয়েছে নিজেরই হাতে।

চাঁদের অমাবস্যা। আলোহীন অন্ধকার। অসীম মহাশূন্যের অনন্ত অন্ধকার। এখানে কুণ্ডলায়িত সাপের শরীরের মতো শীতল ঘন অন্ধকার ব্যক্তিকে এবং রাষ্ট্রকে গ্রাস করেছে। শ্রেণীর দুঃশাসন বন্দি-মানুষের চেতনার ভেতর অস্তিত্বভীতির অমাবস্যাকে পাথরচাপা দিয়ে রেখেছে। মুক্তির প্রত্যাশা কেবল স্বপ্ন।

স্বপ্নভঙ্গের নতুন রাষ্ট্রে ব্যক্তি যে অস্তিত্বের জটিল দ্বন্দ্বের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত, সে যে আত্ম-আবিষ্কারে ব্যর্থ, তারই প্রতীক স্কুলশিক্ষক আরেফ আলী। ধর্মাশ্রয়ী স্বৈরাচারী মুখোশ পরা দুশ্চরিত্র রাষ্ট্রশক্তি কীভাবে সম্পদহীন দরিদ্র জনগণের স্বপ্নময় জীবনকে ধর্ষণ শেষে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে, তারই প্রমাণ বাঁশবনের জোছনার আলো-আঁধারির জটিল রহস্যে নিহত রমণী।

এখানে জীবন অস্তিত্বের অন্ধকারে পতিত, আতঙ্কিত, বহির্চেতনা রহিত জটিল অন্তর্চেতনায় বিভ্রান্ত। অন্ধকার এতটাই গভীর এবং পাথুরে শীতল যে, সত্যের চৈতন্যও ঢাকা পড়ে যায়। সত্য ধ্বংসকারী শাসকশ্রেণী আড়ালে পড়ে যায়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে দুর্বল শ্রেণী। তাই এই উপন্যাস একটি জাতির রক্তে ভেজা কর্দম পথে অন্ধকার বৃত্তে ঘূর্ণায়নের শিল্পরূপ। ঔপনিবেশিদক যুগ থেকেই যায়, অভিযাত্রার রক্তাক্ত অন্ধকার পথ আর ফুরোয় না। কুণ্ডলায়িত অন্ধকার রাষ্ট্র আর ব্যক্তির অস্তিত্ব কেবলই দীর্ঘায়িত হয়।

এত কিছুর পরেও বলতে হয়, উপন্যাসে স্কুল শিক্ষকের মনোবিশ্লেষণে একই পরিস্থিতির পৌনঃপুনিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি এর গতিকে ব্যাহত করেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাক্যের শব্দব্যঞ্জনায় কৃত্রিমতা সৃষ্টি হয়েছে। তবু চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ, পরিবেশ বর্ণনা এবং গদ্যের ব্যঞ্জনাত্মক ধ্বনি নির্মাণের এমনি দক্ষতার নিদর্শন বাংলা উপন্যাসে দ্বিতীয়টি আছে বলে মনে হয় না। এখানেই 'চাঁদের অমাবস্যা' ও তার স্রষ্টা অদ্বিতীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর গদ্যশৈলী।

অক্টোবর-২০০৪

তারাশঙ্করের হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : সীমানা ভাঙার শৈলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' রচনা করে প্রচলিত বাংলা উপন্যাসের মধ্যবিত্ত মানসজাত বৃত্তাবদ্ধ সীমানাই ভাঙেননি, শৈলীর অভিনতুন কলাকৌশলের সূত্রও আবিষ্কার করেছেন। বস্তুবিশ্ব, কালাধার, মানব জীবনের জটিল অসামঞ্জস্য, ভ্রম-প্রপঞ্চ, পতন-উত্থান, অস্তিত্ব অভিঘাতের এমন ঔপন্যাসিক শিল্প তিনি নিজে তো বটেই, পরবর্তী সুদীর্ঘ সময়কাল গতিতে অন্য কারো পক্ষে দ্বিতীয় নির্মাণ আজো অসম্ভব হয়ে রইল। বিষয়ানুগ গদ্যরীতির বস্তু-তন্ত্রীয় এমন দৃষ্টান্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কোনো অসম্ভব হয়ে রইল, সে এক বিস্ময় বটে।

মার্ক্সীয় বিজ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধিবাদ বিরোধী তথাকথিক দলিত সাহিত্য তত্ত্বটি কি? একমাত্র দলিত শ্রেণীই এ সাহিত্য সৃষ্টির আধিকারিক, অন্য কোন জনগোষ্ঠীর কেউ নয়। এ কোন যুক্তি হলো? তবে তো কেবল হিন্দু সমাজ নিয়ে হিন্দুরা, মুসলিম সমাজ নিয়ে মুসলমানেরা, খ্রিস্ট সমাজ নিয়ে খ্রিস্টানেরা, গ্রাম্য কৃষক সমাজ নিয়ে কৃষকেরাই লিখবেন। শ্রমিক শ্রেণী নিয়ে শ্রমিক ভিন্ন, নারীদের নিয়ে নারী ছাড়া, পুরুষদের নিয়ে পুরুষ ছাড়া, রাজনীতি নিয়ে রাজনীতিবিদ ভিন্ন লিখবার বলবার কারো কিছু অধিকার রইল কি? আসলে এ তত্ত্ব হীন– উদ্দেশ্যবাদী, বর্ণবাদী, সাম্প্রদায়িক, ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বছাড়া কিছুই নয়। শিল্পের অধিকারে বিচ্ছিন্নতাবাদী আর সংঘাত সৃষ্টির এ তত্ত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান-মনুষ্যত্ব বিরোধী। সাহিত্য-শিল্প বিরোধী তো বটেই।

অতি আধুনিক বাংলা উপন্যাস তথা কথাসাহিত্যে লাতিনীয়, আফ্রিকী, ক্যারেবিয়, রূপ-রীতির অন্ধ অনুকরণে আঞ্চলিক-প্রান্তিয় উঁচু সমাজবৃত্ত বহির্ভূত গ্রাম্য কৃষক, ব্রাত্য, দলিত জীবন ও জীবিকার বাস্তব কিংবা স্মৃতিবাহী আদি অকৃত্রিম নানা অনুষঙ্গ এসেছে। কিন্তু কাল-কালান্তর ধরে অনড় যাপিত জীবনের অপরিহার্য অবশ্যসম্ভাবী সুপ্রাচীন জিনবাহী ভাষার শব্দ সংযোগে বাক্য-ভাব-ব্যাখ্যার সাহিত্য কোথায়? হ্যাঁ, মাত্র একটি। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'।

এপার-ওপার বাংলা সাহিত্যে অপভাষার (অশ্লীল) যথেচ্ছ অপপ্রয়োগ হয়েছে। কিন্তু যে জীবনের সঙ্গে এসব ভাষারীতির দিনযাপন, যে জীবন তো মধ্যবিত্ত লেখকের শিল্প আকাঙ্ক্ষা পূরণের ভাবালু কল্পনা-প্রিয় বিলাসী নাগরিক ইয়ার্কি ঠাট্টায় নিখোঁজ হয়ে গেছে। তথাকথিক ইতর জনের যা অপরিহার্য প্রাণবায়ু তা কি লেখকের শিল্প-উপভোগ! শিল্পের নামে সেই উপভোগকে কি ফর্ম ভাঙার নির্মাণ-বিনির্মাণ বলে? দরিদ্রের, অশিক্ষিতের বঞ্চিতের অপভাষা তো মধ্যবিত্তের সাহিত্য সৃষ্টির নামে মনস্তাত্ত্বিক সম্ভোগের বিষয় নয়। অপভাষা তো ঈশ্বরের ভাষা নয়। এর উৎসস্থল হচ্ছে সোঁদা মাটি এবং মানুষের নোনা স্বেদবিন্দু। ভাষার কৃত্রিমতা কি অপভাষার প্রয়োগে ভাঙে? নতুন গদ্যরীতি কি কেবল অপশব্দ নির্ভর? ভাষা স্রোতস্বতী হয় তখনই, যখন অপভাষা তার উৎসস্থলের শিল্প ব্যাখ্যা বা জীবনের আর মানব চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক অভিক্রিয়ায় বিদ্যুৎ শিহরণ জাগাতে সক্ষম হয়।

বাংলা সাহিত্যে একমাত্র তারাশঙ্করই সে কাজটি করেছেন খিস্তি খেউড় বা অপভাষা প্রয়োগ না করেও। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' রচিত হয় ১৯৪৬ সালে এবং প্রথম প্রকাশ ১৯৪৭। এই উপন্যাসটির অন্তপ্রবাহে পৌছার সিঁড়ি হচ্ছে তারাশঙ্করের নিজের কণ্ঠস্বর, "এই দলকে (বাম রাজনৈতিক) সমর্থন যতক্ষণ যিনি করবেন, ততক্ষণ তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় এঁরা পঞ্চমুখ হবেন; এবং সমর্থন করা যে মুহূর্তে বন্ধ করবেন, সেই মুহূর্তেই তাঁর অভিধা হবে প্রতিক্রিয়াশীল। এবং কদর্য ভাষায় রূঢ় সমালোচনায় তা প্রতিপন্ন হবে।" এ বক্তব্যের বাস্তবতা যে কবল বামদের বেলার সত্য তা নয়, ডানদের বেলায়ও। দলবাজীর কারণে প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যও বামপন্থীদের আপন হয়ে ওঠে, ডানপন্থী সাহিত্য ও ডানপন্থীদের অপাংক্তেয় হয়ে যায়।

মোটকথা 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' স্নিগ্ধতাশূন্য, পাঠক মনে আনন্দ সৌন্দর্য দানে গররাজি, বরং ভীতি সঞ্চারক, ভীতৎসতা এবং ভয়ংকর শিহরণ সঞ্চারী। উপন্যাসটিতে বর্ণিত ভয়ংকর বিষধর সাপের মধ্যে যে ঐশ্বরিক ক্ষমতা এবং বীভৎস সৌন্দর্য দেখা যায়, সেখানে লেখক সেই আদিম জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব-বিশ্বাসের সঙ্গে একাকার হয়ে যান। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান যে বহুমাত্রিক দ্বন্দ্বের সংবাদ দেয়, তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে তা প্রত্যক্ষ করিয়েছেন পাঠককে। সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া, বাঁক বিবর্তনকে তিনি নিঃশব্দ-নির্বিরোধের দৃষ্টিতে দেখেননি। একটি অবক্ষয় এবং অন্যটির উত্থানে তিনি বিস্মিত হননি, ঐতিহাসিক সত্য বলেই বিশ্বাস করেছেন।

আমাদের পূর্ববঙ্গীয় (বাংলাদেশ) নগর বহির্ভূত প্রান্তবাসী গ্রাম জীবনের উপন্যাস পাঠের বৃত্তমুক্তি ঘটিয়েই হাঁসুলী বাঁকে ঢুকতে হবে। প্রাচীন বঙ্গীয় জনপদ রাঢ় ভূমি অর্থাৎ বীরভূমের ভৌগোলিক প্রকৃতি, জনসংস্কৃতি বা মনোমতির স্পষ্ট ধারণার ভিতর দিয়েই হাঁসুল বাঁকের মহাকাব্যে দৃষ্টি দিতে

হবে। এ যেন এক স্বতন্ত্র ভূমি, আলাদা মানবজীবনের 'উপকথা'। তাই লেখক গোড়াতেই পাঠককে তৈরি করে নিতে চান।

এ মাটি নরম সরস পলি নয়, রুক্ষ। মানুষও সামজ বিন্যাসে নিম্নবর্গ, সংস্কৃতি লৌকিক প্রাকৃত। তারাশঙ্কর সে কারণেই উপন্যাসের শুরুতে পূর্ববঙ্গের দারোগা বাবুর প্রসঙ্গটি এনেছেন। পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন হাঁসুলি বাঁক নদীর দেশ নয়, বারোমাস জল টলমল করে না পূর্ববঙ্গের মতো। নৌকাও চলে না। "হাঁসুলী বাঁকের দেশ' আলাদা। সেই হাঁসুলী বাঁকের দেশ কড়াধাতের মাটির দেশ। এদেশের নদীর চেয়ে মাটির সঙ্গেই মানুষের লড়াই বেশি। 'খরা' অর্থাৎ প্রখর গ্রীষ্ম উঠলে নদী শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যায়।"

নদীমাতৃক সবুজ ফসলের দেশ বাংলাদেশের জনসংস্কৃতি, বাঙালি মানস, তাদের লোকজ জীবনের উৎসস্থল নদীবিধৌত পলিমাটির প্রকৃতি। এটি সমাজ ও নৃতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত সূত্র। কিন্তু খরা আর শুকনো রুক্ষ মাটির দেশ হাঁসুলী বাঁক কী এই বৈপরীত্বের ভেতর পূর্ববঙ্গীয় লোকমানসের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়? কি করে সেখানে শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার তীর্থভূমি তৈরি হয়? সেই মাটিতে কী করে জন্ম নেন চরম ভাববাদী-ভক্তিবাদী বৈষ্ণব পদকারগণ? বড়ু চণ্ডীদাস কিংবা জয়দেব কোন মাটির রসের রসিক? এসব প্রশ্ন আমাদের পূর্ববঙ্গীর লোকমানসের গঠন উপাদানের স্থিরকৃত নির্ধারিত প্রশ্নের সামনে ঠেলে দেয় না কি?

হাঁসুলীবাঁকের ইতিহাস আছে, তার ভূগোলও আছে। বিচিত্র চরিত্রের কোপাই। সে পাহাড়িয়া নদী, নিজের বাঁক দিয়েই বানায় হাঁসুলী গহনা। সেই বাঁকে বা গহনায় বন্দী 'বাঁশবাঁদি' গ্রাম, 'জাঙল' গ্রাম। বাঁশবাঁদি হচ্ছে ব্রাত্য নিম্নবর্গীয় মানুষের গ্রাম, কাহারদের আবাস, অন্যদিকে জাঙল গ্রামে ভদ্রলোকের বসবাস। তো এই আগুনে পোড়া লোহার মতো মাটিতে কোদাল বা গাঁইতির আঘাতে আগুনের ফুলকি ওঠে। চাষ বাস চলে কেবল ২/৩ মাস। বর্ষায়। সেই যে পাহাড়ি কোপাই নদী, তা বর্ষা এলে হঠাৎ প্রেতিনী ডাকিনীর ভয়ংকর রূপ নেয়। লেখক তারাশঙ্কর সেই রূপের সাদৃশ্য দেখেছেন নিম্নবর্গীয় কাহারদের ক্রুদ্ধ মেয়ের ভেতর।

"বাপ-মা-ভাই-ভাজের সঙ্গে ঝগড়া করে, পাড়া-প্রতিবেশীদের শাপ-শাপান্ত করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের পথে, চুল পড়ে এলিয়ে, গায়ের কাপড় যায় খসে, চোখে ছোটে আগুন, যে ফিরিয়ে আনতে যায় তাকে ছুঁড়ে মারে ইট পাটকেল পাথর, দিগবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে চলে কুলে কালি ছিটিয়ে দিয়ে।" এই যে বর্ষা প্লাবিত কোপাই নদী আর নারী, তা কিন্তু ধারে-কাছের শান্তিনিকেতনে বসবাসকারী রবীন্দ্রনাথের চোখেও পড়েনি, পড়েছিল কেবল 'কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ।' তারাশঙ্করের এই গদ্যরীতি তো হাঁসুলী বাঁক থেকে ওঠে আসা, কাহারদের রক্ত থেকে ছিটকে পড়া।

লেখক তো নিম্নবর্গীদের 'জীবনকথা' (ভদ্রলোক) বলেন নি, রূপকথা (শিশুতোষ) বলেন নি, বলেছেন, 'উপকথা', কাহার শ্রেণীর 'উপকথা'।

উপজীবন। উপমানুষ। উপজীবিকা। উপপুরাণ। উপপ্লব (প্রাকৃতিক উপদ্রব)। উপবাস। উপদেবতা। উপাসনা। উপাস্য ইত্যাদি কথা। তাই এখানে ব্যক্তির চেয়ে উঁচু, মানুষের চেয়ে শক্তিমান হলো সমাজ এবং আদি সংস্কার। পূর্ববঙ্গের বাঙালি গ্রাম্য মানুষের সংঘাত মাটিপ্রকৃতির সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, দারিদ্র্যের সঙ্গে। কিন্তু কাহার বাঙালিদের? তাদের সংঘাত নিজেদের সঙ্গে, আধুনিকতার সঙ্গে, ভাগ্যের সঙ্গে, যৌনতার সঙ্গে। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, জন্ম-মৃত্যু এ যেন নিয়তি, অন্ধশক্তি, অপ্রতিরোধ্য স্রোত।

তারাশঙ্কর তাই এই উপন্যাসে ব্যক্তির অনুসন্ধান করেননি, করেছেন জড়াজাড়ি করে থাকা অচ্ছেদ্য ব্যক্তি বিন্দুর সমাজ সমগ্রতাকে। করালী, সুচাঁদ, বনওয়ারি, কালোবৌ, পাখী, নয়ান ইত্যাদি চরিত্রে স্বতন্ত্র মহিমা থাকলেও কোপাই নদী, বাঁশবাঁদি কিংবা জাঙল গ্রাম, চন্দনপুরের রেল স্টেশান, সাদা ইংরেজ সাহেব, ভদ্র ব্রাহ্মণ ভূস্বামী, যন্ত্রসভ্যতা, মহাযুদ্ধ, কালারুদ্র দেবতা, ঐশ্বরিক মহিমার চন্দ্রবোড়া সাপ-শক্তিরই ক্রীড়নক হচ্ছে সেসব মানুষ।

হাঁসুলী বাঁক, সে এক অনিশ্চিত নিরাপত্তার ভয়াল স্থান। বিষাক্ত সাপ, বাঘ, বন্য শূকর, মশা (ঘাতক), কুমির এসবের ভেতরই জীবন চলে। অন্যদিকে যুগযুগের অভিশাপ হিন্দু বর্ণবাদ। কাহারেরা নিম্নবর্গীয়, ওরা উঁচুবর্গের বাড়ির মৃতপশু সৎকার করে, ক্রীতদাস বৃত্তির পালকীর বোঝা বয়, ভদ্রলোক হিন্দুর। উৎসবে শ্রম দেয়, অভুক্ত উচ্ছিষ্ট চেটে যায়। জোতদার বাবুর জমির পাথুরে মাটির বুক ফাটিয়ে রক্ত ঝরায়, বর্ষায় মাটি ভিজলে ধরিত্রীয় জরায়ু ভিন্ন করে ফসলের বীজ বোনে। ফসল পায় মাত্র তিনের একভাগ। কারণে অকারণে অপমানিত হয় বাবুদের হাতে। সবই যেন বিধান। অথচ বিস্ময়কর আনুগত্য, বিশ্বাস আর ভক্তির বান বয়ে চলে মানুষগুলোর মনে দৈবশক্তি তথা কালারুদ্র কিংবা বিল্ববৃক্ষ (বেলগাছ) আশ্রয়ী দেবতা কর্তাবাবার নামে। প্রাকৃত জীবনের এই আলো-আঁধারী-বিশ্বে কল্পিত দেবতা আর মানুষের চলে দুর্জ্ঞেয় এক আত্মীক সুসম্পর্ক। প্রত্যাশা আছে, প্রাপ্তি নেই। তবু বিশ্বাসের বন্ধন অক্ষয় শেকল পরা।

তারাশঙ্কর রূপকথা বলতে আসেননি পাঠকদের। জীবনদর্শনের সমাজদর্শনের কিংবদন্তী নয় কাহারদের জীবন। তাই বস্তুবিশ্বের মানুষের গল্প বলেছেন তিনি। সেই মানুষ আবার অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছে আত্মসমর্পিত, লৌকিক কুহক দ্বারা আচ্ছন্ন, মানস জগতে পৌরাণিক কুয়াসার জাল পাতা। যা কিছুই ঘটে জীবনকে ঘিরে, সবই যেন দৈবলীলা। বস্তুবিশ্বের রাত-দিন, খরা-বর্ষা, জন্মমৃত্যু, সূর্য-তারা-নক্ষত্র তাদের কাছে যতটা সত্য, ঠিক ততটাই সত্য তাদের অলৌকিক বিশ্বাস। সে সবের ব্যাখ্যাকার হচ্ছে বৃদ্ধ সুচাঁদ। পৌরাণিক স্মৃতি, শ্রুতি, অতিপ্রাকৃত পারলৌকিক বিশ্বের অব্যক্ত শব্দ ধ্বনি, হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী হৃদয় সুঁচাদ খুলে রাখে কাহারদেও জন্য। এ থেকে যেন মুক্তি নেই কারো, সুঁচাদ মুক্তি দেবে না, নিজেও পাবে না। যা কিছু

বর্তমান তার সবই সেই ধূসর অতীত জগতের দৈবশক্তির অদৃশ্য, অব্যক্ত, অচ্ছেদ্য প্রভাব, তা সে স্মরণ করিয়ে দেয় নতুন প্রজন্মকে।

সুচাঁদের মুখ দিয়েই যেন লেখক মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যের বিনির্মাণের চেষ্টা চালান। সুচাঁদ হাঁসুলি বাঁকের বিলুপ্ত নীলকুঠির প্রসঙ্গ টেনে, কোপাই নদীর বন্যার উপকথা ফেঁদে বসে। বন্যায় নীলকুঠি ভেসে যায়, ইংরেজ সাহেব এবং মেম অলৌকিক এক নৌকা দেখে তাতে আরোহণের চেষ্টা করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যুবরণ করে। অথচ তাদের সঙ্গী স্থানীয় মানুষটি বেঁচে থাকে। অলৌকিক শক্তি কাহারদের দেবতা কত্তাঠাকুর স্বমূর্তি ধারণ করে তাকে বললেন, "আমার পূজো করিস, দেবতার কাছে মাথা নোয়াস, অতিথিকে জল দিস....অমান্যি করলে ছেড়ে যাবেন, আর ফলভোগ করবি।" এই কাহিনী, এই তার আবহ এবং সময় কিংবা উপন্যাসের চরিত্র, তার ব্যাখ্যার এমন ব্যঞ্জনা সৃষ্টির নামইতো শিল্প।

কাহারেরা প্রকৃতির সন্তান, প্রাকৃত। অলৌকিকবাদে বিশ্বাসী লৌকিক জনগোষ্ঠী। উঁচুবর্ণ ক্ষমতাবানেরা ওদের পশুর চেয়ে উৎকৃষ্ট মনে করে না। ওরা তাদের সেবা করে অথচ পুণ্যি চায় দেবতার কাছে। তাদের রুক্ষ-পাথুরে মাঠে ফসল ফলায়, ঠকে, হারে, কিন্তু প্রাপ্তি যেন দৈবশক্তিরই কাছে। এই দৈব নিয়ন্ত্রিত সমাজে নারী কেবলই সম্ভোগের, শ্রমশক্তির আর প্রজননের যন্ত্র। কিন্তু বৈপরীত্ব এই যে, ওই সমাজে নারীও ক্ষমতার অধিকারী। তার অধিকার আছে ঘর ভাঙার, ভোগ করে সে পরপুরুষ। দ্বন্দ্ব তৈরি করে পুরুষের সঙ্গে। কখনো হারে, কখনো বা জেতে। পাখী চরিত্র এমনি দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে নারী গান করে, নাচে, আকণ্ঠ গেঁজানো মদ পান করে, পাগলামী করে, সম্ভোগে ভাসে।

তারাশঙ্কর একটি প্রচণ্ড ভূকম্পন প্রত্যাশী ছিলেন। এমন ভয়ংকর কম্পন, যার ফলে কাহারদের সাংস্কৃতিক জগৎ, ঐতিহ্য, বিশ্বাস সবকিছুই লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। সেই ভাঙন আর পুনর্গঠনের ঝড় সৃষ্টি করে সময়। সেই সময় হচ্ছে আধুনিকতা। ওখানে সভ্যতার পাশাপাশি চলে বর্বরতা। চন্দনপুরের রেলের কারখানা যদি হয় আধুনিকতার পদধ্বনি তবে বর্বরতার নাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সেই যুদ্ধে রেলকারখানা জরুরি ইংরেজের জন্য, কেননা জাপান ভারতবর্ষের দুয়ারে পা ফেলেছে। ইংরেজদের যুদ্ধজয়ের অস্ত্র পরিবহনের জন্য রেলগাড়ি অপরিহার্য। সংস্কার, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ভেঙে কাহার যুবক করালী সেই রেলকারখানায় কাজ করে। গ্রাম আর গোষ্ঠীনেতা বনওয়ারীর কথা গ্রাহ্য করে না সে। ঠিক যেন হাজার বছরের বৃত্ত ভাঙতে চায় সে, পেশার বৃত্ত। কৃষিকাজ, পালকি বাওয়া যেখানে তাদের কাছে দেবতার নির্ধারিত কাজ, সে বিশ্বাসকে সে উপড়ে ফেলতে চায়।

মনে হবে এ যেন পুঁজিবাদী সমাজে রক্তাক্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মতোই একেবারে বিপরীত আঘাত। সেই মানুষটি আবার প্রেমে পড়ে। পরকীয়া। ঘর ভাঙে। কেবল তাই নয়, গ্রাম-নেতা, গোষ্ঠীনেতা বৃদ্ধ বনওয়ারীর যুবতী স্ত্রীকেও

সে দখলে নেয়। কাহার সমাজে সবকিছুতেই বুঝি ভাঙন আর ভাঙন। একটা কিছু ঘটবে, এ যেন তারই ইঙ্গিত।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির উত্থান-পতন বাস্তব সত্য হলেও, ব্যক্তিকে ডিঙিয়ে প্রকৃতি এবং একটি প্রান্তিয় জনগোষ্ঠীই এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। ব্যক্তির জীবনদর্শনকেও ছাড়িয়ে যায় সমাজ-বাস্তবতার দর্শন। ব্যক্তির লোভ, যৌনতা, প্রতিহিংসা, স্বার্থপরতা সবকিছুই যেন আবর্তিত হচ্ছে ত্রিমাত্রিক দ্বন্দ্বে। প্রথমটি দৈববাদ, দ্বিতীয়টি প্রকৃতি এবং তৃতীয় মাত্রাটি যন্ত্রসভ্যতা।

এসব শক্তির কাছে মানুষগুলো যেন আত্মসম্পর্কিত, আর্কষণ-অভিকর্ষণ তাড়িত এবং প্রাগৈতিহাসিক লালীয় যুক্তিহীন অন্ধ। ক্ষুধা, দারিদ্র, বর্ণউৎপীড়ন, রোগ, মৃত্যু, শোক এবং অচরিতার্থ খণ্ড-বিখণ্ড জীবন পূর্ণতা চায় অসংযম যৌনতায়, পরস্পর বিদ্বেষে, লোক পুরাণে, গানে, নাচে এবং নেশায়। উঁচুবর্ণের দ্বারা নারীদের কাম চরিতার্থ করা, সন্তান লাভের নামে বর্ণ মিশ্রণ, রেলকারখানার কাজ করতে গিয়ে ঘরের মেয়ে-বৌ নিরুদ্দেশ, সবই যেন নির্বিরোধ, অপ্রতিরোদ্ধ। সমাজ-বাস্তবতা, পারিপার্শ্বিকতা, দৈব বিশ্বাস, আদিম ঐতিহ্য-প্রভাব মিলে মানুষগুলোর মনস্তাত্ত্বিক যে ধূমায়িত জগৎ, তা যেন জীবন লীলারই অচ্ছেদ্য অংশ। যে লীলার নিয়ন্ত্রক কাহারেরা নয়; দেবতার আশীর্বাদ কিংবা অভিশাপ।

বিস্ময় এই যে, জীবনের যে গতি নিয়ন্ত্রণ করে 'কালারুদ্র' বা 'কত্তাবাবা' নামের দৈবশক্তি, সেই জীবনই কাম-লালসার চরম স্বেচ্ছাচারে পূর্ণ। ধর্মভয় আছে, পাপবোধও আছে, নেই কেবল আত্মসংযম। এ যেন হাঁসুলী বাঁকের অন্ধশক্তি, খেয়ালী কোপাই নদী। কোপাই নদী তার ইচ্ছাশক্তি দিয়ে এই জনগোষ্ঠীকে, হাঁসুলীর মতো পেচিয়ে আছে। একমাত্র করালীর ভিতর যে শ্রেণীবোধ, মনের দাসত্ব মুক্তির বিদ্যুৎ চমক দেখা দেয়, তা-ও সুশৃঙ্খল নয়, নিতান্তই ব্যক্তিক প্রেরণা, জাতক্রোধ কিংবা গোঁয়ার্তেপনা। সেও তার বৃত্তশেকল ছিঁড়তে অক্ষম। এক দাসত্ব থেকে অন্য দাসত্বে আত্মসমর্পিত।

মানুষের আত্ম-বিকাশের প্রতিবন্ধক মুক্তি যেমনি বিদ্রোহের আগুনে পুড়ে ছাই হয়, কাহার জীবনে যেন তাও রুদ্ধ। সেই জীবন গ্লানি, অতৃপ্তি, অপ্রাপ্তি এবং নীরব নির্দ্বন্দ্ব জীবন। তাই গতিমুখ পাল্টে মদের নেশায়, নারীর শরীরে, পরস্পর বিবাদে চরিতার্থতা খোঁজে। লেখক তারাশঙ্কর এই যে প্রাক-পুঁজিবাদী, অনুন্নত সামন্তবাদী আদিম সমাজ- তরঙ্গের চিত্র কাহার জীবনে লক্ষ্য করেছেন সেখানে তাঁর শিল্পদর্শন রাজনৈতিক একপেশে দর্শনকেও ছাড়িয়ে পরম সত্যের সামনে দাঁড়ায়। সে সত্য বস্তুনিষ্ঠ, সে সত্য অন্তরের জগৎ। ব্যক্তির আচরণিক সত্তা।

জন-চরিত্রে যে জীবন শিথিল, অদৃঢ় এবং এলোমেলো, সেখানে অর্থনীতির মতো নরনারীর ভালোবাসাও বন্য, পশুর মতোই সৌন্দর্যশূন্য। প্রবৃত্তির

তাড়নাকে জয় করতে পারে না মনের সৌন্দর্য। শরীরকে অতিক্রম করতে পারে না হৃদয়। প্রেম যেন হৃদয় ঘটিত নয়, দেহাশ্রিত, সেখানে মনে যতই রং লাগুক। এই 'মনের রং আসলে কামের পূর্ব স্তর মাত্রা। করালী বা বনওয়ারীর জীবনে যা ঘটে তথা প্রেম নয়, কাম। প্রশান্তির সুখ নয়, সম্ভোগের ক্লান্তির ঘুম। কালো বৌকে কেন্দ্র করে তার স্বামী পরমের সঙ্গে বনওয়ারীর যে সম্মুখ যুদ্ধ বাধে তার চিত্র তারাশঙ্কর যেভাবে আঁকেন তা তো অরণ্যবাসী পশুদের বেলায়ই সত্য, অন্য প্রান্তে নিজের যুবতী স্ত্রী সুবাসীকে কেন্দ্র করে করালীর সঙ্গে যে সংঘাত তা-ও সেই পশুত্বকে ডিঙাতে পারে না।

সেখানে আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্বে অরণ্যবাসীর দ্বন্দ্বই স্পষ্ট রূপ পায়। তবু উপন্যাসটিতে মহাকাব্যিক ট্রাজেডির রূপ ধরা পড়ে পরম, করালী আর বনওয়ারীর দ্বন্দ্বে। এ দ্বন্দ্ব কর্তৃত্ব নিয়ে, সমাজের কর্তৃত্ব, তারচেয়ে নারীর শরীর আর শ্রমশক্তি দখলের জন্য সংঘাতটাই প্রধান। তারাশঙ্কর এর বর্ণনায় যে ভাষারীতির আশ্রয় নিয়েছেন তা পাঠকে মহাকাব্যের ব্যঞ্জনার মতোই ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে। কালোশশীর শরীর এবং সুবাসীর শরীর দখলে নেয়ার দ্বন্দ্ব যেন ভয়ংকর বীভৎসতায় নিক্ষেপ করে পাঠককে। "এরপর আরম্ভ হয় যুদ্ধ। নিঃশব্দে-সেই নির্জন প্রান্তরের মধ্যে তারা দু'জনে বন্যপশুর মতো পরস্পরকে আক্রমণ করলে জড়াজড়ি করে দুজনে এ অঞ্চলের পাষাণের মতো মাটির উপরে পড়ে গড়াতে লাগল।....হাঁসুলী বাঁকের উপকথার রাত্রে দাঁতালে দাঁতালে লড়াই হয়। গাছের মাথায় হনুমানের দলে বীরে বীরে যুদ্ধ হয়।"

এমনি এক যুদ্ধের পরপরই আরেক জগতে পাঠককে তাড়িয়ে নেন লেখক। যুদ্ধে পরমকে পরাজিত করে বনওয়ারী চলে যায় পরাজিত পরমের বৌ কালোশশীর কাছে। রক্তে কামের আগুন জ্বলে বনওয়ারীর। কালোশশী বুঝতে পারে। ওরা ঘর ছেড়ে বাহির হয়। "আকাশে সবে চাঁদ উঠেছে। একপাশ-খাওয়া লাল-বরণ মস্ত চাঁদ। কোপাইয়ের তরতরে স্রোতের মধ্যে চাঁদ যেন ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে। কালো বউ গান ধরলে। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার গান।....চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে পরম। চোখ জ্বলছে শ্বাপদের মতো।"

কী ঘটল তারপর? ভয়ংকর সেই ঘটনা। ভয়ার্ত বনওয়ারী অদৃশ্য। কালোবউ অর্থাৎ কালোশশী ভয়ে দৌড়াতে থাকে কোপাইয়ের বালির উপর দিয়ে। পেছনে পরম। কোপাইয়ের জলে আত্মগোপন করে বনওয়ারী। অথচ কালোশশী ছুটছে মৃত্যুপুরীর দিকে, কোপাইয়ের গভীর দহের দিকে। ওটা দেবতা কালারুদ্রের দহ, কালারুদ্রের কন্যা সর্পদেবী মনসার বাড়ি। দহের কিনারে সেই দৈবশক্তির শিমুল গাছ। জঙ্গল। ওখানেই পালিয়ে কালোশশী বাঁচতে চায়। দহের দিকে যে শেকড় ঝুলে আছে তাতে ধরে উপরে উঠে বাঁচার চেষ্টা করে কালোশশী। "হঠাৎ কালো বউয়ের ভয়ার্ত চিৎকার কোপাইয়ের স্তব্ধ গর্ভভূমি যেন বুকের উপর খুনির ছুরির ঝলকানি দেখে চমকে উঠল। ওটা কি?

শিকড়ের তলা থেকে আকাশের বিদ্যুতের মতো এঁকেবেঁকে মাথা তুলে দাঁড়াল, ওটা কি? চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে কোপাইয়ের জল-বালি।....খিলখিল করে হেসে উঠল পরম।...কই কালো বউ? একি হল? শুধু দহের জলটা দুলছে।...পরের দিন সকালে কালোশশীর দেহ ভেসে উঠল কালীদহের মাঝখানে। এলোচুল ঢেউয়ে নাচছে, কালো বউয়ের দেহটা ডুবছে আর উঠছে।"

কী বিস্ময়! একই ঘটনা ঘটে বনওয়ারীর বেলায়ও। তার যুবতী বৌ দখল করছে করালী। তাই যুদ্ধ। "পরস্পরকে নিষ্ঠুর আক্রমণে জড়িয়ে ধরে পড়ল মাটিতে; ডুবে গেল গাছতলায় সেই অন্ধকারের মধ্যে।...হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনের ছায়ায় একদিন যুদ্ধটা শুরু হলেও শেষ হয় নাই।...হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনের অন্ধকার আকাশপথে ভেসে এসে ওই ঝাঁকড়া গাছটার শাখাপল্লব বেয়ে প্রতি মুহূর্তে তলায় নামছে, ওদের দু'জনকে ঘিরে গভীর হয়ে উঠছে।"

এই বর্ণনা, এই যে ভাষাশৈলী তা তো স্তরীভূত ছিল নিম্নবর্গীর জীবনের গোপন আগ্নেয়গিরির গভীর অন্ধকার অতলে। অগ্ন্যুৎপাতের মতোই তা শব্দ ও বাক্যের উত্তপ্ত গলিত ভালা হয়ে বেরিয়ে আসে তারাশঙ্করের কলমের ডগায়। জনজীবন, পরিবেশ, ব্যক্তি-মানস, ঘটনার পরিকাঠামো ইত্যাদি মিলে তৈরি হয় শিল্প-ভাষা। শব্দ বিন্যাস পরিবেশ নির্মাণের যে ধাতব উপকরণ স্তর গঠন করে, তাতে কেবল কাব্যধ্বনি সৃষ্টি হয় না, গদ্যের বহুমাত্রিক মিসট্রিক এবং রিয়ালিজমের মিশ্রণে তৈরি হয় নতুন এক ভাষাশৈলীর গতি বলয়।

পাঠকের মনে হতে পারে তরঙ্গশূন্য শত শত বৎসরে প্রাচীন এই অনড় সমাজ হঠাৎ ভেঙে পরলো কেন? এটা কি অভ্যন্তর ভাগের সমাজ পরিকাঠামোর শিলা স্তরের স্থান বিচ্যুতির আকস্মিক কম্পন? নাকি এটা চারপাশের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংকোচন-সম্প্রসারণের প্রবল চাপের ফল? ভাঙন অবশ্যই চাপের ফল। সেই চাপ যতটা অভ্যন্তরীণ, ঠিক এতটা পারিপার্শ্বিক। একমাত্রিক কিংবা দ্বিমাত্রিক নয়, চাপ বহুমাত্রিক। কেবল যে অর্থনীতির হঠাৎ পরিবর্তনে এ ভাঙন ঘটেছে, তা নয়। একথাও সত্য যে অর্থনৈতিক নববিন্যাস সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তনের ঝাঁকুনি লাগে। কাহার সমাজ এই চাপ সহ্য করার মতো শক্ত কাঠামো তৈরি করেনি।

চাপ ছিল আধ্যাত্ম জগতে তথা ভাবের জগতেও। রেল কারখানায় কাজ করতে আসা মুসলমানদের ধর্ম, নীতি, শাসক ইংরেজ সাহেবের রীতি, ধর্ম এবং হিন্দু বর্ণবাদের বহুবর্ষব্যাপী পাথর দেয়াল। রেলে বা কয়লাখনিতে কাজ করতে গিয়ে কাহার নারীর সাংস্কৃতিক অভিঘাত, হাজার বছরের বৃত্তাবদ্ধ জীবন ভেঙ্গে তৈরি হয় স্বতন্ত্র জীবনের স্বপ্ন-তাড়না।

অন্যদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাবে স্থিতিশীল ভোগ্যপণ্যের উর্ধ্বমূল্য, যুদ্ধের কারণে আদিম গ্রাম্য সভ্যতার উপকরণ বাঁশ আর গাছের গ্রাম ছেড়ে নগর-যাত্রাও এর জন্য দায়ী। বাঁশবন, প্রাচীন বৃক্ষের ঘন ছায়া, কুহকী

অন্ধকার, নির্জনতা যে মানুষের মনে ভাবলোক তৈরি করে, তার ধ্বংসে পরিবেশ বিবর্তনে প্রভাব পড়ে। তার উপর কোপাই নদীর ভয়াবহ বন্যার ধ্বংস লীলা। মোটকথা অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের অভিঘাতই ছিল এর মূলে, কেননা সামাজিক সূত্রমতেও প্রাচীন সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ চিরকালই থাকে অত্যন্ত দুর্বল অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামোয় তৈরি। একের পর এক চাপ সহ্য করার ক্ষমতা তার থাকে না। ফাটল তৈরি হয় ভেতরে, চাপটা বাইরের।

দৈব বিশ্বাস কিভাবে মিথ্যে হয়ে যায় কাহারদের? ওরা দেখতে পায় তাদের রক্ষাকর্তা দেবতা 'কালারুদ্র' এবং 'কত্তাবাবার' পবিত্র ভূমি, দৈব-বৃক্ষ দখলে নেয় যুদ্ধ উপকরণের গুদাম। অথচ দেবতা নির্বাক। শক্তিহীন। যেন পলাতক। এখানেই হাজার বছরের বিশ্বাস ভেঙে খানখান হয়ে যায়। অন্যদিকে ব্যক্তি-শক্তি হিসেবে করালীর আবির্ভাব প্রাচীন এই সমাজসত্তার ভাঙনেরও অন্যতম মাত্রা। তাই তো করালীর শক্তি যেখানে যন্ত্রবিজ্ঞান সেখানে বনওয়ারীর ব্যক্তিত্ব আদিম আধিভৌতিক ভয় ও বিশ্বাস থেকে জাত।

কিন্তু করালী সম্পর্কে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যালোচকগণ যে মত পোষণ করেন সেখানে দ্বিমত আসতে পারে। উপন্যাসের গতিধারায় করালী নতুন যুগের দূত নয়। তার চরিত্রে আধুনিকতার কিছু কিছু গুণ অবশ্যই আছে। যন্ত্রযুগের সত্তাকে সে ধারণ করেছে অনেকটা জেদে, যুক্তিতে নয়, বুদ্ধিতে নয়। সে অনেকটা মধ্যযুগীর বিদ্রোহীদের মতো। যুগ বদলের বা আপন সমাজ বদলের মেধাশক্তির প্রতীক সে নয়। তার মধ্যে রয়েছে কর্তৃত্বপরায়ণতা– স্বসমাজ কর্তৃত্বের। সংস্কার ভাঙার জন্য মোটেই সে কাহার বিধির বাইরে গিয়ে মাটির দেয়ালের উঁচু ঘর বানায়নি, বানিয়েছে নিজের ক্ষমতায়নের জন্য। সমাজ বদলের রাজনীতিও তার অজ্ঞাত।

নয়ানের স্ত্রী পাখী এবং বনওয়ারীর স্ত্রী সুবাসীকে সে দখল করেছে জৈব লালসায়। ঠিক যেন নারী তার ভোগের উপকরণ। তাই সে ভাগিয়ে নেয়া বৌ পাখীকে বলে, "পোষ মাসে একটা ইঁদুর দশটা বিয়ে করে। আমার এখন বারো মাস পোষ মাস। গ্যাঙের সর্দার আমি। আমি সুবাসীকে (বনওয়ারীর স্ত্রী) নিয়ে এসে সাঙা করব, তাতে তোর ঘর করতে খুশী হয় করবি, না হয় পথ দেখবি।" কী বোঝা গেল? এ কোন করালী? সে কি নব যুগের দূত?

বনওয়ারী সামাজিক নেতৃত্ব যেখানে হাঁসুলী বাঁকের আধিভৌতিক জগতে আটকে রাখতে চায় কাহারদের, সেখানে আসলেই কি করালীদের নেতৃত্ব তাদের সভ্যতা ও মুক্তির কাছে পৌঁছে দিতে চায় চন্দনপুরের রেল কারখানায়? করালী কেন স্বপ্ন জাগায় কাহার যুবক যুবতীদের চোখে, সুখের স্বপ্ন? আসলে সে স্বপ্ন তার নিজের, ওই 'গ্যাঙের সর্দার'-এর অসীম ক্ষমতার মধ্যে। করালী যে গ্রাম ছেড়ে রেল-শহরের বস্তিতে চলে যায়, এটা ভয়জাত নয়, নিজেকে কাহার সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে সাহেবর-বাবু আর নগরের কাছাকাছি পৌঁছে স্বতন্ত্র শক্তিতে মহিমান্বিত করার লোভ। ভয়টা থাকলে সে গাঁয়ে সমাজ

বশ্যতা অস্বীকার করে উঁচু বাড়ি তৈরি করত না। সে তো চ্যালেঞ্জ করে উঁচু হতে চায় সব কাহারকে ছাড়িয়ে। একথা বাস্তব সত্য যে নিম্নবর্গের প্রতি উঁচু বর্ণের আচরণকে সে মানতে পারেনি। বনওয়ারীকে তাই বলে, "লজ্জা নাই তোমাদের? সদজাতের ভদ্দলোকের পা চেটে পড়ে থাক, তারা তোমাদের ভাতে মারে, জাতে মারে। পিঠের উপর জুতো মারে, তোমরা চুপ করে মুখ বুঁজে সহ্য কর।"

তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি বটে। কিন্তু এর প্রতিবাদ-প্রতিরোধ চেষ্টা-চিন্তা তো কখনো করেনি করালী? সেই রাজনীতিটা তার অজ্ঞাত বলেই বাক্যটি লেখক কর্তৃক করালীর উপর আরোপিত বলেই মনে হয়। কেননা, রেলে যে কাজ করে সেখানে যেমনি রয়েছে ইংরেজ সাদা সাহেব, তেমনি আছে উঁচুবর্ণের বাঙালি বাবু চৌধুরী। ওখানেও আনুগত্য, দাসত্ব। সামন্তবাদের দাসত্ব ছেড়ে পুঁজিবাদের দাসত্বের জোয়াল কাঁধে নেয়া। গ্রামে করালীর প্রভুরা ছিল একটু দূরে, কিন্তু রেল কারখানায় ওরা একেবারে পাশে, ঘাড়ের উপর। তাই সে তাদের কৃপা নেয়, কৃতজ্ঞ হয়ে সাদা সাহেবদের পথ চিনিয়ে নিয়ে আসে কাহার পাড়া, যুদ্ধের গুদাম বানানোর জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ আর দেবস্থান ধ্বংস করতে। তার ভূমিকা অনেকটা বিভীষণের মতো, যে রামচন্দ্রকে লঙ্কার পথ চিনিয়ে নিয়ে আসে।

করালীর এই প্রভুত্ব-দাসত্বের খেলা তো হাঁসুলী বাঁকের প্রকৃতির চেয়ে ভয়ংকর জটিল। এখানে কেবল কাহার নারীরা কাজ করতে এসে জাতই হারায় না, পুরুষরা হারায় ঘরের নারী। লেখক উপন্যাসে গান্ধীজীর স্বরাজের কথাও শোনান, জ্বালাও-পোড়াও-পুলিশের গুলির কথাও আসে। অথচ করালী ওসব শুনতে পায় না।

লড়াইটা তার ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়, বরং পক্ষের। তাদের যুদ্ধের উপকরণ তৈরির সঙ্গে সে যুক্ত। করালীর ঘৃণা বনওয়ারীর প্রতি। তার প্রহারে বনওয়ারীর মৃত্যু ঘটে। তার মৃত্যুর পূর্বেই তো স্ত্রীকেও দখল করে নিয়ে গেছে সে। বৃদ্ধ বনওয়ারীর নেতৃত্বের বংশরক্ষার দায়িত্বটাও বুঝি সে জোর করে ছিনিয়ে নেয়। কেননা প্রজননে অক্ষম বনওয়ারী-বৌ তো এখন করালীর ঘরে। এ শুধু নেতৃত্ব দখলই নয়, নেতৃত্বের প্রজনন ভূমিও দখল। জটিল থেকে জটিলতর বাসনা। বাসনা পূরণ।

বনওয়ারীর মৃত্যু আর ঝড়-বন্যার কাহার পাড়ার ধ্বংস করালীল উত্থানকে নিশ্চিত করে দিয়ে যায়। সামন্ত সংস্কৃতি আর অর্থনীতির উৎখাতের ভিতর দিয়ে অভ্যুদয় ঘটে পুঁজিবাদের। "উপকথার ছোট নদীটি ইতিহাসের বড় নদীতে মিশে গেল।" কী সেই বড় নদী? নগর সভ্যতার বস্তিজীবন, কৃষির বদলে কারখানা। "কাহারেরা এখন নতুন মানুষ।....মাটি ধুলো কাদার বদলে মাখে তেলকালি, লাঙন-কাস্তের বদলে কারবার করে হাম্বল-শাবল-গাঁইতি নিয়ে। তবে চন্নপুরের কারখানায় খেটেও তারা না খেয়ে মরে, রোগে মরে, সাপের কামড়ের বদলে কলে কেটে মরে, গাড়ি চাপা পড়ে মরে।"

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটি শুরু করেছেন যে বাক্য দিয়ে, তার গভীর ব্যঞ্জনায় শুরুতেই তিনি পাঠকের এমন এক জনপদ আর জনজীবনের ভেতর টেনে নিয়ে যান, যেখানে থেকে পাঠকের বেরিয়ে আসার পথ বন্ধ হয়ে যায়। পাঠক তল থেকে অতলে হাঁটতে থাকে। কী সেই বাক্য? "হাসুলী বাঁকের ঘন জঙ্গলের মধ্যে রাত্রে কেউ শিস দিচ্ছে। দেবতা কি যক্ষ, কি রক্ষ, বোঝা যাচ্ছে না।" এই রহস্যময়তার ভিতর যে বাস্তব সত্য লুকিয়ে থাকে, তা তিনি পাঠককে জানান অনেক পরে।

আসলে এটি হচ্ছে একটি ভয়ংকর বিষেল সাপ, চন্দ্রবোড়া সাপ। কাহারদের কাছে সে দেবতার বাহন। পবিত্র। পূজনীয়। তাই এই আদিম রহস্য ঘেরা জগৎ নির্মাণের জন্য চাই আলাদা ঔপন্যাসিক ভাষা। সেই যে বাংলা উপন্যাসের অচেনা গদ্য-ভাষা, তার উদ্ভব ঘটালেন লেখক 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-এর মধ্যদিয়ে। যে গদ্য রীতিতে তিনি সাপের ভেতর দেবতার অস্তিত্ব নির্মাণ করেন, একই ভাষায় দেবতার দেবত্বকে ধ্বংসের বর্ণনাও দেন। ওই যে সেই– করালী কর্তৃক বাঁশবনে আগুন দিয়ে চন্দ্রবোড়াকে পুড়িয়ে মারার ঘটনা। লোকজ জীবনের সাহিত্যের জন্য লোকজ শৈলীর মাত্রাটা কতুটুকু তারাশঙ্করই প্রথম দেখিয়ে গেলেন বাংলার কথাসাহিত্যে।

কাহার জীবনের মহাকাব্য লিখতে গিয়ে লেখক পদ্য মহাকাব্যকে টেনে আনেন নি, এনেছেন সামজ ও জীবন বাস্তবতাধর্মী লোকজ, প্রাকৃত শব্দ নিয়ে তৈরি গদ্য রীতি। অবলীলায় তিনি উপন্যাসটির জন্য লোকজ শব্দ মিশ্রণে লেখক ভাষারীতিও নির্মাণ করে নিলেন। যেমন– আগ (রাগ), লড়ছে (নড়ছে), অ্যাললাইন (রেললাইন), ওজগার (রোজগার), পিতিপুরুষের জেবন (পিতৃ পুরুষের জীবন), অক্ত (রক্ত), শোগে (শোকে), অক্ষে (রক্ষে), বেপদ (বিপদ), আশ্চয় (আশ্রয়), পিথিমী (পৃথিবী), আন্না-বান্না (রান্না-বান্না), অবিবার (রবিবার), আত (রাত), লতুন (নতুন), চন্ননপুর (চন্দনপুর), আগ (রাগ)। এমনি শত শত শব্দ তিনি কেবল চরিত্রের ভাষায় নয়, লেখক-ভাষায়ও গ্রহণ করেছেন। গদ্যের এই রীতি ভিন্ন এই কাহিনী অবশ্যই বলা যেত, তবে মৃত বাক্যেরই সমাহার ঘটতো। এমন জীবন্ত জীবনকথার 'উপকথা' হতো না।

অন্যদিকে চিত্রকল্প কিংবা উপমা নির্মাণ করতে গিয়ে তারাশঙ্কর বিষয়ানুগত বাংলা গদ্যের নবরূপকেই আবিষ্কার করলেন। যেমন– "কোপাই নদী ঠিক যেন কাহার-কন্যে।" এই বাক্যে 'কন্যা' না বলে কেন 'কন্যে' বলা হলো সে বিষয়টি পাঠককে ভাবতে হবে। "করালীর সঙ্গে পাখীর মনে মনে রঙ ধরেছে।" তার পরবর্তীতে লেখক 'রঙ'-এর বদলে বারবার উচ্চারণ করেছেন 'অঙ'। এ ভাষা কাহারদের। যেন কাহারদের কণ্ঠেই শোনাচ্ছেন তিনি কাহারদের উপকথা।

সুনির্বাচিত শব্দের পর শব্দ বসিয়ে বাক্যের মধ্যে যে ইমেজ তৈরি করেছেন লেখক, তা বিস্ময়কর। কেবল ধ্বনি-ব্যঞ্জনাই নয়, শব্দের অর্থ-ব্যঞ্জনা, ভাবের

ব্যঞ্জনার এক আদালা গদ্যরীতিকে আমরা প্রত্যক্ষ করব উপন্যাসটিতে। যেমন– (১) "হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় দিন গেল যে রাত্রি নেমে আসে, তার সঙ্গে জাঙল-চন্দনপুরের রাত্রির অনেক তফাত।" (২) "বাঁশবনের আদ্যিকালের অন্ধকার সেই কয়েকদিন ঘুমিয়ে থাকে বাঁশতলার জট-পাকানো শিকড়গুলোর মধ্যে, কতকালের ঝরা বাঁশপাতার বিছানায়।" (৩) "এই মাটিতে আট মাস ঘাস জন্মায় না, আষাঢ় থেকে আশ্বিন পর্যন্ত কঠিন রোগে চুল উঠে যাওয়া মানুষের মাথায় সদ্য গজানো রোগা চুলের মত পাঙাশ সবুজ রঙের ঘাস গজায়।" তাছাড়া অবলীলায় ব্যবহার করেছেন প্রচলিত লোকগান, ছড়া এবং প্রবচন। সমাজ ব্যাখ্যার প্রয়োজনে তিনি স্বরচিত গান, ছড়া, প্রবচন তৈরি করেছেন প্রচুর। বাংলা সাহিত্যের এই রীতির প্রথম প্রায়োগিক সার্থক স্রষ্টা হচ্ছেন তারাশঙ্কর।

বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গ কিংবা নাগরিক আদিবাসী নয়তো গ্রামীণ কৃষক সমাজের জীবন-ভিত্তিক সাহিত্যিক ভাষাশৈলী নিয়ে কিছু কথা বলা জরুরি। এই জীবন চিত্রণে গদ্য ভাষারূপ কেমন হবে, তা তারাশঙ্কর দেখিয়ে গেছেন 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' লিখে। ভাষার জড়তা ভাঙার নামে, তথাকথিত মধ্যবিত্তের মানস-চেতনা ভাঙার নামে অশ্লীল শব্দ বা অপভাষার যথেচ্ছ ব্যবহারে ব্রাত্য জীবনের সাহিত্য গড়া যায় না।

ভাষার জড়তা ভাঙা কেবল শব্দ নির্ভর নয়, বাক্যের ইমেজ তৈরির ক্ষমতা নির্ভর। ক্ষুধা, দারিদ্র, শ্রম, ঘাম ইত্যাদির বিস্ময়কর ব্যঞ্জনা নির্মাণ মোটেই অশ্লীল শব্দের বাড়াবাড়িতে সম্ভব নয়। বৃহত্তর নগর বিচ্ছিন্ন সুপ্রাচীন নাগরিক অলি-গলির অন্ধকারে স্যাঁতস্যাঁতে ঘর ও মানুষের অন্ত-সংস্কৃতি, ভাষা ও নৃ-ধারা না জেনে কেবল অশ্লীল বুলির প্রতি উৎসাহী হলে প্রকৃত জীবনটা আড়ালে পড়ে থাকে। বৃত্তাবদ্ধ জীবনের ক্ষুদ্রতার কোন উৎসে অপভাষার জন্ম সে জানাটা জরুরি, তারপর সাহিত্য। প্রয়োজনে অশ্লীল শব্দ আসবেই, কিন্তু ব্যঞ্জনা সৃষ্টির অভিনবত্বে যদি সেই অশ্লীলতাও বিস্ময়কর শ্লীলতায় রূপ নেয় তবে গদ্যটাও মহৎ হয়। এমন দৃষ্টান্ত দূর বা সমকালে কোথায়?

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের সমাপ্তিটা কোথায় ঘটতো? এ প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিত। বনওয়ারীর নিঃসঙ্গ মৃত্যু এবং কালোকেশী কোপাই নদীর দহে ডুবে যেখানে মৃত্যুবরণ করেছিল সেখানেই যেন তাকেও দাহ করা হয়, এই অন্তিম প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে কি শেষ হতে পারত না? বন্যায় আর বালির রাশিতে হাঁসুলী বাঁক ধুধু মরু হয়ে গেছে। বিলোপ ঘটেছে হাজার হাজার বৎসরের এক আদিম সভ্যতার। "বন্ধ্যা মেয়ের মত নতুন সন্তান-সন্ততির জন্য তপস্যা করছে" যে হাঁসুলী বাঁক, সেখানে বালি সরানোর জন্য কি প্রয়োজন ছিল করালীকে ফিরিয়ে আনার? সত্যি কি করালী পাবে বালি চাপা-পড়া মাটির সন্ধান? লেখক বলছেন, "উপকথার কোপাইকে ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দেবার পথ কাটছে। নতুন হাঁসুলী বাঁক।" এ কোন হাঁসুলী বাঁক? কোন সে ইতিহাস?

একজন চিন্তাবিদ প্রবন্ধকারের সবচেয়ে নিষ্ঠুর অনাত্মীয় বা শত্রু হচ্ছে ব্যক্তিগত অহংবোধ। এই বোধ তাকে একটি জটিল বিতর্কের ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দিতে পারে। কেবল তাই নয়, এর ফলে পাঠক সমাজ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হতে হতে পরিণতিতে নিজের প্রজ্ঞার সঙ্গেও নিজেই লড়াই বাধাতে পারেন। তাই প্রবন্ধকারকে সর্বদা নিজের ভেতরের 'আমি' বা আমিত্বে'র বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে হয়। আমিত্ব বিজ্ঞান অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই 'আমি' সৃষ্টির শত্রু, চর্চা ও সিদ্ধান্তের প্রতিবন্ধক।

সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রামাণিক সত্য এই যে, বাংলার প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্ভবকাল (সময়ের বিবেচনায়) অবশ্যই উজ্জ্বল। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত একটি ধারা ঐতিহাসিকভাবেই বিকশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা স্মরণ করব ঔপনিবেশিক যুগকে। এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে বহু বিতর্কিত বঙ্গীয় রেনেসাঁস। সমাজ, রাজনীতি, দর্শন, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, নৈতিকতা এবং অতি অবশ্য সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের বিকাশকাল ওই যুগ। যদিও প্রবন্ধকাররা প্রবন্ধের রীতি ও দর্শন দৃষ্টিভঙ্গি ধার করেছিলেন ইউরোপ থেকে, তবে নিজস্ব সমকালীনতা ছিল এসব সৃষ্টির উৎস।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং উপনিবেশবিরোধী মুক্তিসংগ্রাম বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে গতি এনে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক কূটচাল সাম্প্রদায়িক বিভাজন এবং অসাম্য সেই সাহিত্যে কালো ছায়া ফেলে। বঙ্গভঙ্গের প্রভাবও বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে ব্যাপকভাবে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেকের রচনা এর সাক্ষ্য দেয়।

১৯৪৭ সালে দেশভাগ এবং সাম্প্রদায়িক চিন্তাপ্রসূত প্রবন্ধের পাশাপাশি অগ্রসরমান মার্ক্সীয় প্রগতিবাদ বা দর্শনের প্রবন্ধসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের নতুন অনন্যধারা। বিনয় ঘোষ বা কাজী আবদুল ওদুদের মতো যুক্তি, বুদ্ধি, প্রগতিবাদী প্রবন্ধসাহিত্য বাঙলাভাষার ঐতিহ্য।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সাল এবং ১৯৭১ থেকে বর্তমানকালের বাংলার প্রবন্ধসাহিত্য অবশ্যই অনুসন্ধানের বিষয়। বৃহত্তর ক্যানভাস বাদ দিয়ে আমরা এক্ষেত্রে কেবল পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশকে এই বিবেচনায় আনতে পারি। অবশ্যই এক্ষেত্রে আমরা রাজনৈতিক সাহিত্য এবং সমালোচনা সাহিত্যকে প্রধান বিবেচনায় ধরে নিয়ে এগোব।

বঙ্গভঙ্গ-পরবর্তীকাল থেকেই কলকাতা বা ঢাকাকেন্দ্রিক দর্শনমূলক প্রবন্ধসাহিত্যের পাশাপাশি প্রগতি আর প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক প্রবন্ধের প্রাবল্য দেখতে পাই। ওই যে তথাকথিত রেনেসাঁস, সমাজ সংস্কারের নামে সাম্প্রদায়িকতা চর্চার বাহক হিসেবে প্রবন্ধের ব্যবহারকে অপরিহার্য করে তোলে, ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত এর প্রভাব ছিল প্রবল। সঙ্গে সঙ্গে সে-সময় প্রগতিবাদী প্রবন্ধেরও বিকাশ ঘটতে থাকে। এ যে শুধু রাজনৈতিক প্রবন্ধের

বেলায়ই ঘটেছে তা নয়, কথাসাহিত্য, কাব্য, নাটক ইত্যাদির আলোচনার ক্ষেত্রেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মধ্যযুগের সাহিত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে দ্বৈত ধারাটি স্পষ্ট। একজন গবেষক হিন্দু-মুসলিম সাহিত্যের বিভাজন খুঁজতে যেমন সময় ও মেধা ব্যয় করেছেন, ঠিক তেমনি অন্য দল সমন্বয় বা বাঙালিত্বের সূত্রেরও অনুসন্ধানী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে হিন্দু মানস, মুসলিম মানস, হিন্দুর অবদান, মুসলমানের অবদান অনুসন্ধান করতে গিয়ে বহু ক্ষেত্রেই কেউ কেউ বিচ্ছিন্নতার অনুসন্ধান বা আবিষ্কারের চেষ্টায় বিভ্রান্তিকেই বাড়িয়ে তুলেছিলেন। আজও এই ধারার প্রাবল্য লক্ষণীয়।

১৯৭১ সাল-পূর্ব, বিশেষ করে ১৯৫২ সালের ভাষার আন্দোলন পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্যকে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কবিতা যত দ্রুত বিবর্তিত হচ্ছিল, পাশাপাশি প্রবন্ধসাহিত্যও কি বিষয়ে, কি আঙ্গিকে ঠিক ততটাই গতি লাভ করে। এমনটা দাবি করা যাবে না সেই মাত্রাটি কথাসাহিত্য ধারণ করতে পেরেছিল। আমরা দেখেছি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের প্রশ্নে দেশকে তৎকালে প্রবন্ধকাররা অনেকে যুক্তি, বুদ্ধি এবং সততার ভেতর দিয়ে ১৯৭১-এর দিকে চালিত করছিলেন। বিস্ময় এই যে, কথাসাহিত্যকে পেছনে ফেলে সে সময় কবিতা এবং প্রবন্ধ হাতে হাত ধরে জাতীয় মুক্তির দিকে এগিয়ে দিচ্ছিল এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে। মনন চর্চার এই গতি স্বাধীনতা-উত্তরকালে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

স্বাধীনতা-উত্তর প্রবন্ধসাহিত্য নিয়ে অনুসন্ধানের পূর্বে আমাদের সমকালীন আর্থ-রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক গতিধারার দিকে তাকাতে হবে। সেই বাস্তবতাই প্রমাণ করে কতটা সংকটকাল চলছে প্রবন্ধসাহিত্যের। সংকট যে কতটা গভীর তা দৈনিক, সাপ্তাহিক কিংবা সাহিত্য পত্রপত্রিকার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। দেখা যায়, হাতেগোনা পাঁচ-ছয় জন চিন্তক, ভাবুক, বুদ্ধিজীবী তথা প্রাবন্ধিকের লেখাই বারবার ছাপা হচ্ছে। বাস্তবতা হচ্ছে, তাঁরা লিখতে বাধ্য হচ্ছেন, বাধ্য করা হচ্ছে। বলতে গেলে জোর করেই লিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কেন এমনটা হচ্ছে? এর উত্তরে সহজ। চিন্তা, মেধা আর কঠিন চর্চার রাজ্যে নতুন প্রতিভার জন্ম হচ্ছে না।

বিষয়টি অবশ্যই আমাদের জন্য দুশ্চিন্তার। কবিতার ক্ষেত্রে, কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তরুণদের এগিয়ে আসার প্রবণতা অবশ্যই আশা জাগায়। কিন্তু প্রবন্ধ? এক্ষেত্রে কেন এগিয়ে আসছে না তরুণরা? এর সাধারণ উত্তর হচ্ছে, প্রবন্ধ অবশ্যই জটিল সাহিত্যিক মাধ্যম। বাস্তবতা এই, অনেকটা গবেষণাগারে বসে বৈজ্ঞানিকের কঠিন পর্যবেক্ষণ এবং অনুশীলনের মতোই আবিষ্কারের জন্য ত্যাগস্বীকারের বিষয় হচ্ছে প্রবন্ধসৃষ্টি। অথচ চলমান রাজনীতি এবং অর্থনীতিটা এমন দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কটে পতিত যে, তরুণরা

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আশার বদলে নিরাশার মেঘ দেখতে দেখতে আপন অস্তিত্বভীতিতে ডুবে যাচ্ছে। এই অস্তিত্বের প্রশ্ন তাদের সুস্থ চিন্তা আর অনুশীলনের জগৎ থেকে দূওে ঠেলে দিচ্ছে। ওরা শ্রমহীন খ্যাতি চায়, অর্থ চায়, প্রতিষ্ঠা চায়। রাষ্ট্রব্যবস্থা তরুণদের চিন্তাশীল এবং সৃষ্টিশীল মানুষ হতে দিতে রাজি নয়। তাই এই প্রতিপক্ষ রাষ্ট্র এবং তার দানবীর শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে একজন তরুণ সহজেই রাষ্ট্রের সিস্টেমের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। বাধ্য করাও হয়।

এই যদি চলতে থাকে, আজ যারা চিন্তাশীল রচনার জন্য বেঁচে আছেন তাদের মৃত্যুর পর কী হবে দেশটার? নতুন নতুন চিন্তা সিদ্ধান্ত সৃষ্টি করবে কারা? চিন্তা, মেধা এবং নব নব সৃষ্টির জন্য আমরা যদি একজন জ্যাক দেরিদা, এডওয়ার্ড সাঈদ আশা করি বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের জন্য, নিশ্চয়ই তা অন্যায় হবে না। এ-কথাও সত্য যে, বুদ্ধিবৃত্তিক আর মেধাবী মানুষ সৃষ্টির অনুকূল রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরি না করতে পারলে প্রবন্ধসাহিত্যের সংকটকাল কাটবে না।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা কোন ধরনের সাহিত্যকে পেট্রোনাইজ করে সেদিকে তাকালেই সংকটটা শনাক্ত করা যায়। এই লুটেরা রাষ্ট্রব্যবস্থা সর্বদাই সাহিত্যের নামে বিনোদন চায়, কামশাস্ত্র চায়, ফ্যান্টাসি চায়, উদ্ভট কল্পবিজ্ঞান চায়। ন্যায়, সত্য, ঔচিত্যবোধের প্রবন্ধসাহিত্যকে এই রাষ্ট্রব্যবস্থা ভয় পায়। ফলে এ ধরনের প্রবন্ধসাহিত্য সৃষ্টিতে বাধা দেয়, সৃষ্টিশীল মানুষ তৈরিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আসল উদ্দেশ্য বাণিজ্যিক মুনাফা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অনুসন্ধান চালাতে পারি আমাদের সমালোচনা সাহিত্যের দিকে। সাহিত্যসমালোচক হচ্ছেন শিল্পের গবেষণাগার। শিল্পী সৃষ্টি করেন শিল্প এবং শিল্প ব্যাখ্যাকার তার মেধাশক্তি দিয়ে শিল্পের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্যকে তুলে এনে পাঠকের জন্য পরিবেশন করেন। তাই তিনি হচ্ছেন আবিষ্কারক। তিনি মিথ্যার আশ্রয় নেন না, কাউকে ছোট কিংবা বড় করার দায় তার নয়। তিনি একথা বলবেন না বাংলাদেশের অমুক লেখকের অমুক উপন্যাস গোর্কির মাদার উপন্যাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। যদি বলেন তা হবে পাপাচার, অবশ্যই ক্ষমার অযোগ্য।

এমন দাবি করা ঠিক নয় একমাত্র তারাই প্রবন্ধ সৃষ্টির অধিকারিক, যারা মৌলিক রচনা করেন না। মনে রাখতে হবে আমাদের প্রবন্ধসাহিত্যের উৎকর্ষ এনেছেন মৌলিক সাহিত্যস্রষ্টারাই। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব বসু তো মৌলিক স্রষ্টা। তারপরও প্রচুর প্রবন্ধ তাঁরা রচনা করেছেন যা রীতিমতো অবাক করবে পাঠককে। আমাদের প্রবন্ধসাহিত্যের সংকটকাল তৈরিতে প্রকৃত অর্থে কবি, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকারদের প্রবন্ধ সৃষ্টিতে অনীহাও দায়ী। আমরা জানি প্রবন্ধ শ্রমসাধ্য শিল্পমাধ্যম। একজন কবি বা কথাসহিত্যিক যদি নিজেদের মাধ্যমের

গপরই চিন্তামূলক অনুসন্ধানী রচনা তৈরি করেন তবে লাভটা কিন্তু তাঁরই। এতে মেধার চর্চা হয়, নিজের শিল্পপ্রতিবন্ধকতাগুলো শনাক্ত করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে প্রবন্ধসাহিত্যের ভাণ্ডারও সমৃদ্ধ হয়। একথা বাস্তব সত্য যে, বাংলাদেশের অগ্রগামী প্রবীণ কবি ও কথাসহিত্যিকরা উল্লেখ করার মতো প্রবন্ধের বই লিখেননি। অতি ক্ষীণকায় যাও বা আছে তা প্রবন্ধসাহিত্যকে (জাতীয় বিবেচনায়) সমৃদ্ধ করার মতো নয়।

প্রত্যাশাটা বরং তরুণদেও প্রতি। তরুণরাও সে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছে না। ওরা যে গদ্য রচনা করছে না, এমন নয়। অবশ্যই করছে। কিন্তু এদের অধিকাংশ লেখাই মাধ্যমিক কিংবা উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর রচনার মতো। দৈনিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক থেকে শুরু করে লিটল ম্যাগাজিনের লেখাগুলো এর প্রমাণ। মাঝে মধ্যে খুবই অল্পসংখ্যক লেখা আমাদের ভরসা জাগায়। কিন্তু এরা অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। বিপুলসংখ্যক লেখার ভেতর কোনো মৌলিকত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে কোন কবি কোন কোন শব্দ কতসংখ্যক ব্যবহার করেছেন এসব গণনা করা তো সমালোচকের কাজ নয়, মেধায় চর্চার তো নয়ই। বরং মেধাশূন্যতার পরিচায়ক সাহিত্যকর্ম।

বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্যের সংকট ধরা পড়ে রচয়িতার প্রবন্ধ রচনার পর উল্লিখিত তথ্যসূত্র বা সহায়ক সূত্রের দীর্ঘ তালিকা দেখলে। তথ্যসূত্র তথা মূল গ্রন্থের কোটেশন হিসাব করলে লেখকের কোনো বক্তব্যই খুঁজে পাওয়া যায় না। পাঁচ পাতার প্রবন্ধের ভেতর যদি সাড়ে চারপাতা ধারকরা কথায় পূর্ণ থাকে তবে মৌলিকত্ব আর কোথায় মিলবে? তাই সমালোচনা-সাহিত্যে নতুন আবিষ্কার খুঁজে পাওয়া যায় না। অগ্রজগণ যা বলে গেছেন তা যদি বারবার ঘুরেফিরে আসে তবে তো তা আর মৌলক প্রবন্ধ হলো না।

রাষ্ট্রব্যবস্থা মানুষের চিন্তার জগৎকে যে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তাও স্পষ্ট হয়ে আসে প্রবন্ধের বক্তব্যের ভঙ্গিতে। ধনবাদী রাষ্ট্র ব্যক্তিকে ব্যক্তি থেকে এবং বৃহৎ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এই বিচ্ছিন্নতা ব্যক্তির ভেতর আত্মকেন্দ্রিকতা, অহংবোধ বা আমিত্বকে উসকে দেয়। ব্যক্তি তখন 'আমি' হয়ে ওঠে। কর্তৃত্বপরায়ণতা জন্ম নেয় ব্যক্তির ভেতরে। একজন তরুণ, যে সবেমাত্র লেখালেখিতে হাত দিয়েছে, যার লেখা বলতে গেলে পত্রপত্রিকায় ছাপাই হয়নি, সে যদি প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে লিখে বসে 'আমি এটা মনে করি', 'আমি স্পষ্ট বলতে পারি', 'আমি দেখেছি', 'আমি এ বিষয়ে এখন যাচ্ছি না', 'সময় পেলে এটা আমি ব্যাখ্যা করব', তবে এ ধরনের বক্তব্যে প্রকাশ পায় লেখকের ঔদ্ধত্য বা ধৃষ্টতা। পাঠক কখনো এসব আশা করে না। নীরদ চন্দ্র চৌধুরী, মনসুর আহম্মদ এবং আরও কারও কারও রচনায় এ-ধরনের আচরণ লক্ষ্য করা যায়। তারপরও বলা যায়, তাদের সামাজিক অবস্থান যা সৃষ্টিকর্মের কারণেই তৈরি হয়েছে, তা কি অখ্যাত কোনো তরুণের বা স্বল্পখ্যাতির প্রবীণের বেলায় খাটে?

রচনার ভেতর পাঠক বিনয় খোঁজে। কেননা বাস্তবতা এই, লেখকের আদেশ-নির্দেশ পালনকারী নয় কোনো পাঠক। প্রবন্ধের ভেতর লেখকের বক্তব্য যুক্তি দিয়ে, বিনয়ের ভাষা দিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে হয়। তবে এই 'আমি'র বিষয়টি আত্মজীবনী লেখার বেলায় খাটে, কবিতার বেলায়ও চলে; দর্শন বা যুক্তি ব্যাখ্যার বেলায় খাটে না। মনে রাখতে হবে আমিত্ববোধ লেখকের সঙ্গে পাঠকের দূরত্ব সৃষ্টি করে।

এ সবই হচ্ছে আমাদের প্রবন্ধের সংকট। এর জন্য দায়ী তরুণরা নয়, বরং এই দুশ্চরিত্র রাষ্ট্রব্যবস্থা। কিন্তু আমাদের প্রবন্ধের ঐতিহ্য মোটেই তুচ্ছ নয়। গোড়ার দিকে উনিশ শতকের হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং অপরাপর ভাবুক-চিন্তকেরা যে প্রবন্ধের ধারা সৃষ্টি করেছেন, তাদের উত্তরসূরিদের কর্মে ও মেধায় ঘাটতি নেই। অবশ্য রাজনৈতিক দর্শন তাদের আলাদা হতে পারে। একজন আবু সায়ীদ আইয়ুব আর একজন আবুল ফজল এক হতে পারেন না, যেমনি চিন্তার ক্ষেত্রে, তেমনি প্রায়োগিক ভাষার বেলায়ও।

বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্যে যে সৃষ্টিকালের এবং স্রষ্টাজনের সংকট সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ আরও গভীরে। ১৯৪৭ সালে সীমিত কিন্তু ১৯৭১ সালে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আত্মপ্রতিষ্ঠার যে ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়, তার পথ প্রশস্ত নয়, বরং অন্ধ অলিগলি। দেশি-বিদেশি দানে-অনুদানে, পুরস্কারে ভ্রমণে এবং গবেষণা অনুদানে বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার জগৎটা আজ ভয়ঙ্কর দানবের রাজত্বে পরিণত হয়েছে। এখন আর প্রলোভন, অর্থের ফাঁদ তৈরি করতে হয় না, বুদ্ধিজীবী পদবির অনেকেই সেসব খুঁজে স্বেচ্ছায় ধরা দেন। তরুণদের ডেকে নেন, সঙ্গী করেন। বুদ্ধিজীবীদের তো সময় নেই সত্য, ন্যায়, জনস্বার্থ, জাতীয় স্বার্থে মেধাচর্চা করার। বরং স্বার্থটা জাতীয় স্বার্থবিরোধী আত্মপ্রতিষ্ঠার নোংরা গলির নিশানামাত্র। তরুণরা তাই অনুকরণীয় বুদ্ধিচর্চার সৎ মানুষ যেমনি খুঁজে পাচ্ছে না, তেমনি পাচ্ছে না চর্চার ফসল নব নব যুক্তি, বুদ্ধি তথা বিজ্ঞানমনস্কমূলক অভিনব প্রবন্ধসাহিত্য।

তাই আমরা ভাবিত এ-কারণে যে, বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার অভিভাবকত্ব নিয়ে যে দু-একজন বেঁচে আছেন; তারা গত হলে দেশটার কী হবে? ওই যে ক্রমেই দুর্লভ হচ্ছে চিন্তাশীল প্রবন্ধ, কি বইয়ের দোকানে, কি পত্রপত্রিকায়, এই দুঃসময় কি আরও প্রলম্বিত হবে? চিন্তাশীল মানুষের বিলুপ্তি কি ঘটবে এই অঞ্চলে? আহমদ শরীফের স্থান পূরণ হলো কি? হলো না। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর পরবর্তীতে কে বা কারা?

সেপ্টেম্বর, ২০০৫

মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক জীবন

বিশ্ব-বুর্জোয়ার নিকৃষ্ট অংশ হচ্ছে বাংলাদেশের বুর্জোয়া শ্রেণী। শ্রেণীটি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-লালিত এবং এর ল্যাজটি হচ্ছে এদেশের মধ্যবিত্ত নামক নাক-চোখ-কান হীন অদ্ভুত শ্রেণীটি।

স্বাভাবিক কারণেই বুর্জোয়া সমাজের নৈতিকতার সংকট মধ্যবিত্ত সমাজকে স্পর্শ না করে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী লগ্নিপুঁজি-নির্ভরশীল বাংলাদেশী বুর্জোয়া-সমাজ যেখানে তার শ্রেণীর বিকাশ ঘটছে না, সেখানে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও শূন্যতা বিরাজ করতে বাধ্য। তাই দেখা যায় অপসংস্কৃতির এত দাপট। অপসংস্কৃতি নিশ্চয়ই স্বাভাবিক বুর্জোয়া সংস্কৃতি নয়, পচনশীল বুর্জোয়া সংস্কৃতির পরিণাম মাত্র। স্বাভাবিক জন্ম, বর্ধন, বিকাশ ও ক্ষয় জীবন-ইতিহাসের এই নির্ধারিত সূত্র বাংলাদেশের ধনবাদের বেলায় খাটে না। এদেশে ধনবান হচ্ছে জন্ম বিকলাঙ্গ একটি অবৈধ শিশু। সে শিশু কেবল মৃত্যুর প্রহর গুনছে এবং ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে বেঁচে থাকার।

অন্যদিকে এ-দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর ভেতর নতুন কোনো মেধাশক্তিধর বুদ্ধিজীবীর জন্ম হচ্ছে না। শ্রেণীগত এই সংকট দূর করার চেষ্টায় রত রয়েছে ভাড়াটে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী। এটাও দেখা যায়, এককালে উন্নত ও বুর্জোয়া সমাজ অনুন্নত সমাজে যে মূল্যবোধ নিয়ে এগিয়ে আসতো, তা আজ হচ্ছে না। কেননা বুর্জোয়া সমাজেই সেই উন্নত মূল্যবোধের সমাপ্তি ঘটেছে। এতএব বিকল্প হিসেবে ডিসকো-পপ ব্যান্ড রপ্তানি করছে তারা। ক্রেতাদেরও সেই পণ্য কেনা ছাড়া উপায় থাকছে না। কেননা, যা দিয়ে তাকে ঠেকানো যেতে পারে তেমনি উন্নত দেশীর সংস্কৃতি-পণ্যের উৎপাদন হচ্ছে না।

বুর্জোয়া শ্রেণীর নিকৃষ্টতম অংশ এই মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে কেউ কেউ বলছেন জীবিকার সাথে সম্পর্কহীন সংস্কৃতিচর্চায় রত রয়েছে শ্রেণীটি। কিন্তু জীবিকার সাথে সম্পর্কহীন সংস্কৃতির কোন না কোন অংশ নিয়ে চর্চা করলেই যে তা অধিকারের বাইরে হবে এমন কোন বাধা-ধরা

নিয়ম আছে কি? কোন অধ্যাপক নাটক কিংবা সংবাদপত্রের সাথে জড়িত থাকলে, কোন প্রকৌশলী গান গাইলে, কোন পেশাাদার গায়ক ছবি আঁকলে আমরা মনে করতে পারি না তিনি তাঁর সীমানা লঙ্ঘন করেছেন। দেখতে হবে এসব কর্মকাণ্ডের ভেতরে দর্শনের মিল-অমিলটা।

মূলকথা হচ্ছে, মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি চর্চা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অনুসন্ধান করা দরকার কোন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে দেশিয় এই শ্রেণীটির উদ্ভব। আর সেখানেই লুকিয়ে রয়েছে তার জীবন চর্চার মহাসত্য। কেননা অনেক জটিল রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেহের বাইরের লক্ষণই যথেষ্ট নয়, দেহাভ্যন্তরের গভীরে অতিসতর্ক পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ চালাতে হয়।

যে ঐতিহাসিক কার্যকারণ ইউরোপে উদ্ভব ঘটিয়েছিল মধ্যবিত্তের, ঠিক তেমনটি ঘটেনি এদেশে। যে ঔপনিবেশিক শক্তি এদেশে সামন্ত অর্থ-ব্যবস্থাকে গোড়ার দিকে আঘাত করেছিল তারাই কিন্তু দেশিয় ব্যবসায়ী (দালাল) পুঁজিপতি শ্রেণীকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামে সামন্ত প্রভুতে রূপান্তিরিত করে ব্রিটিশ ও দেশির পুঁজির দ্বন্দ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেলেছিল। সামন্তবাদ থেকে উঠে-আসা এবং ধনবাদের দিকে অগ্রসরমান পুঁজিকে ফের সামন্তবাদের গর্তে পোঁতে দেওয়ার প্রক্রিয়ার রহস্যের মাঝেই লুকিয়ে আছে এদেশের মধ্যবিত্ত-সৃষ্টির গোপন কথা।

ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিকভাবে এদেশে ধনবাদের জন্মের সুযোগ না দিয়ে শাসকশ্রেণী সমাজে চাপিয়ে দেয় অসম ধনবান। সেই ক্ষয়মান দেশিয় সামন্তবাদ আর অসম ইউরোপীয় ধনবাদের সংমিশ্রিত রাসায়নিক বস্তু দিয়ে অবৈধভাবে এদেশে জন্ম হয় মধ্যবিত্ত সমাজের। সেই মধ্যবিত্ত স্বাভাবিক কারণেই ছিল বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজির সেবা-দাস, দেশির জাতীয়-পুঁজির নয়। এভাবেই বিকৃত অসম-জন্মের মধ্যবিত্তের বিকাশও ঘটে বিকৃত সূত্র ধরে।

এরপরেও ঐতিহাসিক কাল বিভাগ করে মধ্যবিত্তের স্তরগুলোকে বিচার করলে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হয়ে আসবে। ৪৭-উত্তর মধ্যবিত্তের সাথে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে '৪৭-পূর্ব স্তরের, '৭১-উত্তর দলের সাথে '৭১-পূর্ব দলের। এই পার্থক্য ধনতন্ত্রের ক্রমক্ষয়মান এবং বিকৃত ধারারই সাক্ষ্য। যেমনটা আমরা দেখতে পাই ধনবাদের গোড়ায় কালের ইউরোপীয় মধ্যবিত্তের সাথে হালের বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের জীবনচর্চার পার্থক্যের ভেতর।

জন্ম যার অবৈধ-বিকৃত-অবাঞ্ছিত, বিকৃতির-ভেতর-বিকৃতি নিয়ে যে শুরু করে জীবন, সংস্কৃতি চর্চাও যে তার এমনি সংকটময় হবে তাতে অবাক হবার কারণ নেই। এদেশের মধ্যবিত্তের জীবনে আছে চরম টানাপোড়েন। আছে জীবনগ্লানি, যন্ত্রণা আর অপ্রাপ্তির দুঃখ। তাই বিকৃত অবাঞ্ছিত ধনবাদী অর্থব্যবস্থা মধ্যবিত্তকে লম্পট হতে প্রেরণা যোগায়। সামন্ত অবশেষ মূল্যবোধ-সংস্কার তাকে ছদ্ম-আধ্যাত্মিকতার দ্বারস্থ হয়ে হতাশা থেকে মুক্তির মিথ্যে স্বপ্ন দেখায়।

আর এ-সবকে কেন্দ্র করেই মধ্যবিত্ত মানসে তৈরি হয় এক জটিল ভূমি। সেই জটিলতা তাকে বানায় ধৈর্যশূন্য, চেতনাশূন্য এবং ভীরু-কাপুরুষ। মগজের নিস্তেজ নার্ভকে কৃত্রিমভাবে তারা তাই সচেতন রাখতে চায় বিপরীত পথে। এ-কাজটা ওরা করছে নির্বোধের মতো, সচেতনভাবে নয় মোটেই। উন্নত পুঁজিবাদী দেশের মধ্যবিত্তের সাথে বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের তফাতটা সেখানেই। সমাজের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ তা অবশ্য করছে বুঝেশুনেই।

এই যে মধ্যবিত্তের জীবনচর্চার অস্বাভাবিক দিক, এটাই কিন্তু আজকের মধ্যবিত্তের জন্য স্বাভাবিক পরিণতি। জীবনচর্চার এই নীতি-নৈতিকতাশূন্য প্রেরণা আজকের মধ্যবিত্ত সমাজের চরম সাংস্কৃতিক সংকট থেকে উদ্ভূত। কেননা বিকৃত মানস-ভূমির মালিকের জমিনে বিকৃত কুফসলই বাঞ্ছিত। এ-সংকট তো তার প্রজননের সংকট। তাই যান্ত্রিক অথবা সনাতনী সূত্র ধরে এদেশের আজকের মধ্যবিত্ত সমাজকে বিশ্লেষণ করা যাবে না। সাম্রাজ্যবাদী লগ্নিপুঁজি অবৈধভাবে যে মধ্যবিত্তের জন্ম দেয় এবং লালন পালন করার নামে চরম নোংরা বানায়, তাদের শ্রেণীচরিত্র, সাংস্কৃতিক জীবনদর্শন ব্যাখ্যা পূর্ব-নির্ধারিত ধারণা দিয়ে সম্ভব নয়।

আদতে মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি বলতে ভিন্ন কিছু আছে কি? জাতি হিসেবে যেখানে মধ্যবিত্ত হচ্ছে বিত্তমান সমাজের অতি নিকৃষ্ট প্রজাতি, সেখানে বিত্তবানের সংস্কৃতির উচ্ছিষ্টভোগী হতে সে বাধ্য। জাতি-শেয়াল আর পাতি-শেয়ালের পার্থক্য হচ্ছে আকারে আর প্রকারে। এবং অবশ্যই ক্ষমতায়। মোটেই আচার-আচরণে নয়। ক্ষমতার কারণেই পাতি-শেয়াল ছাগলের ওপর হামলার বদলে মাঠ খুঁড়ে ক্ষুধা মেটায় গোবরে পোকা চিবিয়ে।

বুর্জোয়া সমাজে সংকট দেখা দিলে মধ্যবিত্ত সমাজেও সংকট নামতে বাধ্য। এ দেশে নির্ভরশীল বুর্জোয়া সমাজের স্বাধীন পুঁজি খাটিয়ে শিল্পবিকাশের ব্যর্থতার ফল যেমনি তাদের সংকট সৃষ্টি করেছে, তেমনি করেছে মধ্যবিত্তের। মধ্যবিত্তের সুখ-সুবিধা, চিন্তা-চেনতা, বিবেক-বিবেচনা এবং স্বভাব-অভ্যাসের এহেন সংকটের ফলেই তার জীবনযাপনে মিশ্রণ ঘটে যুক্তিবাদ এবং ভাববাদের।

তাই একই ব্যক্তি-মানসে গণ-সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল-গীতি, লালন-কীর্তন-মুর্শিদী আর ব্যান্ড গানের সহাবস্থান চলে। কেননা তার চেতনাজগৎ সুনির্ধারিত-সুনির্দিষ্ট নয়। অখণ্ড অদ্বিতীয় চৈতন্যের প্রশ্নই ওঠে না। খণ্ড-বিখণ্ড, সমতল-বন্ধুর চেতনার তো কোন নীতিবোধ থাকে না। থাকে না রুচি-রীতি জ্ঞান। এমনিতরো চেতনার জমিনে ফসলের সাথে অবশ্যই জন্মাবে আগাছা। এমনভাবে জন্মাবে যে, একটা থেকে আর এটা আলাদা করাও মুশকিল। একই মানসের ভেতর হাজার ইচ্ছা-বাসনার জন্য সময়বোধ হাজারটা উপকরণই দরকার। এটাই বাস্তব সত্য।

এই প্রতিক্রিয়ায় কি দেখতে পাই আমরা? দেখতে পাই মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে স্বনির্বাচিত হতাশার শোকদিবস পালন করছে। তাই তারা সেই শোকমুক্তির আশার সাংস্কৃতিক দিবস পালনের নামে সুযোগ ও সময় এলেই পালন করে উৎসব। তাই তো একুশে ফেব্রুয়ারি, পঁচিশে-ছাব্বিশে মার্চ, মে দিবসকে ওরা রূপান্তরিত করে উৎসবে। কেননা প্রতিদিনের ব্যর্থতার গ্লানি থেকে তারা চায় মুক্তি। সেই মুক্তি খোঁজে এক বিকৃত আচরণে। অথচ জীবনের বাস্তবতার বাইরে সভ্যতা বিবর্জিত দ্বীপবাসী ওরা। সেই দ্বীপের চারপাশে লোভ, ভোগবাদ হীনমন্যতা আর সুবিধাবাদের কালোপানি। পানির ওপর আসমানে ডানা মেলে উড়ছে নীতি-ব্যবসার চতুর সামুদ্রিক চিল। কী আশ্চর্য! মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা বলতে বোঝে আপস করাকে, আত্মসমর্পণকে এবং চরিত্রহীনতাকে।

এই চরিত্রহীন মধ্যবিত্ত কেমন করে পারে সুস্থ শিল্পের, সুস্থ সংস্কৃতির জন্ম দিতে? ওরা তাই ভাড়া খাটে বুর্জোয়াসৃষ্ট অপসংস্কৃতির। তাতেও যখন আখের ঘোচেনা তখনই তারা প্রগতিবাদ কপচায়। এ-প্রচেষ্টার গোপন কথাটি হচ্ছে ঘৃণ্য আত্মপ্রতিষ্ঠা। তাছাড়া রাজনীতির সাথে ওরা যা করছে, ইতিহাসের এর চেয়ে জঘন্য দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে!

তাই তো একুশ আর পয়লা বৈশাখ যার চেতনায়, হৃদয়ে তার বায়োনিক ওম্যান, আর চোখ ভরতি ডলারম্যান। আসলে দর্শকের বাসর ঘরটি তো শূন্য। ঘর তো শূন্য থাকে না। থাকতে হয় দয়িতাকে; নয়তো চামচিকের জন্য ছাড়তে হবে আধিকার, আপত্তি ছাড়াই। তাই তো শূন্য বাসরের 'একুশ' ফুলশয্যায় শুয়ে থাকে বায়োনিক ওম্যান।

ব্যাপারটা মোটেই ভণ্ডামী নয়। মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক সংকটেরই পরিণাম। কেননা শীতে সফল ফুরোয়, অথচ আমরা বপন করতে পারি না বসন্তের ফসল-বীজ। তাই তো পরবাসী বুনো আগাছা দখল নেয় জমি-নির্বিবাদে। ক্ষুধা আছে বলেই আগাছা বীজ আমরা গিলতে থাকি ফসল ভেবে। সেই অবৈধ ক্ষুধা উদরে চাপিয়ে দিয়েছে আমাদের অবৈধ জন্ম এবং সাম্রাজ্যবাদেরর ক্ষয়কালীন রোগের ভাইরাসে ঠাসা সংস্কৃতি।

ব্যাপার বোঝা কঠিন নয়। এদেশের মধ্যবিত্তের রুচি-রীতিই স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে তার শ্রেণী-চরিত্র। জীবন-যাপন, ঘর-সংসারের নানা উপকরণই ধরিয়ে দেয় রোগটা কোথায়। শিক্ষক, উকিল, প্রকৌশলীর ড্রয়িংরুমে বিদেশি উপকরণের সাথে দেশিয় লোকজ উপকরণের সহাবস্থানের ব্যাপারটির ভেতরই শ্রেণীটিরও সংস্কৃতি চেতনার মূল রহস্য ব্যাখ্যাত। এতে পরিষ্কার হয়ে পড়ে তার চরম শ্রেণী-সংকটের গোপন কথাটিও।

গ্রামের মেধাবী যে-ছেলেটি অধ্যাপক কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আজ নগরবাসী, তাঁর মনোজগতে তারই অজান্তে বেঁচে-বের্তে আছে লোকজ সংস্কৃতির অবশেষ। তার ড্রয়িংরুমে আধুনিক মহাকাশযানের মডেল, স্ট্যাচু অব

শিবাটির মডেল কিংবা আধুনিক বিমূর্ত আর্টের সাথে লোকজশিল্পের নির্বিবাদ সহবাস সে কারণেই। তাই ড্রয়িংরুমে সাজানোর হাজারো আধুনিক উপকরণ শহরের বাজারে থাকতেও তাঁর লোকজ শিল্প-প্রেম মোটেই প্রতারক মনের পরিচয় বহন করে না। তাছাড়া নগরে জন্ম নেওয়া কোন অধ্যাপক বা আমলার বেলায় এমনটা ঘটলে ধরে নিতে হবে এটা এদেশের অপূর্ণ কিংবা বিকৃত নগর-সভ্যতারই পরিণাম মাত্র।

বাংলাদেশের নগর কেবল গ্রামেই প্রবেশ করে না, গ্রামও প্রবেশ করে নগরে। তবে নগরের মতো সর্বগ্রাসী চরিত্র নিয়ে নয়। তাই তো দেখা যায় শহরের ভদ্রজনের ঘরের মূল্যবান শোকেসের ভেতর দামী খেলনা ও ঐতিহাসিক শিল্পকর্মের সাথে অনায়াসে সহাবস্থান চলছে বাসন-পত্রের।

রান্নাঘরের জিনিস কেমন করে এখানে ঢোকার অধিকার পায়? যে অবসরভোগী শ্রম-বিমুখ গৃহণী এ কাজটা করলেন তার সাথে তো রান্নাঘরের সম্পর্ক শিথিল। তবু এমনটা ঘটলো কেন? জবাবটা সহজ। যে গৃহিণীকে তার সংসার মুক্তি দিয়েছে রান্নাঘর থেকে, তার মগজে তো গোপনে ঘাপটি মেরে বসে আছে সামন্ত সংস্কার : 'রান্নাঘর নারীর পবিত্র স্থান'। তা হলে আমরা কি বলতে পারি এসব ব্যাপার কেবলই গৃহসজ্জা? এটা কি সংস্কৃতির সংকট নয়?

এই সংকট মধ্যবিত্তকে শেখাচ্ছে বিকৃতি। তাই তো মধ্যবিত্ত চাকরির জন্য পিতাকে মিথ্যে একাত্তরের রাজাকার বানাতেও দ্বিধা করে না, যদি মিলে যায় মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক দেশিয় প্রতিষ্ঠানটিতে লোভনীয় চাকরিটি! উন্নত জীবনের লোভে এই সমাজ ইউরোপ-আমেরিকার দেশে দেশে মৃত্যু-ভীতির জাল সার্টিফিকেট নিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়। অর্থের মোহে উচ্চশিক্ষিত যুবকও মধ্যপ্রাচ্যে ঝাড়ুদারের চাকরি নিয়ে নিজকে ধন্য মনে করে। সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের সাথে জড়িত মধ্যবিত্তের দিকে তাকালে বোঝা যাবে শ্রেণীটি কী জঘণ্য!

চরিত্রহীন বিত্তবানের ঘরে ঘরে দেহব্যবসা করে বেড়ায় যে রমণী সে তো মধ্যবিত্ত সমাজের। বিত্তহীন সমাজের রমণী যেখানে ক্ষুধার হাতে পরাভূত হয়ে আত্মসমর্পণ করে দেহব্যবসায়, সেখানে উচ্চতর জীবন ভোগের হীন লালসায় মধ্যবিত্ত রমণী নিজকে বিকোয়। ডলার তাদের টেনে নিয়ে যায় গুলশান বনানীর বিদেশিদের বাসভবনের স্বর্গীয় বিছানায়।

একাত্তরে মধ্যবিত্ত ঘরের যে যুবতীটি পাকিস্তানিদের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছিল, পঁচাশিতে ঢাকা হকি মাঠে পাকিস্তানের জেতার গৌরবে আত্মহারা হয়ে পটকা ফাটিয়ে খেলোয়াড়দের গলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তারই ছোট ভাইটি। মাইকেল জ্যাকসন তার স্বপ্ন, জন রীডের নাম তার অজ্ঞাত। বিকৃতজন্মের মধ্যবিত্তের বিভ্রান্ত তারুণ্যের এক চেয়ে আর কী জঘণ্য দৃষ্টান্ত হতে পারে?

একাত্তরে যে মধ্যবিত্ত তার শ্রেণীগত কারণে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল, বাহাত্তরে সেই হাতেই উঠে যায় ব্রিফকেস। তারই একটি অংশ তো আজ কোটিপতি। তারাই তো শ্রমজীবীর দুর্দশার কারণ। বাকি অংশটির কোটিপতি

হবার প্রচেষ্টার প্রক্রিয়া আজ শ্রমজীবীকে ফেলেছে অবর্ণনীয় দুঃখে-কষ্টে। ধনীরা যেখানে শ্রমজীবীর পয়লা নম্বর দুশমন, সেখানে এই চরিত্রহীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি হচ্ছে দুই নম্বর। সমাজ পরিবর্তনে শ্রমজীবীর সহায়ক শক্তি নয় মোটেই তারা, সামাজিক ঘৃণ্য দুশমন মাত্র।

বড় হাস্যকর ব্যাপার, এই অন্ধ মধ্যবিত্ত সমাজ আজও বুঝতে পারছে না শ্রেণী হিসেবে বিকাশ বা অস্তিত্ব রক্ষার বিকল্প কোন পথই নেই তার, একমাত্র শ্রমজীবীর সাথে রাজনৈতিক সংস্কৃতিক ঐক্য ছাড়া। তার মুক্তির একমাত্র নির্ধারিত পথই হচ্ছে শ্রেণীগত উজ্জ্বল চেতনা। সেই চেতনা তাকে মুক্তি এনে দেবে সংকটময় সংস্কৃতির হাত থেকে। মধ্যবিত্তের বড় সংকটই হচ্ছে উপলব্ধির সংকট। এই সংকট থেকে মুক্তি নিয়ে যদ্দিন না তারা শ্রমজীবীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে তদ্দিন শ্রমজীবীর শত্রু শিবিরে থাকবে তাদের অবস্থান।

সাহিত্য পত্র : ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা– ১৯৮৫

শ্রমজীবীর শ্রেণী-সঙ্গীত

শ্রেণী আছে বলেই আছে শ্রেণী-সংস্কৃতি। আর সেই-সংস্কৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ শ্রেণী-সঙ্গীত। সঙ্গীত নিছক কোন শ্রেণীর আনন্দের উপকরণ নয়, তার অস্তিত্ব রক্ষা এবং বিকাশেরও সহায়ক শক্তি।

তাই সংস্কৃতির যে অংশটি দ্রুত এবং কার্যকরভাবে শ্রমজীবী মানুষকে শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে নিঃসন্দেহে তা হচ্ছে সঙ্গীত। শিক্ষাগত চেতনার নিম্নমান হেতু সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য এবং অপরাপর শিল্পাংশগুলো শ্রমজীবীর চেতনায় প্রবিষ্ট হতে বড় বেশি বেগ পায়। অবশ্য এসব শিল্পের আঙ্গিক যদি যথার্থই তাদের চেতনাকে বিচার পরিমাপ করে তৈরি করা সম্ভব হয় তবে সেক্ষেত্রে কিছুটা আলাদা রূপ দিতে পারে। তবু সঙ্গীতের মতো দ্রুত কার্যকর ক্ষমতা অন্যান্য শিল্পের নেই। এর কার্যকর ক্ষমতা-বৈভব দু'ধরনের : প্রথমটি শ্রেণীগত আত্মবোধ জন্মানো, অপরটি শ্রমের ভার-মুক্তির প্রেরণা যোগানো।

শ্রমজীবীর রাজনীতি শত্রুপক্ষের দখলে বলেই তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের বিরাট অংশও শত্রুপক্ষের দ্বারাই নির্ধারিত। এক্ষেত্রের মধ্যবিত্তের মতো শ্রমজীবীরও চলছে সংস্কৃতির দীর্ঘ বন্ধ্যাত্ব। তাই শ্রমজীবীর শ্রেণী-সংস্কৃতি এত দীর্ঘদিন বাদেও একটা রীতি-পদ্ধতিতে গড়ে উঠছে না। এখনো সামন্ত সংস্কৃতি শ্রমজীবীর সাংস্কৃতিক জীবনে বড় ভার হয়ে আছে, জরাগ্রস্ত ধনবাদের অপসংস্কৃতি সেই সংস্কৃতির পাশাপাশি নির্বিবাদে সহাবস্থান করছে শ্রমজীবী-মানসে। সঙ্গীতের বেলায় সে অবস্থাটি আরো ব্যাপক।

শ্রমজীবীর শ্রেণী-সঙ্গীতের ধারা তৈরি হচ্ছে না বলেই শূন্যস্থান পূর্ণ করে আছে সামন্ত আধ্যাত্মবাদী জীবনবিমুখ গান এবং ধনবাদসৃষ্ট অপ-সঙ্গীত। শ্রমজীবীরা বিভ্রান্ত হয়ে তাই গাইছে বেতার, টি.ভি. আর চলচ্চিত্রের চটুল গান, যে গানের সঙ্গে তার জীবনযাপনের নেই কোন সম্পর্ক, সে গান গেয়ে সে কেবল নির্বোধ পুলক মাত্রই অনুভব করতে পারে। এর কুফল শ্রেণী হিসেবে

গড়ে ওঠার চরম অন্তরায় করেছে শ্রমজীবী সমাজের জন্য। তাকে করেছে অদৃষ্টবাদী, লোভী এবং নৈতিক আদর্শ বিবর্জিত।

সেই চর্যাগীতি থেকে বিবর্তনের পথ ধরে নজরুল, কানাইলাল, রমেশ শীল, হেমাঙ্গ বিশ্বাস শ্রমজীবীর সঙ্গীতের যে ধারার সূত্রপাত ঘটালেন, তাকে উন্নীত করা তো দূরের কথা, বুঝিবা ধরে রাখাও যাচ্ছে না। বাম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যর্থতা এবং সীমাবদ্ধতার দরুণই বিপ্লবের স্বার্থে রাজনৈতিক কর্মী গঠনে যেমনি আসছে স্থবিরতা, ঠিক তেমনি গণসঙ্গীতের সুরকার, গায়ক এবং গীতিকার তৈরি করার ক্ষেত্রেও ঘটছে একই ব্যাপার।

গণসঙ্গীতের এই শূন্যতা যদ্দিন চলবে, তদ্দিন শ্রমজীবী মানুষ যে-গান গাইবে তা কোন কাজেই আসবে না শ্রেণী-চেতনা জাগানো এবং শ্রমের ভারমুক্তির প্রেরণা যোগানোতে। কি কাজে, কি অবসরে শত্রুপক্ষের গান গেয়েই ওরা মিথ্যে আনন্দের গোলকধাঁধার পথে চলবে দিনকে দিন। নয়া সুর তৈরিতে ব্যর্থ হয়ে বিপ্লবী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলো কর্তৃক পুরোনো পল্লী-ভাটিয়ালী সুরের দ্বারস্থ হবার বিচ্ছিন্ন ঠুনকো প্রচেষ্টা তাদের রক্ষা করতে পারবে কি?

জীবন-জীবীকাকে কেন্দ্র করে আদিম শ্রমজীবী সমাজ যেমনি শুরু করেছিল তাদের সাংস্কৃতিক জীবন, আজকের শ্রমজীবী তাকে ক্রমশ উন্নত বিপ্লবী স্তরে বিকাশ ঘটানো তো দূরের কথা, ধারাবাহিকতাটুকুও রক্ষা করতে ব্যর্থ। এই ব্যর্থতারই মূল কারণ বন্ধ্যাত্ব। বন্ধ্যাত্ব জন্ম দিয়েছে সংস্কৃতির চরম সংকট। যদিও আমাদের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীয় মাঝে জীবিকা-ভিত্তিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড কিছুটা আজও বেঁচে আছে, তবু মূল্যবান অংশটি হারিয়ে গেছে। এর ফলে সেখানেও চলছে স্থবিরতা।

আমাদের শ্রমজীবীরা যে গান গায় তার সাথে শ্রেণী-প্রেরণা এবং শ্রমের যতটুকু সম্পর্ক তার চেয়েও ঢের বেশি সম্পর্ক গায়কের ব্যক্তি-মানসের। ব্যক্তি-চেতনাকে ডিঙিয়ে আসছে না সমষ্টি-চেতনার অভিব্যক্তি।

একজন শ্রমিকের মনে সুর ও গানের জন্ম দেয় তার হাতিয়ারের ধ্বনি এবং শরীরের পেশি চালনা। হাতিয়ারের ধ্বনি, পেশি চালনা এবং চারপাশের প্রকৃতির বিশেষ ভাবমূর্তির সমন্বয়ে শ্রমিকদের মনের ভেতর এক ধরনের আবেগানুভূতির সৃষ্টি হয়। সেই আবেগই আদতে গানের উৎসস্থল। হাতিয়ারের ধ্বনি সৃষ্টি করে তাল, প্রকৃতি তৈরি করে ভাব। অন্যদিকে জীবনের বাস্তবতা তৈরি করে গানের ছন্দময় কথা। সেই ভাব ও তালের সমন্বয়, সুরময়তাই গান না-জানা শ্রমিককেও গান গাইয়ে ছাড়ে।

গান তো গাইবে, কিন্তু কী গান? শ্রেণী-অসচেতন শ্রমিকেরও গান স্থূল আনন্দ কিংবা ব্যক্তিগত বেদনাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না। আদতে সামাজিক শ্রেণীগত চেতনা বিশেষ স্তরে উন্নীত না হলে গানের সাথে শ্রমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। যেমনটা সমাজতান্ত্রিক দেশের কিংবা সাম্রাজ্যবাদী পশুশক্তির বিরুদ্ধে

লড়াইয়ে রত কৃষক শ্রমিকেরা গেয়ে থাকে, তেমনটা কিন্তু ঘটে না অসচেতন শ্রমজীবীর বেলায়। আর আমাদের? রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎপাদন অর্থে শ্রমজীবীরা যে-গান গায়, সে অর্থে মোটেই আমাদের শ্রমজীবীরা গায় না।

গান হচ্ছে পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত আপন শ্রেণী-চেতনা নির্ভর মনোভূমে সৃষ্ট ভাবানুভূতিরই সুরময় প্রকাশ। নদী-চরিত্র, তার বিপুল-বিশালতা, গভীরতা, নিঃসঙ্গতা এবং তাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ এদেশের মাঝিকে বানায় গায়ক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি'র জেলে তার শ্রেণী এবং নিজস্ব অর্জিত চেতনার কারণেই ক্লান্তি দূর করতে টানে তামাক। পদ্মার বিপুল-বিশালতায় সে জেলেই ফের হয়ে ওঠে ভাবুক। গেয়ে ওঠে বিরহ সঙ্গীত। সেই বিরহ সঙ্গীতের সাথে মাছ ধরা শ্রমের কোন সংযোগ সম্পর্ক না থাকলেও একপ্রকার ভাবানুভূতি আছে যা তাকে উল্টো পথে শ্রমের ভার ভুলিয়ে রাখে খানিকটা। কিন্তু এ তো যথার্থ পথ নয়।

নদীর উত্তালতার মাঝে লুকিয়ে থাকে ভয়। ব্যক্তি-বিশেষের অনুভূতির কারণেই নদী হয়ে ওঠে রোমান্টিক। নদীর বুকের জলতরঙ্গের ধ্বনি, বৈঠার সাথে জলের আঘাতের ধ্বনি, স্রোতের ধাক্কায় নৌকার তলার ছন্দময় ধ্বনি মিলেই সৃষ্টি হয় সুরধ্বনির। সেই ধ্বনি আর মাঝির চেতনার-স্তরনির্ভর মনোদৈহিক প্রক্রিয়ার মিলনে জন্ম নেয় গান। এ দেশের মাঝি তখন যে গান গায় তার কথার মাঝে থাকে সংসারের সমস্যার কথা, ভালোবাসার সমস্যার কথা, স্মৃতির কথা, পরকাল-ভীতির কথা। নিজের গাওয়া গানের ভাবের সাথে মাঝি ডুবে থাকতে থাকতে পথ ফুরোয়। সে ফুরনোটা কী? সে হচ্ছে তার প্রেরণার ফল, শ্রমের ফল।

সুরের বেলায় খাটে একই কথা। প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতার এক এক শর্ত এদেশের জন্ম দিয়েছে এক এক ধরনের সুর। নদী-চরিত্রই জন্ম দিয়েছে ভাটিয়ালী। নদী এবং তার আদিমতা ছাড়া এ সুর জন্মে না, জন্মাতে পারে না। ভূভাগ ছেড়ে যে মাঝি জলে সমর্পণ করে তার শরীর ও অভিব্যক্তি, ভূভাগের জীবন-সংগ্রামের অনেক ব্যর্থতাই তখন তার কণ্ঠে নদীস্পর্শে হয়ে ওঠে সজীব। নদী যেন তার পরম সখা। সে সখা তো দ্বিধাহীনভাবে শোনে তার ভূভাগের অপ্রাপনীয় আশার, অপ্রকাশিত বেদনার বাণী। তখন জীবন বৈরিতার কথক হয়ে যায় মাঝি।

এ হচ্ছে কিন্তু চরম রোমান্টিকতা, পলায়নপরতা, জীবনবিচ্ছিন্নতা। সামাজিকভাবে অর্জিত অনুভূতির কার্যকারণেই মাঝি ভূভাগের ব্যর্থতা নদীর নির্জনতায় ঢেলে দিয়ে এক দূর প্রবাসী কাল্পনিক প্রশান্তি খোঁজে। হতে চায় ভার মুক্ত। সেই আশা-নিরাশার, দুঃখ-সুখের, সন্দেহ-বিশ্বাসের সুর হচ্ছে ভাটিয়ালী; মোটেই উজানী নয়। সে সুর করুণ কিংবা শান্ত রসে সিক্ত, বীর রসের নয় মোটেই।

অথচ শ্রমের প্রেরণাদায়ী লড়াকু সারি গান গেল কোথায়? উত্তাল নদীকে জয় করার প্রেরণামূলক গান কি ফুরিয়ে গেল? নাকি নদীর উত্তালতা হার মেনেছে মানুষের কাছে? কিন্তু নর-দানবের উত্তালতা তো গর্জনে গর্জনে কাঁপাচ্ছে ভূভাগ। ভাবতে অবাক লাগে, শ্রমজীবী মানুষ সারি গানের মতো এমনি সংগঠিত কোরাসের জন্ম দিতে পারল কী ভাবে? এ-গান তো হচ্ছে শ্রমজীবীর ঐক্যের প্রতীক। একলা গাওয়া যায় না এ-গান। দলের প্রয়োজন। অতি অবশ্যই প্রয়োজন। শ্রমজীবী মানুষের বিপদজয়ের সংঘবদ্ধ সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার এ-এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত।

ভাওয়াইয়া? তার সুর ও কথা উত্তর বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ, সেখানকার মানুষের মন-মনন এবং তার পুরোনো কৃষিভিত্তিক জীবনের সমন্বয়ে সৃষ্টি। বাংলার অপরাপর অংশে সে শর্তগুলো অনুপস্থিত বলেই সেখানে জন্ম নেয়নি ভাওয়াইয়া।

উত্তর বাংলার বিশাল নির্জন প্রান্তর, চলমান গরুর গাড়ির চাকার আদিম ধ্বনি এবং প্রকৃতি-লালিত নিয়ন্ত্রিত বির্ধারিত চালকের ভাবানুভূতির সংমিশ্রণই সম্ভব করেছে এ সুরের উদ্ভব। গরুর গাড়ির মন্থর গতিতে লুকিয়ে আছে যে মন্থর-জীবন-দর্শন, তাও ভাওয়াইয়ার সুরে মিশে একাকার হয়ে আছে। উত্তর বাংলায় যদ্দিন থাকবে প্রকৃতির আদিমতা, যদ্দিন থাকবে পুরোনো কৃষিনির্ভর সামাজিক জীবন চর্চা, থাকবে যদ্দিন এ দুয়ের মিশ্রণে তৈরি সেখানকার মানুষের মন-মনন, তদ্দিন গরুর গাড়ির চালক গাইবে ভাওয়াইয়া।

সমস্যা হচ্ছে, আমাদের পশ্চাদপদ শ্রমজীবী মানুষ জানে না ব্যক্তির সাথে শ্রমের সম্পর্ক কতটুকু। জানে না উৎপাদন কর্ম প্রচেষ্টার সাথে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক কী এবং কতটুকু। তত্ত্ব না-জানা এই মানুষগুলো শ্রমের সাথে গানের সম্পর্কের খবর রাখে না।

কেননা বদলাচ্ছে প্রকৃতি। সে কারণেই মানুষের মনও যাচ্ছে বদলে। যাবেই। বিকৃতি ঘটছে ভাওয়াইয়ার সুরের সাথে কথার, কথার সাথে সুরের। ঘটবেই। আজ উত্তর বাংলার শহরের ধারে-কাছের গ্রামে গরুর চালকের গলায় ভাওয়াইয়া আর পুরোনো আমেজ নিয়ে সুরময়, মনোরম হয়ে উঠছে না। উপজেলা কর্মকাণ্ডের থাবা এ গতিকে আরো করছে সংকটময়।

যে বিশাল প্রান্তরের বুক ফেঁড়ে পাকা সড়ক ছুটে চলেছে, দু'ধারে বিদ্যুৎ শক্তির বুক টানটান করা শরীর দাঁড়িয়ে, সড়কের ধারে গড়ে উঠছে বসতি, লোকালয় প্রান্তরের নিঃসঙ্গ নির্জনতা খান খান করে স্যালোমেশিন পাতাল ফুঁড়ে তুলছে জল, ভোঁ ভোঁ শব্দে পণ্যবাহী ট্রাক আর উপজেলা অফিসারের গাড়ি, ওসি সাহেবের হোণ্ডা চলছে ছুটে, সেখানে অসহায় হতবাক গরুর গাড়ির চালক ভাওয়াইয়া ভুলে রেডিও-সিনেমার নোংরা গানের সাথে অলস মিতালী পাতাবার ব্যর্থ চেষ্টায় আসক্ত। এবং কাঁচা এবড়ো-খেবড়ো সড়ক ছেড়ে পাকা সড়কে গরুর গাড়ির চাকা ঠেলে তোলার প্রচেষ্টায় নিয়ত রত। তার সাথে চুরি হয়ে

যাওয়া নিজস্ব গানের কথা আর সুরের অবৈধ সঙ্গমে জন্ম 'ব্যান্ড' নামক কর্কশ চিৎকারে অপবিত্র হচ্ছে রুচি।

প্রকৃতি ও মানুষের জীবনে আজ ভাওয়াইয়ার বেঁচে থাকার শর্ত অনেকটা কমতির দিকে গেলেও মানুষের প্রাণশক্তির তো কমতি নেই। সে শক্তি অফুরন্ত, সে শক্তি খুঁজছে নতুন প্রেরণা, নতুন কথা আর নতুন সুর।

এইতো গেল গ্রামীণ শ্রমজীবীদের কথা। কিন্তু আধুনিক কলেকারখানায় যে শ্রমজীবীরা রয়েছে, তাদের কাজের সাথে, চাই কি প্রাত্যহিক জীবনযাপনের সাথে সঙ্গীতের সম্পর্ক কী? বলতে গেলে সে সম্পর্ক দেহের হাড়ের সাথে মাংসের মতো।

মানুষের শ্রমশক্তি এবং উৎপাদন ক্ষমতাকে হাজার গুণ বাড়িয়েছে আধুনিক টেকনোলজি অর্থাৎ যন্ত্র ও যন্ত্র ভিত্তিক চেতনা। সে যন্ত্রের সঙ্গে যে শ্রমিক কাজ করে তার সঙ্গে গ্রামীণ পুরোনো টেকনোলজির অধীনে কর্মরত শ্রমিকের পার্থক্য সুস্পষ্ট। কেননা যন্ত্রের সাথে কাজ করতে গেলে দৈহিক শ্রমের সাথে সংঘাত ঘটাতে হয় সতর্ক সচেতন মেধার। তাই আধুনিক কারখানা যখন শোষক শ্রেণীর দখলে থাকে তখন শ্রমিকের দেহ ও মন-মেধা উভয়ই হয় শোষিত। অপরপক্ষে যন্ত্রের সাথে কাজ করতে গিয়ে ভোঁতা চেতনার শ্রমিকও মেধায় চর্চা করে বাধ্য হয়ে। এভাবেই বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায় তার। অথচ এদের জন্য তৈরি হয় না উন্নত সঙ্গীতের একটি ধারা।

বদল হলো টেকনোলজি, বদল হলো শ্রমের চরিত্র. তৈরি হলো না কেবল সেই শ্রমের সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষের জন্য ভিন্নতরো সঙ্গীত। তাই সে মানুষ গায় টিভি বেতার সিনেমার প্রতারণামূলক গান। গাইতেই হয়। বিকল্প কৈ তার? যে টেকনোলজি বস্তু উৎপাদনে নতুন পথ যোগায়, তার সাথে পাল্লা দিয়ে তো ভাব-উৎপাদনের পথ তৈরি হয় না।

হবে কেমন করে? টেকনোলজি তো ধার-করা। যারা টেকনোলজি ধার দেয় তারা তো চাপিয়ে দেয় সংস্কৃতি, পরগাছা সংস্কৃতি। তাকে ঠেকানো যাচ্ছে কৈ? শক্তির অভাব নেই, অভাব প্রচেষ্টার।

নৌকার মাঝি, গরুর গাড়ির চালক আর কৃষক যেমনি শ্রম প্রয়োগ করার সময় একই সাথে গান গাইতে পারে, কারখানার বেলায় তা কি সম্ভব? কারখানার আছে রীতি, আছে নীতি। আছে উৎপাদন হ্রাসের সম্ভাবনা। অসতর্কতার ফলে শ্রমিকের জন্য থেকে যায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা। অন্য বিবেচনায়, যন্ত্র চালাতে গেলে যে মনোযোগিতার প্রয়োজন, সে সময় গান গাওয়া অসম্ভব। তাই তাকে গাইতে হয় অবসরে। কথা হলো, গাইবেটা কী? এমন গান গাওয়া কি সঙ্গত হবে যা তার যন্ত্র চালনার বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার চেয়ে যথেষ্ট স্থূল? একজন ম্যাশিন অপারেটর কি গাইবে বাউলের দেহতত্ত্বের গান? যদি গায় তবে বৈজ্ঞানিক উৎপাদন প্রক্রিয়া-শক্তির সাথে তার সম্পর্ক হবে কতটুকু?

সম্পর্ক নিশ্চয় শূন্য। মদ ও ধূমপান নিশ্চয়ই ক্লান্তি দূর করে, কিন্তু ত্বরান্বিত করে মৃত্যু কিংবা দৈহিক বৈকল্যকে। কারখানার শ্রমিক গান গাইবে অবসরে। বাড়তি, প্রেরণামূলক শক্তি অর্জনে এবং অতি অবশ্যই আনন্দের জন্য গান গাইবে সে। সে গান শোষকের বিরুদ্ধে হতে পারে, ভালোবাসার হতে পারে, বিরহেরও হতে পারে। মনে রাখতে হবে, প্রেম ভালোবাসারও শ্রেণী চরিত্র থাকে। শোষক শ্রেণীর ভালবাসা আর শ্রমজীবীর ভালোবাসার চরিত্র এক নয় মোটেই। শ্রমিক যদি শোষকের ভালোবাসার অনুভূতি নিয়ে সাজায় তার ভালোবাসার গান, নিশ্চয়ই তা হবে তার জন্য দারুণ ক্ষতিকর। তার আনন্দ ও হাসির গানের বেলায় একই কথা খাটে।

গান শক্তি ও প্রেরণা যোগায়। সে শক্তি ও প্রেরণা সহায়তা করে বাড়তি উৎপাদনে। কিন্তু যেক্ষেত্রে বাড়তি উৎপাদনের মুনাফা লুটে নেয় মালিক, সেক্ষেত্রে গান হবে অবিনাশী প্রেরণাদায়ী মহাশক্তি যা দিয়ে শ্রমিক লড়াইয়ের ক্ষমতা অর্জন করবে বাড়তি উৎপাদনের ন্যায্য ভাগ আদায়ের জন্য।

বিপ্লবী শ্রমিকরাই বিপ্লবী গান গায়। যারা শ্রেণীচেতনারশূন্য তারা কী গায়? তারা গায় বিপরীত স্রোতের গান। শোষণ-নির্যাতনের দুঃখ ভোলার জন্য গায় পরকাল-সুখ অর্জনের গান। স্থূল আনন্দের জন্য গায় বিকৃত 'সরকারি সঙ্গীত।'

যে-গান একজন শোষিত শ্রমিককে শ্রেণী-সচেতন করে তুলতে পারে, শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তুলতে পারে, সে-গানই আজ চাই। কোথায় সেই গান? যা আছে তা তো অত্যন্ত দুর্বল এবং অকার্যকার। সরকারি সঙ্গীতের সাথে লড়াইয়ের ধার কোথায় তার শরীরে? ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া এবং নজরুলের পুরোনো সুরে কারখানা জীবনের কথার সাথে (তাও দুর্বল) গোঁজামিলে আজ যে-গান গাওয়া হচ্ছে বিভিন্ন পলিটিক্যাল কালচার্যাল ফ্রন্ট থেকে তা কি যথার্থ? এর কার্যকারিতা কতটুকু? আধুনিক যন্ত্র বরের সাথে ভাটিয়ালী কনের মিলনটা বেমানান নয় কি? নতুন সুর কোথায়? কোথায় আধুনিক কারখানার সাথে সম্পর্কযুক্ত সুর?

সাহিত্যের মতোই সঙ্গীত। নতুন কনটেন্টের জন্য যথার্থ নতুন ফর্ম ছাড়া কি সঙ্গীত হয়? যথাযথ কথার জন্য দরকার নয় কি যথাযথ সুর?

বৈজ্ঞানিক যে মেধা যন্ত্র তৈরি করে ঠিক তেমনি মেধা অত্যন্ত প্রয়োজন সঙ্গীতের বেলায়ও। উন্নত যন্ত্র আবিষ্কারের মতো সঙ্গীতের জন্য উন্নত কথা আবিষ্কার করতে হবে। আবিষ্কার করতে হবে উন্নত সুর। দু'টির একটিও হচ্ছে না আমাদের। দায়িত্বটা কার? নিশ্চয়ই রাজনৈতিক দলের। সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতায় কারখানা শ্রমিকেরা আজ শাসকশ্রেণী পরিচালিত 'শাসক সঙ্গীত' গিলছে নির্বোধের মতো। গিলতে তারা বাধ্য। এ-হচ্ছে মনের ক্ষুধা। খাদ্যের আকালের দেশে মানুষ বাঁচার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাতে বাধ্য, কুখাদ্য গিলে।

গান শ্রেণী-শত্রু খতমে বিপ্লবীর হাতের বুলেট নয়। বুলেট চালনার প্রেরণাশক্তি অতি অবশ্যই। গান তৈরি করে লড়াকু মানুষ, লড়াইয়ের ময়দানে স্বপ্ন দেখায় বিজয়ের, লড়াইয়ের যথার্থতা প্রমাণ করায় এবং আকাঙ্ক্ষা জাগায় মর্যাদাশীল বীরের মৃত্যু-বরণে।

মতলববাজ আর নির্বোধেরা স্বীকার না করলেও আসছে সে দিন, যেদিন লাঙলের চালক, নৌকার মাঝি, গরুর গাড়ির চালক, আধুনিক যন্ত্র চালক তার শ্রম এবং শোষণের ভার মুক্তির জন্য গাইবে গান। নিশ্চয়ই আবিষ্কার হবে সে গান। সে কথা আর সুর আবিষ্কার হতেই হবে। এর বিকল্প নেই। ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী আর সারি গানের সুরে সংযোগ ঘটবেই নয়া শক্তির। কেননা সনাতনী সুরের আঙ্গিকে নয়া বিষয়কে ধারণ করা যায় না।

সুরের সে নয়া আঙ্গিকে নয়া বিষয়ের সংযোজনে শ্রমজীবীরা গাইবে দাসত্ব-মুক্তির গান। সে গানের সাথেই থাকবে তাদের সত্যিকারের শ্রম-সম্পর্ক। সামন্ত আর বিকৃত পুঁজিবাদী সংস্কৃতি প্রভাবিত আজকের শ্রমজীবীরা সেদিন বদলে হবে নয়া যুগের নয়া মানুষ। গাইবে নয়া দুনিয়ার নয়া গান। এবং তাই হবে শ্রমজীবী শ্রেণীর সঙ্গীত।

সাহিত্য পত্র ঃ ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৯৮৫

পলাশীর পতন ও বাঙালি মানস

পলাশীর তথাকথিত যুদ্ধ এবং নবাব সিরাজের পতনকাল থেকে আজকের সময়কালের দৈর্ঘ হচ্ছে আড়াইশ' বছর। এই আড়াই শতাব্দীর ইতিহাসের দিকে তাকালে বাঙালির মানস বৈশিষ্ট্য যেমনি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনি এই জনপদের রাজনৈতিক বাস্তব চিত্রও উন্মোচিত হয়। পলাশীর পতনকালে বাংলার রাষ্ট্রশক্তির অভ্যন্তরভাগের যে অবস্থা ছিল, আজকের বাস্তবতার সঙ্গে তার আশ্চর্য মিলটাও দেখা যায়। রাষ্ট্রশক্তির বিবেচনার পূর্বে আমরা তাকাতে চাই বাঙালি জাতিসত্তার দিকে। বিষয়টি খুবই জরুরি।

বাঙালি জাতির উদ্ভব-ইতিহাস যতটা কৌতূহলোদ্দীপক ততটাই নির্মম। নৃ-তাত্ত্বিক বিবর্তন, গঠন-পুনর্গঠনের ভিতর দিয়ে আফ্রো-এশীয় কিংবা ইঙ্গ-ইউরোপীয় জাতিসমূহের উদ্ভব প্রক্রিয়ার চেয়ে অনেক জটিল বাঙালির উদ্ভব। ইতিহাসের এই হেঁয়ালি-প্রহেলিকার বৈশিষ্ট্য এবং জাতিটির ভাব ও আচরণের দিকে তাকিয়েই মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানেরা বাঙালি মুসলমানদের প্রতি যেমনি নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে, ঠিক একই ধারণা বাঙালি হিন্দুর প্রতি ভারতীয় হিন্দিবলয়ের আর্য্য-রক্তের দাবিদার হিন্দুদের। ধর্মগ্রন্থ বেদ তো নয় কেবল, মহাকাব্য মহাভারতও বাঙালি নিন্দায় ভরপুর।

একথা মিথ্যা নয় যে, বাঙালি একটি সংকরজাতি। হাজার হাজার বছরের নানা রকম বিপরীত-বিরুদ্ধমুখী ঘাত-অভিঘাতের ফলে কখনো শুদ্ধ কখনো বা অশুদ্ধ মিশ্রণ-অভিমিশ্রণে ইতিহাসের নানা ভাঙনের ভেতর দিয়েই বাঙালির উদ্ভব। জাতিটির সংকর রক্তে নয় কেবল, তার সংস্কৃতিতে, বিশ্বাসবোধ আর চিন্তা-চেতনা-আচার-আচরণে পরস্পর বিরুদ্ধ মত ও পথের মিশ্রণ ঘটেছে বলেই সে এক সংকর সংস্কৃতিরও বাহক-ধারক।

এমনি এক জাতির সামনেই পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পতন ভবিষ্যতের জন্য যে ইঙ্গিত দিয়ে যায় তা মোটেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি জাতিটির সামনে। ইতিহাসের ওই মহা বিপর্যয়কে বাঙালি দেখেছিল উদাস বাউলের চোখে,

বোধবুদ্ধিশূন্য চেতনায়। সিরাজের পরাজয় যে মুসলমানের পরাজয় নয় কেবল, হিন্দুরও বিপর্যয় তা তৎকালের হিন্দু সমাজও বুঝতে চায় নি। যে ভয়ংকর ভবিষ্যৎ এগিয়ে এসেছে ১৯৪৭ সালে দেশ ভাঙনের ভিতর দিয়ে, তার ইতিহাস তো পলাশীর প্রান্তরেই লেখা হয়ে যায় সিরাজের রক্তে। সেই রক্তপাতকে তৎকালের বাঙালি হিন্দু যদি বুঝত তবে ঘটনাটিকে মুসলমানের পরাজয় বলে নির্বোধের তৃপ্তি পেত না। বাংলা বিভক্তির বীজ তো ইংরেজ রোপণ করে দেয় পলাশীর প্রান্তরেই।

তৎকালের মুর্শিদাবাদের, বর্তমানে নদীয়া জেলার প্রান্ত থানা পলাশীর পথ কেটে আমরা ইতিহাসের কার্যকারণের আরো গভীরে যেতে চাই। মীথপ্রিয় বাঙালির মীথ ছেড়ে ঘটনার অভ্যন্তরে তাকানোই যুক্তিযুক্ত। নবাব সিরাজ বা পলাশীর পতনের কারণ যে কেবল ব্যক্তিবিশেষের ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতা নয়, অতিরিক্ত কিছু, তাও ভাবতে হবে। ব্যক্তি এখানে উপলক্ষ, আসল ব্যাপার হচ্ছে বহুমাত্রিক দূরগামী কার্য-কারণ। বুঝতে হবে, ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতা এবং ষড়যন্ত্র কখন সফল হয়। নিশ্চয়ই এসবের ক্ষেত্র পূর্বেই তৈরি হয়ে থাকে। ষড়যন্ত্রের কারণ তো রাজশক্তির ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, যা রাষ্ট্রযন্ত্রের অভ্যন্তরীণ ভিতে গভীর থেকে অদৃশ্য-গোপন খাদ তৈরি করে রাখে, ঝাঁকুনি খেলেই তা ধসে পড়ে।

আমরা দেখতে পাব অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, ইংরেজদের কারণে যুদ্ধব্যয় বৃদ্ধি এবং নানা অপচয়ে ঋণগ্রস্ত নবাব আপন অমাত্য সুদব্যবসায়ী অবাঙালি জৈন ধর্মাবলম্বী জগৎ শেঠের কাছে হাত পাতছেন দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারকে কর দেওয়ার টাকার জন্য। সঙ্গত কারণে প্রথম অসফল ষড়যন্ত্রের সময় হাতেনাতে ধরা পড়লেও নবাব শেঠজিকে পদচ্যুত করতে সক্ষম হন নি। অন্যদিকে ব্যবসায়িক কর নিয়ে নবাবের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সংঘাত যখন চলছিল, দিল্লির মুঘল সম্রাট তখন তাদের বাংলায় বিনা করে ব্যবসার অনুমতি দিয়ে রেখেছেন। কেন্দ্রের এই হঠকারী নীতি পলাশীর বিপর্যয়ের আর একটি কারণ। দিল্লির মুঘলেরা নিজেদের দুর্বলতা আর চরম অবক্ষয়ের ভিতর দিয়ে বাংলা-ভারতে ইংরেজ বিজয়ের বীজ বপন করে দেয়।

প্রকৃতপক্ষে পতনের পূর্বে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা চারপাশ থেকেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। দিল্লির মুঘলদের ভ্রান্ত আচরণ, বাংলার রাজপাটে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অভ্যন্তর ভাগে ভাঙন-ফাটল এবং নবাবের প্রজাবিচ্ছিন্নতা কোনটাই মিথ্যা নয়। নবাব সিরাজ বয়সে তরুণ হলেও তাঁর মাতামহ আলীওয়ার্দীর চেয়ে যে রাজ্যপাট পরিচালনায় অদক্ষ, অদূরদর্শী ছিলেন, এমন মনে করা নিরর্থক। বরং মৃত্যুর পূর্বে আলীওয়ার্দীর তৈরি বাংলার মসনদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আগুনের ভেতরে পা ফেলেই, মাতামহ কৃত সংকটের দায়ভার নিজের কাঁধে নিয়ে সিরাজকে নবাব হতে হয়। সিরাজের ব্যক্তিগত শৌর্য-সাহসের যে অভাব

ছিল না তার প্রমাণ মেলে বেশ ক'টি যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজিত করায়। নবাবের দুর্ভাগ্য এই যে, মাতামহ তাঁকে এমন এক জনগোষ্ঠীর শাসক করে গেলেন যারা চরিত্রবলে অদৃঢ়, আত্মকেন্দ্রিক, সংসার-উদাসীন এবং রক্তধারায় বহন করছে পরস্পরবিরোধী কৌমচেতনার অনৈক্য বৈশিষ্ট্য।

নবাবের সেনাবাহিনীতে ভীতু, যুদ্ধে অনাসক্ত ভাবুক বাঙালিরা স্থান পায় নি। সেনাবাহিনীর সঙ্গে স্থানীয় বাঙালির সুসম্পর্ক বা যোগাযোগও গড়ে ওঠে নি। নবাবের অবাঙালি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যদি স্থানীয় প্রজা বাঙালির যোগাযোগ স্থাপিত হতো তবে বাংলার ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হতো। অবাঙালি পাঠান, জাট, মারাঠী, রাজপুত ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর হিন্দু-মুসলমান সৈনিকেরা বাঙালি প্রজার কাছে ছিল দূরের মানুষ, অনাত্মীয়। তাছাড়া বৃদ্ধ-প্রাচীন মন্ত্রণাদাতা অমাত্যগণ তথা রাজকীয় আমলাতন্ত্র ছিল নবাব আলীওয়ার্দী যুগের। তরুণ নবাব সিরাজের সঙ্গে তাদের মতান্তর ছিল অনিবার্য। মাতামহের রেখে-যাওয়া প্রশাসনিক এই প্রবীণ আমলাতন্ত্রই ছিল সিরাজের সবচেয়ে বড় শত্রু।

বেনিয়া ইংরেজকে, আলীওয়ার্দী যতটা বুঝতে পেরেছিলেন তার চেয়েও স্পষ্ট বুঝেছিলেন নবাব সিরাজ। মাতামহের জীবদ্দশাতেই যে ওই ঔপনিবেশিক শক্তি বেনিয়া ছদ্মবেশে জাল বিছিয়ে বাংলাকে ঘিরে ফেলেছে, তা ছিল সিরাজের কাছে পরিষ্কার। এটাও তিনি বুঝতে পারেন যে, উপনিবেশবাদ অমাত্যদের মাধ্যমে তাঁর ঘরে ঢুকে গেছে। কিন্তু তাঁর কিছুই করার ছিল না। একদিকে দিল্লির অপদার্থ কেন্দ্রীয় শক্তি, অন্যদিকে আলীওয়ার্দীর রেখে-যাওয়া চতুর স্বার্থবাদী ইংরেজের দালাল আমলারা তরুণ নবাবকে রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

একথাও পরম সত্য যে, উচ্চবর্গের হিন্দু সমাজের যেমনি, ঠিক তেমনি উচ্চশ্রেণীর মুসলমান সমাজের প্রভাব ছিল নবাব দরবারে। কিন্তু বৃহৎ বাঙালি সমাজের হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে নবাব সিরাজের সম্পর্ক ছিল কর দাতা আর গ্রহীতার, এর বাইরে নয়। কেবল হিন্দু নয়, মুসলমান কৃষক-প্রজা সমাজও নবাবকে আপন ভাবতে পারে নি।

বাঙালি প্রজারা তো চিরকালই রাজশক্তি সম্পর্কে ছিল নিরাসক্ত। রাজার ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি নিয়ে তারা ভাবিত ছিল না। কে রাজা, সেই পরিচয়ের বাইরে বর্ণবিভক্ত বাঙালি হিন্দু সমাজে রাজা বা শাসক হচ্ছেন ঈশ্বরের অবতার। বখতিয়ার খিলজিকেও ভাবা হতো জগতের শেষ অবতার, কল্কি অবতার রূপে। রাজার ওপর ঐশী শক্তি বা দেবত্ব আরোপ করেই তারা প্রশান্তি খুঁজতো। এই বিশ্বাসেই শাসককে শাসিতগণ অনাত্মীয় করে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। অন্যদিকে মুসলমান প্রজারাও বিশ্বাস করত শাসক বা আমীর হচ্ছেন খোদা কর্তৃক মোমেনদের জন্য নির্বাচিত। তাই তিনি শ্রদ্ধার বটে, কিন্তু দূরের অনাত্মীয়।

এই বাংলায় অতীতে রাজা-প্রজা তথা শাসক আর শাসিতের বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি করার প্ররোচনা দেয় ভাষার অনৈক্য। পলাশীর সহজ পতন এবং পরবর্তীতে গণ বা প্রজাপ্রতিরোধ সংগঠিত না হবার পেছনে রাজা-প্রজার এই ভাষা পার্থক্যেরও বেশ কার্যকর ভূমিকা ছিল। প্রজার ভাষা বাংলা, নবাবের ভাষা ফারসি, আমত্যদেরও তাই। নবাবের সৈন্যদের ভাষাও ফারসি কিংবা বিকাশমান হিন্দি-উর্দু। নবাবের প্রশাসনিক মণ্ডলিতে যে অভিজাত হিন্দু-মুসলমানেরা ছিল তারা তাঁর কথা বুঝলেও জনগণ ছিল সে-ভাষায় অজ্ঞ। ভাষার এই অনাত্মীয়তা শাসক থেকে শাসিতকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। পলাশফুল গাছে আচ্ছাদিত পলাশীর আমবাগানে শিবির স্থাপন-করা ইংরেজ সৈন্যদের ভাষার মতোই নবাবের সেপাইদের ভাষাও আবোধ্য ছিল স্থানীয় বাঙালির কাছে।

অন্যদিকে বিষয়টিকে দেখতে হবে এভাবেও যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হোক চাই না হোক, এ কথা মিথ্যে নয়, ইংরেজের অস্ত্র ছিল আধুনিক। কামান, গোলা, বারুদ, বন্দুক নবাবেরও ছিল, অথচ নবাব নিজে ছিলেন তরবারিধারী, যা তাঁর যুদ্ধের পোশাকের সঙ্গেই মানায়, যুদ্ধের সঙ্গে নয়। দেশিয় কর্মকারদের তৈরি কামান যে ইংরেজের কামানের চেয়ে শক্তিশালী ছিল না, এ তো বাস্তব সত্য। তাছাড়া নবাবের যৎসামান্য বন্দুকও ফরাসিদের কাছ থেকে কেনা। এই বাস্তবতার পরও যুদ্ধটা যদি প্রকৃতই হতো তাহলে নবাববাহিনীর সংখ্যাধিক্যের কারণে ইংরেজের পরাজয় ছিল অনিবার্য।

পলাশীর বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে বাংলার অবৈধ শাসনের বৈধ শাসন-সনদ তো ইংরেজরা লাভ করে মুঘলদের হাত থেকেই, পরাজিত বাঙালির হাত থেকে নয়। বিদেশি ইংরেজ শক্তি দ্বারা বাংলা যখন আক্রান্ত এবং বিপর্যস্ত হলো, তখন দিল্লির মসনদে বসে মুঘলেরা কী করছিল? সংবাদ পেয়েও তারা কেন সৈন্য পাঠাল না ইংরেজ প্রতিরোধে? বিদ্রোহ দমনের নামে তারা যদি ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে বিশাল বাহিনীসহ মানসিংহকে পাঠাতে পারে তবে সিরাজের পক্ষে পাঠাল না কেন?

বাঙালি তখন কী করছিল? স্বাধীনতা হারিয়ে গেল, কিন্তু ভাবের জগতে ডুবে আত্মভোলা বাঙালি গাইছে পদাবলী কীর্তন, রাধার বিরহে ফেলছে চোখের জল। রামপ্রসাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গঙ্গা-ভাগিরথীর বটের তলায় বসে গাইছে তারা শ্যামা সঙ্গীত– 'চাই না মা রাজা হতে...।' ইংরেজের হাতে যখন বাংলার রাজা আর রাজ্য চলে গেল তখন অন্যদল বাউলের ভাবের জগতে ডুবে অনুসন্ধান করছে– 'মারফতের ভেদ জানি না মাওলা, শরিয়ত খুঁজে মরি...।'

অথচ কী মহাবিপর্যর ঘটে যাচ্ছে রাষ্ট্রজীবনে, বাঙালি টেরও পেল না। এ জনগোষ্ঠী তো অনুগত প্রজা হয়েই শান্তিতে, নির্বিরোধে, নিরাপদ দূরত্বে পালিয়ে বাঁচতে চায়। মাতৃভূতি স্বাধীন কি পরাধীন, রাজা হিন্দু না মুসলমান,

সাদা না কালো, ইংরেজ না পর্তুগীজ, সেই বোধ তো ডুবে ছিল সংসার নিরাসক্তির অন্ধকারে। কখনো যদি নিরুপায় হয়ে আত্মরক্ষার কথা ভাবতো তবে তারা আশ্রয় নিতো যন্ত্রের বদলে তন্ত্র-মন্ত্রে। মন্ত্রের 'বাণ' মেরে শত্রু নিধনের ব্যর্থ চেষ্টা করে যেত। আরেক দল আশ্রয় নিতো কুফরী কালামে, শয়তানকে বশীভূত করে কার্যসাধনে।

ওই যে ইতিহাসের খলনায়ক, অভিনেতাগণ, তারা কি ছিল বাঙালির আত্মার আত্মীয়? অবাঙালি শিয়া মুসলমান মীর জাফর, অবাঙালি জৈনধর্মী জগৎ শেঠ এবং অবাঙালি হিন্দু রাজবল্লভ কোন দোষে ভাবতে যাবে বাঙালির সুখ-দুঃখের কথা? ব্যক্তিস্বার্থের বাইরে সমষ্টিগত স্বার্থকে ওরা চেনে না। তাদেরই তো উত্তরসূরি আজকের বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীর রাজনীতিক এবং প্রশাসনিক আমলার দল, যারা দেশের স্বার্থ বিকিয়ে বিদেশিদের হাতে তুলে দিতে চায় তেল-গ্যাসসহ সামুদ্রিক বন্দর। সেদিন যেমনি ছিল সামনে ক্লাইভ আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, পেছনে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ, আজকেও তেল-গ্যাস প্রশ্নে সামনে বিদেশি ব্যবসায়ীশ্রেণী, পেছনে-আড়ালে রয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

একাত্তরের যুদ্ধ, এত বড় জাতীয় বিপর্যয়, দুঃখ-কষ্ট, তারপরও যদি জাতীয় দায়িত্ব সম্পর্কে বাঙালি এতটা উদাসীন হয়ে থাকল, তবে তার ভবিষ্যৎ কী? পলাশী যুগের আমলাতন্ত্র আর আজকের আমলাতন্ত্রের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ কি কোন পার্থক্য খুঁজে পায়? পায় না। সেদিনের বাংলার মসনদের পাশে যে মীর জাফর আর জগৎ শেঠেরা ছিল, আজও তো তারাই আছে। সেই আমলাতন্ত্র তথা আমত্যশ্রেণীকে সাম্রাজ্যবাদ ভাল করেই চেনে-জানে। বাঙালি সম্পর্কেও তাদের জানাজানি বাকি থাকে নি।

সেদিন বাংলার ঘাটে ঘাটে বাণিজ্যতরী ভিড়িয়ে নগরে-বন্দরে গাঁয়ে-গঞ্জে বাণিজ্য করতে গিয়ে বাঙালির দুর্বলতার জায়গাটি তারা জেনে যায়। ইংরেজ বণিকেরা দেখতে পায় বাঙালি কূপমণ্ডূক এক জাতি। আপন গ্রামের বাইরের জগৎ সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। গ্রামান্তরেও যায় না। চেনে না সমুদ্র, জানে না জাহাজ কী বস্তু, তার আছে কাঠের ডিঙি নৌকা, তালগাছের ভেলা। ওরা চেনে কেবল কৃষিভূমি আর ফসল।

বিস্মিত ইংরেজ বণিকেরা দেখেছে বাঙালি কেবল ক্রেতা। ব্যবসায়ী নয়। ব্যবসা জগৎ শেঠদের হাতে। বাঙালির প্রাচীন বন্দরে যারা বাণিজ্য করেছে ওরা অবাঙালি, বাঙালি কেবল কাঁচামাল বা কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী। ইংরেজরা দেখেছে তাদের বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিত জাহাজ যখন বাণিজ্য পণ্য নিয়ে নদীর ঘাটে ভিড়েছে কিংবা সদ্যতৈরি রেল লাইন ধরে স্টেশনে থেমেছে বাষ্পচালিত গাড়ি, ন্যাংটো আধা-ন্যাংটো বাঙালি তখন নিরাপদ দূরে দাঁড়িয়ে গাছের আড়াল থেকে ঈশ্বরের অলৌকিক মহিমার কথা ভেবে হাত জোড় করে জানাচ্ছে প্রণাম। নিশ্চয়ই তখন ভয়ার্ত-বিস্মিত বাঙালির চোখের ভেতর,

স্বপ্নের ভেতর ভেসে বেড়াচ্ছিল স্বর্গীয় অলৌকিক পঙ্খীরাজ ঘোড়া কিংবা বোররাখ।

এই বাঙালি আবার বড় রসিক। লজ্জার কথা ভুলে নিজেরাই নিজেদের নিয়ে প্রবাদ-প্রবচন তৈরি করে। প্রাচীন সেইসব প্রবাদ আজো টিকে আছে। 'ব্যাঙ যেমনি পাল্লায় তুলে একত্র করে মাপা যায় না, বাঙালিকেও ঐক্যবদ্ধ রাখা যায় না।' নিশ্চয়ই এই প্রবাদটি আঞ্চলিক ভাষায় তৈরি হয়েছিল, আধুনিক ভদ্রলোক বাঙালি এর ভাষাটা বদলে দিয়েছে। কেন এমন বৈশিষ্ট্য হলো জাতিটির? হয়তো এর মূলে রয়েছে তাদের প্রাচীন আঞ্চলিক কৌম বা গোষ্ঠী চেতনা। বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের বিচিত্র নানা কৌম-গোষ্ঠীর বংশানুক্রমিক জিন বৈশিষ্ট্য তাদের চরিত্র বা মননকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই অনৈক্য বা বিচ্ছিন্নতা কেবল যে রাষ্ট্র বা সমাজ জীবনে, এমন নয়। ব্যক্তি জীবনেও। এমন আত্ম-বিচ্ছিন্ন নরগোষ্ঠী দুষ্প্রাপ্য।

যুক্তির খাতিরে বলতে হয়, যে জাতি ধর্মের প্রশ্নে '৪৭-এ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সে জাতিই ভাষার প্রশ্নে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। '৭১-এ আত্মরক্ষার্থে মাত্র ক'মাসের জন্য বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ক্ষণস্থায়ী হলেও ঐক্যের ব্যাপারে এমন ঘটনা জাতিটির হাজার বছরের ঠিকুজিতে নেই। '৭০-এর নির্বাচনে যে ঐক্যটা দেখতে পাই তা অংকের হিসেবে শতকরা ৬০/৭০ জনমতের ঐক্য। '৭১-এ ঐক্যের পারদ উঠে যায় শতকরা ৯০-এ। পুনরায় '৭৪-এ ঐক্যের পারদটাই মনে হলো অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ওই অনৈক্যটা আসে স্বাধীনতার নামে লুণ্ঠন করতে গিয়ে। এই রাষ্ট্র-লুণ্ঠনস্পৃহা তো বাঙালি লাভ করেছে তার প্রাক্তন শাসক ব্রিটিশ উপনিবেশিক এবং পরে পাকিস্তানী আঞ্চলিক লুণ্ঠনকারীদের দেখে শুনে। কিন্তু বিদেশিরা বাঙালিদের সম্পদ লুণ্ঠন করলেও স্বাধীনতা উত্তর বাঙালি নিজেই নিজের জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন করতে শুরু করে। জাতিটির তো আর উপনিবেশ নাই যেখানে সে তা করতে পারে। দেখে শুনে মনে হয়, বাঙালির যদি ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে আবির্ভাব ঘটতো, তবে সে আজ বিশ্ব-লুটেরা হিসেবে পরিচিত হতো। আজকের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বাস্তবতা তো তা-ই বলে।

তবে কি বাঙালির অনৈক্যের বৈশিষ্ট্য নৃ-তাত্ত্বিক সূত্রে আবদ্ধ? এই জাতির প্রাচীন ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব আর পশ্চিম ভূসীমানা অর্থাৎ গৌড়, পুন্ড্র, রাঢ় জনপদগুলোর গঠন বা ঐতিহাসিক উপাদান এক নয়। তাই ইতিহাসের বিশেষ আবর্তে বিশেষ উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্ন জনপদগুলো শাসক নৃপতিদের তরবারীর দাপটে একত্রিত হয়ে বৃহৎ রাজ্যে রূপ নিলেও, আজো বাঙালি আপন আঞ্চলিক সত্তাকে বৃহৎসত্তায় বিলীন করে দিতে নারাজ। এই আঞ্চলিক সত্তার বিচ্ছিন্নতাই বাঙালির অনৈক্যের মূলে। দৃশ্য-অদৃশ্য অন্ত র্বিরোধ চলছে হাজার হাজার বছর ধরে আজো। রাষ্ট্রনায়কেরা বা জাতির মেধা-

মনন-প্রজ্ঞার নায়কেরা যতই স্বপ্ন দেখুন বৃহৎ জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক ঐক্যের, তা অর্জিত হচ্ছে না।

আঞ্চলিক জাতিসত্তার কথা বাদই দিলাম, এই বাংলাদেশে কত প্রকার আঞ্চলিক বাংলা, উচ্চারণরীতি, আঞ্চলিক শব্দ রয়েছে? বহু থেকে বহুতর। যদি বলা যায়, ভাষা কেন, আচার, আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, কৃষি, শিল্প এবং সাংস্কৃতিক আচরণ অনুষ্ঠান কি এক? সিলেট, চট্টগ্রাম, রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর খুলনার মানুষ কি আপন আঞ্চলিক সত্তাকে বিসর্জন দেবে? আঞ্চলিক এই চেতনা তো রাজনীতিতেও বর্তমান। নেতা বা প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীর জন্মস্থানের জনগণ কেন আদর্শের চেয়ে ব্যক্তিকেই বড় মনে করে? আঞ্চলিকতা কি শুনতে চায় রাজনীতির বড় বড় বুলি?

বাঙালি একান্তভাবেই কৃষি বা ভূমি নির্ভর জাতি। কৃষিভূমির অভাব, উদ্বৃত্ত শ্রম, বেকারত্ব গ্রামীণ মানুষকে বাঁচার তাগিদে গ্রাম পরিত্যাগ করে শহর কিংবা দূর প্রবাসজীবনের প্রতি আকৃষ্ট করছে। কিন্তু ভূমির প্রতি আকর্ষণ শিথিল হয় না। তাই তো নাগরিক বিত্ত-অর্থের গ্রামযাত্রা আজো কমে নি। বাঙালির ভিতর যে হতাশা আর আত্মবিচ্ছিন্নতা দেখা যায় তার সূত্রপাত প্রাচীনকালের সেই ভূমিহীন অবস্থা বা ভূমিবিচ্ছিন্নতা। আধুনিক বাঙালির নেতাভক্তি ও ব্যক্তিশাসকের প্রতি বিশ্বাস-শ্রদ্ধা-আনুগত্য-বশ্যতা প্রাচীন গোত্রতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্রের স্মৃতিবাহী। ওই যে দস্যু-ডাকাত-নির্দয়-নিষ্ঠুর-স্বজাতি-বিজাতি-যে-ই হোক, রাজার প্রতি আনুগত্য তো ধর্মের মতোই পবিত্র কর্তব্য। এই দুর্বলতা অর্থাৎ প্রাচীনকালের রাজা বা সামন্তপ্রভুর প্রতি অন্ধ আনুগত্যের আধুনিক রূপান্তর হচ্ছে আঞ্চলিক বা জাতীয় নির্বাচনে অঞ্চলসীমানার ভেতর থেকে দস্যুকে জননায়ক হিসেবে নির্বাচিত করা। কৌম চেতনার এই জটিল বন্ধন কি কোন কালে ছিন্ন হবে?

কূপমণ্ডূকতা এবং ভোগবাদ চিরকালই বাঙালির বড় আশ্রয়। একান্ত কৃষিনির্ভরতাই এর প্রধান কারণ। কৃষিনির্ভর, জীবনযুদ্ধে পরাজিত, ভাগ্যনির্ভর ঈশ্বর-শাসনে ভীত এই জাতির সবটুকু দুর্বলতাই জেনে যায় ইংরেজরা। এই আধুনিক যুগে আজো সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির কাছে মাটি আর ফসল ছাড়া আত্মরক্ষা আর আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্যপথ অজ্ঞাত। জীবন যেখানে মাটিসংলগ্ন সেখানে আত্মকেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি পাবেই, নিঃশেষ হবে না ভাগ্যনির্ভরতা। আত্মশক্তি বা উদ্যম তো দূর স্বপ্নলোকের। সীমাহীন দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অকাল মৃত্যু আর ঈশ্বর ছাড়া যার চিন্তা ও অভিজ্ঞতার জগৎ শূন্য, তার তো দ্বিতীয় বা বিকল্প আশ্রয়ের সংবাদ জানার কথা নয়। তাই যাকে কর হিসেবে শস্য বা পণ্য দান করতে বাধ্য ছিল অতীতে এই জনগোষ্ঠী, সেই শাসকের জাত-ধর্ম-ভাষা বা নৈতিক চরিত্র নিয়ে কোন ভাবনাই ছিল না বাঙালির।

যে বাঙালি আপন ভিটের বাইরে গ্রামান্তরে যায় নি, রাজনগরের পথ ছিল যার অজানা, সে যখন শুনল সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে সাদা বর্ণের এক

মানব জাতি এসেছে এই ভূমিতে, যার মুখের বুলি মানুষের নয়, স্বর্গের ঈশ্বরের মতো, সে তখন বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ল। দুশমন ভেবে প্রতিরোধ করা তো দূরের কথা। তারা তাই সেই সাদা বর্ণের মানুষগুলোর উপর দেবত্ব, প্রভুত্ব, আনুগত্য আরোপ করতে দেরি করে নি

এই বাঙালি তাদের রাজা (নবাব) সিরাজের ভাষা বুঝতে না পারলেও, নবাব যে প্রজার ভাষা বুঝতেন না এমন নয়। না-বুঝলে কেমন করে তিনি সাধক কবি রামপ্রসাদের গানের কথা ও সুরে মুগ্ধ হয়েছিলেন? একান্ত কাছে পাবার জন্য মুর্শিদাবাদের রাজনগরেই সাধকের জন্য কালী মন্দির তৈরি করে দিতে রাজি ছিলেন তিনি। গঙ্গায় বজরায় ভ্রমণের সময় ঘাটে স্নানরত রামপ্রসাদের কণ্ঠে শ্যামা সংগীত শুনে যে নবাব বিমুগ্ধ হয়েছিলেন, তিনি যে বাংলাভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, এ তো মিথ্যে নয়। যার দরবার পূর্ণ ছিল হিন্দু অমাত্যে, তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ উদার মনোভাবের পরিচয়ের জন্য ইতিহাস ঘাঁটতে হবে কি? অথচ জীবন নিরাসক্ত, সংসারযোগী বাঙালি চেয়ে চেয়ে দেখল তাদের নবাবকে হত্যা করে, হাতির পিঠে লাশ ঝুলিয়ে ধীর, অতি ধীর গতিতে নগর প্রদক্ষিণ করানো হচ্ছে। না, বাঙালির কোন প্রতিক্রিয়াই হলো না। সিরাজের রক্তের প্রতি যে বাঙালি কাপুরুষ আর অপৌরুষ, গোলামী আর নিষ্ক্রিয়তার দৃষ্টান্ত রাখল, তার ভাবীকাল তো অতীতের ইতিহাসেই লেখা রয়েছে। তা না হলে কেন বারবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে আজো।

মনে করা হয়েছিল ইসলামের আগমনের ভিতর দিয়ে এই বাংলায় এমন এক সংস্কৃতিমনস্ক জাতির আবির্ভাব ঘটবে যে পাল্টে দেবে হাজার বছরের সব জীর্ণতা। অথচ তা ঘটল না। ইসলাম এমন এক বাঙালি নৃ-গোষ্ঠীর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল, যারা জীবন সম্পর্কে উদাসীন, একান্তই গৃহাশ্রয়ী এবং দুঃখবিলাসী। অথচ এরাই ইন্দ্রিয় আসক্ত সংকীর্ণ ভোগকাতর। বর্ণবাদে শতধা বিভক্ত। ধর্ম-বদলের পরেও বর্ণাশ্রয়ীই থেকে যায়। ইসলাম গ্রহণ করল বটে, ছাড়ল না বর্ণবিশ্বাস, আসরাফ আর আতরাফের প্রশ্ন। তথাকথিত আরব আভিজাত্য, গোত্র শ্রেষ্ঠত্ব যা মহানবী (সাঃ) তাঁর শেষ হজের দিন আরাফাতের ময়দানে দাঁড়িয়ে বাতিল বলে ঘোষণা করে সাম্যের পতাকা উড়িয়েছিলেন, তাঁর পরবর্তীতে যা পুনরায় ফিরে আসে, তারই ধারাবাহিকতা বাংলায় মুসলিম বর্ণবাদ।

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালির যে জৈববৈশিষ্ট্য, তা হচ্ছে জীবনউদাসীনতা, পিতৃতান্ত্রিকতা, এবং নারীর প্রতি আসক্তি। এই ইন্দ্রিয় আসক্তির প্রাচীন নিদর্শন হচ্ছে ধর্ম আর আধ্যাত্মবাদের নামে কায়াসাধন, তন্ত্রসাধন। উদ্দেশ্য দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ। ওই সাধন-মুক্তির নামে নারীর প্রতি আসক্তি মধ্যযুগে বাউল বা সহজিয়া নানা মতের সাধন পদ্ধতিতে স্পষ্ট। সব সাধন প্রক্রিয়ায়ই নারী হয়ে ওঠে সাধন-সঙ্গিনী। বিবাহ কিংবা বিবাহবহির্ভূত এই তান্ত্রিক সম্পর্কে নারী কখনো পুরুষ সাধকের মায়ের স্থান দখল করে, কখনো দেবীর স্থান, কিন্তু যৌনতাই প্রধান।

সম্ভোগের ভেতর এই যে মুক্তিলাভের কুহক, তা থেকে বাঙালি আজো মুক্তি পায় নি। আত্মবৈরাগ্য বিলাসী এই জাতি কিন্তু সংসারবৈরাগ্য গ্রহণে অনিচ্ছুক। যে ধর্ম-দর্শন মানবজীবনকে সর্বদুঃখের হেতু এবং অন্ধ মায়া মনে করে সংসার জীবনকে ঘৃণা ও অস্বীকার করে পরিত্যাগ করেছে, সেই আত্মনিগ্রহের জৈন ও বৌদ্ধধর্ম কিন্তু গ্রহণ করল না বাঙালি। গৌতম বুদ্ধের মহানির্বাণ তাই বাঙালি চিত্তে কৌতূহল সৃষ্টি করলেও গ্রহণে আগ্রহ জাগায় নি।

প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ এবং ইন্দ্রিয় আসক্তিতে ডুবন্ত এই জাতি ব্রাহ্মণ্যবাদের নির্দয় বর্ণবাদী অপমানকর জীবনে প্রশান্তির আশ্রয় খুঁজেছে ইন্দ্রিয়ভোগের সামাজিক আর পারিবারিক বিকল্প অধিকারে। ব্রাহ্মণ্যবাদী মনুষ্যত্ববিরোধী বর্ণাশ্রমশ্রেণীর ঘৃণ্য জীবন থেকে মুক্তির জন্য বাঙালিরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, তা একটি মাত্র সত্য। অপর সত্যটি হচ্ছে ইসলামের বৈরাগ্যবিরোধিতা এবং পরকালের পাশাপাশি ইহকালের স্বীকৃতি। ইসলামের ইহকালবাদ, তথাকথিত মুক্তির নামে আত্মনিগ্রহের বৈরাগ্যের প্রতি অনাস্থা, সংসার বন্ধন এবং ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়ে ধর্মসাধন পদ্ধতি বর্ণবাদে নিষ্পেষিত বাঙালির একাংশকে আকৃষ্ট করেছে। ওদিকে বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণের দেহলীলা, বাউলের দেহাশ্রয়ী সাধন পদ্ধতি আজো বাঙালিকে আকর্ষণ করে। এসব তো এমন এক ধর্ম পদ্ধতি যা জীবনকে দেয় ইন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকার, কিন্তু উদাসীন করে রাখে এবং অমনোযোগী হতে উৎসাহ যোগায় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্যে।

উনিশ শতকে কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালির জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা মূলত কেন্দ্রীভূত ছিল উচ্চবর্গের হিন্দুশ্রেণীর ভেতর। এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিচু বা মধ্যমবর্গ হিন্দুরা যেমন, তেমনি বঞ্চিত ছিল মুসলমান সমাজ, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের মুসলমান। অর্থনৈতিক কারণ তো বটেই, তার উপর আশরাফ মুসলিমের ইংরেজি ভাষাবিদ্বেষও এর জন্য দায়ী। আরো একটি বাস্তব সত্য হচ্ছে জাতিবৈরী হিন্দু মানসিকতা। উচ্চবর্গের হিন্দু সম্প্রদায় দখল করেছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। সেই সমাজ নিচুবর্গের হিন্দু এবং মুসলমানদের শিক্ষার অদিকারকে অস্বীকার করে। মুসলমান এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুর শিক্ষার কৌতূহল ও প্রত্যাশার প্রতি বিদ্রূপ করে তৎকালে উচুবর্গের শিক্ষিত হিন্দুরা যেসব প্রবচন ও ছড়া তৈরি করেছিল, তা আজো প্রবীণদের অনেকরই স্মরণে আছে। এমন একটি প্রবচন–'হ্যাক আর চাড়ালের পুতে শিলট হাতে ইসকুলে যায়/বামুন আর কায়েতের ক্ষেতের ধান ছাগলে খায়।'

মূলত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই এই অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই শিক্ষার চালিকা শক্তি সম্পূর্ণই দখলে ছিল বিভাগপূর্ব মুসলমান শিক্ষিত বিত্তমান গোষ্ঠীর হাতে। প্রকৃত অর্থে পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছাকাছি শিক্ষা এগিয়ে আসে একাত্তরের পর। একাত্তরের যুদ্ধটা শিক্ষার পুরাতন বৃত্তকে ভেঙে দেয়। স্বাধীনতার পরপর রাতারাতি

দেশে অবিশ্বাস্য গতিতে স্কুল-কলেজ গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু অচিরেই স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গের ভিতর দিয়ে চরায় এসে আটকে যায় স্বপ্নের ভাঙা তরী। সেই শূন্যতা ঝড়ো গতিতে পূর্ণ করে মাদ্‌রাসা শিক্ষা। শিক্ষা দখলে চলে যায় ধর্মের।

একাত্তরের যুদ্ধের অন্যতম প্রতিক্রিয়াটি হচ্ছে শ্রেণীবিবর্তন। একদল লোক অবিশ্বাস্য দৃষ্টান্ত রেখে দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত থেকে ধনীতে পরিণত হলো। অন্যদিকে উদ্ভব ঘটল বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার একটি নতুন শ্রেণীর। জ্ঞান চর্চা, শিল্প-সাহিত্য অনুশীলন তথা মেধা চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হলেও বাস্তবে তার অপচয়ই ঘটছে। স্বাধীনতার ভিতর দিয়ে যতটা এগিয়ে যাবার কথা ছিল বাঙালির, তা আর হলো না। সৃষ্টিশীল সাধনায় দীপ্তিময় হবার পরিবর্তে ইন্দ্রিয় তাড়না তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার লোভ, খ্যাতির মোহ, ক্ষমতার প্রতি লিপ্সা বাঙালিকে আচ্ছন্ন করে দেয়। সৃষ্টিশীল কর্মে যুক্তি, বুদ্ধি ও প্রাণশক্তি যতটা ব্যয় হবার কথা, প্রাণধর্মের দুর্বলতার কারণে তা অনার্জিতই থেকে গেল। প্রাচীন বাঙালি রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে যে দায়িত্বজ্ঞানহীন, উদাসীন বৈরাগ্য মনের চর্চা করত, আজকের বাঙালিও তাই করে। বাঙালির রাজনীতি চর্চা মোটেই রাষ্ট্রকেন্দ্রিক নয়, বরং আত্মকেন্দ্রিক অর্থাৎ আত্মপ্রতিষ্ঠামুখী। যে প্রাণধর্ম জাতিটির শক্তির উর্বর ভূমি হবার কথা ছিল, তা আদর্শিক দুর্বলতায় মুখ থুবড়ে পড়ে।

শত শত বছরের উত্থান-পতন, অর্জন-বিসর্জনের ভিতর দিয়ে যে জাতির নব রূপান্তর ঘটে, বাঙালির তা ঘটল না। তাদের পূর্বপুরুষ যেমনি জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ আর অনুভবকে, হৃদয়াবেগকে প্রতিস্থাপন করত পদাবলী গানে, ভাওয়াইয়া-ভাটিয়ালীর মায়াবী সুর ও কথায়, কিংবা গীতি কবিতায় এবং রূপকথার কুহকে, তেমনি অনার্জিতই থেকে গেল উত্তরপুরুষের হাতে মহাকাব্য আর বিশ্বমানের সাহিত্য। সাংসারিক জীবনের সংকীর্ণ সুড়ঙ্গের পথে নেমে যাবার দরুন পারল না মননের গভীরতায় পৌঁছাতে।

দু'চোখে শস্যের স্বপ্ন নিয়ে ঋতুর আবর্তে বিমোহিত হয়ে রইল যে, সে তো ভীরু মন নিয়ে গেল না রাজ্যবিজয়ে, ভাবল না দিগ্বিজয়ের কথা। যে জাতি শাসক হিসেবে বরণ করে নেয় বারে বারে বাহিরাগত রাজ্যলিপ্সুকে, তার কাছে তো মহাকাব্য-মহাকবি স্বপ্নেরও অতীত। অথচ সে কেবল সংকীর্ণ সংসারের সুখ-দুঃখের গান গাইল। আপন ঘরে ক্ষুধা-দারিদ্র্য আর অন্তহীন শোকের ভেতর রূপকথার রাজপুত্র আর রাজকন্যার দুঃখে ফেলল চোখের জল, সাধন-ভজন সংগীতের কুহকে রইল ডুবে।

এত দারিদ্র্য, এত দুঃখ, এত কষ্ট তবু বাঙালি ইন্দ্রিয়কাতরতা থেকে মুক্তির পথ খুঁজল না। যে জাতি মহাকাব্য রচনা করতে পারল না, সে জাতিই কিন্তু হাস্যরস কৌতুক, রঙ্গরস, রগড় করে সৃষ্টি করল হাজার লক্ষ অশ্লীল ছড়া, প্রবাদ, গান ও কাহিনী। হাজার বছরের প্রাচীন সেসব সৃষ্টি বাঙালি আজো স্মৃতি

ও জনশ্রুতিতে টিকিয়ে রেখেছে। সংগ্রহ করে বই আকারে প্রকাশ করলে লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠা ভরে যাবে। সে সৃষ্টি আজো চলছে প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে। আড্ডায়, পারিববারিক-গার্হস্থ্য পরিবেশে যেসবের চর্চা চলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবার মধ্যেই। বাঙালির অপভাষা, অশ্লীল শব্দ সংগ্রহ করলে হাজার বিশ্বকোষ পূর্ণ হয়ে যাবে। এতে বিস্ময়ের কিছু আছে কি?

একথা ঠিক নয় যে, প্রাকৃতিক পরিবেশ, জলবায়ু, পললভূমির সহজ কৃষি-উৎপাদন বাঙালিকে অলস আত্মকেন্দ্রিক করে রেখেছে। পৃথিবীর বহু দেশ আছে যেখানে পলল ভূমির অভাব নেই, কৃষিও ক্লেশকর নয়। জলবায়ুও অপূর্ব, চিরবসন্ত। সেসব দেশের জনগোষ্ঠী তো বাঙালির মতো অলস কামকাতর নয়? তাদের উদ্ভাবনী শক্তি ও রাষ্ট্রভাবনা ব্যক্তিসংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন নয়। অথচ বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা তার সংকীর্ণ ব্যক্তিভাবনাকে ডিঙিয়ে যেতে পারে না। যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি অনীহা অনিচ্ছুক এই জাতিকে ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্ন কোন কোন সময় বাধ্য করেছে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে। অবশ্যই সেসব অগ্নিবলয়ের সঙ্গে তুলনীর নয়, তারা বরং ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী স্ফুলিঙ্গ-ফুলকির মতো।

পলাশী যুদ্ধে ক্লাইভের বাহিনীর কেবল ইংরেজ সৈন্যই ছিল না, কিছুসংখ্যক আবাঙালি ভারতীয় বিভিন্ন যোদ্ধাজাতির ভাড়াটে সৈন্যও ছিল। ওরা ধর্মে হিন্দু-মুসলমান উভয়ই ছিল একথা মিথ্যে নয়। আশ্চর্য এই, বাংলার নবাবের বাহিনীতে কোন বাঙালি সেপাই ছিল না। অধিক বিস্ময় এই, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখা কিংবা কামানের শব্দে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া, স্মৃতি ও শ্রুতিতে ধারণ করা অলস ভীতু ইন্দ্রিয়পরবশ অথচ করুণরসের মহারসিক বাঙালি নবাব সিরাজের বীরত্ব-সাহস নিয়ে লিখল না ইতিহাস, নাটক কিংবা মহাকাব্য– বীররসের।

বাঙালি লিখল নবাবের পতনের কল্পকথার করুণ রসের সাহিত্য এবং যুগ যুগ ধরে পলাশীর করুণরসে সিক্ত করল নিজেদের অন্তর। সেই করুণরসই যেন বাঙালির আশ্রয় এবং বিলাসী দুঃখবাদী সুখ-প্রশান্তি। অথচ যুদ্ধশেষে পলাতক নবাব এবং তাঁর অনুগত সৈন্যদের ইংরেজের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে গুপ্তচরের মতো বাঙালিরাই। কী ভয়ংকর দ্বিচারিতা!

এই বাংলায় প্রথম যিনি নবাব সিরাজের শৌর্যে-বীর্যে, পতনে, দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন, সেই সুভাষচন্দ্রকে 'নেতাজী' পদবি দিয়ে যেন ইয়ার্কী করল বাঙালি। সুভাষ প্রবর্তিত ২৩ জুন 'পলাশী দিবস'কেও জাতীয় দিবস হিসেবে তারা গ্রহণ করল না। বাঙালির কলংক এই যে, যেদিন ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে নেতাজী সুভাষচন্দ্র মিছিল নিয়ে ইংরেজ বিজয়ের স্মারক কলকাতার মনুমেন্ট ভাঙতে গেলেন কুড়াল কাঁধে তুলে, সেদিন বাংলার প্রাদেশিক সরকারের পুলিশ দেশপ্রেমিক জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ফজলুল হক, বাংলার কি হিন্দু কি মুসলমান, কেউ আস্থা স্থাপন করতে পারে নি তাঁর নেতৃত্বে।

গান্ধী-মুগ্ধ আর মোহাচ্ছন্ন বাঙালি হিন্দুর কেউ সুভাষচন্দ্রের সার্বক্ষণিক যুদ্ধসঙ্গী হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে নি, তাই সুভাষকে যুদ্ধসঙ্গী করতে হয় অবাঙালি মুসলমানকে। অস্ত্র আর রাজনৈতিক সমর্থনের জন্য সুভাষচন্দ্রকে যখন আত্মগোপন করে এশিয়া-ইউরোপ ছুটে বেড়াতে হয়, তখনো তাঁর সঙ্গী ছিলেন অবাঙালি মুসলমান। বাঙালি হিন্দু-মুসলমান কেউ নয়। তাঁর রহস্যজনক মৃত্যুর পূর্বেও এই ছিল বাস্তব সত্য। তাঁর ফৌজে কত শতাংশ বাঙালি সৈন্য ছিল?

বাঙালির সবচেয়ে বড় কীর্তি হলো তার উত্তরাধিকারবোধ। সেই প্রাচীনকালেই সে ভূমির উত্তরাধিকারকে নিশ্চিত করে নিয়েছে। উত্তরাধিকার সম্পত্তিকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরে বাঙালির বড় স্বস্তি। মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি প্রাপ্তির প্রত্যাশা রক্তে যেন প্রশান্তির জোয়ার আনে। কোন কারণে যদি সেই 'হক' অন্যকে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিতে হয়, তখন বাঙালি ভাবে তার এই আত্মত্যাগের মহান দৃষ্টান্ত বুঝি ধরাধামে নেই। একবারও ভাবে না, যে 'হক' সে ত্যাগ করল তা তার নিজের শ্রমে, ঘামে, মেধায় অর্জিত নয়। নিছক পরের ধন। পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও মেধাশক্তির দ্বারা আপন অর্জিত সম্পদের বদলে পরার্জিত সম্পদের প্রতি বাঙালির উত্তরাধিকারিক লোভ, এ যেন তার ঐতিহ্যেরই অংশ।

এই জনজাতি মূলত কৃষিনির্ভর, সে তো বাড়িঘর আর ফসলভূমি লাভ করে উত্তরাধিকার সূত্রে। তাই এই প্রাপ্তির ঐতিহ্যের প্রতি এত দুর্বল সে। বাঙালির সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতি অনাগ্রহ মূলত এই ভূমির উত্তরাধিকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা না-থাকার কারণে। সমাজতন্ত্র প্রতিহতের জন্য সুকৌশলে ধর্মকে সে সামনে আনে, আড়াল করে সম্পত্তির লালসাকে।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এই জনজাতির বড় পছন্দ সেই উত্তরাধিকার। এই আধুনিক যুগে স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হয়েও বাঙালির উত্তরাধিকার শাসকের প্রতি রয়েছে অগাধ শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আনুগত্য। মৃত কিংবা নিহত রাষ্ট্রশাসকের উত্তরাধিকার যোগ্য কি অযোগ্য তা তাদের বিবেচ্য নয়, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ভূমির উর্বরতা কিংবা অনুর্বরতা যেমনটা বিবেচনায় আসে না। জাতিটির এই দুর্বলতা সাম্রাজ্যবাদীরা জানে বলেই এ ধরনের নেতৃত্বের প্রতি তাদের সমর্থন থাকে।

এই উত্তরাধিকারের মায়াবী বন্ধন, তা ছিন্ন হলেই বুঝি বাঙালি হয়ে পড়ে ছিন্নমূল কিংবা সর্বহারা। প্রগতিশীলতার প্রতি অনীহা তথা প্রতিক্রিয়াশীলতা, ধর্মভীরুতা, ধর্মান্ধতা, বিজ্ঞানের প্রতি অনাগ্রহ, বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধের প্রতি অমনোযোগিতার মনোভূমি তো বাঙালি লাভ করেছে উত্তরাধিকার সূত্রের সেই কৃষিব্যবস্থা থেকেই।

বাংলাদেশের রাষ্ট্র সীমানার ভেতর বাঙালি আজ তার জাতীয় ঐক্যকেও করেছে লণ্ডভণ্ড : তার রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতির কাঠামোও ভেঙে

পড়েছে। সে ভাবিত নয় কোন কোন দুর্বলতার কারণে পলাশীর পরাজয়টা অনিবার্য হয়ে পড়ে তা নিয়ে। নিজেদের অপদার্থতা এবং সাম্রাজ্যবাদকে সুকৌশলে আড়াল করার জন্য সব দোষ মুসলমান বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর এবং জৈন জগৎ শেঠ, হিন্দু রাজবল্লভের ষড়যন্ত্রের ঘাড়ে চাপিয়ে ইতিহাস বিকৃতি করা যায়, কিন্তু তাতে রাষ্ট্র ও জনগণের মঙ্গল হয় না।

তাই তো আড়াই শ' বছরের পুরাতন স্মৃতির ভেতর ডুবে গেলে চোখের ভেতর স্পষ্ট ভাসে একাত্তরের স্বাধীনতার ভেতর দিয়ে বিগত সাড়ে তিন দশক ধরে বাঙালির রাজপাটে যারা বসে আছে তাদের ছবি! ওই তো মীর জাফর, ওপাশে কে? জগৎ শেঠ নয় কি? ওদের পায়ের তলায় একাত্তরের সিরাজ-উদ-দৌলার রক্ত স্রোত। ওপাশে মোহম্মদী বেগ। আড়ালে হাসছে সাম্রাজ্যবাদ। ওই নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে কে গাইছে আত্মভোলা বাউলের সংসার নিরাসক্তের গান? হ্যাঁ, সে-ই তো উদাসী বাউল। বাঙালি পুরুষ, কাম আর নারী যার ধর্ম এবং সংসারের সাধনসঙ্গী।

–অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০০৬

গণতন্ত্রের স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন

ইতিহাসের গণতন্ত্র আর গণতন্ত্রের ইতিহাসটা এই উপমহাদেশে যেমনি চমকপ্রদ, তেমনি শিহরণ জাগানো, ঠিক তেমনি রোমহর্ষক। এই নির্দয়, নিষ্ঠুর, নির্মম সত্যটাকে ঢেকে রেখে এই অঞ্চলের গণতন্ত্রের গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করার অর্থ হচ্ছে জন্মান্ধের অন্ধকার রাতে হাঁটার চেষ্টা। আধুনিক গণতন্ত্রের ধারণা এ অঞ্চলের মানুষ পেতে শুরু করে ঔপনিবেশিক যুগে। উপনিবেশ শাসিত দেশে ইংরেজরা গণতন্ত্রকে নিয়ে আসে 'ভাগ কর, শাসন কর' নীতির প্রয়োগার্থে। সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের বদলে সম্প্রদায় (ধর্মীয়) ভিত্তিক তথাকথিক কল্যাণের জন্য শাসক শ্রেণী গণতন্ত্রের আবাদ শুরু করে নীল চাষেরই মতো। নীল চাষের কৃষি পদ্ধতিই রাজনৈতিক চাষে এখানে প্রয়োগ করা হয়। সিপাহী বিপ্লবে উৎকণ্ঠিত শ্বেতাঙ্গ শাসকের হাতে তখন এই ছিল হাতিয়ার। শোষিত বঞ্চিত মানুষ পরিচয়ের অধিকারে নয়, বরং ধর্মীয় পরিচয়ের আধিকারবোধটাই তারা জাগিয়ে তোলে। বঙ্গভঙ্গ থেকে ভারত বিভক্তির সেই ইতিহাস একই সূত্রে গাঁথা।

হাজার হাজার বছর রাজা, সম্রাট, সুলতান শাসিত রাজ্যর অনুগত প্রজার বংশানুক্রমিক রক্তধারা বহন করছে যারা, হঠাৎ তাদের সামনেই গণতন্ত্র এসে হাজির। ধর্মীয় ভেদ-বুদ্ধি, রক্তাক্ত সংঘাত, মনুষ্যত্ব বিরোধী তথাকথিক গণতন্ত্র এই দেশের মাটিতে মাটির আঁতুড় ঘরে জন্ম দেয়া হলো। মনুষ্যত্বের অধিকারে চিরবঞ্চিতের সামনে আলেয়ার ভৌতিক আলোর মতো জ্বলে উঠল লাল-নীল-সবুজ-হলুদ রঙের গণতন্ত্র। অন্ধকার গর্তের পতঙ্গরা আলোর পথের নিশানা ভেবে যেমনি আগুনে আত্মহুতি দেয়, এ দেশের মানুষ সেই দিন ইংরেজের গণতন্ত্রের ভৌতিক আগুনকে আলো ভেবে মুক্তির তৃষ্ণায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। শোষককে শোষক হিসেবে চিনে নেবার বদলে জেনে নেয় হিন্দু হিসেবে, মুসলমান হিসেবে। ইংরেজ শাসককে চিনল ফিরিঙ্গি নাসেরা হিসেবেই। সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে নয়। ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে নয়।

চেনাটা প্রয়োজন ছিল পরস্পরের প্রতিবেশীকে ধনী-দরিদ্র কিংবা রায়ত-জোতদার প্রজা-ভাগচাষী ক্ষেতমজুর হিসেবে। এর বদলে শোষকের শ্রেণী পরিচায়টা আড়ালে চলে গেল, ভেসে উঠল ধর্মীয় পরিচয়। তাই গণতন্ত্রের ভোট এলো পৃথক নির্বাচনের পথ ধরে হিন্দু আর মুসলমান পরিচয়ে। হিন্দুর কাছে আড়াল হয়ে গেল হিন্দু শোষক, মুসলমানের কাছে অদৃশ্যে থেকে গেল মুসলমান শোষক। দেশটাও ভাগ হয়ে গেল ধনীর বিরুদ্ধে নির্ধনের ভোটের মাধ্যমে নয়, বরং মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর, হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের ভোট দানের পথে। আর এই ভোটদানকে কেন্দ্র করে রক্তে ভাসলো দেশ, কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান হাজার বছরের জন্ম ঠিকানা হরিয়ে দলে দলে ছুটতে থাকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পূর্বে। ১৯৪৭ থেকে ২০০৮, আজো এ পথচলা শেষ হয়নি, অর্ধ শতাব্দি কেটে চলেছে। কে জানে কবে শেষ হবে। কোন অনাগত যুগে।

এই রক্তাক্ত অধ্যায়, ধর্মীয় বিভেদের অন্ধকার কাল, তা আজো ভোটের গণতন্ত্রের নাম ধরে এক এক সময় এক এক রং পালটে ছুটে চলেছে। সময় বা কালের রূপান্তরের মতো আজকের এই বাংলাদেশে গণতন্ত্রও বারবার রূপ পাল্টাচ্ছে। ওই গণতন্ত্রটার জন্যই তো একাত্তরে দেশ ভাঙলো, আলাদা হলো বাঙালি। কিন্তু ঔপনিবেশিক শক্তির দেয়া বিভেদের গণতন্ত্র আজো অক্ষত রয়েছে। ইংরেজ গেল, জমিদার বাবুরা গেল, পাঞ্জাবিরাও গেল, চলে গেল ইংরেজি ভাষাভাষী আর উর্দুঅলারা, কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ওই কলংকিত গণতন্ত্র পরিশুদ্ধ হতে পারল না। পলাশী যুদ্ধের স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন, সিপাহী বিপ্লবের স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন, একাত্তরের স্বপ্ন আজো পড়ে রইল দৃশ্যমান থেকে বহুদূরে। অদৃশ্যলোকে।

তাই আজকে এই অঞ্চলের মানুষের জরুরি প্রয়োজন ওই ঔপনিবেশিক গণতন্ত্রের ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে এসে পরিশুদ্ধ হওয়া। ওই সাতচল্লিশের মনুষ্যত্ব বিরোধী ভেদবুদ্ধির গণতন্ত্রের কলংক-মুক্তি না-ঘটলে আমাদেরও নেই মুক্তি। ভোটের গণতন্ত্র তা হলে ঘুরপাক খেতেই থাকবে ধর্মীয় পরিচয়ের ভেতর, রাজনৈতিক দলের নামের পরিচয়ের ভিতর। এ দেশের মানুষ সুখ আর শান্তির সন্ধানে কেবলই ভোট দেয় এক রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে আর এক রাজনৈতিক দলকে, কল্পিত গণদেবতা, ত্রাণকর্তা, দেব-দেবী আর অবতারদের পক্ষে-বিপক্ষে। অথচ কোটি কোটি দরিদ্র শ্রেণীর শোষিত মানুষের গণতান্ত্রিক স্বপ্ন পূরণের জন্য ভোট দেবার প্রয়োজন ছিল শোষকের বিরুদ্ধে, সেই শোষক যেখানে যে দলেই অবস্থান করুক না কেন।

ইংরেজ পিতার ঔরসে দেশিয় মাতার গর্ভে জন্ম নেয়া ওই গণতন্ত্রটাকে যতদিন চেনা না যাবে, ততদিন ভোটের গণতন্ত্রে মানুষের মুক্তি নেই। এ দেশের মানুষ তো ভোট দেয় ধর্মের রক্ষা আর রঙ-বেরঙয়ের জাতীয়তাবাদের নামে। অথচ মুক্তির পথ তো খোলা রয়েছে শোষক শাসক, নির্যাতক,

লুটেরাদের বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার মধ্যে। ও পথে জনগণকে হাঁটতে দেয়া হয় না, জনগণও হাঁটতে চেষ্টা করে না। ভোট গণতন্ত্রের নামে ওরা কেবলই দলের পরিচয়ে শোষককেই ভোট দেয়। বারবার। প্রতিবার।

গণতন্ত্র আসলে আমাদের স্বপ্ন। বাস্তবতা হচ্ছে দুঃস্বপ্ন। প্রচলিত মীথ হচ্ছে এ দেশে বারবার গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়। কথাটা কি সত্য? কোনদিন যে দেশে সত্যিকারের গণতন্ত্রই এল না, ওখানে কোথায় আবার ব্যর্থতা? এই নিষ্ঠুর বাস্তবতার ভেতরই এ দেশের শাসকশ্রেণী বা রাজনৈতিক দলগুলো চাইছে নির্বাচন অর্থাৎ ভোটের গণতন্ত্রের বাস্তবায়ন। দেখেশুনে মনে হচ্ছে ওরা দলীয়ভাবে ক্ষমতায় গেলেই বুঝি গণতন্ত্র মুক্তি পাবে। এ তো মোটেই সত্য নয়। ভোটতন্ত্রে গণতন্ত্র মুক্তি পায় না, মুক্তি পায় অর্থাৎ শাসন ক্ষমতা পায় রাজনৈতিক দল বা জোট।

এ মুক্তি জনগণের মুক্তি নয়, দেশের মুক্তি নয়, বরং গোষ্ঠীর মুক্তি। এ ক্ষেত্রে অনেক প্রশ্ন আসে। কেবল সঠিক ভোটার লিস্ট, সন্ত্রাস-দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচন হলেই কি দেশ ও জনগণের মঙ্গল হবে? এমন একটি নির্বাচনের নাম কি গণতন্ত্র? গণতন্তের অর্থই হচ্ছে দেশের দরিদ্র, শোষিত, বঞ্চিত অর্থাৎ ৯৯% জনগণের মুক্তি। তথাকথিত সৎ মানুষ দ্বারা সংসদ পূর্ণ হলেই কি মানুষের অধিক মুক্তি ঘটবে? একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক চর্চা কাঠামো তৈরি না হলে প্রতিবর্ষায় ডেঙ্গুর মতো অপরাজনীতি আর অপশাসন বারবার ফিরে আসবেই।

একটি দেশে গণতন্ত্রের চর্চা, লালন-পালন-অনুশীলন নির্ভর করে প্রকৃত অর্থে দেশটি কতটা পরিমাণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন সার্বভৌম। সাম্রাজ্যবাদ কবলিত দেশে কখনো গণতন্ত্র বিকশিত হয় না। গণতন্ত্র চিরকালই সাম্রাজ্যবাদের প্রতিপক্ষ। এমনি একটি দেশে মানুষ বাস করে কীটপতঙ্গের মতো। মানুষের জীবন যে কতটা দুঃস্বপ্নে পূর্ণ তা বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তানের গণমানুষই হাড়ে হাড়ে টের পায়। যা কিছু ঘটে এবং ঘটবে তা যেন পূর্বনির্ধারিত, অনেকটা 'লোকনাথ পঞ্জিকা'র রাষ্ট্রগত বর্ষফল এবং ব্যক্তিগত (রাশিফল) বর্ষফলের মতো। বর্ণনাটা এমন– বর্ষের শুরুতে শনি গ্রহের প্রবল প্রভাব হেতু রাহু ও কেতুর দৃষ্টির কারণে অনাবৃষ্টি বন্যা, দুর্ভিক্ষ, লোকক্ষয়, সংঘাত, রক্তপাত, বরেণ্য ব্যক্তির মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা, কিন্তু বর্ষের মাঝামাঝি চন্দ্র ও মঙ্গলের বিষুব রেখার অবস্থান হেতু শুভ সূচনা।

ওই যে শনি এবং রাহু, তারা হচ্ছে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ এবং তার আজ্ঞাবাহী মধ্যপ্রাচ্য। তারাই বাংলাদেশের মানুষকে চারপাশ ঘিরে রেখেছে, গণতন্ত্রের মহিমায় জাতিকে আলোকিত হতে দেয় না। তারাই নিয়ন্ত্রণ করে রাজনীতি আর অর্থনীতি। সৎ দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ এ দেশে নেই, এ কথা মিথ্যে নয়। জাতি এবং জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রকৃত গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যেতে দেয় না তো তারাই। আজ বিশ্ব পরিস্থিতিও বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র

প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্রে সহজ নয়। লাতিন আমেরিকার সৎ নেতৃত্ব এবং জনগণের অব্যাহত সংগ্রামের দিকে তাকিয়ে বোঝা যায় বাংলাদেশের মতো দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কতটা জটিল। কেন না জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং স্বপ্ন তখনই পূর্ণ হবার সুযোগ আসে যখন দেশের সত্তাটি থাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবাহী দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং এই দুই অংশের অভিক্রিয়ায় যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা আজ দানব হিসেবে শহর থেকে গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে বার্ডফ্লুয়ের মতো। জাতির দীর্ঘদিনের যে সাংস্কৃতিক অর্জন তাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে।

খাদ্য সংকট নিরসন কোন কঠিন বিষয় নয়, অর্থনৈতিক মন্দাও কাটিয়ে ওঠা যায়, রাজনৈতিক সংকটও ধীরে ধীরে কেটে যায়, কিন্তু জাতির যদি চিন্তা-মনন-মনীষার মহান অর্জনগুলো চরম স্থূল ভোগবাদী আগুনে পুরে যায় তবে ঘটে সর্বনাশ। অকার্যকর রাষ্ট্র কিংবা দুর্নীতিতে ডুবন্ত রাষ্ট্রও মুক্তি পায়, কিন্তু সংস্কৃতির ঘরে আগুন লাগলে তা নেভানো বড় কঠিন। দেশের ভাবুক-চিন্তকগণ কেবল রাজনীতি-অর্থনীতি নিয়ে ভাবিত, অথচ এরই ভেতর কী সর্বনাশ ঘটে গেছে আমাদের সৃষ্টিশীলতার জগতে তার প্রতি যেন কারো নজর পড়ে না।

জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র আজ লণ্ডভণ্ড, মেধা চর্চার স্থান যেমনি নদী ভাঙ্গনে জনপদ বিলয়ের মতো হারিয়ে যাচ্ছে, তেমনি গভীর শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে মেধায় ক্ষেত্রে। মেধা চর্চার প্রতি অনিচ্ছুক স্থূল আমুদে জন্ম-প্রজন্মে ভরে যাচ্ছে দেশ। এটি আশ্চর্য সত্য যে, বাঙালি সমাজে নতুন অপরিচিত এক মানব প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে অতিমধ্যে। শরীর ভোগ, চিত্ত ভোগ ছাড়া অন্য কিছুতে আগ্রহী নয় এই নব প্রজাতি। শরীর ও মনের বিকৃত ক্ষুধাটা তাদের কত বড় এবং ভয়ংকর তার প্রমাণ কেবল মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট কিংবা মাদক ব্যবহারই নয়। এই অভিনব প্রজাতির মগজও তৈরি হয়েছে অভিনব উপাদানে। ওরা সাহিত্য বোঝে না, বিজ্ঞান বোঝে না, সংগীতও বোঝে না। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংগীতের ভেতর তারা অনুসন্ধান করে দেহ ও মনের সম্ভোগ। সাহিত্য-ধর্ষকের অভাব যে নেই তা বোঝা যায় বইমেলায় তাদের উন্মাদনায়। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অপব্যবহারে তাদের শরীর-মনের ভোগের পরিচয় মেলে, বিকৃত মানসিক-দৈহিক উন্মত্ততার পরিচয় মেলে ব্যান্ড ইত্যাদি সংগীতে।

প্রশ্ন হচ্ছে, এসব কি সভ্য মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার? গণতন্ত্র তো মানুষকে মানুষের প্রতি বিশ্বাসী হতে শিক্ষা দেয়, বন্ধু হতে প্রেরণা যোগায়, সহমর্মী হতে সহায়তা করে। তবে আজ মানুষ কেন একে অন্যের প্রতি সন্দেহপ্রবণ-অবিশ্বাসী ? কেন মানুষের ভেতর মানুষ কেবল হিংস্র রূপ নিয়ে দেখা দেয়? স্বামী স্ত্রী, পিতা-পুত্র, কন্যা-মাতা, ভাই-বোন কেন আজ পরস্পরের প্রতি আস্থাহীন?

আর এই যে মহাসংকট ঘরে-ঘরে, সমাজে-সমাজে, তার মুক্তির পথ কোথায় ? কেবলই চাল-ডালের দাম কমলে, একটি সুন্দর নির্বাচন হলে,

ভোটের গণতন্ত্রের ষোলকলা পূর্ণ হলে কি বাঙালির মনন জগতের এই মহাবিপর্যয় রক্ষা পাবে? যদি তা সত্যি হয় তবে ধনী, মানী, গুণী, বিজ্ঞানীর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষ কেন পৃথিবীর সবচেয়ে অসুখী প্রাণী? কেন এত আত্মহত্যা ওই মুলুকে?

মনন-মনীষা, প্রেম-করুণা, বিবেক-মনুষ্যত্ব, আত্মত্যাগ-নির্লোভ, স্রষ্টা আর সৃষ্টিশীল বাঙালি-প্রজাতি কি নদী আর প্রকৃতির হারিয়ে যাওয়া প্রাণী-প্রজাতির মতো বিলুপ্ত হয়ে যাবে? এই আশংকা এই কারণে যে, সৃষ্টি আর ক্রমবিকাশের যে মূল চালিকাশক্তি, সেই সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে জাতিটি। জাতির মেধা চর্চা আর মননের খাদ্য যোগায় যে প্রিন্ট আর ইলেকট্রনিক মিডিয়া তার দিকে তাকালেই বোঝা যায় ওসবে কী উৎপাদিত হচ্ছে– মানব আহার্য-খাদ্য নাকি অরণ্যচারী পশু-খাদ্য? উক্তিটি নিষ্ঠুর, কিন্তু মিথ্যে কি?

আজো বাঙালির রক্তে গণতন্ত্র মিশেল হচ্ছে না। হতো, যদি না সংস্কৃতি থেকে অর্থনীতি আর রাজনীতিটা পর্যন্ত সাধনা আর সভ্যতা চর্চার উপাদান হয়ে উঠতে পারত। হবে কেমন করে? ঔপনিবেশিক শক্তি যে জাতিকে "গণতন্ত্র" দিয়েছে জাতি-বর্ণ-ধর্ম বিদ্বেষ আর বিবেক-মনুষ্যত্বকে বিচ্ছিন্ন হতে, সে তো কোন দিন শুদ্ধ হতে চেষ্টা করল না। গণতন্ত্রের স্বপ্ন যদি হয় ভোটের তন্ত্রের দ্বারা মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ আর প্রতিহিংসা, দলে দলে ক্ষমতার লড়াই, তবে তা তো স্বপ্ন নয়, বরং দুঃস্বপ্ন।

দুঃস্বপ্নটা আরো আতংকিত করে তোলে। তখনই তোলে যখন বোঝা যায় এ অঞ্চলের মানুষকে চেতনা বিরোধক বড়ি খাইয়ে কতটা অচেতন করে ফেলা হয়েছে, দৃষ্টিশক্তিও হরণ করা হয়েছে। ওরা যেমনি সত্যকে চেনার শক্তি হারিয়েছে, তেমনি দেখতেও পায় না কোথায় আলো, কোথায় অন্ধকার। সাম্রাজ্যবাদীরা দখল করে ইরাক, আফগানিস্তান আর কিনা রাজপথে চিৎকার ওঠে "ইহুদি, ইহুদি, নাসেরা, নাসেরা।" অথচ পাশের যে আরব দেশগুলোতে ঘাঁটি গেড়ে যুদ্ধ পরিচালনা হচ্ছে তাদের নাম-ধান বেমালুম ভুলে যায় মানুষগুলো। এই যে চেতনারহিত জাতি তার আবার গণতন্ত্রের স্বপ্নই কী, দুঃস্বপ্নই কী?

–এপ্রিল–২০০৮

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নভূমি

গতকাল থেকে আজকের দিনটিতে যারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-ভূগোল লেখালেখি করেছেন কিংবা করছেন, তাদের কারো-কারো দর্শন-দৃষ্টিকোণ নিয়ন্ত্রিত হয় জোর জবরবদস্তির রাষ্ট্র এবং শাসক শ্রেণীর ভাবাদর্শে। সেই ভাবাদর্শ রাষ্ট্র আর রাজনীতি থেকে ব্যক্তি-মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, এবং ব্যক্তির চোখ থাকে মাটির বদলে আকাশে। মইয়ের উপর দাঁড়িয়ে তারা আকাশ দেখে, মইটা যে মাটিতে ভর করে আছে তার অবস্থানটা টেরই পায় না। তারাই কিনা তথাকথিত গবেষক সেজে সাহিত্য সমালোচনার নামে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ রচনা করে দাবি করে– এটা এই, উনি এই – এ যেন অলংঘনীয় ঈশ্বরের বাক্য।

তারা যখন দেখতে পায় রাষ্ট্র যারা শাসন করে না, বরং তারা শাসিতদের নিয়ে মহৎ সাহিত্য রচনা করছেন, তখনই ভয়ে চমকে ওঠে। এবং চেষ্টা করে কোনো সূত্রে ফেলে ওসব সাহিত্যকে বাতিল করা যায় কিনা। রাষ্ট্রের জটিল-ভয়ংকর বাস্তবতা, জীবনের নির্মম নিষ্ঠুর বাস্তবতাপূর্ণ সাহিত্যকর্ম দেখে জ্ঞানশূন্য হয়ে তারা লেগে যায় মহৎ লেখকের চরিত্র হননে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেলার এর ব্যতিক্রম ঘটেনি, ঘটার কথাও নয়। "মধ্যবিত্ত" আর "কমিউনিস্ট" কিংবা "কমিউনিস্ট নন" এই চাতুর্যপূর্ণ বিতর্ক আজো চলছে। তাঁর সাহিত্যের চেয়ে তাদের কাছে প্রধান হয়ে ওঠে মৃগী রোগ, মদ্যপান, পার্টির সঙ্গে দ্বন্দ্ব। তাই সাধারণ পাঠকশ্রেণীর কাছে মানিক যতটা স্বীকৃত, ঠিক ততটা অস্বীকৃত তথাকথিক এক শ্রেণীর গবেষকদের কাছে। গাড়ির টায়ার সারাইকারী বালকেরা যেমনি টায়ারে ছিদ্র খোঁজে, জুতো পালিশকারী যেমনি পথচারীর মাথার বদলে পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে চটকে যাওয়া রঙের জুতোর সন্ধানে, মলম বিক্রেতারা যেমনি যাত্রীদের শরীরে ঘা, খোস-পাঁচড়া তালাশ করে, আমাদের লেখকদের মধ্যেও অনেকে মানিককে নিয়ে তাই করে। না করে উপায় থাকে না ওদের। নিজেদের ভাণ্ডার যে শূন্য!

কেন এমনটা করে? করে এই কারণে যে, অলংঘনীয় পর্বতের মতো পাঠকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানিককে না-সরালে আপন মুখখানা যে দর্শকের চোখে পড়ে না। কিন্তু ওরা এটা ভাবে না যে, রাখাল বালকেরা খেলাচ্ছলে যতই ধাক্কা দিক হিমালয়কে, পর্বত তো নেপাল ছেড়ে চীনে ঢুকে পড়ে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে না। আমি একজন অতিনগণ্য লেখক হিসেবে বলতে চাই, মানিককে ছোট করার কিংবা বাতিল করার হাস্যকর পণ্ডশ্রম বাদ দিয়ে নিজের লেখাটি লিখুন এতে মানিকের চেয়ে লাভ আপনাদেরই অধিক।

বলছিলাম সিগমণ্ড ফ্রয়েডের কথা। ফ্রয়েড খুব সামান্যই প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন জীবনবাস্তবতাবাদী কথাকার মানিকের উপর। মানিক ফ্রয়েডকে নিয়ে কৌতূহলী খেলা খেলেছেন প্রথম জীবনে এবং যথাসময়ে সেই কৌতূহল থেকে দূরে সরেও গেছেন। অথচ আমাদের মানিক গবেষকেরা মানিক সাহিত্যে কেবল ফ্রয়েডকে দৌড়ে বেড়িয়েছেন। কেন না পাঠকের বদলে তাদের নিজেদের কাছে মানিকের ছায়ায় ফ্রয়েড বেশ উপভোগের বিষয়। তাই তাদেও লেখায় বারবার মানিকের বদলে ফ্রয়েড যেন চিৎকার করে ওঠেন। আমি এই লেখায় মাত্র একটি গল্পে দেখাতে চেষ্টা করব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সিগমন্ড সাহেবকে নিয়ে কী খেলাটা খেলেছেন।

হ্যাঁ, সেই গল্প, মানিক নিন্দুকদেরও দারুণ উপভোগের গল্প। 'প্রাগৈতিহাসিক'। গৌতম বুদ্ধ একেই বলেছেন মানুষের পক্ষে প্রায় অলংঘনীয় দুঃখের কারণ। ইন্দ্রিয়জাত সম্ভোগ। স্পর্শে জাগ্রত হয়, পঞ্চইন্দ্রিয়ের স্পর্শ কাতর এই আদিম অভিঘাত। যৌনক্ষুধা। ফ্রয়েডের দাবি, উদরের ক্ষুধার চেয়েও যৌনক্ষুধা অদমনযোগ্য। অবশ্য কার্ল মার্ক্স তা স্বীকার করেন না। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিজ্ঞানবার্তা এই, জন্তুদের একদল বিবর্তনবাদের ফাঁদে পড়ে দু ধাপ এগিয়ে "মানুষ" হয়ে গেছে, বাকিরা পেছনে পড়ে যথা পূর্বং তথা পরং। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ জীন খুব একটা বিবর্তিত হতে পারেনি বলেই জড়া আছে, মৃত্যু আছে এবং সঙ্গে আছে প্রবৃত্তি।

প্রবৃত্তির বিষয়ের আড়ালে মানুষের যে আদি বিচ্ছিন্নতা, যা হতে পারে অস্তিত্বের, আত্মপরিচয়ের, সভ্যতার এবং ভয়ংকর নিঃসঙ্গতার সেই কৌতূহল বা জিজ্ঞাসাকে নিয়ে চমকিত ভয়ংকর খেলা খেলেছেন মানিক প্রাগৈতিহাসিক গল্পে। যৌনতাকে মানিক প্রধান করতে চেয়েছিলেন কিনা, গল্পের বয়ানে লেখক ভাষায় যে সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তা নিয়ে আজকের দিনে তুমুল তর্ক হতে পারে। এ তর্কে এমনও হতে পারে লেখক মানিক হেরে যেতে পারেন আপন সৃষ্ট শিল্পেরই হাতে। মানিকের অজ্ঞাত অন্য মানিক তার চেতনা থেকেই বেরিয়ে আসতে পারে। ওই যে বলা হয় লেখক সত্তার আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকে যে অন্য লেখক সত্তা, তা লেখক নিজেও জানেন না। তাই কালজয়ী সাহিত্যের-স্রষ্টারা কোনো কোনো সময় নিজের সৃষ্টির সামনে নিজেই শিশুর

মতো ভেবাচ্যাকা খেয়ে যান। এবং তার তখন জাগে আত্ম প্রশ্ন—সত্যি এমনটা লিখেছি?

তো, মানিক, কী লিখেছেন ওই গল্পে? এর আগে জানাজানি জরুরি কখন লিখলেন এ গল্প? সময়টা ১৯৩৭। ভারতবর্ষ সর্বতোভাবে স্বাধীন হতে চাচ্ছে ঔপনিবেশিক বন্দিদশা থেকে। চলছিল অহিংসার পাশাপাশি বিপ্লবী সশস্ত্র লড়াই। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তখন চরমে। চলছে সাম্রাজ্যবাদের উলঙ্গ গণহত্যা। অন্যদিকে ইউরোপ তৈরি হচ্ছিল মহাযুদ্ধের জন্য, উপনিবেশিক বাজার নিয়ে দানব দানবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শান দিচ্ছিল। সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন অধীন জাতিকে ভিক্ষুকে পরিণত করে ফেলে ততদিনে। পরাধীন জাতি খোঁজে আত্ম পরিচয় যা সে হারিয়েছে পলাশী প্রান্তরে। অস্তিত্ব বিচ্ছিন্ন জাতি, যাকে উপনিবেশ করে রেখেছে আদিম বর্বর, সে চায় সভ্যতার কাছে ফিরে যেতে, বেরিয়ে আসতে চায় আত্মগোপন থেকে। এসব চাপ অবশ্যই 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের লেখক মানিক অনুভব করেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে পরবর্তীতে যুক্ত হওয়া তারই প্রমাণ। এ গল্প তো কমিউনিস্ট মানিকের প্রস্তুতি পর্বের ফসল।

মানিকের গল্পের ভিখু আর পাঁচী চরিত্র তো প্রপঞ্চ পাপেরই প্রতিকল্প। গল্পে মানিক ডাকাত ভিখুকে দিয়ে একটি হত্যাকাণ্ড না ঘটালে সাম্রাজ্যবাদের সেই অন্ধকার উপনিবেশটির খননকার্য করতে পারতেন কি? এখানে মানুষ তার সমস্ত ক্ষুধা আর যৌনতা ভিন্ন জীবনের অন্য ব্যাখ্যা সে হারিয়ে ফেলে। পেছনে আলো ফেলে অন্ধকারে পলায়ন করে সে। আত্মপরিচয় বিচ্ছিন্ন করে মানুষ পলাতক জীবনের বর্বরতা-হিংস্রতার ভেতর অস্তিত্ব অনুসন্ধান করে। সবই এই উপনিবেশিক বর্বরতারই ফল।

ওই যে উপনিবেশিক অন্ধকার জগৎ এবং তার ভেতরও পশুর প্রাণরক্ষার মতো বাঁচার প্রেরণা, তা তো অধীন জাতির জীবনের বাস্তবতা। তাই তো খুনি-ডাকাত, ভিখু অন্যকে যে খুন করে, সেও বাঁচতে চায় সভ্যতা বিবর্জিত আদিম জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে, আত্মগোপন করে। কাঁধে রক্তাক্ত আঘাতের ক্ষত নিয়ে অরণ্যচারীদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চায় সে। এ হচ্ছে চার্লস ডারউনের অস্তিত্বের লড়াই। লেখক বলছেন, "ভিক্ষু তবু বাঁচিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল...তৃষ্ণার পীড়ন...অসহ্য ক্ষুধা...সে কিছুতেই মরিবে না। বনের পশু যে অবস্থান বাঁচে না, সেই অবস্থায়, মানুষ সে, বাঁচিবেই।"

আমরা পাঠক মাত্র চমকে ওঠি। বনের পশু আর পতঙ্গের সঙ্গে বসবাস করলেও সে যে পশু নয়, বরং মানুষ, ভিখুর এই উপলব্ধি আমাদের ভাবিত করে। ভিখুর এই আত্ম আবিষ্কার এবং অস্তিত্বের সংগ্রাম তাকে উচ্চতর প্রাণীর মর্যাদা এনে দেয়। গল্পে দেখা যায় বন থেকে একদিন ভিখু বেরিয়ে আসে এবং পেহলাদের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। এ যেন গুহাবাসী অরণ্যচারী মানুষের সভ্যতার আশ্রয়ে ফেরা। তারপর ওই যে তার একলা বাড়িতে পেহলাদের

বৌ'র হাত চেপে ধরা, এটাকে আমরা কি নিছক প্রবৃত্তির তাড়না বলবো? নিশ্চয়ই তা নয়। এর পেছনে কাজ কি করেছে ভিখুর সেই উপলব্ধি– সে যে বঞ্চিত মানুষ। মানুষ যেমনি নিঃসঙ্গ প্রাণী নয়, তেমনি নিরানন্দের বাসিন্দাও নয়। সে সামাজিক প্রাণী তো বটেই, হৃদয়-চিন্তা-অনুভব-উপলব্ধির প্রাণীও। আসলে পলাতক জীবনে ভিখুর যে বিচ্ছিন্নতা, তা হচ্ছে সামাজিক সঙ্গ এবং চিত্তের আনন্দের বিচ্ছিন্নতা। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষিত দরিদ্র তো সঙ্গ পায় আপন পরিবারের কাছে এবং আনন্দকে খোঁজে ঘরের নারীর শরীরে। এ ছাড়া নিঃসঙ্গ-মুক্তি আর আনন্দ-মুক্তির সহজলভ্য উপাদান তো দরিদ্রের হাতের কাছে থাকে না। ভিখুর এই ঘটনা কি আমরা ফ্রয়েডিয় যৌনচেতনার অনুসন্ধান করব?

আমরা দেখতে পাব ভিক্ষু পলাতক, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, আত্মপরিচয় হারা জীবন থেকে মুক্তি চায়। এমনও তো হতে পারে পেহলাদের বৌ'র হাত ধরা ছিল ভিখুর একটি প্রতিশোধ স্পৃহা। কেননা তার হাতের বাজু বা হাতের গহনা খোয়া যাওয়া পেছনে সন্দেহ করছে সে পেহলাদকে। এই বাজুর বাজার মূল্য যা-ই থাকুক, ভিক্ষুর কাছে তা ছিল তার আত্ম আবিষ্কার বা নিজেকে নিজে চিনে নেবার উপকরণ। ওটা তার দেহের অলংকার নয়, বরং সঙ্গী, নিঃসঙ্গতার আশ্রয়, নিজের বা নিজত্বের সম্পদ। সামাজিক মানুষের শনাক্ত চিহ্ন।

সঙ্গত কারণেই আমরা মনে করতে পারি যে ভিখু আসলেই অস্তিত্বের মহাসংকটে পতিত উপনিবেশেরই গণপ্রতীক। তার আদিম-অসভ্য জীবনের বাস্তবতা হচ্ছে শোষণ-শাসনের অভিঘাতে পতিত সভ্যতা হারিয়ে ফেলা একটি জাতির মহাপতনেরই ছায়া। ওই অন্ধকারের ভিতর 'মানুষ' হিসেবে ওই যে তার আত্ম আবিষ্কার তা তো উপনিবেশের পশুজীবনের ভেতর তৎকালে জেগে ওঠা অধীন ভারতবর্ষের মানুষের জাতিসত্তা আর মানবসত্তারই জাগরণ।

পেহলাদের ঘরে আগুন দিয়ে রাতের আঁধারে ভিখুর নিরুদ্দেশ যাত্রার বর্ণনা পাচ্ছি এভাবে, "সেই রাত্রি হইতে ভিখুর আদিম, অসভ্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল।" পাঠক হিসেবে আমরা সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে রাত্রি বা অন্ধকারের প্রাধান্য অধিক। যেন বা সবকিছু ক্রিয়াশক্তির মূলে কাজ করছে আদিম অন্ধকার। এ যেন অন্ধকারের রহস্য নিয়ে মানিকের শিল্পের খেলা। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাই প্রায় পঙ্গু-ক্লান্ত একটি মানুষের ডিঙ্গি করে নদীর স্রোতে ভাসতে থাকা। নদীকে শাসন করার ক্ষমতা তার নাই। এ যেন মানুষের জীবনের এমন এক বৈরি স্রোত থাকে বশ করার ক্ষমতা শূন্য অক্ষমের অনিশ্চিৎ এক অন্ধকার নিরুদ্দেশ যাত্রা।

আর সেই যে দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবনে পা ফেলে ভিখু, সেখানে ভিখারিনী পাঁচী হয়ে ওঠে তার জীবনের অস্তিত্বের নতুন আস্বাদ আর স্বাধীনতার ঠিকানা-স্বপ্ন। তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয় তার বাকি জীবন। পাঁচী যেন সেই ঠিকানা,

যেখানে অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতর প্রাণশক্তির নব উদ্বোধন। ভিখুর কাছে পাঁচী যতটা নারী, যতটা কাম চরিতার্থের যন্ত্র, তার অধিক প্রশান্তি আর অস্তিত্বের দ্বীপভূমি।

ভয়ংকর যে নিঃসঙ্গতা, দুর্বিনীত যে মানব-অস্তিত্ব ভীতি সেখানে শরীরী ক্ষুধার চেয়েও প্রবল হচ্ছে আত্মক্ষুধা। সেই আত্মক্ষুধার আশ্রয় তো ভিখুর কাছে একমাত্র পাঁচী। পাঁচীর নোংরা শরীর ভিখুর কাছে মূল্যহীন। কেন না, এ যেন অনেকটা অ্যাডাম আর ইভের মত। হোক প্যারাডাইজ লস্ট, সঙ্গে থাকুক ইভ। অথচ আমরা কি এমনটাই মনে করতে পারি পাঁচীর দখল নিয়ে বসিরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ভিখুর নারী কিংবা যৌনতা, চাই কি ভিক্ষা বাণিজ্য দখলের সংঘাত? কী লুকিয়ে আছে এত অতল অন্ধকার গভীরে? সহজ উত্তর, নিঃসঙ্গতার সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধারে ভিখুর উন্মত্ত প্রত্যাশা।

ভিখুর মধ্যে ওই যে আমরা ঘৃণা দেখি তা অবশ্যই অবিকশিত শ্রেণীঘৃণা। সে চুরি করে না বরং জোর করে, খুন করে, ডাকাতি করে– ঘর ওই বিত্তবানের। ডাকাত খুনি ভিখু যখন ভিক্ষুকে পরিণত হয় তখনও মরে না তার সেই ঘৃণা বরং প্রবল হয়। পথচারী করুণাকরণ ভিক্ষাদাতারা বিমুখ করলে সেই ঘৃণাটা উথলে ওঠে। "আরক্ত চোখে তাহার দিকে একবার কটমট করিয়া তাকাইয়া........" ওই যে সে বলে, "হেই বাবা একটা পয়সা : আমায় দিলে ভগবান দিবো"– কথাটা নিজে সে কতটা বিশ্বাস করে? ভগবান যে দেয় না, বরং ভগবানের নোংরা হাত থেকে কেড়ে আনতে হয়, ভিখুর কাছে এটাই পরম সত্য। তার জীবনের অভিজ্ঞতাও তাই।

"নদীর ঘাটে মেয়েরা স্নান করিতে নামিলে ভিক্ষা চাহিবার ছলে জলের ধারে গিয়া দাঁড়ায়। মেয়েরা ভয় পাইলে সে খুশি হয় এবং সরিয়া যাইতে বলিলে নড়ে না, দাঁত বাহির করিয়া দুর্বিনীত হাসি হাসে।......নারীসঙ্গহীন এই নিরুৎসব জীবন আর তাহার ভাল লাগে না।" এখানে ফ্রয়েডিয় ছায়ায় আড়ালে রয়েছে পরম সত্য। মেয়েদের ভয় পাইয়ে দিতে ভিখুর দুর্বিনীত হাসি আর নারীসঙ্গবর্জিত নিরুৎসব অর্থাৎ আনন্দশূন্য জীবনের অর্থ আছে। উপনিবেশিক শাসক তো ভিখুদের জন্য একমাত্র প্রজনন ক্রিয়ার যন্ত্র নারী ভিন্ন আনন্দ-বিনোদনের কোনো উপকরণ অনুমোদন করেনি।

এই উৎসব আনন্দের জন্য শোষিত-দরিদ্রদের পেছনে শাসকদের অর্থব্যয় করার দায়িত্ব নিতে হয় না। বিত্তহীন সমাজ নিজেরাই সমাজ থেকে বিবাহ স্বীকৃতির মাধ্যমে তা লাভ করে। এখানে ভিখুর জন্য সিগমন্ড ফ্রয়েডের দরকার নেই। তা যে নেই এর প্রমাণ নারীদের দিকে তাকিয়ে তার দুর্বিনীত হাসি। এ হাসি যৌনতাগন্ধময় নয়, বরং প্রতিহিংসা, ঘৃণা। কেননা ওই ধনীর ঘরের সুখী নারীরা তাকে ভিক্ষা দেয় না, ওরা তার নিরানন্দের জীবনে আশ্রয়ভূমিও নয়। মানিক তাই জানাচ্ছেন "বিদেশগত কত পুরুষের গৃহে মেয়েরা থাকে একা। এ দিকে, ধারালো একটা অস্ত্র হাতে ওদের সামনে হুমকি দিয়া পড়িয়া একদিনে

বড়লোক হওয়ার পরিবর্তে বিন্নু মাঝির চালাটার নীচে সে চুপচাপ শুইয়া থাকে।" বড়লোক সে হতে চায় না। ।

এই গল্পে মানিক তির্যক গতিতে একটি জগতের উন্মোচন ঘটিয়েছেন। সেই জগতের মানুষ সুস্থ-স্বাভাবিক নয়, পঙ্গু প্রতিবন্ধী। মূল চরিত্র তো বটেই, অন্যরাও। যেমন পাঁচী আর বসির। মানুষ হিসেবে তো নয়ই, ধর্মীয় সম্প্রদায় গত হিসেবেও তারা নিজস্ব আইডেনটিটি হারিয়ে ফেলেছে। শারীরিক পঙ্গুত্ব, অর্থনৈতিক পঙ্গুত্ব তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়কেও বিচূর্ণ করেছে। ক্ষুধা-মুক্তির নামে শারীরিক পঙ্গুত্ব হয়ে যায় উপার্জনের পুঁজি। অর্থটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াল? ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে মানুষ কেবল যে শরীরের পঙ্গুত্বই বরণ করেছে তা নয়, নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়ে মনুষ্যত্বের দায় খুইয়ে, আপন প্রতিবন্ধী জীবনকে জিইয়ে রাখতে চাইছে। সুস্থ জীবনের কাছে ফিরতে চাইছে না। শরীরের সঙ্গে আত্মাকেও পঙ্গু ভিক্ষুকে পরিণত করেছে। ওই যে পাঁচীর প্রতি আসক্ত হলে ভিখুকে সে কী বলে? ঔষধ দিয়ে ঘা সারাতে গররাজি কেন পাঁচী? কী মর্মান্তিক উক্তির "দু'দিন বাদে মোরে যখন তুই খেদাইয়া দিবি, ঘা টি মুই তখন পামু কোয়ানে?"

পাঁচীর কাছে জীবনটা এতটাই নির্মম যে, ইচ্ছে থাকলেও বসিরকে ছেড়ে ভিখুর কাছে যেতে চায় না। কেন চায় না? চায় না এই কারণে যে, মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের শেষ বিন্দুটিও এই ইংরেজ উপনিবেশে ফুরিয়ে গেছে। এখানে পাঁচীরও বসিরের প্রতি ভালবাসা নেই, বনের পশুর মতোই যৌনতা নিরপেক্ষ যৌথ জীবনের তাড়না মাত্র। ঘৃণা নেই ভিখুর প্রতিও। এ যেন প্রতিযোগিতা, একজন নারীসঙ্গীর জন্য দুজন নিঃসঙ্গ আদিম পুরুষের। তাই তো পাঁচী বলে ভিখুকে, "আগে আইবার পার নাই? যা, অখন মর গিয়া।" দেখা যাচ্ছে নিঃসঙ্গতা নিয়ে দুটো পুরুষই আতংকিত। নারীর কাছে পুরুষের প্রাপ্তি কিংবা অর্থনৈতিক প্রয়োজনের বাইরে এটা মানবিক চাহিদা। পাঁচী এটাও জানে নিঃসঙ্গ একাকী মানুষ বেঁচে থেকেও মৃত। 'অখন মর গিয়া" – এই উক্তির লুকানো সত্য এখানেই।

পাঠক মাত্রই জানেন ফ্রয়েডবাদ নিয়ে মানিকের ধরণাও নেতিবাচক। তাঁর নিজের বয়ানে এর প্রমাণ মেলে। 'পদ্মানদীর মাঝি' 'পুতুল নাচের ইতিকথা' কিংবা অপরাপর গল্প উপন্যাস সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করলে বোঝা যায় পশ্চিমের এই তত্ত্ব তাঁকে কৌতূহলী করেছে, মুগ্ধ করেনি। যদি হতো তবে অচিরেই সেই তত্ত্বকে দূরে ঠেলে তিনি মার্ক্স-এর কাছে ছুটে যেতেন না। বিস্ময়কর অথচ চিন্তার অতলস্পর্শী কিছু বাক্যের কাছে দাঁড়ালে আমরা কী পাই? "আপনার ভাগ্যের বিরুদ্ধে ভিখুর মন বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। তাহার চলার পথে বিন্নু মাঝির সুখী পরিবারটি জীবনটা তাহার হিংসায় জর্জরিত করিয়া দেয়।.....মাঝে মাঝে তাহার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে হত্যা করিয়া পৃথিবীর যত খাদ্য ও যত নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারিলে

তাহার তৃপ্তি হইবে না।" এখানে 'আপনার ভাগ্য' 'বিদ্রোহী', 'সুখি পরিবার', 'হিংসায় জর্জরিত' শব্দগুলোর ব্যবহারিক অর্থের চেয়ে ব্যঞ্জনার্থ অধিক। নিঃসঙ্গতার অতলস্পর্শী মর্মজ্বালা তো আপন অস্তিত্বের বাইরে অন্যকিছু ভাবতে পারে না ভিখু। সুখ তো ভিখুর দখলে নেই, দখলে বিনু মাঝির । তাই পুরুষ হত্যার বিনিময়ে কেবল নারীই নয়, খাদ্য দখলেরও অলীক স্বপ্ন দেখে সে।

এমন বর্ণনা মানিক দিচ্ছেন ফ্রয়েডিয় সূত্র ধরেই। ক্ষুধা আর যৌনতার মধ্যে যৌনতাই প্রবল, একথা ফ্রয়েড বললেও মানিক বলেননি। দুটির অভিক্রিয়া মানিক আলাদা নয়, বরং এক করে দেখেছেন। মানিক এটাও নিশ্চয়ই জানতেন তাঁর ভিখু চরিত্র সর্বহারা সমাজের শ্রেণীসচেতন চরিত্র নয়। শ্রেণীবোধের আধুনিক ধারণার বাইরে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঘৃণা আর হিংসা দ্বারা তাড়িত সে। এটাও মিথ্যা নয় যে, ব্যক্তি ঘৃণাই পরিণতিতে শ্রেণী ঘৃণায়, শ্রেণী হিংসায় বাস্তব রূপ লাভ করে। এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, সুখী, ধনী, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষুধা আর যৌনতার অনুভব; দরিদ্র এবং পরিস্থিতির শিকার মানুষের পেটের ক্ষুধা আর যৌন ক্ষুধা এক নয়। এই অনুভবের শ্রেণীগত দ্বান্দ্বিক বহুমাত্রিক রূপ আছে। তাই ভিখুর ক্ষুধা, যৌনতা, হিংসা আর ঘৃণার অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা এবং বহুমাত্রিক।

গল্পের পরিণতিতে আমরা দেখতে পাব ভিখু ভয়ংকর এক হত্যাকাণ্ডের ভিতর দিকে পাঁচীকে দখল করে পিঠের উপর ঝুলিয়ে নিরুদ্দেশ হচ্ছে। জোর করেনি, পাঁচী স্বেচ্ছায় ভিখুর সঙ্গী হয়। যেন পাঁচী বসিরের হত্যার ভেতর এক নিঃসঙ্গ থেকে মুক্তির জন্য নতুন সঙ্গী গ্রহণ করে। পথ চলতে গিয়ে ভিখু কী বলে? "খানিক বাদে নওমির চাঁদ উঠবো, আলোয় আলোয় পথটুকু পার হমু।"

এ নবমীর চাঁদের আলোর পথ যেন মুক্তির পথ। এ পথ অস্তিত্বের কাছে ফেরা, নিঃসঙ্গ-মুক্তির কাছে ফেরা। আঁধার অতিক্রমের এই মানবীয় প্রত্যাশা তো প্রাণী হিসেবে মানুষের সহজাত। আমরা এটাও জানি ভিখু পাঁচীকে নিয়ে যেখানেই যাক, মুক্তি মিলবে না। কিন্তু সে উদ্ধার পাবে অস্তিত্বভীতি আর জীবননিঃসঙ্গতার ভয়ংকর অন্ধকারের জগৎ থেকে। ভিখুর যাত্রাপথ কেমন? "পথের দুদিকে ধানের ক্ষেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নববীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।" আর এই ঈশ্বর তো আকাশের ঈশ্বর নয়, উপনিবেশিক শক্তির শাসন ও শোষনের ঈশ্বর।

পাঠক হিসেবে আমার মনে হয় বাংলা সাহিত্যের এই তুলনারহিত গল্পটির শিল্পগুণ ব্যাহত হয়েছে এর শেষ অনুচ্ছেদের কারণে। এমনও মনে হয় গল্পটি শেষ হবার পর এই অনুচ্ছেদটি মানিক নতুন করে যোগ করেছেন নামকরণের যৌক্তিকতার কারণে। বিজ্ঞানের এই জীনেটিক ব্যাখ্যা গল্পটির জন্য মোটেই প্রয়োজন ছিল না। "হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ......কোনদিন পাইবে না।" 'প্রাগৈতিহাসিক' নামের বৈধতার জন্য এই ব্যাখ্যা মানিকের যুক্তির

বাইরে বোধ করি আবেগের ফসল মাত্র। তারপরও শিল্প বিচারে এই গল্প 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' কিংবা 'হারানের নাতজামাই' গল্পের মার্ক্সীয় শ্রেণী ব্যাখ্যার চেয়েও অধিক সফল সৃষ্টি। অন্তত মার্ক্সীয় মানব প্রবণতার জটিল ব্যাখ্যার বিচারে 'প্রাগৈতিহাসিক' বিস্ময়কর শিল্প সফল গল্প।

এ কথাও আমার মনে হয় 'প্রাগৈতিহাসিক' প্রপঞ্চটি, এখানে যা ফ্রয়েডের বহুবহু পূর্বে স্পষ্ট করেছেন গৌতম বুদ্ধ, ওই যে সেই মাতৃগর্ভ থেকে বয়ে আনা প্রবৃত্তি বা পঞ্চইন্দ্রিয়, তা নয়। এখানে প্রাগৈতিহাসিক সত্যটি হচ্ছে মানুষ কর্তৃক মানুষকে ঔপনিবেশিক দাসে পরিণত করা, তার মধ্যে অস্তিত্বভীতি জন্মানো, তাকে নিঃসঙ্গ করে দেয়া, প্রবৃত্তির দাসে পরিণত করা, ক্ষুধা আর যৌনতার নিকৃষ্ট প্রাণীতে পরিণত করা এবং তার মানুষ্যত্ব-বিবেক-বুদ্ধিকে ধ্বংস করা।

আত্ম পরিচয় ধ্বংসের ভিতর দিয়ে মানুষের পলায়ন, সমাজ ও সভ্যতাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে মানুষকে ইতর প্রাণীতে পরিণত করা তো উপনিবেশেরই অবদান। তারই অভিক্রিয়ায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশ্রয় নিতে হয় মার্ক্সের জীবন ব্যাখ্যার কাছে, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যাখ্যার কাছে। আমার এই ব্যাখ্যার বাইরেও গল্পটিকে শিল্পের একাধিক ডাইমেনশনে ব্যাখ্যা চলে। নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন এই কারণে যে, আমরা আমাদের সাহিত্যেরা প্রত্নভূমির অভিনব ব্যাখ্যার ভিতরে নতুন আবিষ্কার চাই। তা হলেই মানিক মুগ্ধতা বা বিমুখতার ভিতর দিয়ে একটি যৌক্তিক পথ খুঁজে পাব। কেননা এটাও আমরা জানি, ওই যে মানিক গল্পের শেষ বাক্যে বললেন—"সন্তানের মাংস অবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনদিন পাইবেও না।"

কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস পৃথিবীর আলো সেই অন্ধকারে পৌছবে। ক্রমবিকাশমান জীনবিজ্ঞান ছাড়াও রয়েছে সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রই বিনির্মাণ করতে সক্ষম নতুন পৃথিবী, নতুন মূল্যবোধের নতুন মানুষ, ক্রটিহীন জীবনবাহী মানব সমাজ এবং সাহিত্য।

—উত্তরাধিকার—জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০০৮

শরৎচন্দ্রের গফুর ও জাতিগত শুদ্ধিকরণ

শরৎচন্দ্রের গফুরের জন্মভিটে থেকে উৎখাত এবং অন্ধকার অনিশ্চিত যাত্রা রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবনে কোন ভয়ঙ্কর ভবিতব্যের ইঙ্গিতবাহী ছিল, তা তৎকালে বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ধরতে পেরেছিল বলে তো মনে হয় না। কিশোরী কন্যার হাত ধরে গফুরের উদ্বাস্তু জীবনের নিকষ অন্ধকারে হেঁটে চলা, ভয়ঙ্করের কৃষ্ণগহ্বরে পতিত হওয়া কিংবা ধর্মবিদ্বেষ আর বর্ণবৈরীর ভেতর দিয়েই তো ঘটে গেল বাংলার খণ্ডায়ন। কৃষ্ণলোহিত বর্ণ মলিন অতীতে তাকালে আমরা দেখতে পাব আর্যজাত্যভিমান এ ভূখণ্ডে মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কীভাবে বর্ণ এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে তীব্রতর করেছিল। ভারতীয় বৈদিক যুগ তো আর্যজাত্যভিমানের আধিপত্যেরই যুগ। পরবর্তী সময়ে এই আর্যজাত্যভিমান হিটলারের জার্মান, ইরানের শাহ-পাহলভী এবং পরে ভারতীয় জনতা দলের উগ্রতাকে কোথায় নিয়ে যায়? ব্রাহ্মণ্যবাদ তো আর্যবাদেরই অভিন্ন রূপ। শরৎচন্দ্রের গফুর সেই আর্য-ব্রাহ্মণ্যবাদেরই বলি। বিধর্মী বিতাড়নের মধ্য দিয়ে গ্রাম, রাষ্ট্রের তথাকথিত শুদ্ধিকরণের এই তো স্বরূপ।

প্রায় পৌনে এক শতাব্দীকাল পূর্বে 'মহেশ' নামে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত গল্প সম্পর্কে প্রচলিত সাহিত্য ব্যাখ্যাটি হচ্ছে পশু আর মানুষের আত্মিক সম্পর্কের শিল্পরূপ। কিন্তু গভীরের তাৎপর্যটি যেমনি জটিল, তেমনি বহুমাত্রিক। জাতিগত, বর্ণগত, সম্প্রদায়গত শুদ্ধিকরণের বিষবৃক্ষের যে বীজ বপন চলছিল সমাজ অভ্যন্তরের গভীরে, তারই ইঙ্গিতবাহী গল্প 'মহেশ'। গল্পে মহেশ নামে যে ভাষাহীন, নিরুপায় ক্ষুধার্ত পশুটিকে দেখা যায়, প্রকৃত বিবেচনায় সে হচ্ছে ভূমিসংলগ্ন পরাধীন, আজ্ঞাবাহী, প্রতিকার অজ্ঞাত, প্রতিরোধশূন্য মানুষের আশ্রয় ও অস্তিত্বের ঠিকানা। মহেশের মৃত্যু তো মানুষের আশ্রয় ও অস্তিত্বেরই পতন-বিনাশ। এমনি মহাপতন মানুষকে করে ফেলে আশ্রয়শূন্য এবং নির্দেশ করে অজানা অচেনা দুর্বিনীত ভয়াল পথকে। গফুর তো হেঁটে চলে সে পথেই। সে পথের বিকল্প ছিল তার অজ্ঞাত।

শরৎচন্দ্র যখন এই গল্প রচনা করেন তখন বঙ্গ-ভারতের আর্থ-রাজনৈতিক বাস্তবতা কী ছিল? সেই করে সিপাহি বিদ্রোহের অসমাপ্ত অবসান ঘটেছে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বীজ বপনের মধ্য দিয়ে। জমিদাররা এসে গেছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তও হয়ে গেল। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অঞ্চলে হিন্দু জমিদার, হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলমান জমিদার, ঔপনিবেশিক এই কূটচালে আবদ্ধ হলো বাংলা। শাসক আর শাসিতের দ্বন্দ্বটা হোক ধর্মীয় বিবেচনায়, উপনিবেশের ধারক ইংরেজ এমনটাই চাইল। তাই দেখা যায় হিন্দু বর্ণবাদী জমিদার শাসিত গ্রামে প্রজা হচ্ছে দরিদ্র ভূমিহীন মুসলমান গফুর। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি বিনষ্টের কৌশল ভালোভাবেই ঔপনিবেশিক শাসকেরা ছক কেটে তৈরি করে। মানুষের পরিচয় যেন মানুষ নয়, বাঙালির পরিচয় বাঙালি নয়। পরিচয়টা ওখানে ধর্মে ও বর্ণে। তাই তো গফুরের জমিদার বাবু তাকে চেনে দ্বিমাত্রিক দৃষ্টিকোণের বিবেচনায়। প্রথমটি প্রজা হিসেবে, শেষেরটি মুসলমান হিসেবে। এ দৃষ্টিভঙ্গি তো মনুষ্যত্ববিরোধী এবং অনৈতিক। তাই তো মানুষে মানুষে এই অসৎ সম্পর্ক সুস্থ সমাজের কল্যাণময় নিদর্শনের উল্টো বর্বরতার পরিচয়বাহী।

আমাদের মনে রাখতে হবে গল্পের নাম 'মহেশ'। মনের খেয়ালে এমনি নামকরণ করেননি শরচৎচন্দ্র। গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র গফুর থাকলেও লেখক কেন একটি তুচ্ছ পশুর নামেই গল্পের নামকরণ করলেন? রহস্য বা কৌতূহল সেখানেই। মহেশ একটি ষাঁড় বা বৃষের নাম। শব্দটি পুরুষবাচক। হিন্দু পুরাণে সে হচ্ছে দেবতা শিবের বাহন। শিব দেবতা কৃষিভিত্তিক সমাজে উৎপাদন ও প্রজননের প্রতীক। দেবতার বাহন বলেই হিন্দু সমাজের কাছে ষাঁড় বা গরু দেবতুল্য পবিত্র। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, শরৎচন্দ্র গফুরের গরু বা ষাঁড়ের নাম দিয়েছেন মহেশ। অভিধানগতভাবে 'মহেশ' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় মাহা+ঈশ, মহান ঈশ্বর , মহেশ্বর। শিব দেবতার অন্য নাম হচ্ছে মহেশ্বর বা মহেশ। কতটা সাহস এবং মানবিক বোধে দৃঢ়চিত্ত হলে শরৎচন্দ্র আপন ধর্মীয় দেবতার নামে একজন দরিদ্র মুসলমানের গরুর নাম নির্বাচন করেছেন, তা অবশ্যই ভাবার বিষয়। স্বধর্মের প্রতি শরৎচন্দ্রের এই বিদ্রূপ সরল বিষয় নয় মোটেই।

যান্ত্রিকীকরণের এই আধুনিক যুগেও যেখানে বাংলার কৃষি উৎপাদনের মূল উপকরণ পশুশ্রম, সেখানে শরৎ যুগে তার গুরুত্ব অবশ্যই ছিল বিকল্পহীন। পশুর ওপর দেবত্ব আরোপের সেই প্রাগৈতিহাসিক টোটেমবাদে শরৎচন্দ্র যে বিশ্বাসী ছিলেন না, তার প্রমাণ গফুরের গরুর নাম 'মহেশ' নির্ধারণেই বোঝা যায়। এ বিষয়ে আমাদের দূর অতীতের পাশাপাশি বর্তমানেও বিচরণ করতে হবে। হাজার হাজার বছর আগে অশ্বারোহী শ্বেতবর্ণের আর্যগণ ইউরোপ থেকে এশিয়ায় অভিযানের সময় সঙ্গে করে এনেছিল তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ ঋকবেদ, তবে লিখিত নয়, স্মৃতি এবং শ্রুতিতে। সেই ঋকবেদের সূক্তিগুলোতে বারবার

ইন্দ্রদেবতা বা অগ্নিদেবতার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে যেন তিনি আর্যদের অসভ্য-বর্বর অনার্যদের সুপুষ্ট পশু অর্থাৎ (গোধন/গরু) পুরুষ গরুগুলো দান করেন। কৃষিকাজ না-জানা তথাকথিক সভ্য আর্যরা যে অনার্যদের হাত থেকে ষাঁড়গুলো জবরদখল করেছিল তা তো আর মিথ্যে নয়। অল্পবয়সী ষাঁড়ের রক্ত আর মাংস দিয়ে যে আর্যরা পূজা-যজ্ঞ করে দেবতা ইন্দ্রকে তুষ্ট করত, বেদগ্রন্থ তারই প্রামাণ্য দলিল। আর্যঋষিরা খাদ্য হিসেবে গো-মাংসকেই প্রাধান্য দিতেন। গোমেদ যজ্ঞ তো পুরুষ গরু ছাড়া ভাবাই যেত না।

নৃপতি, সম্রাট, রাজাধিরাজদের গোমেদ যজ্ঞে প্রজাদের ষাঁড়দান ছিল বাধ্যতামূলক। এই গোমেদ যজ্ঞের ফল হেতু পশু প্রজনন শক্তি ষাঁড়ের ব্যাপক নিধনের ফলে প্রাচীন ভারতে গো উৎপাদনে বিপর্যয় নেমে আসে। এতে করে কৃষি উৎপাদনও বন্ধ হয়ে গেলে, মহাদুর্ভিক্ষে জনবসতি উজাড় হয়ে গেলে রাজাজ্ঞার কারণেই কোনো এক অতীতকালে হিন্দু সমাজে গো হত্যা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এই রাজাজ্ঞা বা অনুশাসন পরে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এবং হিন্দু সমাজে গো-মাংস ভক্ষণও নিষিদ্ধ হয়। তবু আজো কেরেলা রাজ্যের বিষ্ণু দেবতার উপাসক হিন্দু সম্প্রদায় উৎসবে, আনন্দে গো-মাংস গ্রহণ করে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

বাংলায় আর্যকরণ ঘটে সেন রাজাদের যুগে। কর্নাটকী চরম রক্ষণশীল এই ব্রাহ্মণ রাজবংশ ছিল শাস্ত্র-স্মৃতির অনুগামী। হিন্দু সমাজকে বহু বর্ণে বিভক্ত করে স্মৃতি-শাস্ত্র শাসনের আওতায় আনে তারা। অবাঙালি এই রাজারা বাঙালিকে শিখিয়ে গেল বর্ণবিদ্বেষ, তারই আর এক রূপান্তর ধর্মবিদ্বেষ বা সাম্প্রদায়িকতা। শরৎচন্দ্র সবকিছুই জানতেন, কৃষিনির্ভর তার জন্ম জেলা হুগলীকেও বুঝেছেন। দেখেছেন ভূমির মালিক হিন্দু জমিদার জোতদার, প্রজাদের একটি অংশ দরিদ্র ভূমিহীন মুসলমান কৃষক, গফুর তো তাদেরই প্রতিনিধি। কৌতূহলের বিষয় এই যে, কবি নজরুলেরও জন্ম পাশের জেলায় বর্ধমানেই। এদের কেউই মার্কসবাদী ছিলেন না। শরৎচন্দ্র গান্ধীবাদী কংগ্রেসী থাকলেও শেষ দিকে সম্পর্কটা শিথিল হয়ে যায়। দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন অগ্নিযুগের সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির প্রতি। নজরুল শরৎচন্দ্রের চেয়েও অধিক রাজনীতি সচেতন ছিলেন। রাজনৈতিক মতাদর্শে স্থিতি লাভ করতে পারেননি বলেই কংগ্রেসী দলীয় টুপি মাথায় দিয়ে তিনিও পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন করে হক সাহেবের কাছে হেরে যান। তার রক্তে ছিল সাম্যবাদের আগুন। আক্ষেপ এই, তিনি তা ধারণ করতে পারেননি অস্থির চিত্ততার কারণে।

আসলে শরৎচন্দ্র বা নজরুলের যুগ ছিল সামাজিক এবং রাজনৈতিক চরম জটিল দ্বন্দ্বময়। একদিকে অবিকশিত সমাজ, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক পরাধীনতা, অন্যপ্রান্তে সাম্যবাদী বিপ্লবের বিশ্ব পরিস্থিতি। সে কারণেই তাদের জোর করে সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রী বানানো যাবে না, এমন চেষ্টাও সঙ্গত

নয়। শরৎচন্দ্র সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী লেখক না হলেও শ্রেণী-সচেতনতাকে তিনি জানতেন, বুঝতেন। সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসকেও স্পষ্টভাবেই ধরতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে তাকে উদ্বিগ্ন করে যত না শ্রেণী উৎপীড়ন, তার চেয়েও ব্যক্তির বঞ্চনা। 'মহেশ' গল্পের গফুরকে তিনি যতটা চিনতেন, ঠিক ততটা চেনা জানা ছিল না প্রতিবেশী মুসলমান সমাজ-সত্তার সঙ্গে। তাই ব্যক্তি গফুরের ভিতর দিয়েই শরৎচন্দ্র চিনতে চেয়েছেন মুসলমান সমাজের সংকটকে। তাই গফুরের সংকট তার উদ্বেগের বিষয় হয়ে পড়ে। কেবল শরৎচন্দ্রকে বলি কেন, তৎকালের এবং সমকালের বাঙালি হিন্দু মুসলমান কোনো লেখকেরই জন্মসূত্রে পাওয়া নিজস্ব ধর্মীয় সমাজের বিপরীত প্রান্তে অন্য ধর্মের সমাজ-সংস্কার-জীবনপ্রবাহ-রাষ্ট্রদ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তিদ্বন্দ্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এবং নেই। বাঙালি এবং তার অন্তস্থ জটিল স্রোত প্রবাহকে বুঝতে গেলে একই ভাষাভাষী সমস্ত বর্ণ এবং ধর্মগত শ্রেণীকে অনুশীলন করে সাহিত্যে রূপ দিলেই লেখক-দায় পূর্ণ হয়। অন্যথা খণ্ডিত বাঙালির খণ্ডিত লেখকই হয়ে থাকতে হয় খণ্ডিত সাহিত্য সৃষ্টির ভেতর দিয়ে।

যদিও শরৎচন্দ্রের আত্মস্বীকৃতিতে জানা যায় মুসলমান বাঙালির সমাজ-দর্শন সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা, তবু বলতেই হবে তিনি যেভাবে যতটুকুই জেনেছেন, আজকের প্রেক্ষিতে এই জানাজানিটুকুর মূল্য বিরাট। শরৎচন্দ্র উচ্চ বা নাগরিক শ্রেণীর মুসলমানদের বাদ দিয়ে ভূমিহীন মুসলমান কৃষক গফুরকে নিয়ে কেন গল্প লিখলেন? আমাদের মনে হয় তাদেরই তিনি অধিক জানতেন। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যবাদী 'গো-রাজনীতি' তাঁর সাহিত্যের উপলক্ষ কিন্তু অভিলক্ষ হচ্ছে উঁচুবর্ণের হিন্দু গ্রাম শুদ্ধিকরণের শিকার মুসলমান গফুর। গো-রাজনীতি যে বঙ্গ-ভারতকে বিভক্ত করবে অদূর ভবিষ্যতে শরৎচন্দ্র তা জানতেন, তার কালের রাজনীতি তো সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছিল। এই গফুর যে একদিন নতুন অভিবাসনের খোঁজে মাতৃভূমি ছেড়ে কেবল শিল্প শহর-সন্ধানী হবে এমন নয়, তাকে আরো বহুদূর অজানা দেশে পাড়ি দিতে হবে, তাও জানতেন শরৎচন্দ্র।

সাতচল্লিশের পর শরৎচন্দ্রের এই গফুরেরাই তো কলকাতার খিদিরপুর হাওড়া-হুগলির চটকল ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। সাম্প্রদায়িক কিংবা জাতিগত শুদ্ধিকরণের সেই গল্পই তো হচ্ছে 'মহেশ'। হিন্দু দেবতার নামকরণে গফুরের যে ষাঁড় তার সঙ্গে গফুরের সম্পর্ক তো কেবল পিতৃত্ব বা সন্তানবাৎসল্যের নয়, বরং কৃতজ্ঞতারও। কেননা সেই মহেশ বা মহেশ্বর তাকে আট বছর ধরে কামাই করে খাদ্যের জোগান দিয়েছে। তাই মহেশ কেবল গফুরের সন্তানই নয়, বেঁচে থাকার আশ্রয়ও বটে। অর্থাৎ তার অর্থনৈতিক উৎপাদনের উপকরণ। যেভাবেই ঘটুক মহেশের মৃত্যু, নিরাশ্রয় গফুরের কাছে এই মৃত্যু মানুষের নিঃস্বকরণেই অপার যন্ত্রণা মাত্র। এই যন্ত্রণা প্রতিকারহীন। কেননা মানুষ সেখানে সমাজের বশ্য দাস।

অপরিণামদর্শী বর্ণবাদী তথাকথিত উচ্চবর্গ হিন্দুর কারণেই ভেতর থেকে অলক্ষ্যে বাংলার ভাঙন ক্রিয়াটি চলছিল, সাম্রাজবাদের প্রতিনিধি লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থেই অখণ্ড বাংলাকে ভাগ করলেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া শুভ ছিল না, তা রদও ঠিক তাই। ভারতীয় মুসলিম লীগের জন্মটাও ছিল অনিবার্য। শরৎচন্দ্র যখন 'মহেশ' গল্প লেখেন তখন হিন্দু-মুসলমান বিভাজনটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। অমার্কসবাদী শরৎচন্দ্র তৎকালের বাংলাকে স্পষ্ট ধরতে পেরেছিলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদ তথা উচ্চবর্গ হিন্দুর বর্ণ-বিদ্বেষ যে কেবল স্বধর্মীদের অর্থাৎ তথাকথিক অন্ত্যজবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খ্রিস্টান ইত্যাদির বেলায়ও ছিল। আশ্চর্য এই যে, কেশবচন্দ্র, দ্বারকানাথ আর রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মের প্রতিও সেই জাতি-বর্ণ বিদ্বেষ স্পষ্ট ছিল। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য প্রমাণ করে পাঞ্জাব দখলকারী গ্রিক বীর আলেকজান্ডারকেও ডাকা হয়েছে 'যবন' নামে। অথচ এই যবন শব্দটির উৎপত্তি হিব্রু ভাষা থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র তো মুসলমানদের এই নামেই ডাকতেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদীর দৃষ্টিতে স্মৃতিশাস্ত্রের বাইরে সব জাতিই ম্লেচ্ছ, যবন, নাস্তিক, পাষণ্ড ইত্যাদি।

আমরা লক্ষ্য করব গ্রামের ধর্মনেতা এবং শাসক জমিদারের তলপিবাহক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তর্কতুও গফুরকে সম্বোধন করছে 'পাষণ্ড' নামে। এই 'পাষণ্ড' শব্দটি আজো বর্ণবাদী হিন্দুরা কমিউনিস্ট কিংবা অপরাপর অন্ত্যজ শ্রেণীর সমার্থক বলে মনে করে। এই বঙ্গে উচ্চবর্গের ব্রাহ্মণদের চোখে দরিদ্র মুসলমানেরা কতটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পাত্র ছিল, শরৎচন্দ্রের তা ভালো জানা ছিল। 'ওরে, ও গফরা, বলি ঘরে আসিছ?' এটি তর্করত্নের কণ্ঠস্বর। এখানে 'গফুর' হয়ে গেছে 'গফরা'। কী বিকৃতি! নামের বিকৃতি!

এই যে জাতিগত আর সম্প্রদায় ঘৃণা-বিদ্বেষ তার গভীরের স্তরবিন্যাসটি শরৎচন্দ্র আমাদের জানালেন একটু বাদেরই। হিন্দু ব্রাহ্মণ শাসিত, নিয়ন্ত্রিত গ্রামে একজন বিধর্মী মুসলমানের যত্ন আর অক্ষমতার কারণে গো-মৃত্যু ঘটবে– এ তো অসম্ভব। এ হচ্ছে গো-হত্যা, মহাপাপ, ক্ষমার অযোগ্য। তাই চরম রক্ষণশীল বর্ণ ও ধর্মবিদ্বেষী ভয়ঙ্কর বাক্যটি শরৎচন্দ্র শোনালেন ধর্মব্যবসায়ী তর্করত্নের উচ্চারণে, "এ হিঁদুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে?.... গো-হত্যা হলে যে কর্তা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে। সে যে-সে বামুন নয়।"

গা শিউরে ওঠা কী ভয়াবহ কণ্ঠস্বর! এ যেন হিন্দুদের সাংবিধানিক ধর্মরাষ্ট্র। অথচ শাসন চলছে ইংরেজ। হিন্দুর এই ধর্মরাষ্ট্রে বিধর্মী গফুরদের বুঝি বসবাসের অধিকার নেই। মধ্যযুগের বর্বরতন্ত্র বুঝি বাংলায় ফিরছে ইংরেজের হাত ধরে। হিন্দুর গ্রামে বসবাসের অধিকার নেই, বিশেষ করে উচ্চবর্গের গ্রামের ওই প্রান্তে থাকবে নিম্নবর্গ আর বিধর্মী। বাংলায় গ্রাম বিন্যাসের দিকে তাকালে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। গ্রামের মধ্য ভাগে থাকবে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ, ওই প্রান্তে চাষী, ধোপা, নাপিত, কামার, জেলে-কৈবর্ত আর

মুসলমানেরা। চর্যাপদের ডুমনির ঘর তো তাই গ্রামের বাইরে দূর টিলার উপর। এভাবেই আসে হিন্দু-মুসলমানের বিভাজন, ১৯৪৭ সাল। তারও আগে আসে উচ্চবর্গ হিন্দুর প্রতি অবিশ্বাসী নিম্নবর্গের রাজনৈতিক দল 'তফসিলী ফেডারেশন', যারা ভোট দিয়েছিল পাকিস্তানের পক্ষে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তো জাতিগত শুদ্ধিকরণেই পরিণাম। এতে আর সন্দেহ কী?

তর্করত্নগণ ওই শুদ্ধিকরণের যন্ত্র। শরৎচন্দ্র তার জন্ম জেলা হুগলীতে এই শুদ্ধিকরণ দেখে যেতে পারেননি। সাতচল্লিশের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু কী ঘটবে আসছে দিনে, তা তিনি জানতেন বলেই গফুরের গ্রামান্তরের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট দেখেছিলেন, দেশান্তরকে। গফুরের গ্রাম ছেড়ে ফুলবেড়ের চটকলে যাত্রা বাহ্যিক অর্থে গ্রাম্য অর্থনীতির ভাঙনের ভিতর দিয়ে উদ্বৃত্ত কৃষি শ্রমের কারখানা শ্রমিকে পরিণত হওয়াকে নির্দেশ করে, কিন্তু এর অন্তস্থ সত্যটি হচ্ছে মানুষের জাতিগত বা ধর্মগত শুদ্ধিকরণের ফলে উদ্বাস্তুতে পরিণত হওয়া। মাতৃভূমি থেকে উৎখাত হওয়া। দেশান্তর হওয়া। অথচ গফুরদের শেকড়ছিন্ন হয়ে এই পৃথিবীতে দাঁড়ানোর নিরাপদ নিশ্চিত ভূমি থাকার কথা নয়, তা শরৎচন্দ্রের জানা থাকলেও তর্করত্নদের জানার বিষয় নয়। তাই তো অত্যাচারী বর্ণবিদ্বেষীর পায়ে ধরে বলতে বাধ্য থাকবে, 'বাবু মশাই, হাকিম তুমি, তোমার রাজত্ব ছেড়ে আর পালাব কোথায়...।'

না, পালানোর জায়গা এই দরিদ্র নির্বিরোধ, প্রতিরোধ শক্তিশূন্য মুসলমান গফুরের। থাকার কথা নয়। অভাব, ক্ষুধা আর জীবন বঞ্চনার ভেতর দিয়েই জন্মমাটি কামড়ে পড়ে থাকতে চায়। কৃষিভিন্ন বাঁচার বিকল্প, জন্ম গ্রাম কাশিপুর ভিন্ন বিকল্প মাটির সংবাদ সে জানে না, জানতে চায়ওনি কোনোদিন। তাই তাকে একপর্যায়ে বর্ণবিদ্বেষী, জাতিবৈরী নির্মম এক সমাজের কণ্ঠস্বর শুনতে হয়, তর্করত্নের ছায়ায়, 'তোরা ত রাম রাজত্বে বাস করিস—তাই তাঁর নিন্দে করে মরিস।'

ভয়ঙ্কর সত্য কথা! তো, এই উক্তির ভেতর 'তোরা' মধ্যম পুরুষ শব্দটি কাদের নির্দেশ করছে? নিশ্চয়ই মুসলমানদের। আর হিন্দু ব্রাহ্মণ জমিদার শাসিত এই 'রাজ্য' তো রামায়ণের রাজা রামচন্দ্রের রাজ্য নয় যে, প্রজাদের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করে সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। প্রজা গফুর তো এমন সমাজ-শক্তিধর প্রজা নয়। সে তুচ্ছ এক মানুষ। সে এতটাই ঘৃণিত যে ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে স্পর্শ করলে বুঝি তার হিন্দুধর্মটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তাই শুনতে হয়, 'যা যা সর, পথ ছাড়।'

গফুরকে পথ ছাড়তেই হয়। 'গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি'—এর গ্রাম কি গো হত্যা কিংবা মাতৃসম শ্রদ্ধার এই পশুর কষ্ট, তাও আবার মুসলমানের হাতে, মেনে নেবে? মেন নেবে না বলেই গো-হন্তারক কসাই গফুরের গরুটি কেনার জন্য গাঁয়ে ঢোকে কিন্তু গফুর শেষমেশ মহেশকে বিক্রি করতে পারে না। প্রশ্ন হচ্ছে এ কি মহেশের প্রতি মমতা, নাকি জমিদারের ভয়? শরৎচন্দ্র তা স্পষ্ট করেন

গল্পের প্রান্তপ্রদেশে প্রবেশ করে। মমতার চেয়ে ভয়টাই ছিল বাস্তব সত্য। তারপর লেখক আমাদের জানাচ্ছেন, জমিদার গফুরকে তলব করছে। এ কথাা ও তিনি জানাচ্ছেন, জমিদারের 'সদরে ভদ্র-অভদ্র অনেকগুলি ব্যক্তি বসিয়াছিল।' জনৈক ব্যক্তি গফুরের কাছে জানতে চায়, কোথায় বাস করে আছিস জানিস?'

এখানে খেয়াল করার বিষয় এই, জমিদারের সদর কাচারিতে উপস্থিত ব্যক্তিগণ কারা? কী তাদের পরিচয়? অভদ্রদের আমরা চিনলাম, ওরা দরিদ্র চাষা। কিন্তু ওই যে ভদ্রলোক, ওরা কারা? ওরা হচ্ছে শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক। ইংরেজের আনুকূল্যে বঙ্গে হিন্দু রেনেসাঁসকে তৈরি করেছিল তারাই। ওরা জাতিবিদ্বেষ তৈরি করে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি নষ্ট করেছিল। ওদের স্বপ্নের বাংলা ছিল হিন্দুর গাঁ-হিন্দুর স্থান-হিন্দুস্থান। সেই স্থানের শাসক কারা? নিশ্চয়ই উচ্চবর্গের ব্রাহ্মণ জমিদার। সেই সাতচল্লিশ কিংবা তিরিশের দশকেই গফুরদের জানিয়ে দিয়েছিল ওরা কোথায় বাস করছে? সেই যে প্রশ্নবোধক বাক্য, তার আড়ালে রয়েছে একটি স্থান- হিন্দুস্থান।

কেবল তা-ই নয়, শরৎচন্দ্র আমাদের এক ভয়ঙ্কর সামাজিক এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার দিকে ঠেলে দেন। 'এ মহাপাতক (গফুর) যে শুধু কর্তার পুণ্য প্রভাবে (ব্রাহ্মণ জমিদারের গো-ভক্তি) ও শাসন ভয়ে নিবারিত হইয়াছে (কসাইয়ের কাছে মহেশকে বিক্রি না করা) সে বিষয়ে কাহারও সংশয়মাত্র রহিল না। কর্তরত্ন উপস্থিত ছিলেন, তিনি গো শব্দের শাস্ত্রীর ব্যাখ্যা করিলেন এবং সে জন্য 'এই ধর্মজ্ঞানহীনকে (গফুরকে) গ্রামের ত্রিসীমানায় বসবাস করিতে দেয়া নিষিদ্ধ তাহা প্রকাশ করিয়া সকলের জ্ঞাননেত্র বিকশিত করিয়া দিলেন।'

এখানে আর সাম্প্রদায়িক রাজনীতিটা আড়ালে থাকে না। শরৎচন্দ্র জানাচ্ছেন ওই ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চোখে গফুর ধর্মজ্ঞানহীন, কেননা সে হিন্দুধর্মে আশ্রিত নয়, তার ধর্মটা যেন কোনো ধর্মই নয়। ওই যে তার গ্রামের ত্রিসীমানা বসবাসের জন্য নিষিদ্ধ হয় এবং এ বিষয়ে 'সকলের জ্ঞাননেত্র বিকশিত হয়,' ওখানেই রয়েছে মর্মান্তিক সত্য। এই জ্ঞাননেত্র হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা, মুসলমান বিদ্বেষের বোধ বিশ্বাস। এভাবেই একটি দেশে 'অ্যাথনিক ক্লিনজিন'-এর মানস তৈরি হয়। মানুষ উৎখাত হয় জন্মভূমি থেকে। এই জ্ঞাননেত্রই সভ্যতার শত্রু, মানবতার প্রতিবন্ধক, প্রগতির শত্রু।

কেবল গফুরই নয়, প্রচণ্ড খরায় জলকষ্ট দেখা দিলে এই জাতি-ঘৃণাটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঢেকে রাখার পথ থাকে না। গফুরের কিশোরী মেয়ে আমিনা তখন হয়ে ওঠে পানির অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষের প্রতীক। এই বঞ্চনা ধর্মের নামে, সম্প্রদায়ের নামে, বর্ণের নামে, জাতির নামে। 'বিশেষত মুসলমান বলিয়া এই ছোট মেয়েটা তো কাছেই ঘেঁষিত পারে না।' শরৎচন্দ্র স্পষ্ট করেই কারণটা আমাদের জানিয়ে দিলেন। এতে আরো ইঙ্গিত মেলে

শরৎ-পরবর্তী যুগের বঙ্গ বিভাগ এবং অভিন্ন নদীর পানি নিয়ে রাষ্ট্রীয় বিবাদ। এর মূলেও রয়েছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিরই অন্ধকার বাস্তবতা। শরৎচন্দ্র স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন, ধর্মের নামে মানুষের প্রতি মানুষের এই বিদ্বেষের পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। তার সমগ্র রচনা পাঠ করলে যে ইঙ্গিত মেলে তাতে তার রাজনীতির বিশ্বাসটাও ধরা পড়ে। তিনি মার্কসবাদী বিপ্লবী লেখক নন, হতেও চাননি। তলস্তয়-গোর্কির পরিচয় তিনি জানতেন। তিনি যা বিশ্বাস করেছেন, লিখেছেন, তা তাঁর সমকালীন সমাজেরই বাস্তবতা। এই বাস্তবতার বাইরে গিয়ে তিনি গোর্কি হতে চাননি, হওয়া সম্ভব ছিল না তাঁর নিজের জটিল অনড় সমাজকে ডিঙিয়ে।

জমিদার বাড়ি থেকে লাঞ্ছিত, প্রহৃত, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বেহুঁশ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য গফুর গল্পের পরিণতিতে যা ঘটাল, তা-ই স্বাভাবিক। আমিনার কষ্টে সংগ্রহ করা পানিটুকু মহেশ ঘট ভেঙে খেয়ে ফেললে লাঙলের মাথার আঘাতে গফুর তাকে হত্যা করে। এ বড় ভয়ঙ্কর কাণ্ড, অন্তত গোরক্ষক এ গাঁয়ে। শরৎচন্দ্র ভাগ্যবান, আইন করে গোহত্যা নিবারণের ওই যে ভারতের 'গো-বলয়' হিন্দিভাষী হিন্দু মৌলবাদী শাসিত রাজ্যগুলোর অপচেষ্টা, তা শুনতে হয়নি। কিন্তু দূরদর্শী চিন্তার অধিকারী বলেই বুঝতে পেরেছিলেন অনাগত অন্ধকার যুগকে। গো হত্যার ভয়ঙ্কর পরিণাম থেকে রক্ষা পেতে গফুরের শেকড় ছিন্ন হওয়া, আত্মপরিচয়ের সংকটে ডুবে যাওয়ার বর্ণনা শরৎচন্দ্র দিচ্ছেন, 'অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল।'

অন্ধকার রাতের এই যে চিত্রকল্প তৈরি হলো শরৎচন্দ্রের হাতে, আর সেই অন্ধকারে গফুরদের হেঁটে যাওয়া, তার কি শেষ আছে? সারাবিশ্বের দেশে দেশে গফুর আর আমিনারা যুগ-যুগান্তর ধরে নিরুদ্দেশের পানে হেঁটেই চলেছে, যাত্রা তাদের শেষ হওয়ার নয়। জাতিগত-ধর্মগত এই শুদ্ধিকরণ কি আধুনিক মানব সভ্যতার ভাগ্যলিপি? যদি তা-ই হয় তাহলে রাষ্ট্রহীন, আত্মপরিচয় হারিয়ে যাওয়া এসব মানুষের শেষ পরিণাম কী?

শিল্পবাদী সাহিত্যের শত্রু-মিত্র

অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সূত্রে মানবসমাজে যেমন শ্রেণীবিভক্তি রয়েছে, তেমনি মননচর্চারও শ্রেণী আছে। সাহিত্য কখনও শ্রেণী-নিরপেক্ষ হতে পারে না। ঐতিহাসিক কার্য-কারণের ফলে সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মার্কসবাদের উদ্ভবও সেই দ্বন্দ্বেরই ফল। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব ঐতিহাসিক কারণেই উদ্ভব ঘটায় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী সাহিত্যের। এই সাহিত্যরীতির জন্মের মধ্য দিয়ে প্রচলিত ধনবাদী সাহিত্যও তার শ্রেণী দ্বারা চিহ্নিত হয়ে পড়ে। 'শিল্পের জন্য শিল্প' বা 'সৌন্দর্যের জন্য শিল্প' এবং 'গণমানুষের জন্য শিল্প' এভাবেই দ্বান্দ্বিক পথ ধরে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আদর্শিক বিভক্তিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের আজকের প্রাতিপাদ্য বিষয় দ্বন্দ্বমূলক মার্ক্সবাদী সাহিত্য নয়, সর্বগ্রাসী বিশ্বব্যস্থায় পুঁজিবাদী সাহিত্যের সঙ্কট ও অভ্যন্তরীণ বিরোধকে নির্দেশ করা।

বিষয়টিকে নির্ধারণ করতে গেলে অবশ্যই আমাদের বর্তমানের রাজনৈতিক বাস্তবতার দিকে তাকাতে হবে। রাষ্ট্র, সমাজ এবং ব্যক্তিমানুষ যেমনি রাজনৈতিক নিরপেক্ষ হতে পারে না, তেমনি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তৈরি সাহিত্যও শ্রেণীরই চিন্তা বা মননক্রিয়ার নিদর্শন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি এবং বিশ্বময় সমাজবাদের উত্থানে বিশ্ববাসীর কাছে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর যা হোক, উন্নত বিশ্ব তথা ইউরোপ-আমেরিকায় চরম রক্ষণশীল মৌলবাদী রাজনৈতিক শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতায় আসতে সক্ষম হবে না। অথচ আজকের বিশ্বে এই ধারণা মিথ্যা-ভ্রম প্রমাণিত হয়েছে। প্রকৃত অর্থে আজ উন্নত এবং বিজ্ঞানমনস্ক ইউরোপের দেশে দেশে এবং পরাক্রমশালী আমেরিকায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে মৌলবাদী তথা খ্রিষ্টীয় মৌলবাদ। অচিরেই বিজ্ঞানে-উচ্চতর মানবিক মূল্যবোধ পদদলিত করে ওরা যে ক্ষমতার আসছে এর প্রমাণ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন

এবং অবিশ্বাস্য হঠকারিতার ভেতর দিয়ে সমাজতান্ত্রিক চীনের সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার সঙ্গে গোপন আঁতাত।

আমাদের উপমহাদেশের রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই আজও তাদের বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হননি। তাই তারা বঙ্গ-ভারত বিভক্তির জন্য দায়ী করেন কেবল একে অন্যকে। হিন্দু-মুসলমান এসব রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কণ্ঠস্বর যে ইংরেজ শাসকেরই বিভেদমূলক কণ্ঠস্বর তা তারা ধরতে অক্ষম। বঙ্গভঙ্গ দিয়ে যার সূত্রপাত তার সমাপ্তি ঘটে ভারতভঙ্গ দিয়ে। হিন্দু-মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের অতীত রচনা ঘাঁটলে এবং বর্তমানের বক্তব্যগুলো লক্ষ করলে বোঝা যায়, তারা বিভেদকামী সাম্রাজ্যবাদের কণ্ঠস্বরকেই নিজেরা ধারণ করেছেন। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা এবং দেশভাগের জন্য দায়ী করছেন একে অন্যের সম্প্রদায়কে। এই মনোভাব তো ইংরেজের মনোভাব যা সামনে টেনে এনে তারা দেশ ভাগ করেছে। দীর্ঘস্থায়ী জাতি-বৈরীর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু বঙ্গ-ভারত বিভক্তির মূল কারণ কি উপমহাদেশের আজকের হিন্দু-মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা ধরতে পেরেছেন? অনেকেই পারেননি। একদিকে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় শাসক যোসেফ স্টালিন, অন্যদিকে আসন্ন চীন বিপ্লবের নেতৃত্বে মাও-সে-তুঙ, মাঝখানে ব্রিটিশশাসিত ভারত। এই অবস্থায় শাসক ইংরেজের করণীয় ছিল কী? নিশ্চয়ই হিন্দু-মুসলমান সংঘাত সৃষ্টি এবং পরস্পর অবিশ্বাসের ভেতর দিয়ে দেশকে খণ্ডিত করা। এ ছাড়া সমাজতন্ত্রের বিশ্ব অগ্রযাত্রাকে রোধ করা ছিল অসম্ভব। মূল এই বিষয়টি না বুঝে হিন্দু-মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা আজও সাম্প্রদায়িকতা এবং দেশভাগের জন্য দায়ী করে চলেছেন তৎকালের হিন্দু-মুসলিম রাজনীতিবিদ, সমাজসংস্কারক ও কবি-লেখকদের। তাদের বর্তমান ভূমিকা সাম্রাজ্যবাদের আজকের বিভেদকামী ভূমিকারই স্থানীয় সংস্করণ। তাই আজকের এই বিশ্বপরিস্থিতিতে পুঁজিবাদের হাতে তৈরি গণতন্ত্র ও উচ্চতর মানবিক মূল্যবোধ পুঁজিবাদেরই আগ্রাসী আচরণের কারণে হুমকির মুখে। যে গণতন্ত্র ছিল একদিন বিশ্বমানবের আশ্রয় এবং ভরসার জায়গা তার শত্রুপক্ষ হয়ে গেছে আজ তারই জন্মদাতা পুঁজিবাদ।

এই অবস্থায় পুঁজিবাদী তথা উচ্চতর মানবতাবাদী শিল্প-সাহিত্য তার আদর্শ পরিত্যাগ করে স্পষ্টত নীতিহীন সাহিত্যের রূপ নিয়ে বিশ্বপুঁজির দাসস্যদাসে পরিণত হয়েছে। সাহিত্যের এই অবস্থা মানুষের মনন-সংস্কৃতির পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। ঠিক যেমন বিপজ্জনক ওই বঙ্গ-ভারত বিভক্তি আর সাম্প্রদায়িকতার জন্য এককভাবে দায়ী করে হিন্দু আর মুসলমান সম্প্রদায়ের তৎকালীন রাজনীতিক, কবি, সাহিত্যিক, সমাজসংস্কারদের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দেয়ার মানসিকতায়। কেননা এতে আড়ালে পড়ে যায় ইংরেজ শাসক। তেমনি আদর্শ বর্জনকারী শিল্প-সাহিত্যও আজ আড়াল করে চলেছে সাম্রাজ্যবাদকে। সেসব সাহিত্য চতুরতার সঙ্গে পাঠকের সামনে এমনি

মোহাচ্ছন্নতার পর্দা দুলিয়ে দেয় যে, আড়ালে পড়ে যায় স্বৈরাচারী জুলুম, শোষণ, নির্যাতন তথা সমাজের বাস্তবতা।

আজকের বাস্তবতা এই, উন্নত বিশ্বে চলমান সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে সাহিত্য আলাদা কোনো বিষয় নয়, একে অঙ্গীভূত করা হয়েছে সমাজবিজ্ঞানের অংশ হিসেবে। সাহিত্য তার স্বতন্ত্র মহিমা হারিয়ে ফেলেছে, সে হয়ে পড়েছে ভোগবাদে বিশ্বাসী পুঁজিবাদী সমাজের নষ্ট বিকৃত চেতনার সেবাদাস। তাই আজ ইউরোপে সমকামী সাহিত্যের (!!) গবেষণার নামে ডক্টরেট কিংবা পোস্টডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে, সমকাম এক রাষ্ট্রস্বীকৃত পেশা এবং নৈতিকতার আড়ালে অনৈতিক গ্রহণযোগ্য প্রবৃত্তি? এবং এ নিয়ে রচিত কবিতা, গল্প, উপন্যাস সেই সমাজেরই আত্মস্থ সংস্কৃতি?

প্রাক-পুঁজিবাদী যুগে কিংবা পুঁজিবাদ উদ্ভব ও বিকাশের সময়াধারে অগ্রসরমান পুঁজিবাদী দেশগুলোতে যে ধরনের উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, আজ আর তেমনটা দেখা যায় না। ইংরেজি, ফ্রান্স, জার্মান ইত্যাদি ভাষায় তৎকালের সাহিত্য আজকের লেখকদের ঈর্ষার বস্তু। ৪০-৫০ বছর আগেও যে ধরনের চমকপ্রদ এবং নিরীক্ষাধর্মী সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে এবং যাদের স্রষ্টারা এখনও বেঁচে আছেন, তাদের পরবর্তী ধারা সে ধরনের উচ্চশিল্পমানের কবিতা, নাটক, উপন্যাস, গল্প লিখতে পারছে না। বরং অনুন্নত আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকা আজ বিশ্বসাহিত্যে নব নব আঙ্গিকে মানবজীবনের জটিল অধ্যায়কে তুলে ধরছে।

প্রকৃত অর্থে ভোগবাদী উন্নত বুর্জোয়া সমাজে ক্রমে ক্রমে মেধাশক্তির ধার কমে আসছে, এটিই আজ বাস্তব সত্য। নৈতিক আর আদর্শিক অধঃপতনই এর জন্য দায়ী। যে সমাজ সম্ভোগ ছাড়া কিছু বোঝে না, সে সমাজে সাহিত্য, শিল্পকলাতো অন্তরের সেই গোপন লালসাকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হতে বাধ্য। যে সাহিত্যে সভ্যতার দায়দায়িত্ব থাকে না, এছাড়া তার উদ্দেশ্য কী হতে পারে?

অতীত পুঁজিবাদী সমাজে বেদবাক্যসম একমাত্র স্লোগান ছিল 'আর্ট ফর আর্ট সেফ' অর্থাৎ শিল্পের জন্য শিল্প। ম্যাক্সীয় সমাজ এবং সাহিত্য ব্যাখ্যার পর শিল্পের এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বিরোধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। তারপরও একথা স্বীকার করতেই হবে, শিল্পবাদীদের হাত দিয়েই বিশ্বসাহিত্য নান্দনিকতার নব নব রীতি তো লাভ করেছে, মানবজীবনের ব্যাখ্যাও চমকপ্রদভাবে উঠে এসেছে। এসব সাহিত্য আঙ্গিকে তো বটেই, জীবন ও সমাজ বাস্তবতা নির্মাণেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। বিশ্বসাহিত্যের পাঠকমাত্রই জানেন সেসব শিল্পবাদী সাহিত্য কতটা সমৃদ্ধ করেছে ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান সাহিত্যকে। এ ধারায় আমরা রুশ কিংবা অপরাপর ভাষায় লিখিত মার্ক্সবাদী সাহিত্যকে টানাছি না এ কারণে, আমাদের উদ্দেশ্য শিল্পবাদীদের অধঃপতন এবং আজকের সৃষ্টিকে নির্দেশ করা।

এ কথা দ্বিধাহীন বলা যায়, একেবারে হাল জামানায় পুঁজিবাদী আদর্শিক সাহিত্যের প্রতিপক্ষ আর সমাজবাদী সাহিত্য নয়, বরং সাহিত্যিক দ্বন্দ্বটা নিজেদের মধ্যেই। পুঁজিবাদের সঙ্গে পুঁজিবাদীদের দ্বন্দ্বেরই মতো। সমাজবাদী রাজনীতির মতো সমাজবাদী সাহিত্যও কোণঠাসা হয়ে পড়েছে এবং এই রীতির চর্চায়ও ভাটা পড়েছে। আশ্চর্য নয় বরং বাস্তব সত্য এই যে, ইউরোপ-আমেরিকায়ও সৌন্দর্যবাদী বুর্জোয়া কবি-সাহিত্যিকরা পিছু হটছেন এবং এগিয়ে এসেছে সম্ভোগবাদী সাহিত্য। ক্রাইম, সেক্স, হোমোসেক্স ইত্যাদি অনৈতিক উপাদানগুলো আজ বুর্জোয়া ভোগবাদী সাহিত্যর মূল উপকরণ হিসেবে অতিদ্রুত সামনে এসে পড়েছে। আসছে সঙ্গত কারণেই। কেননা ভোগবাদী অসুস্থ সমাজে উত্তেজনা, আনন্দ, বিস্ময়, উপভোগ বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদী সাহিত্যের দ্বারা পূরণ অসম্ভব।

কেন এমন হল? হল এই কারণে, ভোগবাদী নীতিহীন পুঁজিবাদী সমাজ আজ আর সাহিত্যের নান্দনিক সৌন্দর্যে পরিতৃপ্ত নয়।

মানবজীবনের উচ্চতর বিশুদ্ধ মূল্যবোধ আর জীবনাদর্শপূর্ণ দার্শনিক সমাজব্যবস্থাকে উন্নত রাষ্ট্রগুলো পরিত্যাগ করেছে। ভোগবাদকেই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। তাই সাহিত্যকে তারা চায় নারী সম্ভোগ, মদকদ্রব্য গ্রহণের উত্তেজনার ভেতর দৈহিক শিহরণ জাগানোর মতো পেতে। আরও চায় হত্যা, যুদ্ধ, ভয়ঙ্কর, বীভৎসতার মতো বিকৃত অনুভবের ভেতর। সেই শান্ত আর স্নিগ্ধ রসের সাহিত্যে আজ পরিতৃপ্ত নয় বুর্জোয়া সমাজ। নারকীয় কাণ্ড, পৈশাচিকতা, রক্তাক্ত হত্যা ও ধর্ষণ ইত্যাদি উত্তেজক বিষয় বুর্জোয়া সমাজের নান্দনিক বোধকে বিতাড়ন করেছে। মনুষ্যত্বের নীতিমূলক, জীবন-বাস্তবতার সরল কৌতূহল তাই আজ বুর্জোয়া সাহিত্য থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ঠিক তেমনি চিরায়ত শিশুসাহিত্যকেও উৎখাত করে দিয়েছে কল্পবিজ্ঞান বা সায়েন্স ফিকশন।

এবার আমরা বাংলাদেশের সাহিত্যের দ্বন্দ্বকে বিবেচনায় আনতে পারি। নির্ধারণের চেষ্টা করতে পারি সাহিত্যের পক্ষ-বিপক্ষ-প্রতিপক্ষ অর্থাৎ শত্রু-মিত্রকে। গোড়াতেই প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে কবিতা ও ছোটগল্প পাঠে পাঠকের আজ এত অনীহা কেন? কবিতার কথায়ই আগে আসা যাক। কবিতায় পাঠকের অনীহা কি গদ্যরীতির কারণে? এমনও অভিযোগ শোনা যায়, বর্তমান ছন্দহীন কবিতায় পাঠক তাদের প্রাত্যহিক জীবনের ছন্দকে খুঁজে পায় না। কথাটি আংশিক সত্য হতে পারে, নাও হতে পারে। যদি প্রশ্ন করা হয় যৌন কবিতা বা নিষিদ্ধ শরীরের কবিতা কেন রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে? ওখানেও তো ছন্দ নেই, তবে? আসল সত্যটি হচ্ছে সমাজ দ্রুত ভোগবাদিতার দিকে ধাবিত হয়েছে, মেধাচর্চাকে পরিত্যাগ করে চটুল রসে জীবনকে উপভোগ করতে চায় বলে শিল্পবাদী কবিতাকে বুঝতে না পেরে ছন্দহীনতার দোষ চাপিয়ে সরে যাওয়া।

এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন উঠতে পারে। অন্যসব কবিকে ছাড়িয়ে হঠাৎ সত্তর দশকে জীবনানন্দ দাশ বাঙালি পাঠক ও কবিদের কাছে এত প্রিয় হয়ে উঠলেন কেন? নির্ভেজাল প্রকৃতি, ব্যক্তিগত বিষণ্ন, দুঃখবোধ, নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা, মৃত্যু ইত্যাদি উপাদানে জীবনানন্দের কাব্য পূর্ণ হয়ে আছে বলেই কি আজ তিনি তরুণদের এত প্রিয়?

আমরা এ প্রশ্নের গভীরে যেতে চাই। উনসত্তরের জাতীয়তাবাদী গণআন্দোলন এবং একাত্তরের যুদ্ধের সময়সীমায় জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' ছিল তরুণ যুবসমাজের শিল্পরসের আধার। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে বাঙালি জাতি নতুন এক অভিজ্ঞতার জগতে পতিত হয়। সেই জগৎ কেবলই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যর্থতায় পূর্ণ, মানুষের স্বপ্নভঙ্গ-অপ্রাপ্তির বিষণ্নতায় আচ্ছাদিত। স্বাধীনতার ভেতর দিয়ে বাঙালি প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে পরাজিত হয়েছে। অথচ মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে প্রতিমুহূর্তে হচ্ছিল বিজয়ী। ক্রমেই এই জাতি বিষণ্ন জাতিতে পরিণত হয়েছে এবং ব্যক্তি-বাঙালি হয়ে পড়েছে ভয়ঙ্কর বিষণ্ন। জনবিচ্ছিন্ন, সমাজবিচ্ছিন্ন, জীবনবিচ্ছিন্ন, আত্মবিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তিমানুষ হয়ে পড়ে আদর্শিক আশ্রয়হীন। তাই বিশৃঙ্খল জীবন, জটিল মনোবিকার, মৃত্যুভয়, অতিকল্পনার শিকার হন কবি-লেখক-শিল্পীরা। তাইতো স্বাধীনতা-উত্তর এ জাতি হারাল সম্ভাবনাময় ক'জন শিল্প প্রতিভাকে। অকালে মৃত্যু হল কবিদের, আত্মহত্যা করলেন কথাশিল্পী।

স্বাধীনতা এদেশের কবিদের রাজনৈতিক ও দার্শনিক আশ্রয় দিতে পারল না। তাই অনেকেই আশ্রয় নেন নানা মত ও পথে। কেউ ধর্মে, কেউ চরম হতাশায়, কেউ বা নারীতে-পুরুষে, কেউ মাদকে। তাই কবিদের জীবনাচরণে, মননে, কবিতায় একদিকে হতাশা আর কামশাস্ত্রের এত ভার, ভোগবাদের হাতছানি এবং অন্যদিকে দুঃখ-কষ্টকে অতিক্রমের জন্য ঐশ্বরিক দুঃখবাদ এত কাছে টেনে নেয়। ঈশ্বর ভাবনা আর মাদকদ্রব্যেক আকর্ষণ সমার্থক হয়ে যায়।

বাঙালি তরুণ কবি পরাজিত তার স্বপ্নের জগতে। তাই তারা আশ্রয় খুঁজে জীবননানন্দের বিষণ্নতা, ঘন কুয়াশা আর অস্পষ্ট ধূসর জগতে শান্তির প্রত্যাশায়। আশ্চর্য এই যে, বাঙালি কবির মৃত্যুর অনুভূতিতেও রয়েছে দ্বৈতসত্তার প্রচণ্ড প্রভাব। যতটা ভয় পায় মৃত্যুকে, ঠিক ততটা ভালও বাসে। বাঙালির কাব্যসাহিত্য ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে চমকে উঠতে হয়। এমন কোনো বাঙালি কবি নেই যার ৯০ ভাগ কবিতায়, এমনকি প্রেমের কবিতায়ও মৃত্যুকে স্মরণ করা হয়নি। চর্যাপদ, মধ্যযুগের গীতিকবিতা এবং অতিআধুনিক কবিতায় মৃত্যু উঠে এসেছে কখনও সরাসরি, কখনওরা প্রতীকে-চিত্তকল্পে। তাছাড়া সবকিছু অনুভবের ভেতরই ছড়িয়ে আছে বিষণ্নতা। পাঠক তো বটেই, কবিদের কাছেও তাই জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি এত প্রিয়, এত আপন। বোধকরি বাঙালি ছাড়া বিশ্বসাহিত্যের কাব্য-কবিতায় মৃত্যুকে, বিষণ্নতাকে এত সহজে, এত অধিক কোথাও মিলবে না।

কেন এমন ঘটল বাংলাদেশের কবি ও কবিতায়? সমাজতন্ত্র অস্বীকারকারী, সন্ত্রাসী ধর্মান্ধ মৌলবাদে আশ্রয় নেওয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা আজকের তরুণ কবিদের সব ভরসা আর স্বপ্নকে ভেঙে চূর্ণ করে দিয়েছে। রাষ্ট্র যেমন সামনে এগোল না, তেমনি তার সাহিত্যকেও এগোতে দিল না। না দিল কবিদের, না দিল কথাসাহিত্যিকদের। কবিতার মতো ছোটগল্পেরও পাঠক সঙ্কট। ছোটগল্প ও কবিতা তো সহোদয়। উভয়েরই শিল্প জটিল, উভয়ই ইঙ্গিতধর্মী। কবিতা যেমন, তেমনি প্রকৃত উচ্চাঙ্গের ছোটগল্পও দর্শননির্ভর। শব্দ বা বাক্যের রয়েছে অর্থ ব্যঞ্জনার পাশাপাশি ভাবের ব্যঞ্জনা। এমন উচ্চ ব্যঞ্জনা সৃষ্টির গল্প নির্মাণ সহজ নয় যেমনি, তেমনি তার পাঠোদ্ধারও জটিল। এক্ষেত্রে গল্পকারদের ব্যর্থতা পাঠকদের চেয়ে হাজার গুণ ভারি। তাই ছোটগল্পের পাঠক এত সংখ্যালঘু।

এমন একটা সময় গেছে যখন বাংলাদেশে এত অধিক লোক লেখালেখিতে আসেনি। এখন ছোট-বড় সব শহর এমনকি থানাভিত্তিক ছোটকাগজকে কেন্দ্র করে লেখালেখি চলছে। এসব লেখালেখির পেছনে বলতে গেলে খুব কমই শিল্পগুণ এবং মহৎ রাজনৈতিক সাহিত্যিক আদর্শ খুঁজে পাওয়া যায়। অথচ চল্লিশের দশক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত প্রায় লেখক-কবিরাই কোন না কোন রাজনৈতিক আদর্শের বিবেচনায়ই লিখতেন। হতে পারে সে আদর্শ প্রতিক্রিয়াশীল, নয় তো উদারবাদ কিংবা প্রগতিবাদী । কিন্তু সবার চেষ্টাটা ছিল লেখার রূপরীতিতে শিল্পের অনুশীলন। সার্থকতা কিংবা ব্যর্থতা বড় কথা হলেও তাদের আদর্শ ছিল শিল্পবাদী। এক্ষেত্রে প্রগতিবাদীদের উদ্দেশ্য ছিল একেবারেই আলাদা। এসব কবি-লেখকের নামের ফর্দ-ফিরিস্তি টানার প্রয়োজন নেই, সচেতন পাঠকমাত্রই এদের শনাক্ত করতে সক্ষম।

একাত্তরের স্বাধীনতা-উত্তর সাহিত্যের সবকিছুই এলোমেলো হয়ে গেল। শিল্পবাদী বুর্জোয়া সাহিত্যে নেমে এলো ভয়াবহ সঙ্কট। এ নতুন রাষ্ট্রের গণআকাঙ্ক্ষাকে যেমন অস্বীকার করল বুর্জোয়া রাজনীতি, তেমনি সেই আদর্শবিশ্বাসী কবি-লেখকরাও নিজেদের বিশ্বাস থেকে সরে গেল। আদর্শ নয়, বড় হয়ে ওঠে খ্যাতি ও অর্থ-সম্পদ। যেহেতু পুঁজিবাদের সমর্থক কবি-লেখকদের সামাজিক দায়দায়িত্বটা আর থাকল না, স্বাধীনতা এসে গেছে, এখন বিগত যুগের অপ্রাপ্তিটা পুষিয়ে নেয়ার সময় সমাগত, উঠতে হবে উপরে, সিঁড়ি বেয়ে। পাকিস্তান ঠকিয়েছে, বাংলাদেশে ঠকবে কেন? মাতৃভূমি যেন ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

এভাবেই সামরিক এবং বেসামরিক স্বৈরাচারী শাসকশ্রেণীর পাখার তলায় আশ্রয় নেয় অনেক বুর্জোয়াবাদী ও উদারবাদী লেখক কবি। এবং সেই স্বৈরশাসনের নিয়ন্ত্রণে সাহিত্য বিকশিত হতে হতে আজকের এই স্তরে পৌঁছেছে। এমনও দেখা যায়, কবিতা আর কথাসাহিত্য নব্য ধনী ও অলস মধ্যবিত্তের অবসর সৃজনশূন্য সময় ব্যয়ের উপকরণে পরিণত হয়ে যেতে।

মাধ্যমটা টিভি হোক চাইকি বইয়ের অক্ষর হোক। প্রকৃত অর্থে বিগত তিন দশক স্বৈরাচারী সংস্কৃতি ও রাজনীতির ভেতরই বাংলাদেশের সাহিত্য বিকশিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এভাবেই রাজনীতি ও অর্থনীতির মতো সাহিত্যও তার আদর্শ হারিয়ে ফেলেছে।

বাংলাদেশের মহৎ-সৃজনশীল কবিতাকে যেমন ধ্বংস করেছে অগণতান্ত্রিক গণবিরোধী সামরিক-বেসামরিক জঙ্গি শাসন, তেমনি কথাসাহিত্যকেও। কথাসাহিত্য আর কবিতাকে তার নিজস্ব ভূমি থেকে উৎপাটন করে নিক্ষেপ করা হয়েছে অলস-মেধাহীন দর্শকের খোরাক করে টিভির পর্দায়। এটাও খবরদারির গলায় নির্ধারণ করে দেয়া হল কী লিখতে হবে এবং কেমন করে লিখতে হবে। সম্প্রচারক রঙ-বেরঙের টিভি-চ্যানেলের লাল-নীল পর্দার খোরাক নাটক এবং অপরাপর বিষয়গুলো খেয়াল করলে তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

অথচ সক্রেটিস শাসকশ্রেণীর কণ্ঠস্বর নিজের কণ্ঠে ধারণের বদলে হ্যামলক ধারণকে শ্রেয়-ন্যায় মনে করলেও বাংলাদেশের অনেক কবি-লেখকই পুঁজিবাদী দুর্নীতিবাজ রাজনীতির দর্শনকে আকণ্ঠ পান করল। এমনটা করতে গিয়ে পূর্বসূরি আপন শ্রেণী-মিত্র বুর্জোয়া সাহিত্যের আদর্শ ও ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করল। এখন আর কেউ উচ্চস্বরে সাহিত্যের আর্ট বা সৌন্দর্যের কথা উচ্চরণ করে না। দেখা গেল, যে মহৎ উদ্দেশ্যে কবিতাকে 'উৎসব' আর 'মিছিল' ব্যানারে সাজিয়ে ঘর থেকে টেনে রাজপথে বের করে আনা হয়েছিল, একদিন তা রাজপথেই বেদখল হয়ে গেল। কবিতা আত্মসমর্পণ করল সৌন্দর্য সৃষ্টির বদলে দেশি-বিদেশি লুটেরা কোম্পানি, সাহায্যসংস্থা আর আত্মঘাতী প্রবণতার কাছে। কই, কবিতা তো তার অবিনাশী পতাকা উড়িয়ে রাজপথে নেমে এলো না জঙ্গিবাদ আর সাম্রাজ্যবাদীর ইরাক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মিছিল করে? এখানেই কবি নজরুল আর সুকান্ত হেরে গেলেন তাঁদের উত্তরসূরিদের হাতে। এরপরও আমাদের প্রত্যাশা, কবিতা মুক্ত হোক আদর্শিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে।

এই যখন শিল্প-সাহিত্যের অবস্থা তখন আমাদের কাছে পরিষ্কার হতে হবে সমকালীন বাংলাদেশের পুঁজিবাদী সাহিত্যের শত্রু কারা এবং মিত্রই বা কে? গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট হয়ে পড়ে, বাংলাদেশের পুঁজিবাদী সাহিত্যের দ্বন্দ্বটা আসলে অভ্যন্তরীণ, অর্থাৎ নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেদের। একদল আরেক দলকে বলছে জীবনবিচ্ছিন্ন শিল্পবর্জিত অগভীর পানসে সাহিত্য, অন্যদল বলছে সেকেলে শুদ্ধবাদীর দল। অথচ ব্যাপক কবি-লেখকের ধারণাই নেই কোনটি পুঁজিবাদী শিল্পশুদ্ধ সাহিত্য, আর কোনটি নয়। এরা বুঝতে পারছে না আজকের পুঁজিবাদ কী করে তার প্রগতিশীল আদর্শ আর বৈজ্ঞানিক ইহলোকবাদ হারিয়ে ফেলেছে। ওই যে সত্তরের মাঝামাঝি থেকে রাষ্ট্র মৌলিক উপাদান পরিত্যাগ করে মৌলবাদী হয়ে গেছে তার প্রভাব সাহিত্যেও পড়েছে। শুরু হয়েছে মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল কাব্যচর্চা।

কেননা প্রগতি পরিত্যাগকারী রাষ্ট্রে কবিদের আদর্শের পতন ঘটলে মৌলবাদ চর্চা ছাড়া বিকল্প রাস্তা থাকে না। এই অবস্থায় মৌলবাদী রাষ্ট্রের যেমন জনগণকে দেওয়ার কিছু থাকে না মিথ্যাচার ছাড়া, তেমনি সাহিত্যেরও। জীবন-বাস্তবতার নামে নীতিভ্রষ্ট আজকের পুঁজিবাদী সাহিত্য তাই উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে বিশৃঙ্খল জীবনের, সমাজের উদ্ভট কল্পনাকে। তাই নারী-পুরুষের যৌনজীবনের সঙ্কট, নর-নারীর বিকৃত কাম, লোভ-লালসা, স্বামী-স্ত্রীর অতৃপ্ত কামাচার, নীতিহীন পরকীয়া, হত্যা, ধর্ষণ, নিষ্ঠুরতা, মনোবৈকল্য ইত্যাদি পুঁজিবাদী সমাজের সমস্যাগুলো সাহিত্যে আমদানি হচ্ছে। লেখকরা আসলে বুঝতেই পারে না পুঁজিবাদী শোষণকারী রাষ্ট্রের সঙ্কটটা কী বা কোথায়?

এই অবস্থায় শিল্পবাদী সাহিত্য আজ স্বগোত্র শক্তির হাতেই পরাজিত। যে রাষ্ট্রব্যবস্থা একদিন তাকে সৃষ্টি করেছিল, লালন করেছিল, সে-ই আজ তার প্রতিপক্ষ। বিস্ময়ের বিষয়, এই শিল্পবাদী সাহিত্যই এতদিন প্রতিপক্ষ ভেবেছিল মার্কসবাদী সাহিত্যকে। আজকের বাস্তবতা এই, শিল্পবাদী সাহিত্যকে হটিয়ে সাহিত্যের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে ভোগবাদী সাহিত্য। অসৎ সাহিত্য। বাংলাদেশে বুর্জোয়া সাহিত্যেও নিজেদেও ভেতর এই দ্বন্দ্ব আসলে তাদেও স্রষ্টাদেরই মেধা ও মননের সঙ্কটের ফল।

বাংলাদেশে বুর্জোয়া শ্রেণী আজ যে গভীর সঙ্কটে পড়েছে তা থেকে মুক্তির যেমনি পথ নেই, ঠিক তেমনি তাদের সাহিত্যেরও। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও আদর্শিক অবস্থা যদি বিশৃঙ্খল অবস্থায় পতিত হয় তবে তার মননশীল সৃজনকর্মও পথ হারিয়ে ফেলে। শিল্পবাদী সাহিত্যের নিরাপদ ভূমি হচ্ছে একটি উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। আর এই রাজনৈতিক অবস্থাই শিল্পবাদী সাহিত্যের মিত্রপক্ষ। বাংলাদেশের বুর্জোয়া সাহিত্যের আজ আর মিত্রপক্ষ নেই, বরং আপন শ্রেণীর দুর্বৃত্ত অংশই তার পরম শত্রু। বুর্জোয়া সাহিত্যের ঐতিহাসিক এই পরিণতি যা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সূত্র ধরেই অনিবার্য হয়ে উঠেছে, এক্ষেত্রে প্রগতিবাদী সাহিত্যকে এগিয়ে আসতে হবে। পুঁজিবাদী সাহিত্যের এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রগতিবাদী সাহিত্যের জন্য অবশ্যই অনুকূল অবস্থা। মানবসভ্যতা, প্রগতি উচ্চতর মনন-মেধায় ঐতিহ্য রক্ষার জন্য সাহিত্যিক সৃজনশীলতা চর্চার দায়িত্ব আসলে প্রগতিবাদী লেখকদেরই।

নববর্ষ

বাঙালি বড় বেশি স্মৃতিবিলাসী আর কিংবদন্তিমুগ্ধ জাতি। বিস্ময়ের এই যে, বাঙালির কাছে দুঃখের স্মৃতিও সুখময় হয়ে ওঠে যেমনি, তেমনি সত্য-মিথ্যার কিংবদন্তিও অতীত ধূসর জগতের মুগ্ধতা নিয়ে হাজির হয়। বর্তমানের চেয়ে অতীত প্রিয় এই জাতি তার নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখকেও স্মৃতি দিয়ে দেখতেই ভালোবাসে। তা না হলে পুণ্যাহ আর হালখাতা হারিয়ে গেছে বলে এত হাহাকার কেন? পুণ্যাহ তো শোষক-জমিদার কর্তৃক দরিদ্র প্রজার হাত থেকে খাজনাপ্রাপ্তির দুঃখময় একটি দিন। অথচ তার নাম পুণ্যাহ অর্থাৎ পাপ মোচন করা পুণ্য অর্জনের পবিত্র দিন। সেই পাপ হচ্ছে বকেয়া খাজনা, পুণ্য হয়ে খাজনা শোধ। দিনটি আবার নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ। কেমন তা? দুর্ধর্ষ বরকন্দাজ পেয়াদার পাহারায় ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ধারণ করে বসে আছেন স্বয়ং জমিদার কিংবা তার প্রতিনিধি, অনুগত প্রজারা ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হয়ে শোধ করছে বকেয়া খাজনা, বিনিময়ে আশীর্বাদ পাচ্ছে যেন আসছে বছরও এমনি দিনে খাজনা শোধ করার শক্তি লাভ করে। তারপর ফেরার পথে কাছারি বাড়ি থেকে পাচ্ছে দুটো করে গুড়ের বাতাসা। হালখাতাও তাই। বণিক-মহাজনের ঋণ শোধের দিন। অথচ এই নিয়ে বাঙালি কবি-লেখক-বুদ্ধিজীবীদের কত না কথা, কত না বাণী!

পয়লা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ মোঘল সম্রাটরা বাঙালির সুখ আর শুভদিনের জন্য নির্ধারণ করেনি। কৃষিবর্ষ বা খাজনাবর্ষই এর মূলে। বাঙালি একে সুখের করে নিয়েছে দুঃখ থেকে মুক্তি অর্থাৎ প্রচণ্ড উত্তাপের জ্বরের পর ঘাম দিয়ে শরীরের তাপ নামার স্বস্তির মতো। বাঙালি এই প্রেরণা পেয়েছে প্রকৃতির ভেতর থেকে। সংসারে পরাজিত জাতি তো শান্তি খোঁজে নির্বিরোধ প্রকৃতির কাছে। চৈত্রের অনাবৃষ্টি, বৈশাখের দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি, আবার কিনা বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। গাছে গাছে নব পল্লব কিংবা ফুল ক্ষুধার্ত দুঃখী বাঙালির কাছে চিরকাল ছলনা করে গেছে। তাকে জাগতিক দুঃখ ভুলাতে বানাতে

চেয়েছে প্রকৃতিমুগ্ধ ভাবুক-কবি-বিরহী-সাহিত্য-সংগীতপ্রেমী। অথচ শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের গফুর আর তার মেয়ে আমিনা জানে বৈশাখ মাস কি এবং কেমন। এমনটা জানতেন চর্যাপদের কবিরাও। ধর্মসংগীতের আড়ালে তাঁরাও সত্যকেই উন্মোচন করেছেন হয়তো নিজেদেরই অজান্তে। কেমন সে সব? 'টালত মোর ঘর নাহি পরবেসী/হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।' অথবা 'নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহারি কুড়িআ/ছোই ছোই জাসি বামহণ নাড়িআ/... নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ।' এই তো চিরকালের বাঙালি, তার ঘর তো পর্ণকুটির, হাঁড়ি ভাতশূন্য, উচ্চ শাসক শ্রেণী দ্বারা উৎপীড়িত, সংসার পরাজিত পুরুষ স্ত্রী-পুত্র-ঘর-সংসার ছেড়ে কাপালিক সন্ন্যাসী হয়ে দেশান্তরে পলায়ন করে।

তবু পয়লা বৈশাখ এসেছে, নববর্ষ এসেছে অতীতে, আসছে বর্তমানে, আসবে ভবিষ্যতে। লোকায়ত সংস্কৃতির ওপর চাপিয়ে দেয়া সমাজের উচ্চশ্রেণীর আচরণিক বৈশিষ্ট্যগুলো টিকেও যাচ্ছে রূপরূপান্তরের পথ ধরে। পয়লা বৈশাখে বাড়িঘরকে নবসাজে সজ্জিত করা, নতুন কাপড় পরা, উত্তম পানাহার, নদীর ঘাটে বটের তলায় বসা মেলায় ছুটে যাওয়া তো দরিদ্র সমাজের জন্য নয়। ঘর যার পাতায় ছাওয়া, শত ছিন্ন গামছা-লুঙ্গি যার বসন, নিত্য ক্ষুধা যার ঘরে, তার পরিচ্ছন্ন ঘর কী? নতুন বসন কোথায়? রসনা বিলাস কোথায়? কোথায় বা মেলায় বাজে বাংলাদেশের টাক-ডু-মা-ডুম ঢোল? বাংলাদেশের ঢোল অতীতে বেজেছে, আজও হয়তো বাজে, আগের তালে নয়, হিন্দি গানের নাচের তালে নিশ্চয়ই। আজও দরিদ্র পর্ণকুটিরে অর্ধ উলঙ্গ আদম শিশুরা ছুটে যায় মেলায়, জিলেপির উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, ঘ্রাণ নেয় আর দেখে গ্রাম্য টাউট, বাটপার, চেয়ারম্যান, মেম্বারদের সন্তানরা কেমন করে গরম জিলেপি চাটছে।

আজও পয়লা বৈশাখের নববর্ষের মেলা আসে। কিন্তু বদলেছে তার রূপ। মাটির বাসন, কাঠের তৈজসপত্র নেই, বাঁশিও নেই তালপাতার। আছেটা তবে কী? আছে কাঠের পুতুলের বদলে মেইড ইন চায়না বা ইন্ডিয়ার খেলনা, মোবাইল, গাড়ি। আর পাওয়া যায় নীলক্ষেত, কাঁটাবনের ফুটপাতে অতিসস্তার নীলছবির সিডি।

এটাই স্বাভাবিক, না পাওয়া বরং অস্বাভাবিক। উন্নয়নের নামে এই যে উর্বর ফসলের ক্ষেত বিনাশ করে এলজিডিআরের পাকা সড়ক গ্রামকে ফালাফালা করেছে, তার পাশেই তো এখন বৈশাখী মেলা বসে। এটাই নিয়ম। না হলে শহর থেকে গ্রামে মাদকদ্রব্য যাবে কোন পথে? টিনের বাক্সের ফুটোয় চোখ গলিয়ে ওই যে দিল্লি, লাহোর, লন্ডন শহর দেখা যায়, তা হারিয়ে গেলেও বৈশাখী মেলায় ব্যাটারি চালিত ভিডিওতে চলে হিন্দি ছবি। পাশের টেবিলে স্তূপ দেয়া লাল-নীল ছবির সিডি, ভিসিডি।

শ্রেণীটা ধরা পড়বেই, লুকানো যাবে না। যেমনি সম্ভব নয় শহরে, তেমনি গ্রামে। বরং নববর্ষ, ঈদ, পৌষ, বসন্ত ইত্যাদি মেলায় আরও স্পষ্ট হয়

শ্রেণীটা। কৃষিপণ্যের বৈশাখী মেলায় যদি শিল্পজাত পণ্য ঢুকতে পারে তখন শ্রেণীটা তো আরও স্পষ্টতর হবেই। এক দল ক্রেতা, অন্য দল কেবল দর্শক। এক দল নতুন পোশাকধারী, অন্য দল জীর্ণ পুরোনো পোশাকধারী কিংবা অর্ধনগ্ন। তালপাতার বাঁশি, নৃত্যরত কাঠের বানর আর পঞ্চমুখী কচু হারিয়ে গেছে বলে শহুরে বুদ্ধিজীবীরা নকল-শৌখিন বিলাসী আক্ষেপ প্রকাশ করলেও স্মৃতিভোঁতা গ্রাম্য দরিদ্র মানুষ সেসব বুঝি ভুলেই গেছে। কবি জসিমউদ্‌দীনের কবিতার মানুষগুলো সবাই আছে, কিন্তু বদলে গেছে তাদের চাওয়া-পাওয়ার চরিত্র।

পল্লীকবির আড়ংয়ের মেলা আজও আছে, কিন্তু নেই অনাবিল প্রকৃতির ভেতর প্রাকৃত মানুষের প্রাকৃত আনন্দানুভূতি। নাগরিক আগ্রাসান, দারিদ্র্য বিমোচনের নামে এনজিওদের দাপট, রাজনীতির নামে দস্যুতা নববর্ষের পবিত্রতাকে করেছে ধর্ষণ। মেলায় আগতরা আজও পরস্পর ভাববিনিময় করে, কিন্তু স্বার্থবাদিতা, ছলনা আর কৃত্রিমতাটাই স্পষ্ট। আর রাজধানীতে নববর্ষ আসে কোন রূপ ধরে? পান্তার সঙ্গে ইলিশ ভাজির রসনা বিলাসে নিন্দার বিষয় নেই। থাকাও উচিতও নয়। এত কৃষি সভ্যতা পরিত্যাগকারী যন্ত্রসভ্যতানির্ভর নগরবাসী মানুষের জন্মগত জীববৈশিষ্ট্য অর্থাৎ জেনেটিক ধর্ম। এমনটা অতি আধুনিক সভ্যতার বিজ্ঞানবাদী মানব সমাজেও দেখা যায় যারা নগর ছেড়ে পিকনিক করতে জঙ্গলে প্রবেশ করে। এটাই তো জৈব বিবর্তনের ধর্ম। অরণ্য আর গুহাবাসী মানবের বংশধরেরা পরম্পরায় রক্তে বহন করা জৈবধারা তো পরিত্যাগ করতে পারে না। আদিম স্মৃতিবাহী শরীর-মন তো গোপনে সবই সংরক্ষণ করে। এটাই জীববিজ্ঞানের সারকথা। নৃবিজ্ঞানের রহস্য।

প্রশ্ন সে বিষয়ে নয়। প্রশ্ন হচ্ছে উপভোগের চারিত্রিক পার্থক্য নিয়ে। নগরেও শ্রেণী আছে, বরং গ্রামের চেয়ে আরও স্পষ্ট। যেমন বিত্তবান, তেমনি বিত্তহীন, সঙ্গে আবার মধ্যবিত্ত। ওই মধ্যবিত্তটাই বরং জটিল। সাধ আছে তো সাধ্য নেই। শ্রেণী হিসেবেই ওরা স্বপ্নলোভী। ওরা বড় বেশি বিনোদন বিলাসী। সবকিছুকেই বিনোদনমুখী করে তোলে। কি একুশ, কি ছাব্বিশ, কি পয়লা, সবকিছুর মধ্যেই কেবল উপভোগ চায়। অপূর্ণ ক্ষুধাকাতর মন কেবলই চায় দুহাত ভরে পেতে। কেবল যে নববর্ষেই ওরা পান্তা খায় এমন নয়, মাঝে-মধ্যে ঘরেও খায়, শখ করে নয়, বরং বাধ্য হয়ে। ওরা কেবল খেতেই জানে। আর জানে ভোগ করতে। খেয়াল করলে দেখা যাবে ওরা একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা কিংবা বিজয় দিবস থেকে শুরু করে সব দিবসকেই উদযাপনের নামে ভোগ করে। পুরুষতান্ত্রিক মানস যেমনি ইতর প্রাণীর মতো নারী সম্ভোগ করে, ঠিক তেমনি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও এমনি করেই উপভোগ্য করে তোলে। ওই জীবনযুদ্ধে পরাজিত স্বপ্নখেকো গোত্র।

ওই যে আদিম কৃষি সভ্যতার স্মৃতিবাহী পয়লা বৈশাখ, ওটাকে নগরবাসী গ্রাম থেকে নগরে টেনে এনে ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির নামে এমনটাই ভোগ করে

যে, যার সঙ্গে তুলনীয় গ্রামের দরিদ্র কিশোরীর গার্মেন্টস শ্রমিক হতে গিয়ে ধর্ষিতা হওয়ার মতো। আসলে বাঙালি তার চিরায়ত সব মহান অর্জনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তার প্রতিদিনের জীবনাচরণও আত্মঘাতী, এতে প্ররোচনা জোগায় ধর্মান্ধ রাজনীতি। এ দেশের মাটি ও মনন থেকে উৎসারিত সব সাংস্কৃতিক উপাদানকে অস্বীকৃতির ভেতর দিয়ে শেকড়ছিন্ন করার এবং আত্মপরিচয়কে পরিত্যাগ করার হীন অপচেষ্টা অবশ্যই জাতিটির সাংস্কৃতিক প্রতিপক্ষ। অন্যদিকে আধুনিকতার নামে, বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগের নামে উন্নত পুঁজিবাদী পশ্চিমা ভোগবাদী সমাজ থেকে আগত সাংস্কৃতিক ভোগ্যপণ্য যে বাজার সৃষ্টি করেছে, তারই প্রতিক্রিয়া আজকের ফসল।

তাই স্মৃতিবিলাসী আর কিংবদন্তি স্বপ্নাবিষ্ট জাতিকে নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ নিয়ে আরও নিবিড় করে ভাবতে হবে। অনুসন্ধান করতে হবে সত্যি কি অতীত বাঙালি জীবনে নববর্ষের আবেগ সার্বজনীন ছিল? ধনী, দরিদ্র, রাজা, প্রজা কি নববর্ষকে আনন্দ-উৎসব আর আগামী মঙ্গলদিনের প্রত্যাশায় আহ্বান জানাত? জমিদার বাড়ির নববর্ষ আর নিরন্ন কৃষকের কুটিরের নববর্ষ কি এক ছিল? ওই যে কিংবদন্তি বলছে, নববর্ষে ধনী-দরিদ্র মানুষ অর্থাৎ শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মানুষ শ্রেণীবিলোপ ঘটিয়ে দিবসটি উদযাপন করেছে পরস্পর গলা জড়াজড়ি করে, বাস্তবতা কি তাই বলে? প্রকৃত সত্যটা হচ্ছে কোনো যুগেই শ্রেণীহীন কোনো জাতীয় দিবস ছিল না। যে যার ক্ষমতায় ও অনুভবে ওই দিনকে উদযাপন করেছে।

আজ পয়লা বৈশাখ তার গভীর তাৎপর্য হারিয়ে বিকৃত রূপ নিয়েছে। সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিবর্তনের কারণে সমাজ যেমনি পাল্টে গেছে, সামাজিক মানুষের মনন জগতেরও বদল ঘটেছে। ওই বদলটা শনাক্ত করতে পারলেই বাঙালি বুঝতে পারবে কী কী হারিয়ে কোন কোন জিনিস সে গ্রহণ করেছে। এমনটা বুঝতে পারলেই বাংলা নববর্ষের তাৎপর্যও জাতি অনুভব করতে পারবে। কেন বাংলা বছর, তারিখ সে ভুলে যায়, অথচ বারের নাম ঠিকই মনে রাখতে পারে কেন, তারও উত্তর মিলবে।

বাঙালির কৃষি সভ্যতার সঙ্গে অর্থাৎ ফসল উৎপাদনের সঙ্গে বাংলা সাল, মাস, তারিখ কেন আজ জরুরি নয়, তাও বুঝতে পারবে। সনাতন চাষ, সনাতন শস্য উৎপাদন, সনাতন শস্যবীজ যেখানে হারিয়ে যাচ্ছে, সেখানে বাংলা মাস ও ঋতুর সঙ্গে ওই কৃষি সভ্যতার বা কৃষি উৎপাদনের দ্বন্দ্বটা কোথায় তা না বোঝার কারণ থাকবে না। আরও বোঝা যাবে পয়লা বৈশাখের স্নিগ্ধতা ও পবিত্রতার সঙ্গে কোথায় দ্বন্দ্ব পয়লা জানুয়ারির রাতের ১২ টা ১ মিনিটের বর্বরতা আর উন্মত্তার। তখনই কবি জীবনানন্দের সোনালি ডানার চিলের জন্য আক্ষেপ করার অর্থটা বোঝা যাবে।

–২০১০

রাষ্ট্র চরিত্র ও একুশ

যে কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানই রাষ্ট্রটির চরিত্র বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার উপর এবং ভেতর কাঠামোর বদল হতে থাকে। পুরাতন বা সনাতনী রূপটি আর থাকে না। মানুষ বদলায়, সমাজও বদলায়, বদলায় সব ধ্যানধারণা। এই বদলটা ঘটে রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। রাষ্ট্র যদি আদর্শচ্যুত হয় তবে বদলটা ঘটে অতি দ্রুত। এটা প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য নয় যে, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের আদর্শের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কটা আজ আর মিত্রসুলভ নয়, বরং বৈরী অনেক ক্ষেত্রেই।

পাকিস্তান আন্দোলনের সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র শক্তি প্রগতিশীল রাজনীতিতে বিশ্বাসী অংশটি ছাড়া ব্যাপক অংশই ছিল ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র প্রাপ্তির স্বপ্নে বিভোর। রাষ্ট্রটি পাওয়া গেল ব্যাপক রক্তপাত, সম্পত্তি ধ্বংসকরণের ভিতর দিয়ে। সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তান রাষ্ট্রটির স্বরূপ তাদের কাছে অচিরেই ধরা পড়ে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে।

অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীলগণ যখন দিশেহারা তখন প্রগতিবাদীরা তাদের রাজনৈতিক কৌশল খুঁজে পেল ভাষা বিতর্কের ভিতর। কেননা পার্টি নিষিদ্ধ, নেতা-কর্মীরা জেলে, কেউ কেউ দেশান্তরিত। ব্যাপক নির্যাতন চলতে থাকে সারাদেশে। নাচোল, টঙ্ক বিদ্রোহ আর তেভাগা আন্দোলন তার দৃষ্টান্ত। এই অবস্থায় প্রগতিবাদীরাই ভাষা বিতর্কের ভিতর দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। ধূর্ত প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তান সরকার তখন আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার জন্য তমুদ্দিন মজলিস আর মুসলিম ব্রাদারহুড নামের সংগঠন করে পঞ্চম বাহিনী সেজে আন্দোলনের ভিতরে ঢুকে যায়।

তারপরের ইতিহাস সবারই জানা। পূর্ব বাংলায় মধ্যবিত্তের উদ্ভব এবং প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তির শূন্যতা এক নতুন রাজনৈতিক দর্শনের উদ্ভব ঘটায়। এই মধ্যবিত্তরা ছিল স্বাপ্নিক। তারা বুঝতে পারে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর ভিতর তাদের স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে যাবে। তাই নতুন রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয়ে

পড়ে। কোটি কোটি দরিদ্র আর শোষিত কৃষক, লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত শ্রমিকের আত্মত্যাগের বিনিময়ে ব্যাপক রক্তপাতের ভিতর দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়। কিন্তু ক্ষমতাটা থেকে যায় মধ্যবিত্তেরই হাতে। এমনি অস্থিরতার ভিতর চরিত্রহীন আদর্শহীন মধ্যবিত্তের সমর্থনে আন্তর্জাতিক শক্তির সহায়তায় পাকিস্তানপন্থী সামরিক স্বৈরাচার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে বসে। প্রথমেই তারা আঘাত হানে প্রগতিশীল রাজনীতিতে। সাংস্কৃতিক কাঠামোকে ব্যাপক বিশৃঙ্খলতার ভেতর লণ্ডভণ্ড করে দেয়।

কেবল সংবিধান নয়, নাগরিক চরিত্রকে দিশাহীন ও আদর্শভ্রষ্ট করে অন্ধকারে ঠেলে দেয়। যুব সমাজকে ভাগে-উপভাগে বিনষ্ট করে। এক দলকে বানায় ধর্মান্ধ, চাঁদাবাদ অন্য দলকে ভোগবাদী। তারুণ্য থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় জ্ঞানের কৌতূহল, মননশীলতা, সৃষ্টিশীলতা। মানবিক গুণের অনুশীলন হয় বর্জিত। প্রতি বছর একুশ আসে এমনি রাষ্ট্র আর নাগরিকদের সামনে। এ যেন জলহীন মেঘের আকাশ ভ্রমণ।

পঞ্চাশ আর ষাটের দশকের একুশের সঙ্গে আজকের একুশের উপর ও ভিতর কাঠামোর মিলের চেয়ে বেমিলটাই অধিক। দেখে শুনে মনে হবে, একাত্তরে তো স্বাধীনতা এসে গেছে। একুশের এখন আর দরকার কী? কিন্তু প্রশ্ন জাগবে, একুশ কি শোষক শ্রেণী আর ধর্মান্ধ স্বৈরাচারের জন্য স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিল? একুশের চেতনা যে জনগণের জন্য গণতন্ত্র চেয়েছিল, মানুষের মুক্তি চেয়েছিল; সেই মুক্তি আজ কোথায়? অপবিত্র স্বৈরাচারের পদভারে একুশের শহীদ মিনার হয়েছে কলঙ্কিত। গণতন্ত্র হত্যাকারী, ছদ্মবেশী স্বাধীনতার রক্ষক বারবার শহীদ মিনার, সংবিধান যেভাবে পদদলিত করেছে তা পাকিস্তানপন্থী মৌলবাদীদেরও হার মানায়। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দাবিদাররাও কতটা প্রতারণা করেছে তার হিসাব মেলানো কঠিন।

আমরা মানছি কালের প্রবাহে সবকিছুরই বদল হয়। বদলটা কেবল শাড়ির বদলে জিন্সের প্যান্ট পরা মেয়েদের মিছিলে নয়, চিন্তা ও চেতনারও বটে। মিছিলগুলোও যেন বড় হবার, উঁচু হবার প্রতিযোগিতায় মত্ত। চ্যানেলের ক্যামেরায় আসা, ব্যানার উঁচু করে ধরা, আবার মাথাগুলোও যেন উঁচু হয় সামনে পেছনে সবাইকে ছাড়িয়ে। এ যেন আপন অস্তিত্বকে জনগণের সামনে হাজির করা।

পণ্ডিত বা নেতাদের এটা প্রভাতভ্রমণ তো বটেই, দ্রুত ঘরে ফেরারও তাগাদা। খুঁজতে হয় মিডিয়ার লোকদের স্বেচ্ছায় সাক্ষাৎকার দেয়ার জন্য। একুশকে যে বাণিজ্যিকীকরণ আর চাকরির ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে তার প্রমাণ বইমেলা আর বাংলা একাডেমীর বিশাল কর্মীবাহিনী। কবি-সাহিত্যিকদের নামে গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মীদল।

রাষ্ট্রও পদক দেয়। একুশে পদক। অর্থসহ সনদপ্রাপ্তি ঘটে। আহ্লাদে আটখানা বৈকি। গণমাধ্যম আমজনতার সামনে তা তুলে ধরে। চেনাতে চেষ্টা

করে এসব ব্যক্তির অলৌকিক অবদানের কথা। কিন্তু প্রশ্ন আসে, সত্যিকারের মেধাবী, দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে ভেজাল মালের মিশেল দেয়া হয় কেন? গানলে ওয়ালা, নাচলে ওয়ালি, মঞ্চে কুদানে ওয়ালাদের পদক দিয়ে জনগণের ঘাড়ে তুলে যখন দেয়া হয়, তখন তো একুশ বদলে তিনশ একুশ হয়ে যায়। এ ধরনের কাজ ক্ষমাহীন অন্যায়। একুশ তো অপমানিত হচ্ছে বাংলা একাডেমীর সাহিত্য পুরস্কার থেকে যেমনি, ঠিক তেমনি ফেব্রুয়ারি মাস এলে বিভিন্ন সংবাদপত্রে শুরু হয়ে যায় মহান কবি-লেখক এবং অলৌকিক বই নির্বাচন। ভেজাল এমন দেয়া হয় যে, কলার সঙ্গে মুলার, বেগুনের সঙ্গে আগুনের। জাতীয় সাহিত্য, দেশের জনগণ আর একুশের সঙ্গে এতটা ইয়ারকি কি শোভা পায়?

তাই তো একুশ আজ রাষ্ট্রের দুর্বৃত্তদের করতলগত। ভ্রষ্ট রাজনীতি আর লুটেরা অর্থনীতি একুশকে সর্বনাশ করে দিয়েছে। অযোগ্য অপদার্থ আর ধূর্ত মন্ত্রী-মিনিস্টারগণ লুটেপুটে রাষ্ট্রকে যেমনি নর্দমায় পরিণত করেছে, তেমনি করেছে গণবিরোধী শিক্ষানীতি আর সমাজবিরোধী শিক্ষকেরা। এটা কি ভাবা যায় যে, জনগণের অর্থে লালিত-পালিত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবে নারী নির্যাতক, কামচরিতার্থকারী আর অস্ত্র হাতে গুণ্ডা?

একুশের চেতনার পুনরুদ্ধার না ঘটলে বাঙালি সভ্য দুনিয়ায় বসবাসের অধিকার হারাবে। যে পূর্বপুরুষেরা বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে তাদের নাম-কীর্তন করলেই চলবে না, যে স্বপ্নের ভেতর তারা অকাতরে জীবন দিয়েছে সেই স্বপ্নটাকে জাগাতে হবেই। পতিত এক রাজপুত্রের মতো কি বলা যায়– মুক্তিযুদ্ধ আজ বাতিল বিষয়? বাতিল তো কেবল তার জন্যই, এ নাহলে এত ক্ষমতা এত অর্থ হাতে এসেছিল কী করে? একুশ তার চেতনা হারিয়েছে বলেই এই বাংলায় এমন রাজপুত্রের আবির্ভাব ঘটে। এদের জন্ম রোধ করাও একুশের চেতনার দায়।

বাংলা ভাষা আর বাঙালি দুর্ভোগ আর মহাপতনে পতিত। সমাজের সুড়ঙ্গে আটকে পড়েছে সে। তার সংস্কৃতিকে কোথাও আজ একুশ খুঁজে পাওয়া যায় না। একুশের আলো ম্লান হয়ে গেছে। একুশের চেতনায় যে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ঘৃণাটা ছিল তাও আজ অদৃশ্য। তাকে লুটেরা পুঁজিবাদ বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে চারপাশ দিয়ে। বাঙালির মুক্তির স্বপ্ন তো গেছেই, তার স্বাধীনতাকে অর্থহীন করে দিয়েছে।

বাঙালির স্বাধীনতার গান যা বাংলা ভাষায় রচিত, নিজ সুরে লালিত তাও হারিয়ে গেছে নতুন প্রজন্মের কাছে। বাংলা গানের সুর আর কথারা বুঝি পালিয়ে গেছে বহিরাগত সংগীত দস্যুর আক্রমণে। একুশের গান, সুর, পোশাক আর ভালোবাসা হারিয়ে গেলে বাঙালিকে কি আলাদাভাবে চেনা যাবে? বাঙালি হয়ে যাবে ছদ্মবেশী।

এখনো সময় আছে জীর্ণ হয়ে যাওয়া, নিস্তেজ হয়ে যাওয়া চেতনায় সবুজ অরণ্য গড়ার। এখনো খানিকটা বর্ষার জলবতী মেঘ রয়েছে বাংলার আকাশে।

বৃষ্টি হোক। মরুকরণ আর চেতনার খরা ভূমি ভিজিয়ে দিক শীতল বৃষ্টি। রোপণ করা হোক অরণ্যের বীজ। তবে দেশপ্রেমিক, সচেতন, মানবপ্রেমিক একদল কর্মী চাই। কর্মীর বড় আকাল চলছে এই দেশে। কর্মী না থাকলে কর্মটাও থাকবে শূন্য, অপকর্মে ভরে যাবে দেশের, চেতনার মাটি।

কেবল তো ঢাকা শহর নয়, সারাদেশ শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় টিকে আছে। ৫২'র একুশ ফিরে না এলে মানুষের মননের শরীরটা সুস্থ হবে না। এই যে একুশ প্রতি বছরই ফিরে আসে সে তো ৫২'র একুশ নয়, তার প্রাণহীন ফসিল মাত্র। ফসিলে জল, বীজ, ফুল ছড়িয়ে দিয়েই কি বীজের ঘুম ভাঙে? অঙ্কুরোদয় ঘটে? এ প্রশ্নটাই জাগাতে হবে অন্তরে। এটা না জাগালে জাতির পতন ঠেকানো অসম্ভব। রাজনীতি, অর্থনীতি, তার সংস্কৃতির স্বচ্ছতা ছাড়া একুশের আয়োজন নিছক বিনোদন, তা মঞ্চ মাঠেই হোক আর মিডিয়ায়ই হোক।

ফেব্রুয়ারি ২০১১

ওয়ালীউল্লাহ্'র উদ্বাস্তু বাক্য

'শস্যহীন জনবহুল এ-অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত যেন সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে। ঘরে কিছু নেই– ভাগাভাগি, লুটালুটি আর স্থান বিশেষে খুনাখুনি করে সর্ব প্রচেষ্টার শেষ। দৃষ্টি বাইরের পানে, মস্ত নদীটির ওপারে, জেলার বাইরে– প্রদেশেও। হয়তো-বা আরো দূরে। ... জ্বালাময়ী আশা; ঘরে হা-শূন্য মুখথোবড়ানো নিরাশা... তাই তারা ছোটে, ছোটে।' *লালসালু*

'বাড়িটা তারা দখল করেছে। ... দেশভঙ্গের হুজুগে এ শহরে এসে তারা যেমন-তেমন একটা ডেরার সন্ধানে উদয়াস্ত ঘুরেছে, তখন একদিন দেখতে পায় বাড়িটা। সদর দরজায় মস্ত তালা, কিন্তু সামান্য পর্যবেক্ষণের পর বুঝতে পারে বাড়িতে জনমানব নাই এবং তার মালিক দেশপলাতক।' *একটি তুলসী গাছের কাহিনী*।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে যাঁর মেধাতুল্য লেখার পাশে দ্বিতীয় বিকল্প আজো জন্মায়নি, সেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্'র উপন্যাস এবং ছোটগল্প থেকে এই উদ্ধৃতি দেয়া হলো। এই রচনার উদ্দেশ্য পূর্বসূরি কিংবা সমকালের ওয়ালীউল্লাহ্ গবেষকদের চর্বিতচর্বন নয়, বরং অনাবিষ্কৃত অন্য এক ওয়ালীউল্লাহ্র সাহিত্য জগতে পরিভ্রমণের চেষ্টা।

আমরা এখানে তিনদল উদ্বাস্তুর সন্ধান পাচ্ছি। এ-কথাও আমরা স্মরণে রাখছি যে, ১৯৪৭ সালে ধর্মবুদ্ধির কাছে উচ্চতর মানবতার পরাভবের মধ্য দিয়ে দেশ খণ্ডনের আর মনুষ্যত্ব হননের যে উদ্বোধন ঘটেছিল তা এই সমকালেও বহমান। ওই উদ্বাস্তুকরণের শেকড় কিন্তু ওই ১৯৪৭ সাল। কেবল পাল্টেছে প্রকার-প্রকরণে। এখনো তৃতীয় তথা দরিদ্র বিশ্বের মানুষ দলে দলে উদ্বাস্তু হচ্ছে স্বেচ্ছায়। কেন? কেননা তাদের জন্মের ঠিকানার মাটি তাদের জীবনের দায়দায়িত্ব নিতে পারছে না। নিজ বাসভূমিতে মানুষ অস্তিত্বের সংকটে পতিত। অস্তিত্বের অসম লড়াইয়ে হেরে যাওয়া মানুষ উন্মাদের মতো

ছুটছে তথাকথিত উন্নত বিশ্বে। ওই উন্নত বিশ্বের কল্পিত স্বপ্ন প্রতিটি উদ্বাস্তু মনে গোলকধাঁধা তৈরি করেছে।

প্রসঙ্গটি এসেছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র *লালসালু* উপন্যাসের আয়োজন থেকে। ওই যে ওখানে উদ্বাস্তু-মানুষ কেবল ছোটে, ওরা কোন ভূমি ফেলে কোথায় যায়? এটা জানাজানির আগে অবশ্যই আমাদের জেনে নিতে হবে কোন সময়াধারে উপন্যাসটি রচিত। যদিও ১৯৪৮ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত, কিন্তু এর ভ্রূণায়নের কাল ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ সাল। তখন দেশ ভাঙছে, ভেঙ্গেছে, ধর্মের নামে ভূমি ভাগাভাগি হয়েছে। কিন্তু সুখ স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। বরং বলা যায় দেশ ভাঙার অভিঘাতে মানুষের দুর্ভোগ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

মানুষের স্বপ্নের ওই দেশটার নাম পাকিস্তান। এমনই একটা রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র মানুষকে মিথ্যে স্বপ্নিল করে, প্রতারিত করে। তবু মানুষ ওখানেই পৌঁছতে চায়। এ যেন এক উন্মাদের অভিযাত্রা। এমনই একটা রেলগাড়ি উদ্বাস্তু মানুষগুলোকে অন্ধকারে-ঢাকা শস্যহীন বিরাণ মাঠের এক দেশে পৌঁছে দেয়। রেলগাড়িটি কেমন? 'তার দেহ ঝন ঝন করে লোহালক্কড়ের ঝঙ্কারে, উত্তাপলাগা দেহ কেঁপে কেঁপে ওঠে... দেহচ্যুত হয়ে অদূরে অস্পষ্ট আলোয় ইঞ্জিনটা পানি খায়।' ওই রেলগাড়ি আর ইঞ্জিন তো অন্তঃসলিল সত্যের ভেতর প্রতীক হয়ে ওঠে দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনীতি আর উন্মত্ততার। সেই উন্মাদনা মানুষকে কী করে? 'ইতিমধ্যে আত্মীয়-স্বজন, জানপছানের লোক হারিয়ে যায়। কারো জামা ছেঁড়ে, কারো টুপিটা অন্যের পায়ের তলায় দুমড়ে যায়... হারিয়ে যায়। হারাবে না কেন? দেহটা গেলেই হয়।'

নতুন রাষ্ট্রের নামে স্বার্থবাদী রাজনীতিকগণ গণমানুষকে এমন এক মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রে নিক্ষেপ করে যেখানে 'সত্যি শস্য নেই। যা আছে তা যৎসামান্য। শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি। ভোরবেলায় এত মক্তবে আর্তনাদ ওঠে যে, মনে হয় এটা খোদাতালার বিশেষ দেশ।'

এই সেই দেশ, ১৯৪৭-এর দেশ, ওয়ালীউল্লাহ'র *লালসালু*'র দেশ। দেশ খণ্ডায়ন আর ধর্মীয়করণের দ্বারা মানুষকে বৈষয়িক দিক দিয়ে তো বটেই, অন্তরের বিশ্বাসের দিক দিয়েও উদ্বাস্তু করে দেয়। তাই তারা লোভী-উন্মাদ হয়ে যায়, কেবল সুখ চায়, নেতারা তো সেই সুখের কথা বলেই দেশ ভেঙে নতুন দেশ বানিয়েছে। 'কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ। শস্যশূন্য। শস্য যা-বা হয় তা জনবহুলতার তুলনায় যৎসামান্য।... তবু আশা, কত আশা।... এরা তাই দেশ ত্যাগ করে, ওরা গ্রাম ছেড়ে শহরে যায়। ওদের পরিণতি কি? 'জাহাজের খালাসি হয়ে ভেসে যায়, কারখানার শ্রমিক হয়, বাসাবাড়ির চাকর... কেউ মসজিদের ইমাম হয়, কেউ মোয়াজ্জিন। দেশময় কত সহস্র মসজিদ।'

এই যে আমরা বর্ণনা পাই *লালসালু*'র দেশটার, কোন সেই দেশ তা না-বোঝার কারণ নেই। কেবল যে আমাদের এই দেশ, এমন নয়, বিশ্বে এমনি

ধর্ম বা সাম্প্রদায়িক দেশের অভাব নেই। এ সব দেশ তার জনগণকে উদ্বাস্তু বানায়, শেকড় বিচ্ছিন্ন করে ঈশ্বরের নামে। এখানেই এই উপন্যাসটির আন্ত র্জাতিকতা, এখানেই ওয়ালীউল্লাহ মহান শিল্পী। সাতচল্লিশে জন্ম নেয়া প্রতারক দেশটির স্বার্থবাদী ছদ্মবেশী শ্রেণীটিকে যতটা চিনতেন লেখক, বাংলাভাষী অন্য কোনো লেখক ঠিক এভাবে চিনতে পেরেছেন কিনা তা পাঠক হিসেবে আমার জানা নেই। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ জানাচ্ছেন, 'এক সরকারি কর্মচারী সেখানে হয়তো একদিন পায়ে বুট এঁটে শিকারে যায়। বাইরে বিদেশি পোশাক, মুখমণ্ডল মসৃণ। কিন্তু আসলে মুসলমান। কেবল নতুন খোলসপরা নব্য শিক্ষিত মুসলমান।'

কী ভয়ংকর নিষ্ঠুর উক্তি! এরা, এই শ্রেণীই তো ভাগ করেছিল দেশ, আর স্বপ্নভঙ্গের ভেতর উদ্বাস্তু করেছিল স্বদেশের ভেতর স্বদেশী কোটি দরিদ্র জনগণকে। এরা যে কেবল ছদ্মবেশী মুসলমান, তা তো নয়, হিন্দুও বটে, ওই সাতচল্লিশের–বাইরে বিদেশি পোশাক কিন্তু ভেতরে ব্রাহ্মণ্যবাদী পৈতা। এদের কুকর্মের পরিণাম যে কী তা আমরা দেখতে পারব লেখকের *একটি তুলসী গাছের কাহিনী* গল্পে। তো *লালসালু*'র উদ্বাস্তু মজিদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে ধর্মব্যবসার বিষয়টি ভাবতে হবে আমাদের। রাষ্ট্র যেখানে ধর্মব্যবসায়ী রূপ নেয়, সেখানে অস্তিত্বের টানাপোড়েনে ব্যক্তি-মানুষ ওই ভয়ংকর খেলাটি খেলবে, তাতে আশ্চর্যের কী আছে! কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা মজিদকে ধর্মব্যবসায়ী বানিয়েছিল? নিশ্চয়ই সেই রাষ্ট্র যে কিনা তাকে উদ্বাস্তু বানিয়ে জন্মমাটি-বিচ্ছিন্ন করেছিল।

আক্ষেপ এই, আমাদের সাহিত্য সমালোচকেরা মজিদকে সর্বদোষে দোষী বানায়, কিন্তু গোপন রাখে দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রকে। অথবা সাহিত্য সমালোচকেরা উপন্যাসটির গতি-প্রকৃতি আর লেখককে বুঝতেই ব্যর্থ। প্রশ্ন জাগবে, আসলে মজিদ চরিত্রটি কোন বাস্তবতাকে নির্দেশ করছে? উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় এ কোন মজিদকে আমরা দেখতে পাই। এ কি সত্য-মিথ্যার চরম দ্বন্দ্বে নিপতিত একজন ভেঙে খান খান হওয়া শেকড়ছিন্ন উদ্বাস্তু মজিদ, নাকি তথাকথিত লম্পট প্রতারক ধর্মব্যবসায়ী মজিদ? লেখক আসল মজিদকে আমাদের সামনে উন্মোচন করেছেন, 'মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরেও কী যেন একটা ওলটপালট হয়ে যাবার উপক্রম করে, একটা বিচিত্র জীবন আদিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ পায় তার চোখের সামনে, আর একটা সত্যের সীমানায় পৌঁছে জন্মবেদনার তীক্ষ্ণযন্ত্রণা অনুভব করে মনে মনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাল খেয়ে সে সামলে নেয় নিজেকে।' *লালসালু*।

একটি নির্মম প্রশ্ন এসে যায়। ওই জন্ম-বেদনার যন্ত্রণা আর সত্যের সীমানায় না হয় মজিদকে পৌঁছতে দেয় না সাতচল্লিশের প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তান, কিন্তু আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র কি দেয় জনগণকে সত্যের সীমানায় পৌঁছাতে? দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা তো মানুষকে কেবল বাইরেই উদ্বাস্তু করে থেমে থাকেনি, অন্তরের গভীরেও উন্মূল-উদ্বাস্তু করে রেখেছে।

তা হলে এবার আমাদের বোঝাপড়া হোক ওয়ালীউল্লাহ'র *একটি তুলসী গাছের কাহিনী* গল্পের সঙ্গে। ওই সাতচল্লিশ, একই সময়াধারে লেখা এই গল্প। ধর্ম পরিচয়ে খণ্ডিত বাংলার হিন্দু-মুসলমানের অভিযাত্রা। এ তো স্বপ্নের কাছে পৌঁছা নয়, মহাবিশ্বের কৃষ্ণ গহ্বরের দিকে অন্ধের ছুটে চলা। উদ্বাস্তু। শেকড়ছিন্ন। অনিশ্চিৎ যাত্রা। পেছনে পড়ে থাকে আজন্ম পরিচয়, মায়া-মমতার ভিটেবাড়ি আর সম্প্রদায়ের আইডেন্‌টিটি–*একটি তুলসী গাছ*। লেখক আমাদের বলেন নি কলকাতা থেকে ঢাকা শহরে (উল্লেখ নেই যদিও) আসা একদল মুসলমানের ফেলে আসা জায়নামাজ কিংবা পারিবারিক কোনো মসজিদের কথা। আমরা বুঝে নেবো, পাঠক হিসেবে এ আমাদের দায়। আরো আরো বুঝে নিব ধর্মের নামে সাতচল্লিশের উদ্বাস্তু আর অর্থনীতির নামে আজকের বাংলাদেশের এক কোটির উপর মানুষের উদ্বাস্তু হয়ে প্রবাসী হওয়ার মধ্যে কতটুকু পার্থক্য।

যে রাষ্ট্র তার জনগণের একটি অংশকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য ক্রীতদাস বানিয়ে রফতানি করে বিদেশে, সেই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে না বুঝলে ওয়ালীউল্লাহর উদ্বাস্তুদেরও জানা সম্ভব নয়। আরো জানা সম্ভব নয় এই নির্মম সত্যটি যে, ওই সাতচল্লিশ থেকেই এই উপমহাদেশে শুরু হয়েছে জাতিগত শুদ্ধিকরণ, বিতাড়ন, নিঃস্বকরণ, উন্মূলকরণ আর শ্রেণীশোষণের দ্বারা ভৃত্যকরণের মধ্য দিয়ে দেশান্তরকরণ। সাতচল্লিশ পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তাই একাত্তর-উত্তর বাংলাদেশের তফাতটা আর রইল কোথায়? নির্মম প্রশ্ন হচ্ছে একাত্তরের যুদ্ধটা কি বাঙালি করেছিল প্রবাসের উদ্বাস্তু জীবনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে গোলামী বরণের জন্য?

ওয়ালীউল্লাহ কী সংবাদ জানাচ্ছেন তুলসী গাছের গল্পে? 'সদর দরজায় মস্ত তালা, কিন্তু সামান্য পর্যবেক্ষণের পর বুঝতে পারে বাড়িতে জনমানব নাই এবং তার মালিক দেশপলাতক', উদ্ধৃতিটি দ্বিতীয়বার এই রচনায় স্মরণ করা হলো। কোন অপরাধে মালিক দেশপলাতক? ধর্মের প্রশ্নে। কোন অন্যায়ের কারণে স্বাধীন বাংলাদেশীর প্রবাস জীবন, জন্মভূমির নাগরিকত্ব বর্জন? দারিদ্র্যের দুঃখ আর মধ্যবিত্তের অলীক সুখ কল্পনা? তো, পার্থক্যটা কোথায়? তাই তো সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পরিত্যক্ত বাড়িটির গৃহকর্ত্রী উদ্বাস্তু রমণীর কথা জানাচ্ছেন, 'পরিত্যক্ত তুলসী গাছের তলে প্রতি সন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ দিতো। আকাশে যখন সন্ধ্যাতারা বলিষ্ঠ একাকিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, তখন ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরের নীরব রক্তাক্ত স্পর্শে একটা শান্ত-শীতল প্রদীপ জ্বলে উঠত প্রতিদিন।' সেই উদ্বাস্তু গৃহকর্ত্রী এখন কোথায়?

ওয়ালীউল্লাহ সম্ভাব্য ঠিকানা নির্ধারণ করেছেন, 'হয়তো আসানসোল, বৈদ্যবাটি, লিলুয়া বা হাওড়ায় রেলওয়ে-পট্টিতে সে মহিলা কোনো আত্মীয়ের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। ... অথবা মহিলাটি কোনো চলতি ট্রেনের জানালার পাশে যেন বসে। ... হয়তো তার যাত্রা এখনো শেষ হয় নাই। কিন্তু যেখানেই সে

থাকুক এবং তার যাত্রা এখনো শেষ হয়েছে কি হয় নাই, আকাশে যখন দিনান্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন প্রতিদিন এ তুলসী তলার কথা মনে হয় বলে তার চোখ হয়তো ছলছল করে ওঠে।'

উদ্বাস্তু জীবনের এমন মর্মস্পর্শী বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে কোন, উপমহাদেশের অন্য কোনো ভাষার সাহিত্যে দ্বিতীয়টি নেই। আমরা যেন ভুল না করি। ওয়ালীউল্লাহ'র ওই তুলসী গাছ কিন্তু কোনো ধর্মীয় নিদর্শন নয়, বরং প্রতীকের আড়ালে বিশ্ব উদ্বাস্তুদের ছিন্নভিন্ন অস্তিত্বের ঠিকানা। পরিষ্কার হবে গল্পটির শেষাংশে পৌঁছলে। স্পষ্ট দেখা যাবে পাকিস্তানী পুলিশ কলকাতা থেকে বিতাড়িত একদল স্বধর্মীকে ওই পরিত্যক্ত বাড়ির আশ্রয় থেকে উচ্ছেদ করে দিচ্ছে। লেখক জানাচ্ছেন, 'সে দিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়েনি। কেন পড়েনি সে কথা তুলসী গাছের জানবার কথা নয়, মানুষেরই জানবার কথা।' ওই যে জানবার কথা যে মানুষগুলোর, তাদের পরিচয় কী?

এর উত্তর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ দেননি। সে দায়ও তার নয়। কেননা সেই মানুষগুলোর আড়ালে বসে আছে যে দুর্বৃত্ত রাজনীতি, বর্বর রাষ্ট্রব্যবস্থা তাকে আমরা জানি। ওয়ালীউল্লাহ'র উদ্বাস্তু পুরাণের কাব্যকথার অন্তর্তলে স্পর্শ করার ক্ষমতা না থাকলে সেই রাষ্ট্র আর মানুষকে জানা যাবে না। এতদিন আমরা *লালসালু* উপন্যাসকে যে ধর্মব্যবসায়ের কাব্য হিসেবে জেনেছি এবং *একটি তুলসী গাছের কাহিনী*কে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী বা দেশ ভাঙার গল্পের ডগ্‌মার ভেতর জেনেছি, সেই প্রপঞ্চ থেকে মুক্তি না পেলে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র উদ্বাস্তুদের শনাক্ত করতে কেবল ব্যর্থই হব।

কৃষ্ণপক্ষে তারুণ্যের সাহিত্য

তরুণের সৃষ্টি বা সৃষ্টিশীলতা নিয়ে কথা বলার পূর্বে চিন্তায় ধারণ করতে হবে তাদের সমকালকে। কোন ধরনের রাষ্ট্র-সমাজ-কালে ওরা সৃষ্টিকাজে মগ্ন, এ বিবেচনা যাদের নেই তাদের কোনো অধিকারও নেই তরুণদের সাহিত্য নিয়ে কোনো মন্তব্য করার। যেসব প্রবীণ সাহিত্য ব্যাখ্যাকার এ বিষয়ে কথা বলতে আগ্রহী তাদের অবশ্যই চলমান সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং বিশ্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিতে হবে এবং পরে তরুণদের নিন্দা কিংবা প্রশংসার বিষয়ে মুখ খুলতে হবে। তারুণ্য এবং মনোবিজ্ঞানটাও বাদ দেয়া যাবে কি? এতে তারুণ্যের প্রবণতা ধরা যায়।

আমরা প্রথমেই তাকাতে পারি চলমান সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে। উত্তর-উপনিবেশ অথচ নয়া সাম্রাজ্যবাদী বা সম্প্রসারণবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার অধীন এই ব্যাংলাদেশ। অবশ্যই এটি জটিল রাজনৈতিক বাস্তবতা। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-নজরুলেরা ছিলেন উপনিবেশ রাষ্ট্রের অধীন। আকাঙ্ক্ষা ছিল একদিকে স্বাধীনতা, অন্যদিকে মনুষ্যত্বের বিকাশ। অবশ্য ক্ষীণ কণ্ঠ ছিল সমাজবাদেরও। তাঁদের সাহিত্য সেসব ধারণ করেছে। বিস্ময়কর এই, যা ভাবা যায় না, আধুনিক সময়ে আধুনিক রাষ্ট্রকে জন্ম দিতে হয় ধর্মান্ধ-মৌলবাদ, জাতিবিদ্বেষের অপকৌশলে। হ্যাঁ, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের কথা। বলা হলো এই কারণে যে, আজকের বাংলাদেশের কবি, লেখক-শিল্পীর শিল্প-জেনেটিক ধারা সেখান থেকেই বাহিত। '৪৭-এর কবি-লেখকদের বড় অংশটিই মহা ঘোরে আচ্ছন্ন ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের। '৫২-র ভাষা আন্দোলনও দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, সেই আচ্ছন্নতা মুক্তির স্পষ্ট লক্ষণ তুলে ধরতে পারল না।

বরং বলতে হয় '৭০-৭১ কিংবা '৬৯-এর নতুন সাহিত্যের উদ্বোধন ঘটে একদল তরুণের হাতে। বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকে আসে নবচেতনা। এই সময়াধারে কেন এমনটা ঘটলো? এটা কি কোনো দৈব ঘটনা? নিশ্চয়ই নয়।

বরং ঘটলো এই কারণে যে, তখন জনগণের কামনা-বাসনা ছিল মুক্তি, গণতন্ত্র আর সমাজবাদের তীব্র ব্যাকুলতা। তরুণেরা লিখল নতুন কবিতা, নয়া গদ্যরীতির গল্প আর উপন্যাস। বরাবরই অগ্রগামী ছিল কবিতা। কবিতার ভেতর দিয়ে মানুষের মুক্তি আর মনুষ্যত্বের নতুন ব্যাখ্যাকে তুলে ধরলো তরুণেরা। এমনকি স্বাধীনতা-উত্তর জনমানসে হতাশা আর দুর্ভিক্ষও কবিতায় নতুন রূপ পেল।

এ অবস্থা বদলাতে বা দুর্বিপাক ঘনিয়ে আসতে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। একাত্তর-পরবর্তী মাত্র ক'বছর পরেই রাষ্ট্র তার নগ্ন রূপ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো মুক্তিপ্রত্যাশী জনগণের ওপর। নবরূপে ফিরে এলো বাংলাদেশি মডেলে পাকিস্তানি সামরিক স্বৈরাচার। ওই যে কৃষ্ণ গহ্বরে ঢুকে গেল রাষ্ট্র, আজো সে সেখানেই তলিয়ে আছে গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে।

হিজবুল বাহারের প্রমোদ বিহার, রাজার কাব্যপ্রীতি, আদর্শ বর্জিত বুদ্ধিজীবী নিয়ে নবরত্ন সভা হচ্ছে তারুণ্যের মগজ ধোলাইয়ের কারখানা। গ্রাম থেকে নগরে আসা তরুণ, নাগরিক আধা গ্রাম্য তরুণের কাঁচা আবেগকে বিপথগামী করা হলো। মগজে বাসা বাঁধল ক্রীতদাস। আনন্দ-বিনোদন মানেই ইয়ার্কি, ফাজলামো, স্থূলতা, সাহিত্যকে করা হলো বিনোদনের পণ্য। কবিতায় আমদানি করা হলো যৌনতা, খ্যাতিমান ভাষাবিজ্ঞানী বলে কথিত অধ্যাপকও কবিতা লেখার চেষ্টায় নেমে লিখে ফেলে যৌন সীৎকারের ধ্বনি– ওহ্ আহ্! এই যদি হয় অধ্যাপক গুরুর কাব্যালঙ্কার, শব্দালঙ্কার ধ্বনির ব্যঞ্জনা, তবে কবি হতে চাওয়া ছাত্র-শিষ্য যাবে কোথায়? শরীরী প্রেম, হতাশা, ব্যক্তিক জটিল মনের অলিতে গলিতে কবিতা অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

জীবনানন্দের বিষণ্ণতা মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ে কবিতায়। কবিতার নাম নিয়ে বাণিজ্যিক শব্দ পণ্য আসে কলকাতা থেকে। খাদ্য কি অখাদ্য গোগ্রাসে গেলে তরুণেরা। এসব নৈরাজ্যের ভেতর কবি ছাড়া কবিতার প্রকৃত পাঠক আর মেলে না। তরুণেরা গল্প লিখতে চায় না, লিখে ফেলে উপন্যাস (?)। জানাজানি পড়েই থাকে গল্প আর উপন্যাসের শিল্প বিচার। বাজারে বিকোয় বেশ। সেসব আবার দেদারসে নাটক (?) হয়ে টিভির পর্দায় ঢুকে যায়। সীমা লঙ্ঘন হয় শিল্পের। সত্তরের শেষের দিকে এসেই কথাসাহিত্যের মহাপচন ধরে। সেদিন যারা নবীন ছিল তারা এখন প্রবীণ। নবীনদের সঙ্গে মিডিয়ায় তাদেরও মহাদাপট। এই বিনোদন সাহিত্য সর্বনাশ করে দিয়েছে জাতীয় সাহিত্যের। সাহিত্য আজ কেবল পণ্য নয়, সস্তা নিকৃষ্ট পণ্য মাত্র।

শহরের উচ্চবিত্ত পরিবারের টিভিতে বাংলা চ্যানেল নিষিদ্ধ। ওরা ওসব চ্যানেলের নাম শোনেনি। ওদের বিনোদন অন্য ভাষার চ্যানেলে। কিন্তু বড় অংশের চ্যানেল যে বাংলাভাষার নাটক, গান প্রচার করে তা কোনো শিল্পপদবাচ্য নয়। বাঙালি শ্রোতাদর্শক যে কতটা স্থূল আর মেধাশূন্য তার প্রমাণ এসবের জনপ্রিয়তা। এই জাতিকে মেধাশূন্য করার পরিকল্পনা।

জনগণকে ইতরপ্রাণীতে পরিণত করার প্রচেষ্টা, তরুণ সাহিত্যিকদের অবাস্তব জীবন বিলাসী বানানোর যে ষড়যন্ত্র, তা বোঝা যায় 'তারকা' লেখকদের জীবনাচরণ দেখেই। যেন ওরা দায় নিয়েছে দুঃখী মানুষকে হাসাবার।

সাহিত্যের এই যে ভয়ঙ্কর বাস্তবতা তার বাইরে রয়েছে আর একটি শক্তি। এই তারুণ্য সত্যি অর্থে সাহিত্য নিবেদিত প্রাণ। ওরা সংখ্যায় অল্প, গাঁজার কলকেতে কবিতা পোড়ায় না। সচেতন পাঠকমাত্রই জানেন, এসব তরুণকে মিডিয়া পাত্তা দেয় না। ওদের সাহিত্যের গডফাদার নেই। আমি একজন পাঠক হিসেবে লিটল ম্যাগাজিন, দৈনিক, সাপ্তাহিকগুলো নিয়মিত পাঠ করি। এমন কিছু কবিতা (বেশিরভাগ) গল্প পেয়ে যাই হঠাৎ হঠাৎ, রীতিমতো চমকে উঠি। ভাবি, এই দুঃসময়ে, নষ্ট রাষ্ট্র-সমাজে কী করে ওরা এমন লেখাটি লিখল? আক্ষেপের বিষয় এই যে, এমন তরুণদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও সফল হইনি। আমি তাদের খুঁজি এ কারণেই যে, ওরা যেন পথভ্রষ্ট না হয় সে বিষয়ে সতর্ক করে দিতে। দেখা হলে বলতাম, কোনো গোস্বামী, গঙ্গোপাধ্যায় নয়, তোমার কাব্যের শিক্ষক মিশে আছে দেশের জল-কাদা-ধুলোর মাটিতে।

এই কৃষ্ণপক্ষেও আমি হতাশ নই। হতে পারে মানুষের চেয়ে কীটপতঙ্গের সংখ্যা অধিক; কিন্তু রাজদণ্ড তো মানুষেরই হাতে। অসাহিত্য স্থূল চেতনার অর্ধমানব অর্ধজীবের খাদ্য মাত্র, প্রকৃত সাহিত্যই সভ্যতার অহঙ্কার। সেই অহঙ্কারের ঈশ্বর হচ্ছে সেই তরুণেরা, যারা সাহিত্যকে পণ্য বানাতে রাজি নয়। মিডিয়ার পদতলে যাদের মাথানত হয় না, বরং পদাঘাতই করতে জানে।

-৮ অক্টোবর-২০১০

বাংলা তারিখের অন্তর্ধান

কষ্টদায়ক কিংবা সহনশীল যাই হোক, একথা চরম সত্য যে, বাঙালির জীবন থেকে বাংলা সাল বা তারিখ আজ বিলুপ্ত প্রায়। শ্রেণী হিসেবে গ্রাম্য কৃষক কৃষি-মওসুমের প্রয়োজনে হয়তো এখনো স্মৃতি, শ্রুতি এবং স্মরণে এর কিছুটা ধারণ করে আছে। নগর, উপনগর কিংবা আধানগর জীবনে বাংলা সাল-তারিখ যেন আজ আর জীবন সংস্রব নয়। বন্যা এলে শ্রাবণ, শীত এলে পৌষ, গরমকালে জ্যৈষ্ঠ মাসের কথা কারো কারো মনে পড়ে। আশ্চর্য বটে, মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া বাঙালির চলে না, কিন্তু সাল-তারিখ ছাড়া বেশ চলে। ধর্মীয় আচরণিক বিষয়গুলো বিবেচনায় আনলে কী পাওয়া যায়? রমজান, ঈদ ইত্যাদির তারিখগুলো আরবি সন বা তারিখ ধরে এলেও সরকারি, বেসরকারি হিসাবটা আসে ইংরেজিতে। তেমনি পূজা-পার্বণও তাই। চন্দ্র বা গ্রহের হিসাব, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব কালটা বাংলায় স্থান পায় না বা মানায় না। আধুনিক কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা তো তাদের জন্মের বাংলা সন-তারিখ ভুলেই গেছেন। সরকারি বা পারিবারিক ঠিকুঁজি কিংবা নির্দেশিকায় তো আছে কেবল ইংরেজি সালের কথা।

৮ ই ফাল্গুনের বদলে ২১ শে ফেব্রুয়ারি কিংবা ২৫ শে মার্চ অথবা ১৬ ডিসেম্বর নামের তারিখগুলোর সঙ্গে তো জড়িয়ে আছে বাঙালির রক্তাক্ত ইতিহাসের শিরা, তো তারিখটা বাংলা হলো না কেন? কবি-লেখকরা তাঁদের ছাপা বইয়ের ইনারে কি বাংলা সন-তারিখ লেখেন? কী করে যে পহেলা বৈশাখ নামের তারিখটা টিকে রইল সে এক বিস্ময়। যদিও 'নববর্ষ' নামের শব্দের আঘাতে 'পহেলা বৈশাখ' শব্দের উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া যদি এখন প্রশ্ন করা যায়, বাঙালির কি নির্ভেজাল 'নববর্ষ' আছে? নিশ্চয়ই নাই। যা আছে তার নাম 'বাংলা নববর্ষ'। ইংরেজরা কী বলে 'ইংলিশ হেপী নিউ ইয়ার?' বলে না। ওরা বলে 'হেপী নিউ ইয়ার'। তবে বাঙালিরা নববর্ষের কাঁধে 'বাংলা' বসায় কেন?

বসায় এই কারণে যে, ওদের মগজে ইংরেজি নববর্ষ। তাই সুনির্দিষ্ট করতে নববর্ষের পূর্বে 'বাংলা' লাগাতে হয়।

এই যে বিপর্যয় বাংলা সন-তারিখের, তার মূলে রয়েছে বাঙালির দাসত্ব-মন বা উপনিবেশিক আনুগত্যের ধারা। কেবল ইংরেজ উপনিবেশের দোষ ধরি কেন, ওই যে আর্য্য-ব্রাহ্মণ্যবাদ আর ইরান-তুরানী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন কি বাঙালির বিশৃঙ্খল মানস গঠনের জন্য কম দায়ী? ধর্মীয় সংস্কৃতির হাত ধরে এসেছে বিদেশির ভাষা এবং সন-তারিখ। সমন্বয়ের উপকার যতটা হয়েছে সামঞ্জস্য শূন্য বিরুদ্ধবাদও অপকার এতটাই করেছে। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক আর সাংস্কৃতিক ইতিহাস-ভূগোল নির্ণয়কারীরা তো মোটা মোটা যুক্তিতর্কের বই লিখে সমন্বয়-সৃষ্টির মহাকীর্তন করে গেছেন, বাঙালি কী কী হারালো তার হিসাবটা করলেন না।

ওই যে ঔপনিবেশিক মানসের কথা বলা হলো, বেশিরভাগ বাঙালির বিশ্বাস, ওটাই বুঝি আধুনিকতা। বাঙালি আধুনিকতা বোঝে না, বোঝে কেবল ইউরোপীয় আধুনিকতার বাইরের রূপটা। এতেই চোখ ধাঁধায় ডুবে যায়। ভাষা হচ্ছে কাল নিরপেক্ষ। এর আবার আধুনিকতা কী? কিন্তু বাঙালির কাছে ইংরেজি মানেই আধুনিকতা। পত্র লিখবে বাংলায়, তারিখটা থাকে ইংরেজিতে। ইদানীং বিয়ে, আকিকা এমন কি ঈদ কার্ডও ইংরেজিতে চলছে। কেবল দু'একটা বর্ণ আরবি নমুনায় লেখা বা আঁকা।

আমরা এতদিন জেনে এসেছি বাংলার কৃষি ব্যবস্থা বাংলা সন নির্ভর। কথাটা আজো সত্য হলেও অচিরেই তা উধাও হয়ে যাবে। উচ্চ ফলনশীল ধান এবং অপরাপর খাদ্যশস্য বাংলা সন নির্ভর নয়। তাছাড়া উন্নত চাষ অর্থাৎ কৃষিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ বাংলা কৃষিবর্ষকে পাল্টে দিয়েছে। ওই যে অঘ্রাণে নবান্ন, সেই যুগ বাসি হয়ে গেছে। শরৎ-হেমন্তই আজ আর ফসল তোলার মৌসুম নয়, বারো মাস ফসল পাকে। সে কারণেই খনার বচনের কৃষি কথায় আজ আর কান দেয় না কৃষক। বাংলা মাসের নামে ধানের হাল কি? নবীন কৃষকরা তার নামই উচ্চারণ করে না। আগনি ধান, ভাদ্দরি ধান, আষাঢ়ি ধান, কার্তিশাইল কিংবা শীতাল ফসল, চৈতী ফসলেরা গেল কোথায়?

বাংলা সন তারিখ তো বাঙালির জীবনের সঙ্গে জড়াজড়ি করেই ছিল। আজ সরকারি বেসরকারি কৃষি উন্নয়ন বিভাগ তো ইংরেজি মাস ধরেই ফসল চাষের ব্যাখ্যা দেয়। নাগরিক পত্র-পত্রিকাগুলো প্রতি সপ্তাহেই কৃষির উপর আলাদা পাতা ছাপিয়ে কৃষকদের অছিয়ত করে। এসব খবর কৃষকেরা জানে না। কেননা সংবাদপত্রের সঙ্গে তাদের যোগাযোগই নেই। অমুক কৃষক অমুন ফসলের চাষ করে বিপ্লবসাধন করেছে– এহেন বিপ্লবের খবর স্থানীয় সাংবাদিকরা ছবি সমেত পত্রিকায় ছাপিয়ে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করে মাত্র। ইসলামী নয়, কমিউনিস্ট নয়, এসব বিপ্লবের খবর শুনে কৃষকেরা

ক্ষণকালের জন্য কৌতূহলি হয়ে হয়তো জানতে চায়, আজকের বাংলা মাসের কয় তারিখ কিংবা পরের মাস আসতে আর কদ্দিন বাকি। কেন না কৃষকেরা আজ জানে না, সাংবাদিকও জানে না বাংলা মাসের হিসাব।

অপ্রিয় সত্য কথাটি এই যে বাংলা তারিখও আজ শ্রেণী বিভক্তির শিকার। গ্রামীণ কৃষক শ্রেণী আর নগরের গ্রাম্যজীবনের স্মৃতি বহনকারী প্রবীণেরাই বাংলা তারিখের খোঁজ-খবর রাখে। গ্রামের অকৃষিজীবী পরিবার, কৃষক পরিবারের স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থী, পরিবার পরিকল্পনা কর্মী, গ্রাম্য রাজস্বকর্মীরাও বাংলা তারিখের হিসাব রাখে না। কেননা তাদের অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে বাংলা তারিখের কোনো সম্পর্ক নেই। তা হলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে অর্থনীতির ইংরেজি গতিই বাংলা সাল-তারিখের মূল প্রতিবন্ধক। তাছাড়া রয়েছে শিক্ষা। গ্রামের একটি শিশুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জন শুরু হয় বাংলা সন-তারিখ পরিত্যাগের মধ্য দিয়ে। তার শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় ইংরেজি পঞ্জিকানুসারে। বিষয়টি গভীরভাবে ভাবনার। অথচ এ নিয়ে কেউ ভাবে না। মাতৃভাষা চর্চার গালভরা কথায় কেবল দিন যায়। সবচেয়ে বিস্ময়কর এই যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব, বিকাশ এবং তার চূড়ান্ত রূপ যে মুক্তিযুদ্ধ, তার মাইল ফলকের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোও নির্ধারিত হয়েছে, চিহ্নিত হয়েছে বাংলার বদলে ইংরেজি সন-তারিখ দিয়ে।

আসলে আমাদের মূল সমস্যাই হচ্ছে ঔপনিবেশিক অধীনতামূলক মানসিকতা। জানা-অজানায় আমরা রক্তে বহন করছি সেই দাসত্বের ঐতিহ্য। বারবার আমাদের স্বাধীন হতে হয়েছে। সেই স্বাধীনতার জন্য ভাঙতে হয়েছে দেশ। মানব সম্পদ এবং অর্থনৈতিক সম্পদের অশেষ ক্ষতিসাধন করতে হয়েছে। কিন্তু মুক্তি থেকেছে প্রতিবারই ধরাছোঁয়ার বাইরে। জাতি হিসেবে অনেক অর্জন আছে আমাদের। কিন্তু সব অর্জন থেকে যায় দূরে। ওই যে চিন্তার মুক্তি, তা কেবল কথায় আছে, আসে না মুক্তবুদ্ধি চর্চার প্রবল ঢেউ। দু'পা এগিয়ে চার পা পিছিয়ে যাওয়া আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। এক ধরনের অন্ধ প্রভুত্ববাদ বাস করে আমাদের চেতনায়। একে অন্যকে ছাড়িয়ে বড় হতে চাই আমরা। বিচ্ছিন্ন হতে চাই। স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করতে চাই। এবং ভাষার অস্ত্র হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে চাই ইংরেজিকে।

আজো আমাদের বিশ্বাসে ইংরেজি হচ্ছে রাজভাষা। এদেশের মানুষ বিশ্বাস করে খ্যাতি, অর্থ-বিত্ত, জ্ঞানচর্চা সবই ইংরেজি নির্ভর। ইংরেজের প্রত্যক্ষ প্রভুত্ব নিঃশেষ হলেও ইংরেজির পরোক্ষ প্রভুত্বটা দিন দিন আরো বৃদ্দি পাচ্ছে বৈকি! তেমনি দাস মনোভাবেরও বিস্তার ঘটেছে শহর ছাড়িয়ে গ্রাম পর্যন্ত। এই পর্যায়ে বাঙালিত্বটা টিকবে কেমন করে? পয়লা জানুয়ারি বা ইংরেজি নববর্ষে অভিজাত বাঙালি যতটা উত্তেজিত হয়, ততটা কি ঘটে পহেলা বৈশাখে? বাংলা নববর্ষকে আবাহন করতে কোনো রাত ১২ টা ০১ মিনিটে তরুণ-তরুণীর উদ্দাম মিছিল বের হয় রাজপথে?

ইতিহাসের চেয়ে আমরা বেশি আস্থা পাই ঐতিহাসিক মীথের পেছনে ছুটতে। বাংলা নববর্ষ কিংবা পয়লা বৈশাখ সম্পর্কে কত মীথ, কত নস্টালজিয়া ছড়িয়ে পড়ে ওদিনের প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা আর নানা মিডিয়ায়। যেন এক রূপকথার রাজ্য হারিয়ে ফেলেছি আমরা। আমাদের অতীত বংশধরেরা এই করত, সেই করত, কত না কি। বাংলা নববর্ষ বরণ ছিল যেন এক মহাভারতের মহাকাণ্ড। আসলে কি তাই ছিল? বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস প্রমাণ দেয় চিরদারিদ্র্যের এই দেশে বাংলা নববর্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষের জীবনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়া কিছুই দিতে পারেনি। যা কিছু আয়োজন তা পারিবারিক সীমার ভেতর, সামাজিক নয়। জমিদার, জোতদার শ্রেণী এর ভোক্তা। গ্রাম্যমেলার রূপটা ধরা পড়ে কবি জসীম উদ্‌দীনের কাব্যে। তাছাড়া লোক কবিদের ছাড়া-গানে-পালায় তো এর শত শত প্রমাণ মেলে। জমিদারের বকেয়া খাজনা দিয়ে পুণ্য অর্জনের তথাকথিত 'পুন্যাহ' নামক যে উৎসব তা তো দরিদ্র প্রজার কষ্ট জাগানিয়া দিবস ছাড়া কিছু নয়। ব্যবসায়ীর 'হালখাতা' দিবস তো বকেয়া আর 'ঋণের দানবের অট্টহাসি'। বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য দূর ইতিহাসে যেতে হয় না। বাংলাদেশের এমন একটি গ্রাম বেছে নিন যে গ্রামে নাগরিক আধুনিকতা ঢুকেনি। কী দেখতে পাবেন পয়লা বৈশাখে? নীরব, নিস্তব্ধতা, তরঙ্গশূন্য, বৈচিত্র্যহীনতার সরব উপস্থিতি। একথা বলা যাবে না, আধুনিকতা সব বাঙালিত্ব লুটে নিয়েছে। বরং ওসব গ্রামে শুনতে পাবেন কেবল আক্ষেপ। বছরের একটা দিন কোনো আয়োজন করা গেল না বলে। এই আক্ষেপের ইতিহাস দীর্ঘ। বংশপরম্পরায়। তবে সোনার বাংলাটা ছিল কবে? আসলে বাঙালির সব দিবসই শ্রেণীভিত্তিক। সার্বজনীন নয়। সার্বজনীন শব্দটা আরোপিত।

আজ নববর্ষে বাংলাদেশে নাগরিক ফুর্তি-বিনোদনে পরিণত হয়েছে এর চিরকালীন আবেদনকে পেছনে ঠেলে। এর পেছনের দার্শনিকতা, সমাজতাত্ত্বিকতা আর আত্মজিজ্ঞাসার বিষয়গুলো বহুদূরে হারিয়ে গেছে। যেসব নগরবাসী নববর্ষে পান্তা খায়, গান গায়, নাচে তারাও পয়লা বৈশাখের তারিখটি খুঁজে নেয় পত্র-পত্রিকা কিংবা ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে। নিজের স্মৃতি ও শ্রুতিতে নেই। কেননা নগরে রাত পোহায় ইংরেজি তারিখ ধরে। দিন-মাস যায় ইংরেজি সেজে। বাংলা তারিখ বা মাসের সঠিক হিসেব না-জানাটা যেন গৌরবের, আভিজাত্যের বিষয়।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, কয়টা বাড়িতে বা অফিসে বাংলা ক্যালেন্ডার আছে? যাদুঘর ছাড়া তো বাংলা ক্যালেন্ডার খুঁজেই পাওয়া যায় না। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে ফুটপাতে ক্যালেন্ডারের ক্রয়-বিক্রয় জমে ওঠে। চৈত্র-বৈশাখে বাংলা ক্যালেন্ডারের বাজার জমে না কেন? ক্রেতা নেই বলে। নোট বই বা ডায়রিতে ইংরেজি তারিখের এক পাশে দীন হীন দরিদ্র দুর্বল যে বাংলা তারিখ পাওয়া যায়, তাও অনেকক্ষেত্রেই ভুল।

বাংলা তারিখ হারিয়ে গেছে। জীবনানন্দের কবিতার ভাষায় 'তারে আর খুঁজো না কো ধানসিঁড়ি নদীটির তীরে।' কিংবা ওই যে 'সুরঞ্জনা' নামের মেয়েটি, যে অন্য বালকের সঙ্গে কথা বলে 'কী কথা তাহার সনে?' আমাদের বাংলা তারিখ সুরঞ্জনা আর নাই। খুঁজে কী লাভ তাকে? সে হারিয়ে গেছে। পর হয়ে গেছে।

স্বাধীনতার দুর্ভোগ

কথাটি চমকে ওঠার মতো। অথচ এটিই বাস্তব সত্য। বিশ্ব ইতিহাস তার রক্তাক্ত পৃষ্ঠায় এটা লিপিবদ্ধ করেছে যে, যেখানে স্বাধীনতা যুদ্ধ, যেখানে বিজয়, পরবর্তীকালে সেখানেই নেমে এসেছে দুর্ভোগ। স্বাধীনতার ফসল হিসেবে যেমন স্বাধীনতা-উত্তর দুর্বৃত্ত-দুশ্চরিত্র একটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, তেমনি মগজশূন্য মানুষের প্রাদুর্ভাব ঘটতে থাকে। বিশ্ব ইতিহাসের বাংলাদেশ এর অন্যতম অপকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। দেশটির হাজার বছরের ইতিহাস খুব যে গৌরবের, এমনটা দাবি করা যাবে না।

ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে শুভর চেয়ে অশুভের দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। বাঙালির সৃষ্টিশীলতাকে তাই বারবার তলিয়ে দেয় অপসৃষ্টি। যতটা সৃষ্টি করে সে, ধ্বংস করে তার চেয়ে বহুগুণ। এভাবে চলছে জাতিটির কাল থেকে কালান্তর যাত্রা। সেই অতীত থেকে দেখা গেছে যখনই বহির্শক্রর আক্রমণ কিংবা ষড়যন্ত্র চলেছে এদেশে, তখনই অতি সহজে ও সস্তায় বিশ্বাসঘাতক দালালও মিলে গেছে। তাই তার স্বাধীনতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, বিজয়ের ভেতর দিয়ে নীরব দাসত্ব বরণ করে নিয়েছে সে।

বাংলা-ভূমি দখলকারী ভারতবর্ষের অন্যপ্রান্তের শক্তিই হোক, বহিরাগত আরব-ইরান-আফগান বাহিনী হোক, চাই কি সাতসমুদ্দর তেরো নদীর ওপারের ইংরেজ-ওলন্দাজ-ফরাসি শক্তিই হোক, তাদের পক্ষ নিয়ে মাতৃভূমির বিরুদ্ধে দালালির লোকের অভাব ঘটেনি এই দেশে।

আজও দালালের অভাব নেই, বরং মাত্রাটা অধিক, পূর্বের তুলনায়। বাড়িয়ে বলতে গেলে দাঁড়ায়, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা কিংবা এশিয়ার যে দেশটি ঔপনিবেশিক অধীনতা ভেঙে স্বাধীন হয়েছে, সে দেশটিতে তৈরি করা হয়েছে দেশ ও গণবিরোধী দালাল শক্তি। যে কোনও দেশের তুলনায় সেই শ্রেণীটি বাংলাদেশেই সংখ্যায়, শক্তিতে এবং অপকৌশল প্রয়োগ ক্ষমতায় অধিক দক্ষ। আফ্রিকা বা লাতিন দেশগুলোতে পুরোনো প্রভুদের তৈরি করা

গৃহযুদ্ধ যতটা দেশগুলোর বারোটা বাজিয়েছে, গৃহযুদ্ধ ছাড়াই বাংলাদেশের গণবিরোধী দালালেরা চৌদ্দটা বাজিয়ে ছেড়েছে দেশের।

তলিয়ে দেখা যাক ইংরেজ যুগকে। যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি তৈরি হয়েছিল সেই সময়ে, তারাই ছিল আধুনিক জাতীয়তাবাদের ধারক। বিদেশি ইংরেজ শাসককে দেশ থেকে তাড়িয়ে স্বরাজ, স্বাধীনতা পেতে চায় তারা। তাই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি একটি দল রক্তাক্ত সশস্ত্র সংগ্রামের পথে দেশ স্বাধীন করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেদিন।

কূটচালের বঙ্গভঙ্গ এবং মহাকূটচালের বঙ্গভঙ্গ রদ করার ভেতর দিয়ে গোপনে যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হয় অচিরেই তার ফল ফলতে থাকে। বাঙালি হয়ে যায় 'হিন্দু' আর 'মুসলমান'। এরই ফলে হিন্দুরা অখণ্ড ভারতের স্বপ্নে হাতে তুলে নেয় অস্ত্র। ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা আর অবিশ্বাসের ভেতর দিয়েও মুসলমানেরা থাকলো নিষ্ক্রিয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন থেকে শুরু করে প্রতিটি বিদ্রোহে-সশস্ত্র লড়াইয়ে খুব কম মুসলমানকেই দেখা যায়। বরং তারা অখণ্ড ভারত স্বাধীনের চেয়ে দেশ ভাঙ্গার পাকিস্তান কায়েমের সঙ্গেই যুক্ত হয়।

সেখানে তাই শত্রু যার হওয়ার কথা ছিল সেই ইংরেজ শাসকের, তার বদলে শত্রু হয়ে যায় স্বদেশি হিন্দুরা। এভাবে ইংরেজ তার হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার সুযোগ তৈরি করে নেয়। দাঙ্গায় ইংরেজ শাসকের বদলে রক্তে ভাসে হিন্দু-মুসলমান। বাংলা বিভক্তির জন্য দাঙ্গাটা প্রয়োজন ছিল ইংরেজদের কাছে। বাঙালির স্বাধীনতার প্রত্যাশা দখলের জন্য আরও প্রয়োজন ছিল ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে সরিয়ে নেওয়া। তাই তো তারা বাঙালি সুভাষ বসুকে ক্ষমা করেনি।

আজও জাতিসংঘের যুদ্ধাপরাধীর তালিকায় সুভাষের নাম রয়েছে মোস্ট ওয়ান্টেড ব্যক্তি হিসেবে। অপর প্রান্তে পশ্চিমবঙ্গের তিতুমীরের কথা ভোলেনি ইংরেজ। ভোলেনি তার সমর্থকদের ইংরেজ বিরোধিতার কথা, সশস্ত্র লড়াইয়ের কথা। তাই হিন্দু আর মুসলমান বাঙালিকে চিরদিনের জন্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইংরেজরা ভাগ করে দিল বাংলা।

যে হিন্দু-মুসলমান পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজ বিতাড়নে অংশ নেয়, এমন অবস্থা সৃষ্টি করা হয় যে, তারা অনেকেই নিজেদের মাতৃভূমিতে চিরস্থায়ী বসবাসের অধিকার পর্যন্ত হারায়। ইংরেজের মনোভাবটা এমন যে, রাখ, দেখাচ্ছি মজা, আমাদের তাড়াচ্ছিস, আমরাই তোদেরকে দেশছাড়া করে ছাড়ব! জয় হলো ইংরেজের ইচ্ছারই। ভাঙা দেশ নিয়ে হিন্দু-মুসলমান পেটে ঢুকে গেল হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান নামক দুই রাক্ষসের। দাঙ্গা আর উদ্বাস্তুর অভিশাপ ওই যে শুরু, আজও তার শেষ নেই।

একই ভাগ্যবরণ করতে হয় পাঞ্জাবি আর পাঠানদের। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে লড়েছিল এই দুই জনগোষ্ঠী। তারই ফল রক্তাক্ত পাঞ্জাব আর দ্বিখণ্ডিত

পাঞ্জাব। আর স্বাধীনচেতা পাঠানেরা? গোলাম হয়ে গেল পাকিস্তানের। এই হলো ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের ফল। শেষ জীবনে এ নিয়ে বড় আক্ষেপ করে গেছেন পাঠান নেতা সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফফার খান।

আজও পাঠানদের মুক্তি নেই। ষড়যন্ত্র করে তালেবান বানিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া হয়েছে। তাই তাকিয়ে দেখা যাক বাংলায় হিন্দু-মুসলমান ইংরেজ-বিরোধী স্বাধীনতা যোদ্ধাদের অবস্থাটা কেমন। মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হতে কি হয়নি সূর্যসেনের বংশধরদের? মূলোচ্ছেদ ঘটে আজ কোথায় নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা আর তিতুমীরের বংশধরেরা? এই ছিল স্বাধীনতা পিপাসু বাঙালি জাতির কপালের দুর্ভোগ। স্বাধীনতার বদলে কেউ হলো ইসলামের গোলাম, কেউবা পুরাতনের বদলে নয়াদিল্লির সেবাদাস। ছিন্নমূল উদ্বাস্তু।

সেই দাসত্ব মুক্তির প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গ ঘুমিয়ে থাকলেও ১৯৭১-এ জেগে উঠেছিল পূর্ববঙ্গের মানুষ। প্রশ্ন উঠতে বাধ্য, পূর্ববঙ্গ জাগলেও পশ্চিম কেন জাগল না? পশ্চিমবঙ্গ জাগল না এ কারণে যে, ওরা গোড়া থেকেই গণতন্ত্র ভোগ করে, সামরিক স্বৈরাচার তাদের গ্রাস করেনি।

অন্যদিকে বিশাল ভারত ভূখণ্ডের তুলনায় ওরা অতিক্ষুদ্র অঞ্চলের বাসিন্দা, সংখ্যায় একশত দুই কোটির মধ্যে মাত্র নয় কোটি বাঙালি। ভৌগোলিক অবস্থাটাও ভাগাভাগির জন্য বড় জটিল। অথচ পূর্ববঙ্গে ভৌগোলিক অবস্থান, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনসংখ্যার হিসাব, ভাষার প্রভাব, সবই ছিল পূর্ববঙ্গবাসীর আলাদা রাষ্ট্র হওয়ার অনুকূলে। তারা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারও করল। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে হলো লিপ্ত। যদিও বাঙালির যুদ্ধটা সামনা-সামনি ছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, কিন্তু পরোক্ষ শত্রু ছিল সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা। আমেরিকার ইচ্ছার বাইরে পূর্ববঙ্গের জনগণ হাতে তুলে নিয়েছিল অস্ত্র। ৭ম নৌবহর পাঠিয়েও দমন করা গেল না তাদের। পারল না আমেরিকা। প্রকৃত অর্থে সেদিন বাঙালির বিজয়টা কেবল পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই ছিল না, ছিল মার্কিনের বিরুদ্ধেও।

আমেরিকার বিরুদ্ধে বাঙালির এ বড় ক্ষমাহীন বেয়াদবি। ওরা ক্ষমা জানে না। অবাধ্যকে কীভাবে বাধ্য করতে হয় তারা তা জানে। জানে বলেই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আর সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ষড়যন্ত্রের পথে মাত্র তিনবছর বাদেই পঁচাত্তর সালে বাঙালির স্বাধীনতার স্বাদ কেড়ে নেয়। পাকিস্তানপন্থীদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার ভেতর দিয়ে সেদিন সাম্রাজ্যবাদ প্রতিশোধ নিল অবাধ্য বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে।

সেই যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সব বাঙালি কি জানত তাদের এ যুদ্ধ কেবল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয়, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও? বামেরা জানলেও তৎকালের শাসকেরা তা জানত না, বা জানলেও মানতে রাজি ছিল না। তাই তো তাদের ভেতর থেকেই অতিদ্রুত তৈরি করা হলো একদল লুটেরাকে, তৈরি

করা হলো গণতন্ত্র অস্বীকারকারীদের। সৃষ্টি করা হলো মহাদুর্ভিক্ষ। চালের জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া হলো সাগরে। ব্যাপারটা এমন যে, স্বাধীনতা চেয়েছিস? নে স্বাধীনতা, পেট ভরে স্বাধীনতা খা।

ওই যে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধরা এবং পরবর্তীকালে তারই বিশ্বস্ত তাঁবেদার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, এ যেন বাঙালি জাতির এক পবিত্র মহাপাপ! ইংরেজি ভাষাভাষীরা চলে যায়, চলে যায় উর্দু-পসতু-পাঞ্জাবি ভাষাভাষীরা, কিন্তু দুর্গতি আর যায় না। বাঙালি তো ইংরেজ তাড়াতে পারে, পারে পাকিস্তানিদের হঠাতে, যাকে পারে না সেই শক্তির নাম সাম্রাজ্যবাদ আর ধর্মান্ধতা। পারবে কেমন করে? সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারেরা তো ইসলামাবাদ, ওয়াশিংটন আর লন্ডনে বসে নেই। ওরা আছে বাঙালির ঘরে ঘরে। ওদের ভাষা ইংরেজিও নয়, উর্দুও নয়, ওরা কথা বলে বাংলায়। প্রতিদিন ওরা জন্মে বাঙালির ঘরে ঘরে, আঁতুড় ঘরে। তাই তো অত্যাচারী হিন্দু জমিদার পালায়, শোষক উর্দুভাষী মুসলমানও হটে যায়, দুর্ভোগ তো ছাড়ে না জাতিটিকে। বারবার স্বাধীন হতে হয় জাতিটিকে, কিন্তু গণতন্ত্র হাতের নাগালে পায় না।

তাই আজ প্রশ্ন জাগে মনে, স্বাধীনতা অর্জন কি বাঙালির পাপ? তবে অনিঃশেষ এই প্রায়শ্চিত্ত করে যাওয়া কেন? আজ তো আর ধর্ষক-হত্যাকারী জমিদার নেই, আছে কি কুঠিয়াল-নীলকুঠির সাদা সাহেব? ১৯৪৭ সালে কিংবা ১৯৭১ সালে বাঙালি কি ভেবেছিল, বুঝতে পেরেছিল সংগ্রামে-যুদ্ধে শত্রুকে হারালেও বিজয় তার ঘটেনি? জানত কি বাঙালি জমিদার আর নীলকুঠিয়াল প্রতিদিন জন্ম নেবে তার নিজেরই ঘরে?

নিশ্চয়ই জানত না। জানবে কেমন করে? সাতচল্লিশে খেয়েছিল ধর্মের উন্মাদ বটিকা, একাত্তরে গিলেছিল উগ্র জাতীয়তাবাদের দাওয়াই। রোগ আর সারল না। তাই প্রশ্ন করতে হয়, একটি জাতি এই দুনিয়ার ইতিহাসে কয়বার স্বাধীন হয়? মাত্র একবার, একটিবার। অথচ বাঙালি স্বাধীন হলো দু'বার। একবার মুসলমান হিসেবে, অন্যবার বাঙালি হয়ে। এতো যে স্বাধীনতার স্পৃহা, এতো যে মুক্তির স্পৃহা, এতো যে মুক্তির কাঙাল, এতো যে উন্মাদ, পরিণামে পেল কী জাতিটা? গোলামীর দুর্দশা তো স্বাধীনতাও তাড়াতে পারল না।

বাঙালি কি জানে তার রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে গোপনে বহমান বেঈমান, ধর্ষক, হত্যাকারী, লুটেরা ইংরেজ আর পাকিস্তানি পাঞ্জাবির অপবিত্র বীজ-বিষ? তাই তো জাতিটির স্বাধীনতা যুদ্ধের রক্তের ভেতর দিয়েও উচ্ছেদ করা সম্ভব হয় না দুঃখ আর দুর্দিনকে। এটি তবে পরাজিত বিতাড়িত পরাধীনতার অভিশাপ? বাঙালি তো দৈবে বিশ্বাসী, অতিপ্রাকৃতে অবনত। তবে কি জাতিটির দুর্ভাগ্যের মূলে কাজ করছে গ্রিক ট্র্যাজেডির ইডিপাসের পূর্বনির্ধারিত অলঙ্ঘনীয় ভাগ্য? বাঙালি কি অজান্তে-অজ্ঞাতে ইডিপাসের মতো মাতৃ-ধর্ষক, মাতৃ-সম্ভোগকারী? কবে তা ঘটেছে? সেই সাতচল্লিশের মাতৃভূমির খণ্ডায়নের ভেতর দিয়ে কি?

শোনা যায়, স্বাধীনতা নাকি মানুষকে দেবত্ব দান করে। এটাও শুনেছি স্বাধীনতা নাকি মানুষকে সর্বোচ্চ মহিমায় উন্নীত করে ঈশ্বরের সমকক্ষ করে তোলে। অথচ সবকিছু মিথ্যা করে দিয়ে স্বাধীনতা আজ বাঙালিকে পশুস্তরে নামিয়ে এনেছে। পশু তো পশুর মাংস খায়, পশুর প্রজনন-নৈতিক জ্ঞান নেই বলে আপন মায়ের গর্ভে সন্তান জন্ম দেয়।

বাঙালিকে স্বাধীনতা কি এসব দায়িত্বই তুলে দিয়েছে? তা না হলে এদেশে জন্মগ্রহণকারীর মুখে ইংরেজের বুলি কী করে উচ্চারিত হয়– সূর্যসেন সন্ত্রাসী? সুভাষ বসু ফ্যাসিস্ট হিটলারের অনুগামী? কী করে শেখ মুজিব হয়ে যান ইসলামের দুশমন? কী করে সিরাজ সিকদার হয়ে যান সন্ত্রাসী-খুনি? সবই তো ইংরেজের কণ্ঠস্বর, পাকিস্তানের আওয়াজ। তাই জিজ্ঞাসা জাগে মনে, তবে কি সবকিছুর মূলেই রয়েছে বাঙালির স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দুর্ভোগ? ভারতবর্ষ ভাঙার পাপ? পাকিস্তান ভাঙার গোনাহ্?

এতো কষ্ট, এতো ত্যাগ, এতো রক্তপাতের ভেতর দিয়ে যে জাতি নিজস্ব রাষ্ট্র পেল, সেই রাষ্ট্র কী করে ব্যর্থ আর অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়? কেন অর্থহীন হয়ে যায় স্বাধীনতা? কেন তামাশার বস্তুতে পরিণত হয় ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়? একাত্তরে সমুদ্রের চেয়েও অসীম ছিল যাদের দেশপ্রেম, তারা কি করে হয় দুর্নীতিবাজ জাতি? কারা এর পেছনে? বাঙালিকে আজ খুঁজে দেখতে হবে কারা এর মূলে। তাদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

ওরা টিকে থাকলে বাঙালির স্বাধীনতা শান্তির বদলে অশেষ দুঃখের বোঝা হয়েই টিকে থাকবে। কেন না স্বাধীনতার বোঝা তো পরাধীনতার বোঝার চেয়েও ভারি। স্বাধীনতার ব্যর্থতা তো পরাধীনতার গ্লানিময় রক্তক্ষরণের চেয়েও কষ্টদায়ক।

মাস্টারদার কংকাল

ইতিহাসের এমন কিছু ঘটনা আছে যা জানা থাকলেও জানতে ইচ্ছে করে, পড়া থাকলেও বারবার পড়তে ইচ্ছে করে। এমনি একটি ইতিহাস হচ্ছে মাস্টারদা সূর্য সেনের বিপ্লবী জীবন। এই ইতিহাস মনের গহীনে যে কৌতূহল আর রোমান্স জন্ম দেয় তার ব্যাখ্যা সহজ নয়। *মাতৃভূমিতে* শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রেম রঞ্জন দেবের লেখা *চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহ* রচনায় সেই পুরাতন কৌতূহল নিয়েই চোখ বুলাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনের ভেতর কে যেন চিৎকার দিয়ে ওঠে, মাস্টারদার কংকাল চাই। তো সেই কংকাল কোথায়? যতদূর জানা যায়, যদি ঘটনাটি সত্যি তাই ঘটে থাকে তবে সেই কংকাল বঙ্গোপসাগরের গহীন তলায়। সন্দেহ এই কারণে যে, স্বৈরাচার বা সাম্রাজ্যবাদী নিষ্ঠুর শাসকশ্রেণী সর্বদা কূটকৌশলে মিথ্যাকে সত্য বানায়, সত্যকে মিথ্যা। ইতিহাসের অনেক ঘটনারই সত্য চাপা পড়ে এবং তা নিয়ে কল্পকাহিনী বা মিথ তৈরি হয়। বাঙালিরা তো আবার মিথপ্রিয় জাতি। তারা ইতিহাসের সত্য ঘটনার চেয়ে মিথের জগতে বিচরণ করতে ভালোবাসে।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বিপ্লবী সূর্য সেনকে যদি সত্যি সত্যি ফাঁসি কার্যকরের পর সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয় তবে এমনটা ইংরেজরা করল কেন? প্রচণ্ড ঘৃণা থেকে? নাকি ভয় থেকে? ভয় হতে পারে, তার চিতাকে কেন্দ্র করে বিপ্লবী স্মৃতিসৌধ যেন গড়ে না ওঠে বাংলা বা ভারতের মাটিতে। নাকি সেই লাশ কোথাও গুম করে প্রচার চালিয়ে দেয়া হয় সমুদ্রে নিক্ষেপের কথা? কেন না স্বৈরাচার বা সাম্রাজ্যবাদীরা চিরকালই জীবন্ত বিপ্লবীর চেয়ে বেশি ভয় পায় বিপ্লবীর মরদেহকে। যেমনটা ঘটেছে সাম্যবাদ বর্জিত রাশিয়ায় লেনিনের সংরক্ষিত দেহ নিয়ে। ইয়েলৎসিনই নিজ হাতে তা অপসারণ করে দূরে কোথাও পুঁতে রাখত, যদি না বিষয়টি নিয়ে আবার কী অঘটন ঘটে যায়।

হ্যাঁ। এ মুহূর্তে আমার দাবি বিপ্লবী মাস্টারদার কংকাল চাই। ফিরিয়ে দাও সেই সিন্দুক যাতে করে তার মরদেহ নিক্ষেপ করা হয়েছিল সমুদ্রে। এটি

আমার স্বপ্ন বিলাস। বাস্তবে কোনো কালেই সম্ভব নয়। অথচ দাবিটা পাগলের প্রলাপ নয় এবং বিষয়টি যে একেবারেই অসম্ভব তাও নয়। এর জন্য অবশ্যই একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন তৎকালের সব দলিল পত্র। দলিলপত্র মেলানো কঠিন হলেও একেবারে অসম্ভব নয় ভারত বা ব্রিটিশ সরকার সহায়তা দিলে। তারপরও বিষয়টি যেমনি জটিল তেমনি ব্যয়বহুল। এর জন্য প্রয়োজন আধুনিক জ্ঞান এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি। এসব তো আর বাংলাদেশের নেই। রীতিমতো একটি অত্যাধুনিক নৌবাহিনী প্রয়োজন অনুসন্ধানের জন্য। উপকূল ভাগ থেকে সমুদ্রের কত নটিক্যাল মাইল দূরে মাস্টারদার লাশপূর্ণ সিন্দুকটি নিক্ষেপ করা হয়েছে তারও সঠিক দলিল প্রয়োজন। হয়তো তা আজো ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের মহাফেজখানায় রক্ষিত আছে। তারপর প্রয়োজন সমুদ্রের তলদেশে অনুসন্ধানের জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্র যা উন্নত বিশ্বের পুলিশ বাহিনীর হাতেই থাকে। হাজার বছর আগের নিদর্শন যদি সমুদ্রগর্ভ থেকে উদ্ধার করা যায় তবে এটি তো খুব বেশিদিন আগের ঘটনা নয়, ১৯৩৪ সালের।

আমরা স্থির বিশ্বাস রাখতে পারি, সেই সিন্দুক আজো অক্ষত রয়েছে অতল সমুদ্রে। আরো বিশ্বাস রাখতে পারি, মহান বিপ্লবীর দেহাবশেষ বা কংকালও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। হয়তো সেখানে বালির স্তর পড়েছে যা আধুনিক যন্ত্রের সহায়তায় খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষের উদ্ধার আমরা ছেড়েই দিলাম, প্রথম মহাযুদ্ধের বোমা বা বিমান এবং জাহাজের সন্ধান যদি মেলে, এটিও মিলতে বাধ্য। আজকের কৌতূহলী মানুষ সেই নূহ নবীর নৌকা বা কিসতির সন্ধানের আশা যদি করতে পারে, জেরুজালেমের মাটির তলায় যীশুর কবরের সন্ধান যদি আজো চলতে পারে তবে সূর্য সেনের কংকালের সন্ধান কালের বিচারে তো ওইদিন মাত্র। হাজার হাজার বছর আগের ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরের সন্ধান যদি করা যেতে পারে সমুদ্রগর্ভে, যদি মিলে যায় তৎকালের মানুষের ফসিলে রূপান্তরিত কংকাল তবে বাঙালির অগ্নিযুগের মহান পুরুষের কংকাল মিলবে না কেন? বিভ্রান্ত বাঙালিকে কোটি কোটি বছরের ডাইনোসরের ফসিল কৌতূহলী করে তুললেও সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত একটি লাশ যা কিনা আবার লোহার সিন্দুকে রক্ষিত তা নিয়ে আগ্রহ নেই। আমার আগ্রহ ওই সিন্দুকের কারণে। সিন্দুক তো আর হাঙরে গিলে ফেলতে পারে না। যা সহজে পারে তা হচ্ছে জাহাজ ডুবে যাওয়া লাশ বা সমুদ্রে ভেঙে পড়া বিমানের হতভাগ্য যাত্রীদের লাশ।

ভারতের সংবাদপত্রের একটি সংবাদ আমাকে চমকে দিয়েছিল। সংবাদটি ছিল পুরীর সমুদ্র তীরবর্তী প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি মন্দিরের সংস্কার কাজ করতে যেয়ে একটি অজ্ঞাতনামা নরকংকালের আবিষ্কার। কেউ কেউ দাবি করেছেন কংকালটি অন্য কারো নয়, শ্রী শ্রী চৈতন্য দেবের। কেবল দাবিই নয়, তারা চাইছিলেন ডিএনএ টেস্ট করা হোক। মহাফাঁপরে পড়ে গেল পাণ্ডা বাহিনী

এবং স্থানীয় প্রশাসন। সত্যি যদি এটি তাই হয়ে থাকে অর্থাৎ চৈতন্য দেবের কংকাল তবে মহাবিপদ ঘটে যাবে। এতোদিন একটি মহামিথ্যাকে যেভাবে গেলানো হয়েছে ভারতীয় সাধারণ জনতা এবং ধান্ধাবাজ বুদ্ধিজীবীদের তা প্রকাশ পেলে সর্বনাশ! আমার দুঃখ ও আফসোস, আজো বিপুলসংখ্যক কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ বিশ্বাস করে কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদ হয়ে মহাপ্রভু জ্যোৎস্না পড়া সমুদ্রের ঢেউয়ের ভেতর শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি দেখে আলিঙ্গন করতে যেয়ে সমুদ্রে ভেসে গেছেন। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় চৈতন্য দেবকে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পাণ্ডারা খুন করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছে। এমনও যুক্তি রয়েছে সেই লাশ সমুদ্র থেকে তুলে এনে সমাধিস্থ করা হয় মন্দির সংলগ্ন অজ্ঞাত কোনো স্থানে। তবে এ কথা চরম ও পরম সত্য যে শ্রীচৈতন্যকে কেবল হত্যাই নয়, নিষ্ঠুর নির্যাতন (লাঠি ও পাথরের আঘাত) করে খুন করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল দেহের সঙ্গে প্রেমধর্ম বা মানবীয় মতবাদকে মাটির পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি ঠিক সেই কৌশলটাই অনুসরণ করেছিল মাস্টারদার বেলায়।

সেই চরম রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সমাজের চোখে (যারা আজো পুরীর ধর্মমন্দির নিয়ন্ত্রণ করছে) কী অপরাধ ছিল শ্রী চৈতন্যের? ছিল, অনেক অপরাধ ছিল। চৈতন্য দেব বাঙালি, চৈতন্য দেব হিংসা-ঘৃণার উর্ধ্বে প্রেমকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ পাণ্ডাদের ধর্মের নামে অনাচার সহ্য করতেন না। হিন্দু-মুসলিম (যবন-হরিদাস) মুচি-চণ্ডালকে একসূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন। ধর্ম ব্যবসায়ী মন্দির ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পাণ্ডাদের উচ্ছেদ করে পুরীর মন্দিরকে সব শ্রেণীর মানুষের জন্য উন্মুক্ত করার প্রচেষ্টায় ছিলেন। সে যা হোক। ভারতীয় ধর্মীয় সমাজে আজো পাণ্ডাতন্ত্র চলছে। তা নাহলে ওই প্রাপ্ত কংকালটি প্রকৃত অর্থেই শ্রী চৈতন্য দেবের কিনা তা ফরেন্সিক পরীক্ষার ধারে কাছেও নিতে দেয়নি কেন তারা? কেননা সত্যি সত্যি যদি প্রমাণিত হয় কংকালটি শ্রী চৈতন্যের তবে এটাও প্রমাণ করা কঠিন হতো না, কী ধরনের নির্যাতনে তার মৃত্যু হয়েছে। আর তখনই ইতিহাসের মিথ্যা পাতাটা উড়ে যেত এবং ধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রকৃত চরিত্রও ফুটে উঠত।

ধারা যাক আমার কল্পনা সত্যি সত্যি বাস্তবে রূপ পেল একদিন। একদল বিদেশি সমুদ্র অনুসন্ধানী ১৯৩৪ সালে বিক্ষিপ্ত সিন্দুকটি উদ্ধার করেছেন বঙ্গোপসাগরের গভীরের ২০ ফুট বালির স্তরের নিচ থেকে। সেই সিন্দুকে পাওয়া গেল একটি কংকাল, যার ঘাড়ের হাড়টি ভাঙা (ফাঁসির কারণে)। বিদেশি বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করলেন, এই কংকাল বিপ্লবী মহানায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনের। তখন হিমালয় থেকে সুন্দরবন– কোটি বাঙালি পুনরায় গর্জনে কাঁপাবে পৃথিবী। তৈরি করতে হবে বিশাল স্মৃতিসৌধ সেই জালালাবাদ পাহাড়ের চূড়ায়। বাঙালির কংকাল নিয়ে প্রথম বিপ্লবী স্মৃতিসৌধ। না, এমনটা সহজে হবে না। রাজপথে নামবে মিছিল। প্রতিবাদ মিছিল। কেননা যার

কংকাল উদ্ধার করা হয়েছে সে একজন দস্যু, একজন খুনি, একজন বিধর্মী। তার কংকাল চট্টগ্রামের মাটিতে সমাহিত হতে দেয়া হবে না। পীর আওলিয়ার চট্টগ্রামের পবিত্র ভূমিকে নাপাক করা চলবে না। হায় রে স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পরপরই ৩০ লাখ শহীদ হয়ে গেল ৩০ লাখ মরা মানুষ।

তবু আমি একটি হারানো সিন্দুক চাই। আমি ফিরে পেতে চাই একটি কংকাল। আমার জন্মের বহু আগে যিনি নিক্ষিপ্ত হয়েছেন সমুদ্রে তার কংকাল আমি দেখতে চাই। আমি সেই কংকাল সংরক্ষণ করব একটি কাচের ঘরে। কোটি কোটি বাঙালি দেখবে দুচোখ ভরে তাদের মহাবীরকে। ওরা রচনা করবে অমর এক বীরগাথা। আমি মনে করি ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর, ২১ ফেব্রুয়ারির চেয়ে কম দীপ্তিময় নয় সেই কংকাল। হায়! এ তো আমার দিবাস্বপ্ন। পাগলের প্রলাপ। কোনোদিন এটি হওয়ার নয়। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি জাদুঘর সহ্য করতে পারে না যে অশুভ শক্তি, সেই শক্তির হাতেই পৈত্রিক ভিটে বেদখল হয়ে যায় সেই মানুষটির, যার লাশ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল আজ থেকে ৬৬ বছর আগে সমুদ্রের অতল জলের অন্ধকারে।

সেই লৌহনির্মিত সিন্দুকটি হারিয়ে গেছে বলেই বাঙালি জাতির স্বাধীনতা আজ অরক্ষিত। অরক্ষিত বলেই স্বাধীনতা হচ্ছে ক্ষতবিক্ষত বিস্মৃত কলংকিত। স্বাধীনতাকে সংরক্ষণের জন্য তাই আজ বড় প্রয়োজন একটি সিন্দুকের, একটি কংকালের। যদি এ জাতি কোনোদিন খুঁজে পায় সেই হারানো সিন্দুক আর একটি কংকাল তবেই রক্ষিত হবে স্বাধীনতা, স্বাধীনতাযুদ্ধ, বিজয় দিবস এবং একটি মহান মুক্তিযুদ্ধ।

হতভাগ্য ও বিভ্রান্ত এ জাতি তো কেবল হারাতেই শিখেছে, শেখেনি সংরক্ষণ করতে, শেখেনি অর্জন করতে। স্বাধীনতার ঘোষক আর জাতির পিতার মহাবিতর্কে পড়ে কত মহান অর্জন যে হারিয়ে গেছে তার হিসাবটা কারা করবে? চীন আর রাশিয়ার সেই ঐতিহাসিক মহাবিতর্কের ফাঁক দিয়ে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী সাম্যবাদী শক্তি তত্ত্বের গোড়ায় বিষ ঢেলে দিচ্ছিল। তা যেমনি টের পায়নি চীনারা, তেমনি বুঝতে পারেনি রুশরা। আমাদেরও হয়েছে একই দুর্দশা। কে জাতির পিতা, কে স্বাধীনতার ঘোষক সেই বিতর্কের ফাঁকে অপরাপর আত্মত্যাগী মহান ব্যক্তিদের অর্জনকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে অন্ধকারে। পারলাম না আমরা সংরক্ষণ করতে।

আমরা কি পেরেছি মাওলানা ভাসানী, তাজউদ্দিন আহমদ, মণি সিংহ, দেবেন সিকদার, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সৈয়দ নজরুল, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদসহ আত্মত্যাগী জাতীয় নেতাদের মূল্যায়ন করতে? স্বাধীনতার ঘোষক আর জাতির পিতার মল্লযুদ্ধে আজ সব তলিয়ে গেছে। সত্যকে মিথ্যায় মিথ্যাকে কল্পিত সত্যে রূপ দিতে গিয়ে আমরা বেইমানের মতো বঞ্চিত করেছি মহান সেসব পুরুষকে। আমাদের ভয় যদি সেসব জাতীয় নেতাকে সত্যিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয় তবে হয়তো বঙ্গবন্ধুর

অবদান ম্লান হয়ে যাবে। এটা করতে গিয়ে অজ্ঞাতসারে নিজেরাই যে ইতিহাস বিকৃত করছি তা কি কেউ ভেবেছে? প্রয়াত জিয়াউর রহমানের বেলায়ও তাই ঘটছে। বাস্তবের জিয়াকে কল্পলোকের রাজপুত্তুর বানাতে গিয়ে এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বী বানাতে গিয়ে মিথ্যা আর মিথের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। প্রশ্ন আসতে পারে আগরতলা মামলার আসামিদের কথা। তারা কি জাতীয় বীরের মর্যাদার অধিকারী নন? তাদের স্বীকৃতিতে কি অন্য কেউ বা যুদ্ধের ইতিহাস ম্লান হয়ে যাবে? কিসের এতো ভয়? দু-এক ব্যক্তিকে হাইলাইট করতে গিয়ে আমরা যে আত্মঘাতী কর্মে লিপ্ত হয়েছি তারই ফল আজকের এ স্বাধীনতার সংকট। এ সংকটমুক্তির একটাই পথ, জাতীয় নেতাদের কর্মকে হাইলাইট করা। এ নাহলে স্বাধীনতার সংকটের বর্তমানের বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হয়ে পড়বেন নিঃসঙ্গ। নির্বোধ, অবিবেচক, অদূরদর্শী আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জাতির পিতা নিঃসঙ্গ হয়েছেন। তাকে আমরা দলীয় স্বার্থে স্বাধীনতার বিশাল কর্মকাণ্ডে একা করে ফেলেছি। তার নির্ভীক সহকর্মী কিংবা অগ্রজ নেতাদের অন্ধকারে ঠেলতে গিয়ে তাকেই ঠেলে দিচ্ছি অন্ধকারে। তা হলে আমরা কি অস্বীকার করতে পারব ইতিহাসকে অজ্ঞাতসারে নিজেরই খণ্ডিত করছি না?

আমরা কী ভেবেছি বঙ্গবন্ধুকে নিঃসঙ্গ, একাকী দ্বীপবাসী করতে গিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস তথা স্বাধীনতাকেই নিঃসঙ্গ বা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি মাটি আর মানুষ থেকে? তাই আজ আমাদের বড় প্রয়োজন বিপ্লবী সূর্য সেনের হারিয়ে যাওয়া কংকাল। যদি আমরা সমুদ্রের অতল জলের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করতে পারি অগ্নিযুগের সেই হারানো কংকাল, আরো যদি উদ্ধার করতে পারি আত্মত্যাগী অপরাপর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কর্মের ইতিহাস, তবেই শঙ্কাশূন্যভাবে জাতির হৃদয়ে সংরক্ষিত থাকবেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু কোনোকালেই একা ছিলেন না, তার ছিল বিশাল আত্মত্যাগী সহকর্মী দল। তাদের মধ্যভূমিতে তিনি জেগে ছিলেন সূর্যের মতো দীপ্তিময় হয়ে। তাই আমরা চাই পুনরুদ্ধার। ম্লান হয়ে যাওয়া নক্ষত্রগুলোকে পুনরুদ্ধার করতে পারলেই অগ্নিপিণ্ড মহাসূর্যও হবে অবিনশ্বর গৌরবের অধিকারী।

স্বাধীনতার তথাকথিত ঘোষক বিতর্কে জড়িয়ে নির্বোধের মতো কেন আমরা বঙ্গবন্ধুকে লজ্জায় ফেলি? আজ বঙ্গবন্ধুর ছবির অপমান করা হয়, এ কি তার অপরাধ নাকি আমাদেরই হঠকারী রাজনীতির পরিণাম? সে কারণেই আজ আমাদের বড় প্রয়োজন একটি হারানো কংকাল খুঁজে পাওয়া। সেই কংকাল কেবলই কংকাল নয়, আমাদের আজকের অরক্ষিত স্বাধীনতার রক্ষাব্যূহ, জাতির পিতার নিঃসঙ্গতা মুক্তির বরাভয়।

উত্তরাধিকার

মানুষ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সন্তানের জন্য রেখে যায় অবশিষ্ট অর্থসম্পদ। পশু তার শাবকের জন্য রেখে যায় অরণ্যের অধিকার। অথচ পশু যা পারে না, মানুষ তা পারে। একজন সামাজিক মানুষ পৃথিবীতে রেখে যায় তার সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বাক্ষর। তারই নাম ক্রমবিকাশমান সভ্যতা। সভ্যতা রেখে যায় সভ্য মানুষ প্রবহমানকালের জন্য, যা অন্য মানুষ লালন করে, যাপন করে কালের পর কাল। এ না হতে পারলে সমাজ টেকে না, রাষ্ট্র টেকে না, সভ্যতা টেকে না। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তাই প্রশ্ন জেগেছে, আমরা বাংলাদেশের মানুষ কী কী অর্জন রেখে যাচ্ছি আমাদের অনাগত কিংবা যাপিত বংশধরদের জন্য? আমাদের বয়স যাদের পঞ্চাশ পেরিয়ে যাচ্ছে তারা অতীত বা বর্তমানে কী রেখে যাচ্ছি? আমাদের কোন কোন সৃষ্টি নিয়ে জীবনযাপন করবে আগামী দিনের নাগরিকরা? ধরা যাক রাজনীতির কথা। কী রাজনীতি বা আদর্শ আমরা তুলে দিচ্ছি তরুণ শক্তির হাতে? আমরা আজ আছি তো কাল নেই। কিন্তু তরুণরা তো থাকছে। কী নিয়ে থাকবে তারা?

রাজনীতির দিকে তাকালে দেখা যাবে যারা দিগ্‌নির্দেশনা দিচ্ছেন বা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা কেউ তরুণ নন। তরুণরা কেবল অনুসরণ করছে তাদের পূর্বপুরুষদের। রাজনীতি যে সমাজের মঙ্গলের জন্য নয় ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার– এ মিথ্যে তথ্যটি আমরা বয়স্করা জানিয়ে দিচ্ছি তরুণদের। ক্ষমতার নামে সন্ত্রাস আর হত্যায় জড়িত যারা তারা তরুণ। কিন্তু তরুণরা হাতিয়ার হচ্ছে বয়স্কদের। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তাই। যারা নিয়ন্ত্রণ করছে গোটা অর্থনৈতিক সিস্টেমটাকে তারা কেউ তরুণ নয়। এ যে অর্থনৈতিক লুণ্ঠন আকাশে, পাতালে, মর্ত্যে– তার হোতা কারা? স্বাধীনতা-উত্তর কাল থেকে যে লুণ্ঠনের সিস্টেম চালু হয়েছে তা আজ প্রবল দৈত্যের আকার ধারণ করেছে। কিন্তু সেদিন যারা এ সিস্টেম চালু করেছিলেন তাদের বহুলাংশই এ ধরাধামে নেই। অথচ টিকে আছে রোপণ করা লুণ্ঠনের বিষবৃক্ষটি।

সমাজে যারা ছিলেন ত্যাগী তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে, নির্বাসিত করা হয়েছে। আজ যদি মৃত্যুশয্যায় শায়িত কোনো পিতার কাছে প্রশ্ন রাখে পুত্র, 'তুমি তো যাচ্ছো কিন্তু আমাকে কী দিয়ে গেলে?' জানি উত্তর থাকবে না। সমাজ টিকে থাকে গতিশীল সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কাঠামোকে নির্ভর করে। পশুর সাংস্কৃতিক জীবন নেই, মানুষের থাকতেই হয়। আজ সমাজে কী ধরনের সংস্কৃতিকে লালন-পালন করা হচ্ছে, নিজেদের কুকর্মকে আড়াল করার জন্য আমরা দায় চাপিয়ে দিচ্ছি অপসংস্কৃতি তথা আকাশ-সংস্কৃতিকে। দায় চাপাচ্ছি বিদেশিদের ওপর। অথচ সেই আকাশ-সংস্কৃতিকে আমরা ব্যবহার করছি অর্থের জন্য, বিত্তের জন্য, ক্ষমতার জন্য। ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের জন্য কি তৈরি হয়েছে স্যাটেলাইট, টেলিফোন, মাইক, মুদ্রণ যন্ত্র, ক্যাসেট, মোবাইল ই-মেইল টেপরেকর্ডার? বিজ্ঞানের সৃষ্টিকে কীভাবে অপব্যবহার করা হচ্ছে ধর্মীয় উন্মত্ততার জন্য তার হাজার হাজার দৃষ্টান্ত রয়েছে। কারা টিভির পর্দায় ভাসিয়ে দিয়েছিল সারা বিশ্বে বাবরি মসজিদ নিয়ে দানব শক্তির সেই হুংকার? এসবই আমরা তরুণদের কাছে রেখে যাচ্ছি দৃষ্টান্তস্বরূপ। মাদকদ্রব্যের কারখানার মালিক এই আমরা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরিচালনের অধিকার দিয়ে যাচ্ছি তরুণ উত্তর-পুরুষের হাতে।

ভাবা যাক শিক্ষার কথা। যত প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হচ্ছে তার পেছনে কারা? উন্নয়নের নামে বৈদেশিক অর্থ সহায়তার বিরাট অংশটি ব্যয় হচ্ছে সভ্যতা তথা প্রগতিবিরোধী শিক্ষার নামে। শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ আজ হয়ে উঠছে আগ্নেয়াস্ত্র। অস্ত্রটি হাতে তুলে দিয়ে আমরা বয়স্করা তো চলেই গেলাম, তরুণরা কী করবে? আজ বাংলাদেশে একটি গবেষণাগার তৈরির জরুরি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তা হচ্ছে, কোথায় দুর্নীতি নেই তা খুঁজে বের করার জন্য। একজন তরুণ যখন তার দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত পিতার কাছ থেকে প্রতিদিনের প্রয়োজনের টাকাটা তুলে নিচ্ছে, সাধ-আহ্লাদ মিটিয়ে নিচ্ছে, পরে সেই সন্তানের কাছে দেশ বা জাতি কী আশা করতে পারে?

যে পিতা আপন সন্তানদের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখে অন্যের সন্তানকে টেনে আনছে মিছিলে, সেই পিতা কী নামে আখ্যায়িত হতে পারে? যে তরুণ দেখছে তার পিতা ট্রেড ইউনিয়ন নেতা অথচ কোনো কাজকর্মই করছে না, তরতর করে বাড়ছে তার বাড়ির উচ্চতা, গাড়ির মডেল বদলাচ্ছে ফড়ফড় করে, সেই সন্তান পরে কোন ধরনের নাগরিক হবে এ দেশের? যে আমলার মাসিক বেতন হাজার দশেক তিনি যদি চল্লিশ হাজার টাকার বাড়ি ভাড়ায় থাকেন, তার একটি মাত্র স্কুলগামী সন্তানের পেছনে শিক্ষা ব্যয় হয় মাসে ৫০ হাজার টাকা, তবে সেই সন্তানটি পিতার আদর্শ থেকে কী শিক্ষা নিচ্ছে?

কবি সুকান্ত এমন একটি পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে থাকবে শোষণের পরিবর্তে সাম্যের শাসন। তাই তিনি এমন পিতার স্বপ্ন দেখেছিলেন

যে পিতা তার সন্তানের জন্য জঞ্জাল পরিষ্কার করে পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য করে 'তারপর হব ইতিহাস'। অথচ আমাদের ইতিহাস হচ্ছে দুর্নীতির ইতিহাস, সুবিধাবাদের ইতিহাস। এই যে আমরা একাত্তরের স্বপ্ন নষ্ট করেছি এ দেশটা থেকে, তার প্রায়শ্চিত্ত তো করতে হবে আমাদের সন্তানদের। নষ্ট রাজনীতি, নষ্ট ইতিহাস, নষ্ট অর্থনীতি, নষ্ট সংস্কৃতি এ দেশটার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে না হয় আমরা মরে ইতিহাসই হয়ে গেলাম, তারপর? উত্তরাধিকার সূত্রে একটি স্বপ্নের দেশের ক্ষত-বিক্ষত শরীর নিয়ে আমাদের সন্তানরা দাঁড়াবে কোথায়? আপনি কি রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে নিরাপদ? পুত্র-কন্যাকে স্কুলে পাঠিয়ে নিরাপদ? রাতে জানালা খুলে ঘুমোতে গিয়ে নিরাপদ? সর্বদা আতঙ্কের ভেতর কাটছে দিন-রাত। ভেবে দেখুন রাতে ঘুমানোর আগে স্ত্রী কেন বারবার খেয়াল করেন ঘরের দরোজাটা ঠিকঠাক মতো সিটকিনি আটকানো হলো কি না? কেন অ্যাসিড নিক্ষেপের ভয়ে গৃহিণী প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও জানালা বন্ধ করে রাখেন? কেন রাস্তায় চলতে গিয়ে কিশোরী মেয়েটিকে মা ভয়ার্ত চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে আগলে রাখেন?

ভেবেছেন কি, কে কেড়ে নিল আপনার দুর্ভাবনাহীন শান্তির মুহূর্তগুলো? কর্মক্ষেত্রেও আপনি মানসিক চাপের শিকার, ঘরেও শান্তিহীন দুশ্চিন্তা, যাবেন কোথায়? স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি সত্য। আজ প্রশ্ন করার দিনও গত হয়ে যাচ্ছে। যারা সেদিন বুকের রক্ত দিয়েছিলেন, ঘরবাড়ি সম্পদ হারিয়েছিলেন, ইজ্জত হারিয়েছিলেন তাদের কত ভাগ মানুষ দেশের প্রবহমান রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ভোগ করছে? দশমিক বা শূন্যের পরে হয়তো কোনো ছোট সংখ্যা। একাত্তরে যারা আত্মত্যাগ করেনি, একটি বেড়ালের আঁচড়ও গায়ে পড়েনি, তারা কীভাবে আজ দেশের সব সম্পদের মালিক হলো– তার হিসাবটা বের করবে কে? বঙ্গবন্ধু কেন স্বাধীন দেশে নিহত হলেন, তার প্রকৃত কারণ এদেশের কত ভাগ মানুষ জানে? কত ভাগ মানুষ বিশ্বাস করে জনগণের মুক্তির জন্যই তাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল? হিসাব করলে অবশ্যই চমকে উঠতে হবে। তার বিরুদ্ধে আজো যেভাবে অপপ্রচার চলছে, ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে তা রীতিমতো অবিশ্বাস্য। তবে যারা তারই নামে শাসন করছেন দেশ, তাদের কর্তব্যটা কী? আজ যারা বঙ্গবন্ধুর অনুসারী বলে দাবি করেন তারা কি সত্যি তার অনুসারী? মুজিব কোট খুলে পরীক্ষা চালালে শরীরে কিসের চিহ্ন বেরোতে পারে?

এই তো আমাদের দেশ! এই তো আমরা গড়েছি স্বাধীনতার ফসল। কিন্তু মরে যাওয়ার আগে কোন আদর্শ আমরা রেখে যাব সন্তানদের কাছে? কোন ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছি আমরা আমাদের সন্তানদের? তরুণের সামনে আজ আর মহান আদর্শের উদাহরণ হিসেবে তুলে আনতে পারি না মার্কস-লেনিন-মাওয়ের নাম। নাক সিঁটকায় ওরা। প্রগতির সংস্কৃতি যারা নির্মাণ করেছিলেন তারা আজ পরিত্যাজ্য। তবে কারা হবে আদর্শ? আমরা ভেবে না

পেলেও চরম প্রতিক্রিয়াশীলরা পেয়ে গেছে শূন্য মাঠ। ছেঁড়া বল সেলাই করে তালি মেরে মাঠে নামতে ভুল করেনি তারা। তরুণরা দর্শক হিসেবে দেখছে সেই আদর্শের খেলা, নিজেরাও অংশ নিচ্ছে খেলায়। যে তারুণ্যের মেধাশক্তিকে আমরা বিজ্ঞান গবেষণায়, জ্ঞানচর্চায়, সমাজপ্রগতির চর্চায় লাগাতে পারতাম, তা আমরা পারিনি বলেই ওরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে তালেবান হতে চলে যাচ্ছে। তারুণ্য শক্তি হাতছাড়া হয়ে গেছে। আমাদের সেই শক্তি আজ দখল করে নিয়েছে চরম প্রতিক্রিয়াশীলরা, বিজ্ঞানবিরোধী দানবেরা। সেই দানবদেরই সেবাদাস আমরা। ঘরে ঘরে জরিপ করলে দেখা যাবে, কেমন শিশু-কিশোর বেড়ে উঠছে মাতাপিতার লালন-পালনে। সন্তানদের ব্যতিক্রমী আচরণ আর চাওয়া-পাওয়ার দিকে তাকিয়ে আমরা মাতাপিতারা ভাবি খুশি ভবিষ্যতে দারুণ মেধাবী হচ্ছে আমাদের সন্তান। আসলে শিশু মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন, এ হচ্ছে পরিবেশ আর সমাজের কুফল। ভয়ার্তকালে, দুঃশ্চিন্তাকালে, অসৎ চিন্তাকালে, মানসিক জটিলতাকালে নিজেদের অজ্ঞাতে সন্তান প্রজনন করতে গিয়ে যে সন্তানের শরীরে জেনেটিক সমস্যা সৃষ্টি করেছি তা আমরা বুঝি না। এমনি অস্থিরচিত্ত সন্তানের পিতা হয়ে, অস্বাভাবিক সন্তানের পিতা হয়ে, সন্তানকে ভবিষ্যতের আইনস্টাইন ভাবা আজ মাতাপিতাকে এক ধরনের অন্ধত্বে পেয়ে বসেছে। না বসার কারণ নেই। আমরা যেমনি সৃষ্টি করেছি সমাজ এবং তার ব্যবস্থাকে, তেমনি সৃষ্টি করেছি সন্তানের মানসকে। তাই একবার ভাবুন কেমন দেশ রেখে যাচ্ছেন আপনি আপনার সন্তানের জন্য। কেমন রাজনীতি, কেমন অর্থনীতি, কেমন সঙ্গীত-সাহিত্য, কেমন বিনোদনের উপকরণ সৃষ্টি করে রেখে চলে যাচ্ছেন দূরে।

তাই আজ এবং এখনই প্রয়োজন সুস্থতার দিকে ফিরে আসা। একটি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, দুর্নীতিমুক্ত অর্থব্যবস্থা এবং বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা এবং তার জন্য উপযুক্ত সামাজিক শৃঙ্খলা সৃষ্টির বিকল্প নেই আমাদের। তাই আগে চাই কঠোর আত্মশাসন, তারপর সন্তানকে শাসন। দুর্নীতিকে মেনে নিয়ে, ব্যাপক লুণ্ঠন আর সন্ত্রাসের সমাজকে টিকিয়ে রেখে কোনোদিন সম্ভব নয় শিশুর জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের। আমরা জানি ত্রিশ-চল্লিশের দশকের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সামাজিক মানুষরাই সত্তরের দশকে আত্মত্যাগী সন্তানদের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন স্বাধীনতার স্বপ্ন আর সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন। আজ আমরা সেই সামাজিক মানুষ নই বলেই তারুণ্য বুকের রক্ত দেয় সন্ত্রাসের যুদ্ধে, ধর্মান্ধতায় আর বীরের মৃত্যুর বদলে ধুঁকে ধুঁকে মরে যায় নেশা গিলে গিলে।

উত্তর-উপনিবেশবাদ ও বাংলাদেশের উপন্যাস

পোস্ট-কলোনিয়ালিজম বা উত্তর-উপনিবেশবাদ সম্পূর্ণ একটি পুঁজিবাদী কনসেপ্ট। এর উদ্ভবের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতা হচ্ছে ঔপনিবেশিক বা উপনিবেশ-উত্তর কাল। মার্কসীয় বস্তুবাদী তত্ত্বের সাহিত্যিক অভিজ্ঞানের বিপরীতে তৃতীয় বিশ্বের ধনবাদী সমাজের নন্দনতাত্ত্বিক চর্চা এর বস্তুবিশ্ব। বাংলাদেশ শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে এসেছে উপনিবেশ-অধীন ভূখণ্ড হিসেবে। বিশ্বের অপরাপর উপনিবেশমুক্ত দেশের মতো নয়, বরং বাংলাদেশের ঔপনিবেশিক কাল যত দীর্ঘ তত জটিল। পরপর দুটি ঔপনিবেশিক কালকে অতিক্রম করেছে এই জাতি। একটি আন্তর্জাতিক, অপরটি আঞ্চলিক। ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান। এই দুই উপনিবেশের অভিক্রিয়াকে স্মরণে না রাখলে বাংলাদেশের সাহিত্য তথা উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় বিভ্রান্তিতে পতিত হবে। কেননা আজো বাংলাদেশের উপন্যাস তার রক্ত-শিরায় বহন করে চলেছে এদের অভিঘাত। বিষয়বস্তু তো বটেই, লেখক-দৃষ্টিভঙ্গি এবং আঙ্গিকের বিবেচনায়ও। উপন্যাসের দার্শনিক সূত্র ধরেই বিষয়টির ওপর আলোকপাতের চেষ্টা করা হবে। অবশ্য এখানে অনুপুঙ্খ বা দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ নেই। কেননা এটি কোনো অভিসন্দর্ভ নয়, নিছক মামুলি রচনা।

যে কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের মতোই বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশ হিসেবে ১৯৪৭ সালে ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে প্রবেশ করে। উপনিবেশের মুক্তির একটি জটিল গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে প্রকৃত অর্থে ভূখণ্ডটি আঞ্চলিক উপনিবেশ বা আধিপত্যে পতিত হয়। এই দুই আধিপত্যের প্রভাবে এ দেশের ঔপন্যাসিকদের দু-একজন বাদে প্রায় সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। স্বাধীনতার আড়ালে পাকিস্তানি মুগ্ধতায় তারা ভুলে যান দেশের কোটি কোটি শোষিত দারিদ্র্য গণমানুষকে। অথচ উত্তর-উপনিবেশবাদের একটি শর্ত ওই গণমানুষের জীবন। মধ্যবিত্ত লেখকদের

আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাদের সৃষ্টি অবিকশিত নব্য মধ্যবিত্তের স্বপ্নের মতোই ব্যর্থতার একাকারের ভেতর হারিয়ে গেল।

পোস্ট-কলোনিয়ালিজমের মৌলিক দ্বান্দ্বিক কার্য-কারণ হচ্ছে ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্র। উপনিবেশবাদ যেখানে ব্যক্তিকে অস্বীকার করে, সেখানে এর উত্তরকাল ব্যক্তির বিকাশকে সহায়তা করে। কিন্তু '৪৭-এর স্বাধীনতার ভেতর দিয়ে আমরা যে রাষ্ট্রের অধীনে ছিলাম সেই রাষ্ট্র কি ব্যক্তি-মানুষের মৌল অধিকারকে মেনে নিয়েছিল? বরং রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক (ইংরেজ) যুগের বর্বরতা দিয়ে, ব্যক্তির স্বাধীনতাকে দমন করেছিল। ৫০/৬০-এর দশকে ওই যে ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তির নির্মম পরাভব ঘটে অত্যাচারী রাষ্ট্রের হাতে, এ বিষয়টি নিয়ে কি কোনো উপন্যাস লিখিত হয়েছে? হয়নি। প্রকৃত অর্থে বাস্তব সত্যটি ছিল এই যে, ব্রিটিশ উপনিবেশের পরিত্যক্ত দাসত্বমূলক দর্শন পাকিস্তানি আঞ্চলিক উপনিবেশ শক্তি তার স্বার্থেই হাতে তুলে নেয় এবং ব্যক্তির মতাদর্শচর্চার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে। মূলত সেই যুগ ছিল পূর্ব উপনিবেশেরই সম্পূরক শক্তি। আমাদের ঔপন্যাসিকদের অক্ষমতা বা ব্যর্থতা এখানেই যে, তারা জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিটাও বুঝতে চান নি বা পারেন নি।

ইংরেজরা নেটিভদের যে ঘৃণার চোখে দেখেছে, উচ্চবর্গের মানুষের দাবিদার পাঞ্জাবিরাও বাঙালিকে একই দৃষ্টিতে দেখেছে। অথচ উত্তর-উপনিবেশবাদের সূত্রানুসারে সেই অন্যায় দৃষ্টিভঙ্গিকে আঘাত করে কোনো সাহিত্যিক দর্শনই আমাদের লেখকরা তৈরি করতে পারলেন না তাদের উপন্যাসের ভেতর দিয়ে। চল্লিশ দশকের উপন্যাসের একমাত্র সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ছাড়া কারো মধ্যে এই বোধ ছিল কি-না সন্দেহ। তাই তাঁর উপন্যাসেই উত্তর-উপনিবেশিকবাদের অভিজ্ঞানকে আমরা দেখতে পাই। তাঁর এই সফলতা বিস্ময়কর বটে।

আরো বিস্ময়করভাবে আমরা লক্ষ্য করি যে, ঔপন্যাসিকদের এই চরম ব্যর্থতার সময়কালে কবিতা বা কাব্যে ভাষা আন্দোলনের স্পন্দন আপন সৃষ্টিতে প্রচণ্ড অভিঘাত সৃষ্টি করে। ইংরেজের শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গ বিতর্কে শ্বেতাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্বের যে অনৈতিক দাবি, তারই এ দেশিয় রূপটি ছিল পাঞ্জাবিদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি। এই দাবির প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পেলাম কবিতায়। কবিতা আরো জানিয়ে দিল বাঙালির বাংলা ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা।

উপন্যাস তো গল্পে-উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এ কথা বলতে পারেনি, বাঙালির ভাষার মতো তার নৃতাত্ত্বিক রক্তধারাও অন্য জাতির তুলনায় কম মর্যাদাকর নয়। কেবল তা-ই নয়, ঔপনিবেশিক বন্ধন ছিন্ন করে উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে উঠে আসার ক্ষেত্রে কবিতা যা করতে পারল, উপন্যাস তা পারেনি। যুদ্ধ-বিরোধী, দেশভাগ-বিরোধী, বর্ণবাদ-বিরোধী, সাম্প্রদায়িকতা-

বিরোধী, বিশ্বায়ন-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কবিতার সংকলন গল্পকারদের জন্য ব্যর্থতা ও লজ্জার বিষয়। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করলে কৌতূহলী পাঠকরা সহজেই তা বুঝতে পারবেন।

আমাদের দরিদ্র এই মাতৃভূমি বাংলাদেশ উত্তর-উপনিবেশবাদী বিশ্বের একটি অংশ। পৃথিবীর অপরাপর উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রতিটি দেশের মতো বাংলাদেশের জনগণেরও অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন কিংবা দৃশ্য-অদৃশ্য সংঘাত চলছে পশ্চিমি দুনিয়ার সঙ্গে। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে প্রতিনিয়তই আমরা হারছি পশ্চিমের কর্তৃত্ববাদের কাছে। এর প্রতিফলন হিসেবে কবির ব্যক্তিসত্তার আধারে, প্রতীকে, উপমায়, উৎপ্রেক্ষায়, চিত্র-চিত্রকল্পে (রাজনীতির শব্দে বাইরে) ফুটে উঠেছে। হালের এই যে বিশ্বায়নের অভিঘাত তাও মেলে কবিদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রাতিভাসিক কবিতার শরীরে।

কিন্তু উত্তর-উপনিবেশবাদী রোধের পরিচয় কি মেলে হালের কোনো উপন্যাসে? চাই কি ছোটগল্পে কিংবা নাটকে? তবে কথাসাহিত্য নিয়ে কিসের আমাদের গৌরব? কোন সৃষ্টিকর্মটির জন্য? যে ঔপনিবেশিক শক্তি তথা পশ্চিমকে দেখার বা বোঝার ক্ষেত্রে উত্তর-উপনিবেশবাদ নতুন দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করেছে, বাংলাদেশের জনগণ যে তা থেকে বহুদূরে সেই সংবাদ কি আমরা ঔপন্যাসিকরা প্লট বা চরিত্র-নির্মাণের দ্বারা পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি? পারিনি। লেখকদের বোধ-বিবেচনা বা জ্ঞানতাত্ত্বিক অর্জনের শূন্যতার কারণেই এই বাস্তবতা তৈরি হয়েছে। আমরা এখনো পশ্চিমকে প্রভু হিসেবেই জানি। পশ্চিম আমাদের কাছে বিস্ময় কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিবেচনায়ই নয়, শ্বেতবর্ণের কারণেও। জনগণের দাসত্ব-দৃষ্টিকোণকেও উপন্যাসে আমরা তুলে আনতে পারিনি। জীবন-ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পশ্চিমি দুনিয়া যা চাপিয়ে দিয়েছে দাসত্বের মুগ্ধতার ভেতর, তাই আমরা মেনে নিয়েছি। উত্তর-উপনিবেশবাদ আধিপত্যবাদী পশ্চিমের সনাতনী যে দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে দিল তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে, তা আমাদের ক'জন ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে?

তৃতীয় বিশ্বের তথা উপনিবেশ-উত্তর বিশ্বের বস্তুগত অধিকার এবং সাংস্কৃতিক অধিকারকে খর্ব করে সাম্রাজ্যবাদ যে অসাম্যের সমাজ তৈরি করে রেখেছে এবং দেশের ভেতর এর বিরুদ্ধে যে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দ্বন্দ্ব চলছে তা কি ঔপন্যাসিকদের চোখে পড়ে না? পুঁজিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এডওয়ার্ড সাইন কিংবা রণজিৎ গুহরা যে অরিয়ান্টালিজম বা সাব অলটার্ন তত্ত্ব নির্মাণ করলেন তার যথার্থ প্রয়োগ কি ধনবাদের পক্ষের বাংলা ঔপন্যাসিকরা তাদের লেখায় তুলে ধরতে পেরেছেন? এসব তত্ত্ব তো উত্তর-উপনিবেশবাদেরই ফল এবং তাদেরই জন্য তাদের দ্বারা সৃষ্ট।

আমাদের এই বাংলাদেশের জনগণ সাম্রাজ্যবাদ কিংবা বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে প্রতিদিন যে সাংস্কৃতিক সংগ্রাম করে যাচ্ছে তার প্রতিফলন কি কথাসাহিত্যে

মেলে? নয়া ঔপনিবেশিক এই আধিপত্যের বিরুদ্ধে কৃষক-শ্রমিক আর মধ্যবিত্তের সংগ্রাম উপন্যাস-গল্পে অনুপস্থিত কেন? আমরা এটাও দেখছি যে, আমাদের উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলাদেশে অতীতের ঔপনিবেশিক শক্তিই আধিপত্য বিস্তার করে আছে। আমরা হারিয়েছি আমাদের প্রত্যাশার স্বাধীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সত্তা। রাষ্ট্র ও সমাজের এই বাস্তব চিত্রকে পাওয়া যায় কি উপন্যাসে?

আমার এই লেখার উদ্দেশ্য উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বগত বিচারে বাংলাদেশের উপন্যাসকে খারিজ করে দেয়া নয়। বরং এটা প্রমাণ করা যে, তত্ত্বের কোন কোন দিক আমাদের উপন্যাস পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং কোন বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করেছে। এবার আমরা আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে তাকাতে চাই। কেননা ধনতন্ত্র আদর্শের অনুসারী উপন্যাস লেখকদের ব্যর্থতার বোঝাটা ভারি হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা সফলতাও দেখিয়েছেন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞান হচ্ছে রাজনৈতিক অসাম্য। এর পরেই রয়েছে অর্থনৈতিক অসাম্যের বাস্তবতা।

চল্লিশ দশক থেকে একেবারে হাল আমলের ধনবাদী মতাদর্শের গল্পকার-ঔপন্যাসিকরা এক্ষেত্রে একেবারেই অসফল। রাজনীতিকে উপন্যাসে কীভাবে কোন শিল্পকৌশলে প্রয়োগ করতে হয়, সেই চর্চা তাদের মধ্যে ছিল না বা নেই। চল্লিশের দশকে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেবল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এবং আবু ইসহাক। পঞ্চাশ-ষাট দশকে আমরা পাচ্ছি শওকত ওসমান, শওকত আলী, আবু জাফর শামসুদ্দীন, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হকদের। অবশ্য সত্যেন সেন এবং শহীদুল্লা কায়সারকে আলাদা দেখতে চাই এ কারণে যে, তারা ছিলেন ধনবাদবিরোধী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ঔপন্যাসিক। তাদের পথ ভিন্ন।

উত্তর-উপনিবেশজাত ওই যে রণজিৎ গুহ, গৌতম ভদ্রদের নিম্নবর্ণের তত্ত্ব, সেই বিবেচনায় একমাত্র অদ্বৈত মল্লবর্মণকেই আমরা পাই। নিম্নবর্গের তত্ত্বটি প্রকৃত অর্থে মার্কসবাদ-বিরোধী শোষিত-বঞ্চিত শ্রেণীকে বিভক্তিকরণের এক অপকৌশলী তত্ত্ব। তারপরও বলা যায় বুর্জোয়া-দৃষ্টিতে এই অভিজ্ঞান সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাবশালী। জাতি এবং বর্ণগত নিম্নবর্গকে নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস লিখেছেন এবং কবি জসীমউদ্‌দীন লিখেছেন কাহিনী কাব্য। কিন্তু বাংলাদেশের উপন্যাস লিখিয়েগণ এ নিয়ে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কাজই করেনি।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশের ধনবাদে বিশ্বাসী ঔপন্যাসিকেরা মোটেই পরিশ্রমী নয়। তরুণ প্রজন্মের কথা বাদই দেয়া গেল, প্রবীণেরাও নিজেদের সাহিত্যিক মতবাদের অর্থাৎ যে আদর্শের তারা অনুসারী, সে সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা সংগ্রহ করেনি। উত্তর-উপনিবেশবাদী চর্চা এখানে

সীমাবদ্ধ রয়েছে কেবল বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী মহলে। তারাই চর্চা করেন হেলেন টিফফিন, ইমরে জেমান, গায়ত্রী স্পিনাক প্রমুখের তত্ত্ব। কিন্তু পাঠকমহলে তা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন না।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলাদেশে নারীবাদী কবি-লেখকদের সৃষ্টি করেছে উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রবণতা। তসলিমা নাসরিন, সেলিনা হোসেন, নাসরিন জাহান, ওম্মে মুসলিমারা এ পথেই তৈরি হয়েছেন। আমরা একথা জানি ঔপনিবেশিক যুগের অবসানের পর অধীন দেশগুলো থেকে খেটে খাওয়া শ্রমিক এবং ভাগ্যান্বেষী শিক্ষিত দরিদ্ররা ভিড় জমিয়েছে তাদের প্রভু ও প্রভাবশীল দেশে দেশে। এক্ষেত্রে অভিবাসী জীবন নিয়ে গল্প-উপন্যাসও রচনা করেছেন তারা। ইউরোপ-আমেরিকায় বসবাসকারী এসব লিখিয়েরা যদিও এখনো সফলতা অর্জন করতে পারেনি বাংলা ভাষায় উপন্যাস লিখে, যদিও তারা ইংরেজি ভাষার অভিবাসী ভারতীয় সফল লেখকদের অনুকরণকারী, তবু তাদের এই প্রচেষ্টা বাংলাদেশের উপন্যাসে এনে দিয়েছে বহুমাত্রিকতা। মাসুদা ভাট্টি, সালমা বানী, মীনা ফারাহ এবং আরো অনেকে জাতীয় আইডেনটিটির সংকট নিয়ে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করছেন। উপনিবেশবাদ যেখানে ইংরেজি ভাষাকে ভাষা সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে, আজকের যে উত্তর উপনিবেশবাদী তত্ত্ব তার মূলে আঘাত হানার যুক্তি ও শক্তি নির্মাণ করেছে। সেই প্রবণতার ফলেই কলকাতাকেন্দ্রিক উপনিবেশ সৃষ্ট বাংলা ভাষার রূপরীতি যেমনি পাল্টে গেছে, তেমনি ঢাকা কেন্দ্রিক বাংলা ভাষার রূপও কলকাতা থেকে আলাদা শরীর ধারণ করেছে।

উপনিবেশবাদের সবচেয়ে ঘৃণার পাত্র ছিল বাংলার নেটিভ বা গ্রামের অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষ এবং তার প্রতিদিনের জীবন-যাপনের ভাষা। এ যে সাহিত্যের ভাষা নয় তা প্রমাণের চেষ্টা কম হয়নি। অথচ আজকের বাংলাদেশের বাস্তবতা ভিন্ন। কবি-লেখকরা ওই অস্পৃশ্য-অন্ত্যজ আঞ্চলিক গ্রাম্যভাষাকে সাহিত্যে স্থান দিতে দ্বিধাবোধ করছেন না। এক্ষেত্রে অমার্কসবাদী উদার বুর্জোয়া লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর উপন্যাসে অপভাষার ব্যবহার ঔপনিবেশিক বাংলা ভাষার প্রতি সুস্পষ্ট চ্যালেঞ্জ। তিনিই বাংলা উপন্যাসের প্রথম লেখক যিনি সাহসের সঙ্গে ঔপনিবেশিক বাংলা ভাষার সমস্ত সংলাপ ভাঙার চেষ্টা করলেন। যদিও উপন্যাসের গঠন কৌশলে তিনি লাতিনীয় অনুকরণকারী, কিন্তু তার মৌলিকত্ব সেই অপভাষার সাহিত্যিক রূপায়ন।

সঙ্গত কারণেই বারবার কবিতার প্রসঙ্গ আসে। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের হাত ধরে যে নাগরিক সাহিত্যের সৃষ্টি হলো, সেই যুগেই কবি জসীমউদ্‌দীনের হাতে তৈরি হলো দরিদ্র গ্রাম্য অশিক্ষিত নিম্নবর্গের চাষী-জীবন নিয়ে কাহিনী কাব্য। এই কাব্যের রূপ-রীতিতে যে উপমা-অলংকার তৈরি হলো একেবারে লোকজ, তা ছিল ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদী সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গির

বিপরীত। সে কারণেই জসীমউদ্‌দীনের সৃষ্টি ছিল একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার ভেতর দিয়ে আত্ম আবিষ্কার এবং আত্ম বিকাশের সাহিত্যিক বীজ। একইভাবে কবি আল মাহমুদের লোকজ জীবন ও লোকজ উপাদানে তৈরি কবিতা স্বাধীনতা-উত্তর বাঙালি জাতির শেকড় সন্ধানী স্বপ্নের উত্তর-ঔপনিবেশিক গর্বিত আত্মপরিচয়ের স্বাক্ষর। জীবনানন্দের পাশাপাশি তাঁর এই কৃতিত্ব মোটেই সামান্য নয়।

এই আত্ম আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা, এ চেষ্টার সফল দৃষ্টান্ত কিন্তু পাওয়া গেল না একাত্তর-পরবর্তী উপন্যাসে। গ্রামের গরিব চাষাদের নিয়ে লিখলেই যে তা উত্তর-ঔপনিবেশিক উপন্যাস হয়ে উঠল, তা কিন্তু নয়। অবশ্য সেই উপন্যাসে থাকবে উত্তর-ঔপনিবেশিক গদ্যরীতি এবং ঔপনিবেশিক বিরোধিতার দৃষ্টিকোণ। চরিত্রও হতে হবে উপনিবেশের পুতুল মানব নয়, স্বাধীন সত্তার অধিকারী উত্তর-উপনিবেশের মানুষ। এসব শর্ত পূরণ করা উপন্যাস কি এদেশে লিখিত হয়েছে? হয়নি। আর ওই গণতন্ত্র বিরোধী স্বৈরাচার, সাম্প্রদায়িকতা, নারীর প্রতি হিংস্রতা নিয়ে বৌদ্ধিক কোনো উপন্যাস কি সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশে? উত্তর ঔপনিবেশিক উপন্যাসের প্রধান উপাদান তো এসবই।

সবচেয়ে পরিতাপের এবং লজ্জাজনক ব্যর্থতা এবং সাহিত্যিক অপরাধ হচ্ছে শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে লেখা উপন্যাসের দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের সাহিত্যে অনুপস্থিতির বিষয়টি। অথচ উত্তর-উপনিবেশিক জীবনের অর্থনৈতিক অনুষঙ্গই হচ্ছে শিল্প-কারখানা। আমাদের পাটশিল্প, বস্ত্রশিল্প, ইস্পাতশিল্প থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রশিল্পে নিয়োজিত রয়েছে লাখ লাখ শ্রমিক। ভাষা আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের অবদান বিরাট। আমার মনে হয় বাংলাদেশের লেখকদের এই ব্যর্থতার মূলে রয়েছে তাদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানের সঙ্গে নিজেদের বিচ্ছিন্নতা। নিশ্চয়ই এর পেছনে শিল্প কারিগরি বিজ্ঞান সম্পর্কে লেখকদের অজ্ঞতাও খানিকটা দায়ী। কেননা সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে বিজ্ঞানের ভাষার যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক এ বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না থাকলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভাষাকে সাহিত্যিক ভাষায় রূপান্তর একেবারেই অসম্ভব।

কথা সাহিত্যের লেখক হিসেবে আমি আমার ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নিয়েই জানাতে চাই যে, এ ধরনের একটি প্রচেষ্টা একবার আমার দ্বারা হয়েছিল। বোধ করি বাংলাদেশের উপন্যাসে আমার লেখা 'রুদ্ধ দুয়ারে হাত' একমাত্র উপন্যাস যা লিখিত হয়েছিল পাটকল শ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন নিয়ে। মূলত এটি ছিল একটি ব্যর্থ প্রয়াস, যার হয়তো কোনো সাহিত্যিক মূল্যই নেই। আর এতেই এটা প্রমাণ করা চলে যে, কথাসাহিত্যের লেখকদের রাজনীতির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক-প্রাযুক্তিক জ্ঞান অপরিহার্য।

মোট কথা, উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্ব রাষ্ট্রের জনগণের জন্য নির্ধারিত অসাম্য অকল্যাণমূলক সমাজব্যবস্থাকে স্বীকার করে না। এই অস্বীকৃতির সামাজিক বাস্তবতা নিয়ে কোনো উপন্যাস কি আমরা লিখতে পেরেছি? অবশ্যই পারিনি। আমরা কি পেরেছি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কিংবা ভাষাগত সংকট নিয়ে কোনো মহৎ উপন্যাস লিখতে? উত্তর-ঔপনিবেশিক এই সাহিত্যিক দায়িত্ব কেন আমরা পালন করতে আজো ব্যর্থ? আমরা কি এখনো নব্য উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদী কূটচাল থেকে মুক্ত হতে রাজি নই? ওই যে বলা হচ্ছে, চাপ দেয়া হচ্ছে, উপন্যাস থেকে রাজনীতিকে নির্বাসনে পাঠানোর জন্য, তা-ই কি অনুগত দাসের মতো মেনে নেব? একবারও কি ভাবি না সাম্রাজ্যবাদী সাহিত্য রীতির এই উদ্দেশ্যের পেছনে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক যুক্ত? এ কথা কি সত্য নয় যে, উপন্যাস থেকে রাজনীতিকে নির্বাসনের অর্থই হচ্ছে মানুষকে তার সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে নির্বাসন? একথা তো বলা হচ্ছে না বা দাবি করা হচ্ছে না, সব লেখককেই মার্কসবাদী উপন্যাস লিখতে হবে।

মৌলবাদের ভয়ংকর গতি প্রকৃতিকে 'লালসালু' উপন্যাসের ভেতর দিয়ে চিহ্নিত করতে গিয়ে কিংবা '৪৭ উত্তর মৌলবাদী, গণতন্ত্র বিরোধী, স্বৈরাচারী জটিল রাষ্ট্রটিকে চিহ্নিত করে বাংলা উপন্যাসের বিরল সৃষ্টি 'চাঁদের অমাবস্যা' সৃষ্টি করার জন্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে কমিউনিস্ট কিংবা মার্কসবাদী হওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। উত্তর-উপনিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটাই ছিল যথেষ্ট। একাত্তর সালে আঞ্চলিক উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা, গণহত্যা এবং পরিণতিতে বিজয়– এ নিয়ে হাজার হাজার পৃষ্ঠার দলিল, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বই লিখিত হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশ্বমানের কবিতাও লেখা হয়েছে। যা হয়নি তা হচ্ছে একটি মহৎ মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস। অথচ উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বের এই দাবি এবং শর্তই হচ্ছে মতাদর্শিক বাস্তবতা।

তবে এটাও সত্য যে, ক্ষুদ্র এবং নান্দনিক ঘাটতির ভেতর এ ধরনের অনেক উপন্যাস লেখা হয়েছে। এটাও কম কী যে উপন্যাস লেখকগণ উত্তর-উপনিবেশবাদের এই শর্তকে পূর্ণ করার চেষ্টা করেছেন। বড় অর্জন না থাকলেও ক্ষুদ্র প্রয়াসের নিদর্শন তো আছে। বড় অর্জনটা আজো কেন অনার্জিতই রয়ে গেল, এ নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে এটা অনুমান করা চলে যে, স্বাধীনতার ভেতর দিয়ে অসম পুঁজিবাদী অর্থনীতির অসম বিকাশ, বুর্জোয়া রাজনীতির মহৎ আদর্শ থেকে বিচ্যুতি, সামন্ত আর সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির অশুদ্ধ মিশ্রণের ভেতর দিয়ে জাতীয় মেধা ও মননের যে মান তৈরি হয়েছে, তাতে মহৎ সৃষ্টি প্রত্যাশা করা বড়ই কঠিন। কেননা বিচ্ছিন্নতাবাদই বড় স্পষ্ট। সমাজ থেকে, শিল্প থেকে, মেধাচর্চা থেকে লেখকের স্বেচ্ছা নির্বাসন বড় বাস্তব।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপন্যাসের পাঠকদের মধ্যে সর্বদাই একটি বিভ্রান্তি কাজ করে। মার্কসবাদ সম্পর্কে ধারণা না থাকা বা অস্পষ্ট ধারণার ফলে তারা ধনী-দরিদ্রের দ্বন্দ্ব, শ্রমিক-মালিকের দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাসকে মার্কসবাদী উপন্যাস বলে ধরে নেয়। আসলে এ ধরনের রাজনৈতিক উপন্যাস অবশ্যই উত্তর-উপনিবেশবাদী উপন্যাস। কেননা এসব উপন্যাসে গরিবের জীবন-চিত্র আছে, শ্রমিক-মালিকের লড়াইয়ের বর্ণনাও আছে, যা নাই তা হচ্ছে পরিণতির নির্দেশ। চূড়ান্ত দ্বন্দ্বের কোথায় শেষ তা লেখকরা বলেন না, গোপন রাখেন শিল্প নিরপেক্ষতার নামে। লেখকের এই চতুরতার অপর নাম শিল্প-প্রতারণা।

মনে রাখতে হবে দ্বন্দ্ব থাকলেই সেই উপন্যাস সমাজতান্ত্রিক উপন্যাস নয়। কেননা দেশিয় ভাষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ইত্যাদির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভাষা, সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব সর্বদাই চলছে। এই দ্বন্দ্ব নিয়ে রচিত উপন্যাসই উত্তর-ঔপনিবেশিক। বুর্জোয়া লেখকগণ আঞ্চলিক ভাষা, জীবন, আঞ্চলিক সংস্কৃতি, মূল্যবোধ নিয়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্য নির্মাণ করেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের বুর্জোয়া ঔপন্যাসিকরা এ ধরনের উচ্চাঙ্গের উপন্যাস নির্মাণেও সার্থকতা দেখাতে পারেননি, যদিও লাতিন আমেরিকা বা আফ্রিকান সাহিত্যিকরা তা করতে সক্ষম হয়েছেন।

বাংলাদেশের ছোটগল্পের রূপান্তর

সাহিত্যের শিল্পতত্ত্বের সূত্র যদিও চিরন্তন নয়, বরং আপেক্ষিক এবং রূপান্তরযোগ্য, তবু তাকে অস্বীকার করে সাহিত্য-বিশ্লেষণ অসম্ভব। তত্ত্বের সামনে দাঁড় করিয়েই বাংলাদেশের ছোটগল্পকেও বিবেচনায় আনতে হবে। আমাদের জানা আছে বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্পের উদ্ভব সম্ভব করেছে শিল্প বিপ্লবের অভিঘাত। এর প্রকরণে বৈপ্লবিক বিবর্তন ঘটে পরপর দুটো বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে। যন্ত্রযুগ এবং বিশ্বযুদ্ধ মানবসভ্যতায়, সমাজে এবং ব্যক্তির মননে যে ভাঙাগড়ার কম্পন সৃষ্টি করে তার সঙ্গে অবশ্যই উপনিবেশ এবং উত্তর উপনিবেশিক যুগের সংঘাত যুক্ত হয়েছে। ছোটগল্প তো তারই ফসল। অবাক করার মতো বিষয় এই যে, বিশ্বসাহিত্যে যখন ছোটগল্পের উদ্ভব ঘটে তার খুবই কাছাকাছি সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে বাংলা ছোটগল্পেরও উদ্ভব। তারপরও আমরা দাবি করতে পারি না আজ বিশ্ব ছোটগল্প যেখানে পৌঁছেছে, বিস্ময়কর বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরে, বাংলা ছোটগল্পও ততটা এগিয়েছে। আমাদের বিবেচ্য বিষয় সেটাও নয়, বরং দেখতে চাই বাংলাদেশের ছোট গল্পের রূপ-রূপান্তরের গতি-প্রকৃতি।

ইংরেজ এবং পাকিস্তানি শাসনের যুগকে যদি পরাধীন উপনিবেশ এবং আঞ্চলিক উপনিবেশিক যুগ হিসেবে বিবেচনা করি এবং একাত্তর-পরবর্তী যুগকে ধরি উত্তর-উপনিবেশিক যুগ, তবে অবশ্যই বাংলাদেশের ছোট গল্পকারদের মধ্যে আমরা দুটো স্পষ্ট বিভক্তি দেখতে পাই। একদল উপনিবেশিক যুগের লেখক, অন্যদল উত্তর-উপনিবেশিক যুগের। মোটকথা, যারা একাত্তর-পরবর্তীতে ছোটগল্প লিখতে শুরু করেছেন তারা ভিন্ন অন্য সবাই উপনিবেশিক যুগের লেখক। তাদেরকে শখ করে অনেকে 'নতুন প্রজন্মের লেখক' নামে অভিহিত করেন, যদিও এ বিভাজন ভ্রান্তিমূলক এবং 'উপনিবেশ' শব্দটিকে সুকৌশলে আড়াল করার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপকৌশল মাত্র।

এই রচনায় এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ নেই। আমার বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, এই দুই যুগের লেখকদের শিল্প প্রকরণের গতি নির্ণয়। অবশ্যই কৌতূহল জাগাবে সেসব গল্পকারদের যারা ধারণ করে আছেন একই সঙ্গে দুটো যুগকে। এটাও আমরা দেখব তারা আদৌ উপনিবেশিক যুগের শিল্প চেতনাকে পরিত্যাগ করে উত্তর-উপনিবেশিককালের শিল্পসত্তাকে ধারণ করতে পারলেন কিনা। কেবল বিষয়বস্তু বা কাহিনীগত বিবেচনায় নয়, এই বিবেচনা আসবে গল্পের নব নব আঙ্গিকের বিচারেও। কেননা কাহিনী নয়, বরং আঙ্গিকই ছোটগল্পের প্রাণ। বিজ্ঞানী বা প্রকৌশলী অভিনব কৌশলে আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে যে নব নব বস্তু নির্মাণ করেন তার অবশ্যই থাকে দৃশ্যমান উপাদান। উপন্যাস কিংবা ছোটগল্পেরও ঠিক তেমনি উপাদান থাকে। সেই উপাদান মূলত ত্রিমাত্রিক। রাজনীতি, অর্থনীতি এবং এই দুই উপাদানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ব্যক্তিমানুষ।

উপন্যাস ও ছোটগল্পের পার্থক্য কেবল গঠন কৌশলে, উপাদানে নয়। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই এবং অবাক হই বৈকি, চল্লিশের উপনিবেশ যুগে যারা ছোটগল্প লেখা শুরু করেন তারা সত্তর-আশির উত্তর-উপনিবেশ যুগেও একই জায়গায়ই দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাদের বিপুল অংশই যুগ বিবর্তনকে ধরতে পারেননি যেমনি, তেমনি আঙ্গিক বিবর্তনেও কোনো ভূমিকা রাখতে পারেননি। অবশ্যই দুই-একজন বিস্ময়কর সফলকাম হয়েছেন। তাদের মধ্যে আমরা স্মরণ করতে পারি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে। তাঁর 'নয়নচারা' আর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্প দুটো বাংলাদেশের ছোটগল্পে কেবল বিষয়গত দিক দিয়েই নয়, আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যেও বিস্ময়কর। ষাটের দশকে একটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ছোটগল্পের যে প্রকরণ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলে, বলতে গেলে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। যদি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সেখান থেকে বেরিয়ে না আসতেন তবে তার হাতেও সত্তর-আশির দশকে আমরা উঁচুমানের ছোট গল্প পেতাম না। অবশ্য তার গল্প আঙ্গিক বিচারে চমকপ্রদ সৃষ্টি নয় উপন্যাসের তুলনায়।

চল্লিশ দশক থেকে একেবারে হাল আমলের ছোটগল্প লেখকদের নাতিদীর্ঘ একটি তালিকা তৈরি করে আমরা বাংলাদেশের ছোটগল্পের গতি-প্রকৃতি বিবেচনা করতে পারি। বাংলাদেশে কবিদের সংখ্যা নিয়ে মস্করা-রগড় করলেও গল্পকারদের সংখ্যাও কিন্তু কম নয়। তা হলে দেখা যাক অবস্থাটা। শাহেদ আলী, শওকত ওসমান, আবু রুশদ্, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, সরদার জয়েনউদ্দীন, সত্যেন সেন, জহির রায়হান, শওকত আলী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবু জাফর শামসুদ্দীন, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, রিজিয়া রহমান, মাহমুদুল হক, রশীদ করীম, বশীর আল হেলাল, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, হাসান আজিজুল হক, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবু ইসহাক, আবু বকর সিদ্দিক, আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রাহাত খান, সুব্রত বড়ু

য়া, রশীদ হায়দার, বিপ্রদাস বড়ুয়া, হাসনাত আবদুল হাই, মাহবুব তালুকদার, শহীদ আখন্দ, রাবেয়া খাতুন, আনোয়ারা সৈয়দ হক, দিলারা হাশেম, আবুল মনসুর আহমদ, সেলিনা হোসেন, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আহমদ ছফা, বুলবুল চৌধুরী, মঞ্জুর সরকার, কায়েস আহমদ, তাপস মজুমদার, নয়ন রহমান, ঝর্ণা দাস পুরকায়স্থ, সুশান্ত মজুমদার, জুলফিকার মতিন, হুমায়ূন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, মঈনুল আহসান সাবের, নাসরিন জাহান, জাকির তালুকদার, শহিদুল জহির, হুমায়ূন মালিক, মহীবুল আজিজ, অদিতি ফাল্গুনী, প্রশান্ত মৃধা, আহমেদ মোস্তফা কামাল, মুজতবা আহমেদ মুরশেদ, রাজীব নূর, ইমতিয়ার শামীম, মামুন হুসাইন, মণিরা কায়েস, উম্মে মুসলিমা, হামীম কামরুল হক, শাহনাজ মুন্নী, সেলিম মোরশেদ, শাহদুজ্জামান, কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর, খালেদ হামিদী, রফিকুর রশীদ, আতা সরকার, জাহিদুল হক, পুরবী বসু, মাসুদা ভাট্টি প্রমুখ।

দীর্ঘ সত্তর বছরে তৈরি হওয়া বাংলাদেশের ছোটগল্পের এই দীর্ঘ লেখক তালিকার বাইরেও প্রায় সমসংখ্যক গল্পকার রয়েছেন। এই সত্তর বছরে এই ভূখণ্ডে কী ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক বিবর্তন ঘটেছে তার একটা চিত্র পাওয়া যাবে এই লেখকদের লেখায়। এই তালিকায় নাম থাকা সত্তরপূর্ব লেখকদের সত্তরপূর্ব লেখার বিবেচনা অত্যন্ত জরুরি। সত্তরপূর্ব ছোটগল্পে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, হাসান আজিজুল হক, আবু ইসহাক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শওকত আলী ও জহির রায়হান ছাড়া অনেকের মধ্যেই রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রস্থিত জনমানুষের গতিপ্রকৃতি ধরা পড়ে না। ষাটের দশকে কিছু নাগরিক গল্প তৈরি হয়েছিল পশ্চিমি বাসী হয়ে যাওয়া পরাবাস্তবের নামে। যেগুলো ছিল নাগরিক জীবন নিরাসক্ত, ব্যক্তিমানুষের নাগরিক মানসিক দ্বন্দ্ব বর্জিত হালকা একপেশে জীবনচিত্র। অথচ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন এবং পূর্ববঙ্গে কৃষক-শ্রমিকের লড়াই তাতে যেমন স্থান পায়নি, তেমনি নাগরিক মধ্যবিত্তের ক্রম বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের ঠিকানার যে অন্ধকার যাত্রা তাও চিত্রিত হয়নি। লেখকরা (নাগরিক) তা ধরতেই পারেননি। কেবল বিষয়বস্তু কেন, ছোটগল্পের আঙ্গিক সৃষ্টির বেলায়ও তা ছিল একেবারেই স্থির অর্থাৎ বর্ণনামূলক কাহিনীনির্ভর। ষাট দশকের বাংলাদেশের ছোটগল্পের বড় সংকট ছিল গল্পকারদের সৃষ্ট চরিত্রের জটিল মনস্তাত্ত্বিক টানাপড়েন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকা। লেখকদের দীর্ঘ তালিকার গোড়ার দিকের লেখকদের গল্প যারা পাঠ করেছেন তাদের কাছে বিষয়টি অবশ্যই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

পাঠককে অবশ্যই অতি সতর্কতার সঙ্গে উপনিবেশিক যুগের লেখকদের দ্বারা লিখিত উত্তর-উপনিবেশিক যুগের ছোটগল্পগুলো পাঠ করতে হবে। দেখা যাবে একাত্তর-পরবর্তী সময়ে তারা স্বাধীনতা যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি বিষয়েও গল্প লেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ওই বিষয় সম্পর্কে তাদের বিপুল অংশেরই প্রত্যক্ষ কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। তারা যেমনি থাকেনি ঊনসত্তরের

গণআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তেমনি একাত্তরের যুদ্ধের সঙ্গে। নিরাপদ দূরত্বে বসে কেবলই হালকা চোখে বিষয়গুলো দেখেছে। সে কারণেই তাদের দ্বারা বিশ্বমানের (আঙ্গিকের দিক থেকে) একটিও ছোটগল্প (যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ) লেখা সম্ভব হয়নি। পঞ্চাশের মম্বন্তর নিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'নয়নচারা' গল্পে যা পারলেন চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ নিয়ে পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের লেখকরা তার ধারে-কাছেও যেতে পারেননি। 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প' শিরোনামে উপনিবেশিক যুগের লেখকদের যেসব গল্প প্রকাশিত হয়েছে সে মতে আমরা রুশ লেখকদের ক্ষমতা খুঁজতে চাই না বটে, কিন্তু অভিনব আঙ্গিকে যুদ্ধের গল্প অবশ্যই খুঁজে দেখব। নিশ্চয়ই হতাশ হব। কেননা, সেসব গল্পে কেবলই এসেছে যুদ্ধ, নরহত্যা, ধর্ষণের চিত্র। মুক্তিযুদ্ধের গল্পে এমন একটি চরিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে চরিত্র পরিপূর্ণ একজন মানুষ। কেমন সেই মানুষ? সেই মানুষকে হতে হয় চরম দ্বান্দ্বিক। একই ব্যক্তির ভেতর হাজার ব্যক্তির গোপন অভিসার। কখনো সে যোদ্ধা-বীর, কখনো কাপুরুষ, কখনো হীন স্বার্থবাদী, কখনো আত্মত্যাগী, যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কখনো সে নিজেকে প্রশ্ন করবে–এ যুদ্ধ কেন এবং কার জন্য? এই যে দ্বান্দ্বিক যোদ্ধা, তা কি কোনো ছোটগল্পে তৈরি করতে পেরেছেন কেউ?

আমার এই লেখার গতিপ্রকৃতি যেমনি সীমাতীত নয়, তেমনি বিশ্লেষণকারী হিসেবেও নিজের রয়েছে অনেক সীমাবদ্ধতা। এ রচনায় বিস্তারিত লেখা যেমনি অসম্ভব, তেমনি আমার অর্জিত শক্তিও হয়তো এতদূর যেতে সক্ষম নয়। নিজেও একজন গল্পকার হিসেবে আমার মনে মাঝে মধ্যেই প্রশ্ন জাগে, আমি কিংবা আমরা কি আমাদের ছোটগল্পে এমন একটি চরিত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি, যে চরিত্র পরিপূর্ণভাবেই অতি আধুনিক যুগের, অতি আধুনিক জটিল মানবিক, দ্বান্দ্বিক, মনস্তাত্ত্বিক অভিক্রিয়াকে ধারণ করে? আসলে আমরা পারিনি। অথচ চরম সংকটময় অতি আধুনিক জটিল যুগে আমরা বসবাস করছি। প্রতিদিন অভিনব জীবন জটিলতায় আটকে পড়ছি আমরা এবং আচরণও করছি জটিল দ্বান্দ্বিক। এই যে জটিল মানুষে পূর্ণ এই সমাজ বা রাষ্ট্র তার ব্যাখ্যা তো পুরাতন ভাষাশৈলী, পুরাতন রচনাভঙ্গি, প্রচলিত ছোট গল্পের রূপরীতিতে তৈরি করা সম্ভব নয়। অথচ অনাবিষ্কৃতই রইল অতি আধুনিক জটিল সমাজের জটিল মানুষকে নিয়ে লেখা ছোটগল্পের নতুন আঙ্গিক।

এবার আমরা লেখক তালিকার নিচের দিকে মনোযোগী হতে পারি। এই লেখকেরা সত্তর, আশি, নব্বই বা শূন্য দশকের। এটাও আজ স্বীকার করার সময় এসেছে, বাংলাদেশের ছোটগল্প রূপ-রূপান্ত, আঙ্গিক-প্রকরণে আজ যেখানে এসে পৌঁছছে, তার কারিগর অবশ্যই সত্তর-উত্তর অর্থাৎ স্বাধীনতা পরবর্তী গল্পকাররা। বাংলাদেশের ছোটগল্পের নির্ধারিত অভিনতুন একটি আঙ্গিক ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে, এ দাবি সত্য নয়। তবে পুরাতনকে বর্জন

করে নতুন আঙ্গিক নির্মাণের চেষ্টাকাল এখন বহমান। নব্বই বা শূন্য দশকের গল্পের প্রকরণের দিকে তাকিয়ে আমি দাবিটি তুলছি। আমার বিশ্বাস, আসছে ১০ বছরের ভেতর বাংলাদেশের ছোটগল্প সম্পূর্ণ একটি নতুন রূপ পাবে।

এই আশার ভেতর আশঙ্কাও অনেক। কেননা পুরাতন যখন একদিকে ধ্বংস হতে থাকে, তখন দ্বান্দ্বিক নিয়মেই পাশাপাশি নতুন সৃজনও চলতে থাকে। সৃজনের কাল সরল এক রৈখিক থাকে না, বরং থাকে আঁকাবাঁকা এবং জটিল। আমাদের আশি, নব্বই আর শূন্য দশকের গল্পকারদের সামনে এখন পশ্চিমী সাহিত্যের অভিনতুন শত শত তত্ত্ব হাজির হয়েছে। ওসব তত্ত্ব মোটেই সহজে হজমযোগ্য নয়। অস্থির চিত্ত দিয়ে, বহেমিয়ান জীবন আচরণ দিয়ে এসব হজম করা একেবারেই অসাধ্য। গভীর অনুশীলন, চিন্তার স্থিরতা এবং ব্যক্তিজীবনের শৃঙ্খলাবোধ না থাকলে সেই জটিল সাহিত্য-আঙ্গিককে অর্জন করা অসম্ভব। তরুণ গল্পকারদের মনে রাখতে হবে এই গ্লোবালাইজেশন তাদের অন্ধকার সুড়ঙ্গে নিক্ষেপ করেছে। এখানে সৃষ্টির চেয়ে উন্মত্ততা অধিক, কথার চেয়ে অনর্থ কথা প্রচুর। জীবন অনুসন্ধানের চেয়ে জীবন বিনষ্ট করার মত্ততা অপ্রতিরোধ্য। এর প্রমাণ হালের কিছু কিছু ছোটগল্প। পশ্চিমী শিল্পতত্ত্ব বুঝে না বুঝেই তার প্রয়োগের চেষ্টার মধ্যে কৌতূহল থাকে, সৃষ্টি থাকে না। লাতিনীয় উপন্যাস বা গল্প অন্ধভাবে অনুকরণের ফল আজ স্পষ্ট হয়ে গেছে। যারা অন্ধের মতো এ কাজটা করেছে তারা আসলে নিজেকেই বৃথা অপচয় করে নিঃশেষ করে দিয়েছে। গল্পের আড্ডায় বৃথাই তর্ক হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে সব লেখা। সৃষ্টি রয়ে গেছে অপূর্ণ।

আশঙ্কা রয়েছে হাজারটা। আশঙ্কা বাস করে মগজে। সেই মগজে দাসত্ব ঘাপটি মেরে আছে। উপনিবেশের দাসত্ব। পশ্চিমের দাসত্ব। যে তরুণ গল্পকার জাতীয় স্তরেই পৌঁছার শক্তি অর্জন এখনো করতে পারেনি, তার মগজে কিনা বাস করে আন্তর্জাতিকতা! তাই তো কৃষিভিত্তিক গ্রামের গল্পে পাই ইউরোপের প্রকৃতি, ঋতু, পর্বত সমুদ্র, জীবজন্তুর উপমা। ইংরেজি সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক কল্পকথা, ফ্যান্টাসি, কিংবা ইত্যাদির চরিত্ররা হুবহু নামে, বেনামে যদি ঢুকে পড়ে বাংলাদেশের ছোটগল্পে তবে নৈরাজ্য বৈ কিছুই লাভ হবে না। তরুণ গল্পকারদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তাদের ছোটগল্পের আঙ্গিক নির্মাণের বেলায় যদি ইউরোপ, আমেরিকা, লাতিন কিংবা আফ্রিকার ভূপ্রকৃতি, ইতিহাস, সাগর, নদী এসে যায় উপমা, চিত্রকল্প নির্মাণের উপাদান হিসেবে তবে তা নতুন আঙ্গিক তো নয়ই, আন্তর্জাতিক ঠাঁট-ঢং তো দূরের কথা, বাংলা ছোটগল্পও নয়।

তরুণরা নিজেরাও জানে না কীভাবে তারা প্রভাবিত হয়েছে। বিদেশি বই, চ্যানেল, ফ্যান্টাসি, উদ্ভট কল্পকথায় তাদের মগজ ধোলাই হয়ে গেছে। তারা কি একবারও ভাবে না, যারা সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন বা পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন তারা কেউ তাদের সাহিত্যের চিত্রকল্পের জন্য বাংলাদেশের প্রকৃতি,

মানুষ কিংবা ইতিহাস-ভূগোলের ধারে-কাছেও আসেননি। তারা কি চিত্রকল্প নির্মাণ করেন বনলতা সেনকে ধরে নিয়ে কিংবা নাটোরকে স্মরণ করে? তবে আমাদের দাসত্ব মন এত ব্যাকুল কেন? শিল্প দাসত্বের এই প্রবণতা ভয়ঙ্কর। শূন্য দশকের (কবিদের দেয়া নাম) কোনো কোনো তরুণের গ্রাম আর কৃষকের জীবন নিয়ে লেখা গল্পে যখন আধুনিক নাগরিক গদ্য ভাষা ব্যবহার করা হয়, উপমা যদি আসে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের তবে বড় আক্ষেপ হয়, মাত্র কদিন পূর্বে গ্রাম থেকে শহরে আসা এই তরুণকে কী ভয়ঙ্কর বিভ্রমে ফেলেছে এই ঢাকা শহর ও অতি অবশ্যই স্যাটেলাইটে ভেসে আসা নিউইয়র্ক। গ্রামভিত্তিক ছোটগল্পে সে তো আঁকতে পারত কী করে হাইব্রিড বীজ সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশের উর্বর ভূমিতে ঘটাচ্ছে রক্তক্ষরণ, কীভাবে বিচূর্ণ করছে একজন ব্যক্তি-কৃষককে, কীভাবে বিলুপ্ত করছে তার গৃহপালিত পশুসম্পদ আর তৃণভূমিকে– এসব বুঝতে গেলে রাজনীতি আর অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিবিজ্ঞানেও জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কেবল অলঙ্কার শাস্ত্র পাঠেই চলে না। মৃতদেহ বা নারীর লাশ অলঙ্কারে সাজালে কি শিল্প সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়? অলঙ্কার জীবন্ত মানুষের জন্য যেমনি, ঠিক তেমনি জীবন্ত কন্টেন্টের জন্য চাই অভিনব ফর্ম। উত্তর-আধুনিক তত্ত্ব কেন, কোন উদ্দেশ্যে, কার জন্য তৈরি হলো ইউরোপে এবং কী কী উপাদানে তৈরি হলো, তা না-বুঝে কি উত্তর-আধুনিক গল্প লেখা যায়? উত্তর-আধুনিক তত্ত্ব সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই অথচ প্রচলিত শিল্প আঙ্গিককে অস্বীকার করে গল্প লেখার চেষ্টা করলাম। এর অর্থ তো সৃষ্টি নয়, নৈরাজ্য। এই নৈরাজ্য একজন তরুণ গল্পকারকে ব্যর্থ শিল্পীতে পরিণত করে এবং পরিণতিতে হতাশায় ডুবে গিয়ে সে হয় আত্মঘাতী বা জীবন বিনাশী। ব্যর্থ জীবন বহনকারী আত্মবিচ্ছিন্ন।

আমি স্পষ্ট করে জানাতে চাই, বাংলাদেশের ছোটগল্প এখন পুনর্গঠনের কাল অতিক্রম করছে। মোটকথা, মহাকাশে যেমনি মহাশূন্যতার ভেতর সব প্রাকৃতিক উপাদান মিলে নতুন গ্রহ সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলে, বাংলাদেশের ছোট গল্পেরও সেই কালই চলছে। এতে মাঝে মধ্যে শূন্যতা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এমন আশঙ্কা মিথ্যে যে, ছোটগল্প মরে যাচ্ছে। মরে যাচ্ছে সেই শিল্পবর্জিত ছোটগল্প, যা উপনিবেশ যুগে লিখিত হয়েছে এবং উপনিবেশ যুগের লেখক কর্তৃক উত্তর-উপনিবেশেও লিখিত। কিন্তু নতুন আঙ্গিক তৈরি হচ্ছে স্বাধীনতা-উত্তর লেখকদের মেধা এবং মননে, যারা এটা মানতে রাজি নন, তাদের আমি কষ্ট করে আশি, নব্বই ও হাল দশকের ছোটগল্পগুলো মন দিয়ে পাঠ করতে পরামর্শ দেব।

একথাও জোর দিয়ে বলতে চাই, বাংলাদেশের ছোটগল্পের এ নির্মাণ-বিনির্মাণ, গঠন পুনর্গঠন চলছে স্বাধীনতাপূর্ব গল্পকে অতিক্রম করে, আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে। একথা স্পষ্ট বুঝতে হবে, মানতে হবে, ভাবতে হবে পঞ্চাশ-ষাট দশক আর আজকের দুই হাজার সাত সাল এক নয়। রাষ্ট্র, সমাজ,

ব্যক্তিমানুষ পূর্বের তুলনায় লক্ষগুণ অধিক ভঙ্গুর এবং ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতার শিকার, অস্তিত্ববিনাশী শক্তিগুলো আরো হাজার গুণ বেগবান এবং নৈরাশ্য অতলস্পর্শী। তাই ষাটের মেধা-মননে এবং শিল্প আঙ্গিকে এই জটিল জীবন বাস্তবতাকে রূপ দেয়া অন্তত ছোটগল্পে সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই বুঝি অবশ্যম্ভাবী নতুন সৃষ্টিলগ্নের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে নবতর অভিঘাতগুলো। এদেরই ধারক নিরীক্ষাধর্মী তরুণ গল্পকারেরা।

-২০০৭

নিশ্চিন্দিপুর : ঔপনিবেশিক ভূমিতল

প্রাচীন এবং মধ্যযুগকে পেছনে ফেলে বাঙালির আধুনিক যুগে প্রবেশ ঘটে ঔনিবেশিক অধীনতার জোয়াল কাঁধে। যে বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিকাঠামোর প্রস্তুতিপর্ব চলে আধুনিকতায় অনুপ্রবেশের জন্য, বাঙালির তা ঘটেনি। কলোনিয়াল বাস্তবতাই জাতিটির ঘাড়ে আধুনিকতাকে চাপিয়ে দেয়। এই অবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় বাঙালি কলোনিয়ালিজমের আদর্শের ভিতরই আধুনিক সাহিত্যের চর্চা শুরু করে। তাই আরোপিত রোমান্টিসিজম নিয়ে বাঙালির উপন্যাসের যাত্রা। বঙ্কিম-উত্তর বিভূতিভূষণকে কিন্তু আমরা দেখতে পাই পরাধীন যুগের রাজনৈতিক বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে, সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজমকে অস্বীকার করে আকণ্ঠ রোমান্টিসিজমে ডুবে যেতে। তার প্রকৃতিবিমুগ্ধতায় যতটা আছে নিবিড় প্রশান্তি, তার চেয়েও অধিক রয়েছে ব্যক্তিক এবং নৈর্ব্যক্তিক মিশ্রণে তৈরি এক জটিল দুঃখবাদ আর গভীর বিষণ্নতার জগৎ।

বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের আখ্যানস্থল নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম তো বিপন্ন মানুষেরই বিষণ্ন ভূমিতল। আত্মভোলা নিস্তরঙ্গ বৈরাগ্য চর্চার তপোবন। কিন্তু লেখকের অলক্ষে নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম তো প্রতীক হয়ে উঠে এসেছে ঔপনিবেশিক বাংলার রস নিংড়ানো ভগ্নবিচূর্ণিত গ্রাম্য আর্থ-সামাজিক কঙ্কালচিত্রের। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচণ্ড অভিঘাতে মুঘলি, সুলতানি কিংবা নবাবী বাংলার স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন গ্রাম্য অর্থনীতির স্থিতাবস্থা ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। সামন্তবাদের রক্ষক উপনিবেশবাদী ইংরেজের হাতেই আবার সামন্ত বাদের ক্ষয়ও শুরু হয়, কিন্তু ইতিহাসের যা অনিবার্য, সেই পুঁজিবাদেরও বিশুদ্ধ বিকাশ ঘটছে না। নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম তো সেই সাক্ষ্যই বহন করছে। লেখক বিভূতিভূষণ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন কৃষিভিত্তিক বাংলার সেই অস্থির সময়কে। যেহেতু তিনি রাজনীতি-নিরপেক্ষ, তাই গ্রাম্য দরিদ্র-অসুখী মানুষগুলোর অপ্রাপ্তির দুঃখকে নৈর্ব্যক্তিক প্রকৃতির আশ্রয়ে মুক্তির ঠিকানায়

তুলে দিতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতিবিমুগ্ধতার ভেতর কল্পিত এক সুখের জগতের সন্ধান দিতে গিয়ে তিনি বরং অব্যক্ত এক দুঃখের জগতেই টেনে নিলেন মানুষকে। বোধকরি লেখক প্রকৃতিবিমুগ্ধ চিরকালের দুঃখী বাঙালির দার্শনিক প্রবণতাকেই উপন্যাসে স্পষ্ট করতে চেয়েছিলেন।

'নিশ্চিন্ত' শব্দটির অর্থ হচ্ছে চিন্তাহীন বা উদ্বেগশূন্য। নিশ্চিন্তপুরের অপভ্রংশই হচ্ছে নিশ্চিন্দিপুর। অর্থাৎ এমন একটি জনপদ, যেখানে মানুষের জীবন সুখের। মনে রাখতে হবে বাংলার গ্রামগুলোর নামকরণের পেছনে উদ্দেশ্য এবং বাস্তবতার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু বিভূতিভূষণ এমন এক নিশ্চিন্দিপুরের বর্ণনা দিতে গিয়ে ইন্দির ঠাকরুণের মতো চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন উপন্যাসের শুরুতে, যেখানে ভূগোলের পাশাপাশি ইতিহাসও হাত ধরাধরি করে এগিয়ে আসে। ইন্দির ঠাকরুণের জীবন তো নির্ধারণ করে দেয় প্রাক-ইসলাম এবং প্রাক-ইংরেজ যুগের বর্বর আর্যব্রাহ্মণ্য কৌলীন্যবাদ। তার দীর্ঘ সত্তর বছরের জীবন তো বাঙালির সমাজবশ্যতা আর আত্মনিগ্রহের সময়কালেরই সাক্ষী।

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে নিশ্চিন্দিপুরকে মানুষের বাসযোগ্য একটি নিরাপদ গ্রাম-জনপদ বললে ইতিহাস অশুদ্ধ হবে না। তার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে গ্রামটির পরিত্যক্ত কিংবা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া জনবসতির নিদর্শনে। হরিহরের বাস-অযোগ্য ভগ্নপ্রায় পাকা বাড়িটি কী প্রমাণ করে? ইংরেজ শাসন আর শোষণে মানুষ হারিয়েছে তার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। হাজার বছরের পুরোনো অর্থনৈতিক কাঠামোটি ভেঙে পড়লেও নতুন কাঠামোর ভিত তৈরি হচ্ছে না। কেবলই চলে ভাঙনের পালা, সৃষ্টির নতুন ধারা অস্পর্শই থেকে যায়। এই ক্ষয়মান কাঠামোর ভিতর হরিহরের সংসারে ইন্দির ঠাকরুণের আশ্রয় লাভ ইতিহাসেরই অংশ।

আর্যব্রাহ্মণ্যবাদী কৌলীন্যপ্রথা তো ব্রিটিশ যুগেও বহাল ছিল, ওখানে ইংরেজ হাত বাড়ায়নি। কেননা এই প্রথা ইংরেজ শাসনের জন্য, তার টিকে থাকার প্রশ্নে বেশ মানানসই ছিল। এতে রয়েছে বর্ণ বিভক্তি, শ্রেণী বিভক্তি, যা ছিল সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে। ঔপনিবেশিক রাজনীতি আর অর্থনীতির কারণে কৌলীন্যপ্রথায় সংকট সৃষ্টি হলেও শাসকদের এ নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না। 'পূর্বদেশীয় এক নামজাদা কুলীনের সঙ্গে ইন্দির ঠাকরুণের বিবাহ হইয়াছিল। স্বামী বিবাহের পর কালেভদ্রে এ গ্রামে পদার্পণ করিতেন। এক-আধরাত্রি কাটাইয়া পথের খরচ ও কৌলীন্য সম্মান আদায় করিয়া লইয়া, খাতায় দানা আঁকিয়া পরবর্তী নম্বরের শ্বশুরবাড়ি অভিমুখে তল্পিবাহকসহ রওনা হইতেন, কাজেই স্বামীকে ইন্দির ঠাকরুণ ভালো মনে করিতেই পারে না।'

বোঝা গেল কৌলীন্যপ্রথাটা কী। কিন্তু কৌলীন্যপ্রথার শিকার হয়ে কোনো নারীকে তো প্রাক-উপনিবেশ যুগে আশ্রয়হারা হতে হয়নি। পিতার সংসারে তাদের এক ধরনের সম্মানের আশ্রয় ছিল। ঔপনিবেশিক শোষণ বাংলার সেই

সনাতনী সামাজিক রীতিকে আঘাত করে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। তাই ইন্দির ঠাকরুণদের হতে হয় আশ্রয়হীনা, মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হয় অমর্যাদার ভেতর। ইন্দির ঠাকরুণগণ লাঞ্ছিত হন ভাই-বৌ সর্বজয়াদের হাতে। সর্বজয়াদের ক্ষমতা-ভালোবাসা, সহানুভূতিশীল দৃষ্টি আর দুঃখ-কষ্টকে আপনজনের সঙ্গে ভাগ করে নেয়ার পুরাতন মূল্যবোধ তো ভেঙে খান খান করে দেয় ঔপনিবেশিক স্বার্থবাদী মূল্যবোধ। ওই যে বাঙালির চিরকালীন পারিবারিক আর আত্মীয়বন্ধনের স্বার্থহীন মমতা তা তো লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় ঔপনিবেশিক আদর্শের নোংরা হাতে।

যে হরিহর, সর্বজয়া, অপু, দুর্গার দুঃখ-কষ্ট আর করুণ পরিণতির কথা পথের পাঁচালীতে কথক বিভূতিভূষণ বর্ণনা করে আবেগতাড়িত বাঙালিকে কাঁদানোর প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, তিনি কিন্তু একটি পরম সত্যকে ফাঁস করে দেন। লেখক জানাচ্ছেন হরিহরের পূর্বপুরুষ বিষ্ণুরাম রায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধাভোগী জমিদার প্রাচীন ধনী বংশ চৌধুরীদের নিষ্কর ভূমিদান লাভ করেই গ্রামে বসত গেড়েছিল। পরবর্তী সময়ে তার উত্থান যে দস্যুবৃত্তি, খুন, লুণ্ঠনের সঞ্চয় দ্বারা সম্ভব হয়েছিল, তাও জানান লেখক। 'বহু জমিদার ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের অর্থের মূলভিত্তি যে এই পূর্বপুরুষের ধনরত্ন... বিষ্ণুরাম রায়ের পুত্র বীরু রায়ের এই রূপ অখ্যাতি ছিল। তাহার অধীনে বেতনভোগী ঠ্যাঙাড়ে থাকিত।'

মনে রাখতে হবে এই ঠ্যাঙাড়েদের নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লিখেছেন। প্রশ্ন থাকছে এসব ঠগী, ঠ্যাঙাড়ে, জলদস্যুরা কি কেবল মুঘল, পাঠান যুগেই ছিল, নাকি ইংরেজ যুগেও ছিল? পর্তুগিজ, ফরাসি, ইংরেজ জলদস্যুদের পরিচয়টা কী? ওরা কি বাংলার দরিদ্র শ্রেণীর বাগদি, বউরি ভাড়াটে দস্যুশ্রেণী? দস্যুবৃত্তিতে আধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার তো ঔপনিবেশিক কৌশলেরই দান। ঔপনিবেশিক অর্থ আর রাজনৈতিক বাস্তবতা যখন বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত বিচূর্ণ করে দেয়, তখন তো আমরা আধুনিক শিক্ষাবঞ্চিত, কৃষিকাজে অনভিজ্ঞ হরিহরকে দেখতে পাই ভবঘুরের মতো। তার কোনো স্থিতিশীল অর্থনৈতিক জীবন নেই। পূজা বা শাস্ত্রজ্ঞানী হতে সে গ্রাম ছেড়ে 'পশ্চিমে' চলে যায়। নববিবাহিতা স্ত্রী সর্বজয়ার প্রতিও তার দায়িত্ববোধটুকু থাকে না। সর্বজয়া পড়ে থাকে পিতার সংসারে। দীর্ঘদিন পর হরিহর 'পশ্চিম হইতে নাকি খুব লেখাপড়া শিখিয়া' গ্রামে ফেরে। নিজের দায়িত্ববোধ থেকে নয়, বরং 'সেদিন সে গ্রামের সকলের পরামর্শে শ্বশুরবাড়ি স্ত্রীকে আনিতে গিয়েছিল।'

এই তো হচ্ছে বিভূতিভূষণের হরিহর। এমনি আত্মভোলা, উদাসীন দায়িত্বজ্ঞানহীন বাঙালির শাসক হতে পেরে ইংরেজেরও বেশ স্বস্তি ছিল। কোন সে বাঙালি গোষ্ঠী লুটেরা দস্যু ইংরেজ শাসকের জন্য ছিল নিরাপদ? যাদের শান্তির একমাত্র স্বর্গ আপন গৃহকোণের কাল্পনিক সুখ, সেই সুখ স্বপ্নে ডুবে থাকা বাঙালি। স্ত্রী সঙ্গে প্রথম মিলন রাতে আমরা হরিহরের ভেতর চিরকালের

বাঙালিকেই আবিষ্কার করতে পারি, 'হরিহরের মনে হইল বাংলার এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তের বাঁশবনের ছায়ায় একখানি স্নেহব্যগ্র গৃহকোণ যখন তাহার আগমনের আশায় মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অভ্যর্থনাসজ্জা সাজাইয়া প্রতীক্ষা করিত, কিসের সন্ধানে সে তখন পশ্চিমের অনুর্বর অপরিচিত মরু পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে গৃহহীন নিরাশ্রয়ের ন্যায় ঘুরিয়া মরিতে ছিল!' আপন ক্ষুদ্র সীমানার বাইরে বাঙালি হরিহরেরা তো চিরকালই ভীতসন্ত্রস্ত। স্বপ্নে যাদের 'স্নেহব্যগ্র গৃহকোণ' তাদের জীবন বাস্তবতার ভেতর 'অনুর্বর অপরিচিত মরু পাহাড়' কিংবা 'গৃহহীন নিরাশ্রয়' তো অনতিক্রম্য ভয়ঙ্কর বিভীষিকার মতো। ওসবকে জয় করার আত্মশক্তি কই?

নিশ্চিন্দিপুরের ঔপনিবেশিক গ্রামটিকে চিনতে হলে অবশ্যই আমাদের অপুর সঙ্গে সরস্বতী পূজার বৈকালে গ্রামের বাইরের মাঠে নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে বের হতে হবে। কেননা চিরকালের বাঙালি তো শ্রম-মেধার বাইরে প্রকৃতির নীলকণ্ঠ পাখি দর্শনের ভেতর আপন সৌভাগ্যের অনুসন্ধান করেই কাল কাটাল। উপন্যাসজুড়ে প্রকৃতির এতটাই ঘন বিস্তৃতি যে, মানুষ যেন ক্রমেই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বামন হয়ে গেছে। তাই মানুষের অর্জিত মনুষ্যত্বের মহিমা ক্ষুদ্র হয়ে যায় প্রকৃতির বিশালত্বে। বাঙালির এই প্রকৃতি মুগ্ধতা ঔপনিবেশিক কালকে যেমনি দিয়েছে স্থিতিশীলতা, তেমনি দান করেছে দীর্ঘায়ু। তাই তো ছয় বছরের শিশু অপুর চোখ আর মর্ম দিয়ে দেখা নীলকুঠির জ্বালাঘর এবং ওই মাঠটা তো বিভূতিভূষণ এবং চিরকালের ভাবুক বাঙালিরই চোখে দেখা, 'ঐ মাঠের পর ওদিকে বুঝি মায়ের মুখের সেই রূপকথার রাজ্য? শ্যাম-লঙ্কার দেশ বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গাছের নিচে... জগতের শেষ সীমাটাই এই। ইহার পর হইতেই অসম্ভবের দেশ, অজানার দেশ শুরু হইয়াছে।'

মনে হয় নীলকুঠির স্মৃতিবিজড়িত বেঙ্গল ইন্ডিগো কনসারনের বিশাল হেডকুঠির ধ্বংসাবশেষ বাঙালির চোখে ইতিহাস আর বস্তুবিশ্বের বিপরীতে ব্যক্তির মৃত্যু শোক দুঃখ বিষণ্ণতার দার্শনিকতা। ওখানে কবর ফলকে লেখা আছে– Here lies Edwin Lermor. The only son of John & Mrs. Lermor, অথচ ঔপনিবেশিক শোষণ-নির্যাতন আর বাংলার কৃষি বিপর্যয়ের রক্তাক্ত ইতিহাস যে এই নীলকুঠি, তা চলে যায় বোধের বাইরে। নীলকুঠির ধ্বংস তো সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস নয়, ইংল্যান্ডে কৃত্রিম নীল আবিষ্কার রয়েছে এর পেছনে।

যে নীলচাষ বাংলার কৃষিব্যবস্থাকেই ধ্বংস করে দিল তার সাক্ষ্যও উপন্যাসটিতে রয়েছে অন্য বৃত্তের আড়ালে। ওই যে লেখক বারবার বর্ণনা দিচ্ছেন ধ্বংসপ্রাপ্ত পরিত্যক্ত পাকা ভিটের এবং হাহাকার করছেন হারানো পরিবারগুলোর জন্য, আসলে ওরা তো বাংলার নীলচাষজনিত কারণেই বিলীন হয়ে গেছে। সেই কুঠি রোমান্টিক লেখক বিভূতিভূষণের মনের অজান্তেই বাস্তব ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। লেখক বলছেন, 'সেকালের কুঠিটা যেখানে

প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় হিংস্র জন্তুর কঙ্কালের মতো পড়িয়াছিল...।' এখানে তো স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঔপনিবেশিক হিংস্র জন্তুটার রূপ যা নিশ্চিন্দিপুরকে গ্রাস করেছিল।

ওই যে সেই চিনিবাস ময়রা, মিষ্টির গন্ধে যার পেছনে বৃথাই ছুটে বেড়াত অপু-দুর্গা, তার সম্পর্কে উপন্যাসে যে বয়ান রয়েছে তা তো মিথ্যে নয়। এমন কোনো দ্রব্যের ব্যবসা নাই যা করেনি, কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। কেন? 'পুঁজি কম হওয়ায় কিছুতেই সুবিধা করিতে পারে না, অল্প দিনেই ফেল মারিয়া বসে।' পরাধীন বাঙালি খুদে ব্যবসায়ী তো ফেল মারবেই। পুঁজি তো ইংরেজ ব্যবসায়ীদের দখলে। ওখানে কি বাঙালির স্থান হয়?

ঔপনিবেশিক নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম তো পরাধীন বাংলারই প্রতীক। শোষণ-নির্যাতনে অর্থব্যবস্থা পড়েছে ভেঙে। তৈরি হতে পারেনি স্বাধীন ব্যবসায়ী শ্রেণী। নবগঠিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বেকার ওই শহরে, গ্রামের ভূমিহীন ধর্মপেশাজীবী আধুনিক শিক্ষাবঞ্চিত হরিহরের তবে কোন উপায় হবে? অর্থনীতি ভেঙে পড়া গ্রামে হরিহর পূজা করে, মন্ত্র দিয়ে দীক্ষাগুরু সেজে পঙ্গু গ্রাম্য সমাজে কত টাকা আয় করতে পারে? যুগের তুলনায় যে অনেক পিছিয়ে, ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ যেখানে তার পেশাকে অর্থহীন করে দিয়েছে, সেখানে তার স্ত্রী সর্বজয়া তো ভাগ্যবাদী হতে বাধ্য। ধ্বংসপ্রাপ্ত মজুমদার বাড়ির পরিত্যক্ত পুকুর পাড়ে বেলোয়ারী কাচের টুকরো পেয়ে তার সন্তানেরা হীরক ভেবে বাড়ি ফিরলে সর্বজয়াও ঈশ্বরের কৃপাপ্রার্থী হয়– যেন তা সত্যিকারের হীরকখণ্ড হয়, 'দোহাই ঠাকুর... বাছাদের দিকে মুখ তুলে তাকিও।'

এভাবেই তো ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ মানুষকে নিঃস্ব করে এবং তার সব লুণ্ঠন করে, আত্মশক্তি বিনষ্টের ভেতর তাকে বানায় ভীরু ভাগ্যবাদী, ঈশ্বরের কৃপাপ্রার্থী। বাঙালির ব্যর্থ ব্যবসার প্রমাণ তো প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের অতি তুচ্ছ মুদির দোকান। ওখানে তো এক পয়সার সৈন্ধব লবণ বেচা-কেনা হয়। ওখানেই বিকেলে বসে অলস বাঙালির আড্ডা। দীনুপালিত আর রাজু রায়গণ সেই মানুষ। ওই রাজু রায় বাণিজ্যের জন্য সমুদ্র পাড়ি দেয় না, শিল্প কারখানা গড়ে না, বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস স্মরণ করে আষাঢ়ের হাটে তামাকের দোকান খোলে। মাদকদ্রব্য তামাক সেবন করেই তো বাঙালি জমিদার হলো, সোনার তৈরি হুক্কায় টান দিয়ে বনেদি রক্ষা করে নিঃশেষ হয়ে গেল। ইংরেজ তো আর বাঙালির জন্য তামাক সেবনের নেশার জোগানদার ছিল না, ছিল বিলেতের চুরুট আর চা-কোম্পানির মালিক। ইংরেজ সেই নেশার খবরটা জানত বলেই তামাকের পাশাপাশি চায়ের কাপের পাশে আফিম, সিগারেট এলো বাঙালির ঘরে ঘরে। বঙ্কিমের কমলাকান্তকে না চেনার কথা নয় তাদের।

বিভূতিভূষণ সেই ঔপনিবেশিক বশ্য-দাস্য মনের বাঙালির দৃষ্টির পরিচয়ও তুলে ধরেন প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের সেই অলস আড্ডায়। ঔপনিবেশিক বাঙালির

দেশ ভ্রমণের ভূগোল এবং অর্জনকেও তিনি নির্দেশ করেন। 'কোথায় দ্বারকা, কোথায় সাবিত্রী পাহাড়, কোথায় চন্দ্রনাথ, তাহা আবার একা দেখিয়া তাহার (সান্যাল মহাশয়ের) তৃপ্তি হইত না, প্রতিবারই স্ত্রী-পুত্র লইয়া যাইতেন এবং খরচপত্র করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া ফিরিতেন।' না, পথের পাঁচালীর বাঙালির ভ্রমণ ঠিকানা দুর্গম পর্বত, অজানা সমুদ্র, অচেনা দূর দেশ নয়। উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন নয়, বরং পরকালের জন্য পুণ্য অর্জন, ধর্মস্থান বা তীর্থ ভ্রমণের মহাপুণ্য। ঔপনিবেশিক পরাধীনতা যে মূল্যবোধ সৃষ্টি করে বাঙালির অন্তরে, সেখানে পুণ্যার্থে অর্থব্যয় করে সর্বস্বান্ত হতেও দ্বিধা নেই। এই বাঙালির কল্পনাজগতে পরাধীনতার এমন এক জগৎ তৈরি হয় যা শিশু অপুর মতোই, 'পৃথিবীপৃষ্ঠে যাহাদের ভৌগোলিক অস্তিত্ব কোনোকালে সম্ভব ছিল না, শুধু এক অনভিজ্ঞ শৈশব মনেই সে কল্পজগতের প্রস্রবণ পর্বত তাহার সতত-সঞ্চরণমান মেঘজালে ঢাকা নীল শিখরমালার স্বপ্ন লইয়া অক্ষয় আসন পাতিয়া বসিল।'

বিভূতিভূষণ অপুর চোখ দিয়ে তৎকালের বাঙালির যে অর্থনৈতিক বাস্তবতার চিত্র আমাদের দেখান, তা তো চিরকালের ঔপনিবেশিক শক্তির একটি সভ্যতাকে ধ্বংসেরই সাক্ষ্য বহন করে। 'অনেকদিনের জীর্ণ পুরাতন কোঠাবাড়ির পুরাতন ঘর। জিনিসপত্র, কাঠের সেকালের সিন্দুক, কটা-রঙের সেকালের বেতের প্যাঁটরা, কড়ির আলনা, জলচৌকিতে ঘর ভরানো।' অথবা 'সেই ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক, অন্ধকার বাঁশবন, ঝোপ-জঙ্গলের অন্ধকার ঝিঙের বিচির মতো কালো। পোড়ো ভিটেবাড়ি, আরো অজানা কত কী বিভীষিকা!' অথচ বাংলার এই পরিণতির ভিতর দিয়ে বাংলারই লুণ্ঠিত সম্পদে ইংরেজের ইংল্যান্ডে ঘটে গেল শিল্প বিপ্লব। এ যেন ধর্ষিত নারীর অবৈধ গর্ভ জন্ম দিল অন্যের সন্তান। অপুর শকুনির ডিম মুখে পুরে শূন্যমার্গে বিচরণ করার স্বপ্ন তো অসুখী বাঙালির মাটির পৃথিবীর বাইরে কল্পলোকের শূন্যতায় সুখ সন্ধানেরই বাস্তবতা।

যে সমাজের চাওয়া-পাওয়ার পূর্ণতা আপন ঘরে অপূর্ণ থেকে যায়, সে ব্যক্তি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না বস্তুবিশ্বে, সে তো এবং সেই সমাজ তো প্রকৃতির ভেতর অতিপ্রাকৃত কল্পলোক-সৌন্দর্যে সুখসন্ধানী। এভাবেই তো চিরকালের বঞ্চিত বাঙালি শূন্য আকাশে, প্রকৃতির বৃক্ষলতায়, লোকপুরাণের ধূসর জগতে সান্ত্বনা খুঁজেছে। আজো খোঁজে। আশ্রয় নেয় ধর্মে, কেননা, প্রকৃতিটা তো আগের মতো নেই। ধর্মটা আছে প্রতাপের ভেতর।

বিভূতিভূষণ আমাদের রেলগাড়ির মধ্য দিয়ে এক নতুন সভ্যতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। যে রেললাইন, সংবাদবাহী তার এবং কয়লা-জ্বালানি চালিত এ্যাঞ্জিল, সে তো অপু-দুর্গা নয় কেবল, গ্রাম বাংলার ভয়, বিস্ময়, শ্রদ্ধার বিষয়। ওর গন্তব্য এক নগর থেকে অন্য নগর, তারপর সমুদ্র বন্দর। সে কেবল জনবাহক নয়, পণ্যবাহক, বাণিজ্যিক পণ্য। কী তার মহিমা? 'খুব লম্বা, অনেকগুলো চাকা, সামনের দিকে কল, সেখানে আগুন দেওয়া আছে, ধোঁয়া

ওড়ে... রেললাইনের ধারে কোন খড়ের বাড়ি নাই, থাকিতে পারে না, পুড়িয়া যায়।'

বাস্তব সত্য। ঔপনিবেশিক সভ্যতার বাহক এই রেললাইন। সে যে কেবল সুখী মানুষকে বহন করে দূর-দূরান্তে নিয়ে যায় তা নয়, অসুখী বঞ্চিত জীবন যুদ্ধে পরাজিত মানুষকেও জন্মভিটে থেকে তুলে নিয়ে যায় অজানা অনিশ্চিত জীবনের দিকে। হরিহর পরিবারের বাহক তো এই রেলগাড়ি। কিন্তু সে সহ্য করে না দারিদ্র্যকে, দরিদ্রকে, খড়ের বাড়ি ঘরকে, পুড়ে ছাই করে দেয়। তার সখ্য নগরের সঙ্গে, সুখী নাগরিকের সঙ্গে। দুর্গাকেও সে সহ্য করেনি। তার জন্য তৈরি করে ঘাতক ব্যাধি ম্যালেরিয়া। এই বাংলায় ইংরেজের রেললাইন যে বন্যা আর জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে তার ফলেই একদিন বাঙালির ঘরে ঘরে জীবাণুবাহক মশারা জন্মে আর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় মানুষকে। রেললাইন-পূর্ব বাংলায় ম্যালেরিয়া কী, বাঙালি দেখেনি। দুর্গার অকালমৃত্যু তো ঔপনিবেশিক তথাকথিত সভ্যতারই ফল।

বাংলার সনাতন সমাজ আর কৃষি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে উপনিবেশ এমন এক নতুন শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে, যে শ্রেণী ইংরেজের অনুগত, আজ্ঞাবাহী। এই নতুন মহাজন, জোতদার, জমিদার শ্রেণীর উপার্জনের উৎস হচ্ছে গ্রাম, ব্যয়ের স্থান হচ্ছে নগর। ওরাই পূজা-পার্বণে-নানা উৎসবে গ্রামে ফিরে গ্যাসের বাতি জ্বালিয়ে মানুষের দৃষ্টিশক্তিকে পতঙ্গের আগুনে আত্মাহুতির মতো বিভ্রান্ত করে দেয়। ছিন্নমূল মানুষ খাদ্য আর আশ্রয়ের সন্ধানে ওই গ্যাসের আলো অন্তরের স্বপ্নে ছড়িয়ে ছুটে যায় শহরে এবং অচিরেই পরিণত হয় নাগরিক বর্জ্যে। হরিহরের তো তাই ঘটে!

একটি স্বাধীন দেশের নগর আর পরাধীন দেশের নগর তো এক নয়। পরাধীন বঙ্গের নগরে তো সে সব নেটিভদেরই সমাদর যারা ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত, ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের সহায়ক। কিন্তু হরিহর? সে তো পুরোহিত। দেবতা শাস্ত্র আর শিষ্য যার আয়ের উৎস। তাই তার জন্য কলকাতা বাণিজ্য আর প্রশাসনিক নগর নয়। ধর্ম, তীর্থ, দেব-দেবী আর শাস্ত্র-পুরাণের নগর কাশী। ঔপনিবেশিক প্রজা হরিহরের শ্রম বিক্রির বাজার যেমনি বিনষ্ট হয়ে গেছে গ্রামে, তেমনি সে তীর্থ শহরে কাশীতেও উদ্বৃত্ত। ওখানে ভীষণ প্রতিযোগিতা।

পরাধীন দেশে জাগতিক দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তির জন্য শাসকেরা মানুষকে তীর্থমুখী যেমনি করেছে, তেমনি শাস্ত্র-ধর্মপেশাজীবীদেরও ভিড় বাড়িয়ে দিয়েছে। হরিহর সেখানে দেখে কেবল অপার সমুদ্র। প্রতিযোগিতায় হেরে সে হয়ে যায় কথক, পুরাণের কাহিনীর কথক। তবু হরিহর এবং তার স্ত্রী সর্বজয়া মেয়ে দুর্গার মৃত্যুশোককে চাপা দিয়ে সুখী হতে চায়, ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধ জীবনের স্বপ্ন দেখে। হরিহরের স্রষ্টা বিভূতিভূষণ তো সেই স্বপ্নের কুহকে তার মাঝে সর্বদা জাগিয়ে রাখতে চান, 'জীবন বড় মধুময় শুধু এইজন্য যে, এই মাধুর্যের

অনেকটাই স্বপ্ন আর কল্পনা দিয়ে গড়া। হোক না স্বপ্ন মিথ্যা... তাহারাই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ...।' মিথ্যা কী করে সম্পদ হয়?

দুর্গার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে হরিহর পরিবারের নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম পরিত্যাগ আমাদের কাছে মোটেই ব্যক্তির মৃত্যুর পার্শ্বক্রিয়া নয়। এটি হচ্ছে একটি পরিবারের জীবন-অস্তিত্বের মূল উৎপাটনের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক নিঃস্বকরণের বিষক্রিয়া। মূলকে ছেদন করে মানুষের আশ্রয় ভূমি বিচ্ছিন্ন করার যে কলোনিয়াল কৌশল এবং পরিণতিতে তাদের নোংরা পচা গলগলে নগর বর্জ্যে পরিণত করা, তারই দৃষ্টান্ত হরিহর, পরিবারের অনিশ্চিত রেলযাত্রা। এভাবেই তো কলোনিয়াল সিটি কলকাতাকে গড়েছিল ইংরেজরা। একথা কি মিথ্যে যে, গঙ্গা-তীরবর্তী পতিতালয়গুলো একই প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেছিল?

অবচেতন মনেই বিভূতিভূষণ আমাদের আরেক ভয়ঙ্কর বাস্তবতার মধ্যে নিক্ষেপ করেন। ওই যে সতুর কাছ থেকে বই পেয়ে 'অপু হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল'– ওই স্বর্গটা কী? ওই স্বর্গ তো কলোনিয়াল বিভেদমূলক মূল্যবোধের ধারক বাঙালি লেখকদেরই সৃষ্টি। বাংলা বিজয়ী ইংরেজ মিথ্যা এক ইতিহাসের সুড়ঙ্গে নিক্ষেপ করে লেখকদের। তারই ফসল 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' কিংবা 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা'। ওখানে আছে সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের অন্ধকার এক জগত। বিমুগ্ধ অপু পাঠ করে, 'সরোজিনীকে (হিন্দু রমণী) সঙ্গে লইয়া সরোজ নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদে যাইতেছেন, পথে নবাবের লোকে (মুসলমান) নৌকা লুটিয়া তাহাদের বন্দি করিল।... গভীর রাত্রে কক্ষের দরজা খুলিয়া গেল, নবাব মত্ত অবস্থায় কক্ষে প্রবেশ করিয়া।...

কলোনিয়ান শোষণ নির্যাতন এবং গ্রাম নিঃস্বকরণের মধ্য দিয়ে তীর্থ শহর কাশীর স্বপ্নে আচ্ছন্ন না হওয়ার কথা নয় হরিহর আর সর্বজয়ার। গ্রামের উপবাসী-কষ্ট তাদের স্বপ্ন দেখায়, 'এদেশ (নিশ্চিন্দিপুর) অপেক্ষা কাশীতে... জিনিসপত্রও সস্তা... সেসব সোনার দেশে কখনো কাহারো অভাব নেই...।' কিন্তু জীবন-বাস্তবতা এই, একজন নগরজীবনে অনভ্যস্ত আনাড়ি আধুনিক শিক্ষাবঞ্চিত বাঙালির পক্ষে সেই স্বপ্নের জীবনের ঘাটে ভেড়া অসম্ভব। তবু নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে যেতে হয়। ওই যে অপু রানুদিকে বলেছিল– 'সে কি নিজের ইচ্ছাতে দেশ ছাড়িয়া যাইতেছে?'– এটাই পরম সত্য। ইচ্ছাটা তো কলোনিয়াল নির্দয় বিধিবিধানের। তবু মাটি সংলগ্ন বাঙালি মন (হরিহরের) দ্বিধায় ডুবে যেতে চায়, 'কতদিনের পৈতৃক ভিটা... মাটির প্রদীপ টিমটিম করিতেছিল, আজ সন্ধ্যা হইতে চিরদিনের জন্য নিবিয়া গেল।' তারপরও মিথ্যে স্বপ্নটায় আশ্রয় খুঁজে মরা, 'সর্বজয়ার মনে হইল যা কিছু দারিদ্র্য, যা কিছু হীনতা, যা কিছু অপমান সব রহিল পিছনে পড়িয়া– এখন সামনে শুধু নতুন সংসার, নতুন জীবনযাত্রা, সব সচ্ছলতা।'

কিন্তু একথা ওরা কেউ ভাবতে পারছে না হীনতা, দারিদ্র্য অপার অপমানকে পেছনে ফেলা যায় না, ওরা সঙ্গী হয় পথের। কেননা, ওরা যেখানে

যাচ্ছে ওটা আরো জটিল নাগরিক কলোনি, স্বাধীন ভূমি নয়। অথচ ট্রেনে চেপে অপুর যে অনুভূতি, তাই পরম সত্য! কারা অপুকে নিশ্চিন্দিপুর থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে? অপু ওদের না চিনলেও আমাদের চিনতে কষ্ট হয় না; ওই ঔপনিবেশিক নির্দয় বাস্তবতা। তবু তো মৃত দুর্গার উদ্দেশ্যে বলতে হয় অপুকে, 'আমি চাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছে করে ফেলেও আসিনি– ওরা আমায় নিয়ে যাচ্ছে।'

সেই তীর্থ শহর, ক্ষুদ্র ধর্মরাষ্ট্র কাশীতে আমরা কী দেখতে পাই? পুণ্যার্থী দেশিয় রাজ্যের মহারানী, সোনার কারুকার্য করা মহারানীর শাড়ির আঁচল 'আরতির পঞ্চপ্রদীপের আলোয় আগুনের মতো জ্বলিতেছিল।' হ্যাঁ ওরাই তো ইংরেজ উপনিবেশের রক্ষক-সমর্থক। আর কাদের সাক্ষাৎ ঘটে? জমিদার, কন্ট্রাক্টর ওরাও আছে উপনিবেশের সুবিধাভোগী দেশিয় শ্রেণী। পরগাছা বটে।

জন্মমাটি বিচ্ছিন্ন কাশীর পরবাসে সুখের মিথ্যে স্বপ্ন দেখে দেখে অকালে অপূর্ণ আর ব্যর্থ জীবনের গ্লানির বয়ে যার মৃত্যু ঘটে সেই হরিহরকে আমাদের চেনা জানা বোঝা খুবই জরুরি। আমরা দেখলাম উপনিবেশ তার এক বশ্য প্রজাকে কীভাবে একেবারে ছাঁচে ঢেলে তৈরি করেছে। একজন ব্যক্তিত্বহীন, মেরুদণ্ডহীন, নির্বিরোধ, জীবন বৈরিতার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণকারী মানুষ হচ্ছে হরিহর। তার স্ত্রী যে নিঃসম্বল, দীনহীন, তার ওপর বিধবার বেশ যার, সে তো সংস্কারের দাস। নিশ্চিন্দিপুরে ফেরা হয় না তার ওই বৈধব্য লজ্জার কারণেই।

বৈধব্য বুঝি ভয়ঙ্কর, পুরুষের অধিকারমুক্ত নারীজীবন বুঝি দুর্বিষহ সর্বজয়ার কাছে। তাই সেই লজ্জা থেকে আত্মরক্ষার জন্য সর্বজয়া বেছে নেয় দাসত্ব, দাসীর কাজ। সেই দাসত্ববরণ করেই কাশীতে বেড়াতে আসা এক বিত্তবান পরিবারের পেছনে হেঁটে ছেলের হাত ধরে কাশী পরিত্যাগ করে সর্বজয়া। এই দাসত্ববরণে আত্মসমর্পণ করার শিক্ষাটা কোথায় পেল সর্বজয়া? সেই কলোনিয়াল মানস জগৎ থেকেই তো! ওরাই কলোনির বশ্য অনুগত প্রজা। দ্রোহশূন্য, আত্মজিজ্ঞাসাহীন ক্ষুদে মানব।

আর অপু? আমাদের অপেক্ষা বুঝি দীর্ঘতর হয়। দেখতে হয় ওই বড়লোকের বাড়িতে দাসীপুত্রের লাঞ্ছনা, অপমান, শারীরিক নির্যাতন। 'পথের পাঁচালী' পেরিয়ে আমরা 'অপরাজিতা'য় প্রবেশ করলে যে অপুকে স্পষ্ট দেখতে পাই সে তো আমাদের পূর্বের চেনা-শোনা অপুই। জীবন অসফল দুঃখবিলাসী অধ্যাত্ম-আশ্রয়ী চিরকালের দুঃখী, বিষণ্ন এক বাঙালি। ঔপনিবেশিক দাসত্বের রক্ত যার ধমনীতে, মানুষের অসুখী সংসারের জটিল জগত থেকে মুক্তির জন্য যে পালাতে চায় প্রকৃতির ভেতর অতিপ্রাকৃতের জগতে, তার কি মুক্তি আছে? যাকে কেবলই দূরে হারিয়ে যাওয়া নিশ্চিন্দিপুর ডাক দেয়, সোনাডাঙ্গার মাঠ, বাঁশবন, কদমতলার সায়েরের ঘাট আর দেবী বিশালাক্ষী, তাকে কি সুখী করতে রাজি কলোনিয়াল শহর কলকাতা?

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসজুড়ে এত মৃত্যু, এত শোক, এত হাহাকার। নীরব প্রকৃতির অতিপ্রাকৃত রূপের মধ্যে এত অদৃশ্য অরূপ, তার আকর্ষণ থেকে বাঙালির মুক্তি বড় সহজ নয়। বাঙালি আছে, নেই আজ কেবল অপুর দেখা সেই বিস্ময়ের প্রকৃতির লীলা। বিগত উপনিবেশের গোপন রক্তবাহী বর্তমান বাঙালি বর্বরদের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সোনাডাঙ্গা মাঠ, ইছামতীর তীর, মধুখালী বিলের পদ্মফুল আর বেত্রবতীর খেয়াঘাট। হারিয়ে গেছে শিরীষ সোঁদাদি বন, নাটাকাঁটার ঝোপ, বনকলমির ফুল, বন অপরাজিতার নীল ফুল, অক্রুর মাঝির মাছ ধরার দোয়াড়ি, ঠাকুরঝি পুকুর, কালো মেঘের জঙ্গলের ঝিঁঝি পোকা, জগডুমুর গাছের লক্ষ্মীপেঁচা আর ওড়কলমির ফুল। নির্যাতিত হয়ে ওই যে অপু চোখের জলে প্রার্থনা করেছিল, সে তো মিথ্যে নয়– 'আমাদের যেন নিশ্চিন্দিপুর ফেরা হয় ভগবান, নৈলে বাঁচবো না।'

বাঙালি কি আর কখনো নিশ্চিন্দিপুর ফিরে যেতে পারবে? না, পারবে না। পেছনে নয়া উপনিবেশের, বিশ্বায়নের কণ্ঠস্বর, 'অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া করে এনেছি। চল এগিয়ে চল।' তো, কোথায় যাবে বাঙালি? তার তো নিশ্চিন্দিপুর নেই। ঠিকানা নেই প্রশান্তির আশ্রয়ের! নিকট, দূর, নিবাস, প্রবাস সবখানেই দাসত্ব!

বাঙালির সাম্রাজ্যহীন উপনিবেশ

শস্যভূমি এবং মাতৃভূমি– কুণ্ডলীর আড়ালে সাপের ডিমের মতো বাঙালির সর্বসত্তাকে ঘিরে আছে। এই অনড়-অপরিবর্তনীয় জৈব বৈশিষ্ট্য বাঙালিকে দান করেছে ভাববাদী দার্শনিকতা, দেয়নি দূরদর্শী জীবন জিজ্ঞাসা। তৃষ্ণা জাগায়নি অন্তরে, বিবর্তন ঘটাতে আপনাকে অস্তিত্বের প্রশ্নে। শস্যভূমির শস্যের মতোই ভূমি থেকে উদ্ভূত এই জনজাতি পলল ভূমিতে খুঁজে বেড়ায় জীবনের ব্যাখ্যা। তার আর্থ-সমাজ রাজনীতির ঘূর্ণিপাকের মতো মাটির তৈরি মাতৃভূমির সীমানাকে লঙ্ঘন করতে পারেনি। সে তো সত্যি পারে না বেদুইনের মতো নাঙা তরবারি হাতে দিগ্বিদিক ছুটে যেতে। যদি ছোটে পশ্চাতে, সে যেন করুণা প্রার্থী, আশ্রয়প্রার্থী শেকড়হীন প্রবাসী হয়ে স্বজাতিকে ছাড়িয়ে আত্মোন্নতির সংকীর্ণ আশায়।

বাঙালি রূপকথার জগতের মানব। সে বিজ্ঞান কল্পকথার অলীক স্বপ্নের মানুষ। প্রাচীন বাঙালির রূপকথার রাজপুত্র রাজ্যজয়ের জন্য নয়, বরং দয়িতা হারানো কিংবা রাজকন্যার বিরহে কাতর হয়ে আত্মশক্তির বদলে মন্ত্রশক্তির অলীকে পঙ্খিরাজ ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে যায়। সেই বাঙালি যদিওবা সমুদ্র পাড়ি দেয়, বাণিজ্য কিংবা রাজ্যজয়ের জন্য নয়, বরং তীর্থ ভ্রমণ কিংবা ধর্ম প্রচারের জন্য। শ্রীলংকা কিংবা যবদ্বীপকে ধর্মের চোখে দেখছে এই নরগোষ্ঠী, আবার প্রচার ভ্রমণ শেষে ফিরেও এসেছে আপন মাটির কোলে। বাঙালির অতীশ দীপঙ্কর সুদূর দুর্গম তিব্বতে চলে যান পায়ে হেঁটে, রাজ্যজয়ের বদলে বুদ্ধের অহিংস প্রেমবাণীর শিক্ষা দিতে।

রূপকথার রাজপুত্র যে দূর পর্বতারণ্যে প্রেতপুরী থেকে দানবের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতে রাজকন্যাকে উদ্ধারের পর দেশে ফিরে আসে, এতে বাঙালি বড়ই প্রশান্তি অনুভব করে। যদি না ফিরত রাজপুত্র, ওখানেই রাজকন্যাকে নিয়ে সুখে দিন কাটাত, তবে বাঙালির বড় অসুখের কারণ হতো। সে তো চায় তার রাজপুত্র দেশে থাকুক, পাশে থাকুক। রূপকথার স্বপ্নতাড়িত বাঙালি তাই

তো আজো রাজপুত্র চায়, রাজকন্যা চায়। ওই যে রাজকন্যা পরমা রূপবতীকে চায়, তা তাদের নিজের জন্য নয়; রাজপুত্রের ভোগের জন্য। রাজপুত্রের সুখেই যে তাদের সুখ। হোক তা গণতন্ত্র, তাতে কী, রাজার পুত্রকে সমর্থন দিয়ে সিংহাসনে বসালে যেন সব পাওয়া হয়ে যায়। এই যে রাজ-আনুগত্য, বংশানুক্রমিক শাসকের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা-বিশ্বাস, তার মূলে রয়েছে সেই অতীত ঐতিহ্য; রাজপুত্রের স্বপ্নলোক। তা না হলে রূপকথার রাজা আর রাজার পুত্রের দুঃখে কেঁদে বুক ভাসাবে কেন বাঙালি? রাজা নয় বরং অনুগত আজ্ঞাবাহী প্রজা হিসেবে টিকে থাকার দৃষ্টান্ত বাঙালির মতো আর কোন প্রজা-জাতি আছে এই ধরাধামে? এমন বিদ্রোহশূন্য অনুগত প্রজা? রাজদর্শন তো বাঙালির কাছে ঈশ্বর দর্শনের মতো।

আজ যে বাঙালির নিজেদের দেশ বা রাজ্য আছে তার ভৌগোলিক সীমানার সৃষ্টি কি বাঙালির হাতে? এ দেশ-রাজ্যের সীমানা তো নির্ধারিত হয়েছে পরজাতি, পরভাষী শাসকদের হাতে, সেই প্রাগৈতিহাসিক কালে। বাঙালির সবচেয়ে বড় কীর্তি এবং অবশ্যই মহান সৃষ্টি হচ্ছে গ্রাম। নদীর ধারে, বন বা জলাধারের পাশে শস্যভূমি বেষ্টিত যে গ্রামের উদ্ভব, তার স্রষ্টা বাঙালি। ক্ষুদ্র গ্রামের বাইরে বৃহৎ রাজ্যের প্রশাসনিক মেধা বাঙালির যেমনি অতীতে ছিল না, আজও নেই। এই ক্ষুদ্রতা বাঙালির চেতনাকেও প্রসারিত হতে দেয়নি।

একথা চরম ও পরম সত্য যে, হাজার হাজার বছর ধরে বাঙালির যে চলমান জীবনধারা তাতে দেখা যায়, সে সর্বদাই রাজা বা শাসকের অনুগত হয়েও দূরে বহুদূরে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে। রাজদর্শন যেমনি তার পুণ্যেও, তেমনি ভয়ের। তার সাহিত্যে পাওয়া যায়– যে ব্যক্তি শ্মশান কিংবা রাজদরবারে বাঙালির সঙ্গী হয় সেই প্রকৃত বন্ধু। এতেই রাজার সঙ্গে প্রজা হিসেবে বাঙালির ভয়-ভক্তির সম্পর্কটা বোঝা যায়। সে কারণেই প্রাচীন কবিকে জানাতে হয় বাঙালি ডুমনীর ঘর নগরের বাইরে টিলার উপর গ্রামপ্রান্তে। ওই যে বাঙালির হাসি-তামাশার গল্প গড়ে উঠেছে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আর গোপাল ভাঁড়কে নিয়ে, এর তাৎপর্য কী? যদিও সবই অতিকল্পনা, তবুও বোঝা যায় রাজার কাছে প্রজা গোপাল মোটেই সম্মানের পাত্র 'ভদ্রলোক' বাঙালি নয়, নিতান্তই ভাঁড়, এই গোপাল ভাঁড়ামি করেই চলেছে কৃষ্ণনগরের রাজদরবারে যখন, তখন পাশেই পলাশীর প্রান্তরে বাঙালির স্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছে ইংরেজ ক্লাইভ। রাজাও তাঁর সুধা পানে মত্ত।

এই ভাঁড় আর কূপমণ্ডূক বাঙালি রাজা-প্রজা আবার সংসারে নিরাসক্ত বাউলও বটে। বাইরের জগতে নয়, বরং আপন সংকীর্ণ জগতে বিচরণ করেই বাঙালি সুখ পায়। তাই তো লালনকে আক্ষেপ করতে হয় খাঁচার ভিতরের অচিন পাখিকে পায়ে বেড়ি না দেবার কারণে। রবীন্দ্রনাথও আক্ষেপ করেন, যিনি হিয়ার ভিতর লুকিয়ে আছেন তাঁকে দেখতে পাননি বলে। আরো

আক্ষেপ–*বাহির পানে চোখ মেলেছি/হৃদয় পানেই চাইনি*। এই যে সংসার নিরাসক্ত বাঙালির আধ্যাত্মজগৎ তাতেই খানিকটা নাড়া পড়ে ইংরেজ শাসনামলে। ইউরোপের আধুনিকতা এবং নাগরিক চেতনা বাঙালিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফেলে। আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা ও ইউরোপীয় জীবন দর্শনে বিমুগ্ধ হয় যে বাঙালি, তারা বৃহৎ অংশের অতিক্ষুদ্র দল। গ্রাম থেকে শহর-কলকাতায় উঠে আসা এই শ্রেণীটির সঙ্গে গ্রামের আত্মার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। নগর জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এই বাঙালিকে চেনা যায় সেকালের রচনায়। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' নয় কেবল, জানাটা হয় মাইকেল, প্যারিচাঁদ এবং তৎকালের লেখকদের প্রহসন নকশা রচনা পাঠ করলে। প্রকৃত অর্থে পরাধীন বাংলায় এরাই ছিলেন রাষ্ট্রহীন বাঙালির প্রথম অভিজাত গোষ্ঠী। সনাতন গ্রাম বিচ্ছিন্ন এই শ্রেণীটির পক্ষে গ্রামের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ আর সম্ভব ছিল না। কিন্তু একটি বিষয় ভাবলে অবাক হতে হয় যে, মধ্যযুগ থেকেই শাসক শ্রেণীর বাইরে বাঙালির অভিজাত ক্ষুদ্র অংশটির মানসলোক আচ্ছাদিত ছিল আপন শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং শাসক জীবনের স্বপ্নলোকে বিচরণ করার প্রবণতা। মাইকেলের ইংরেজ কোট-টাই, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজা রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ আরো অনেকের নবাবী জামানার পাগড়ী এবং অপরাপর পোশাক-আশাক বড় কৌতূহল সৃষ্টি করে। ব্যাপারটা এই যে, ভেতরে প্রজা, কিন্তু বাইরে নবাব-বাদশা-রাজা-ভাইসরয়, কিং, লর্ড-এর স্বপ্ন। যেন নিজেদের শাসকগোত্রীয় শ্রেণীভুক্ত করার ভেতর রয়েছে আলাদা প্রাপ্তিসুখ।

এই যে প্রজার ওপর রাজার সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, তাতে সে সব বাঙালিই আক্রান্ত হয়েছে যারা রাজবাড়ি বা রাজধানীর সংলগ্ন ছিল। সমাজের বৃহৎ অংশ রাজনগর থেকে বহুদূরে বৃক্ষ আর শস্যভূমির আড়ালে প্রকৃতির ভেতর প্রাকৃত হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু যারা পরাধীন এই বাংলায় ইংরেজি শিখে রাজা হতে চাইল, নবাব হতে চাইল, ইংরেজ সরকার তাদের স্বপ্ন অপূর্ণ রাখেনি। কেউ পেলেন রাজা পদবি (রাজা রামমোহন), কেউ পেলেন প্রিন্স (প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর), কতজনই তো পেলেন খান বাহাদুর, রায়বাহাদুর পদবি। ইংরেজ রাজা দীন-হীন প্রজা বাঙালিকে বঞ্চিত করেনি, অনেককেই করে দেয়া হলো নবাব (ঢাকার নবাব), বানানো হলো জমিদার শাসক, ইংরেজ শাসকের অধীনে ভৃত্য শাসক। রাজ্যহীন বাঙালি বিনাযুদ্ধে লাভ করল রাজ্য, জমিদারী রাজ্য। অন্য রকম উপনিবেশ।

কিন্তু বাঙালি ডেপুটিরা, কোম্পানির বড় চাকুরেরা কী করবেন? তাদেরও কি ইংরেজ হবার সাধ কম ছিল? কালো বাঙালির বর্ণে না হোক, ক্ষমতা না হোক, মন-মননে ইংরেজ হতে দোষ কী? বঙ্গ-ভারত যদি শাসক ইংরেজের উপনিবেশ হতে পারে, শাসিত অভিজাত শ্রেণীর বাঙালির অন্তত 'উপনিবাস' তো থাকতেই হবে। এ ক্ষেত্রে জমিদারী উপনিবেশের মালিক রবীন্দ্রনাথকে

শ্রদ্ধা না জানালে বাঙালি জাতি অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথই একমাত্র বাঙালি যিনি পৈতৃক সূত্রে জমিদারী উপনিবেশ লাভ করেও সৃষ্টিশূন্য অসল ভোগবাদী হয়ে ওঠেননি। ইংরেজ হবার চেষ্টা তাঁর মধ্যেও ছিল তবে শাসক ইংরেজ নয়, আধুনিক চিন্তা-চেতনার ইংরেজ। বিস্ময়কর এই যে, জোড়াসাঁকো বা শান্তি নিকেতন নয়, বরং তাঁর উপনিবেশ শিলাইদহ, শাহজাদপুর কিংবা আসাম-দার্জিলিং দিয়েছে তাঁকে সৃষ্টির প্রেরণা। সেসব বাংলো বা কাছারিবাড়ি রবীন্দ্রনাথের ভোগবিলাসের আবাসন ছিল না, ছিল সৃষ্টির উৎসভূমি, এ ক্ষেত্রে জমিদার টলস্টয়ের খানিকটা মিল আছে বৈকি তাঁর সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথ থেকে মাইকেল এবং আরো অনেকের ওই যে বিলাত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরার বাসনা যদিও ওই মানস ইংরেজ উপনিবেশেরই দান, তবু তা ব্যর্থ হয়ে যায়। নজরুলের বেলায় যে বিলাত গিয়ে ব্যারিস্টার হবার চেষ্টাটা হতো, এমনটা দাবি করা যায় না। বাল্যে পিতৃহীন, মায়ের পুনর্বিবাহ পারিবারিক অবহেলার পরিণতিতে 'দুখু মিঞা' হয়ে যান তিনি। সত্যি কি নজরুল দুখু মিঞা ছিলেন? বর্ধমানের অভিজাত কাজী পরিবারের এই কবিকে কেন বাঙালি সাহিত্যিকরা পাঠকের কাছে করুণার পাত্র করে রাখলেন? বিধবা মায়ের সঙ্গে চাচার বিবাহে ক্ষুব্ধ নজররুল পারিবারিক অবহেলার শিকার আত্মভোলা নজরুল কি ক্ষুধার জন্য দারোগা বা রুটির দোকানে চাকর বনেছিলেন?

বহুদেশে রেনেসাঁস যে অভিজাত শ্রেণীটি তৈরি করেছিল, সেই কলকাতা কেন্দ্রিক অভিজাতদের কথা শরৎচন্দ্র যুগের বা রবীন্দ্র যুগের গদ্য সাহিত্যে নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। রাতে মশা, দিনে মাছির সেই কলকাতা শহর-গ্রাম থেকে আসা নব্য অভিজাত নব্য নগরবাসীকে মুগ্ধ করলেও প্রশান্তি দিতে পারেনি, পারেনি সুস্বাস্থ্যের অধিকার দিতে। কলকাতার ম্যালেরিয়া তাড়িত করত অভিজাত বাঙালিকে উপনিবেশের ভেতর উপনিবেশ গড়তে। সেই উপনিবেশ কেবল যে শরীর রক্ষার বিষয় ছিল তা নয়, বরং আভিজাত্যটাই ছিল বড় বিষয়। বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী সেই এলাকা, সাঁওতাল পরগনা (বর্তমান ঝাড়খণ্ড প্রদেশ) ছিল বাঙালির উপনিবেশ।

সে যুগে কে না গড়েছেন উপনিবাস সাঁওতাল পরগণায়? রবীন্দ্রনাথ, কবি কামিনী রায়, প্রশান্ত মহলানবিশ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বিদ্যাসাগর, আশুতোষ মুখার্জী, এমনকি কবি বিষ্ণু দে পর্যন্ত। সাঁওতাল পরগণার গিরিডিহি ছিল ব্রিটিশ বঙ্গে পরাধীন বাঙালি নগরবাসী অভিজাত প্রজার উপনিবাস। তাঁরা বাড়ি তৈরি করেছেন, বছরের একটা সময় পরিবার পরিজন নিয়ে কলকাতাকে দূরে ঠেলে চলে এসেছেন এখানে। যদিও প্রজা নয়, স্থানীয় নেটিভ দরিদ্র সাঁওতালেরা ছিল বাঙালি ভদ্রলোক বাবুদের চাকর-নফর। শাসক ইংরেজদের চোখে নেটিভ বাঙালিরা যেমন ছিল তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের, তেমনি বাঙালি নাগরিক এলিটদের চোখে স্থানীয় সাঁওতালেরাও ছিল তাই। আজো তো তাই।

কাল বয়ে চলে মহাকালের দিকে ধেয়ে। আজ ঔপনিবেশিক বাংলার উনিশ-বিশ শতকের সেই অভিজাত পরিবারগুলো প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হয় বিলুপ্ত, নয় তো মহামানবের মহাস্রোতে ওদের বংশধরেরাও হারিয়ে গেছে। ইতিহাসের এই নীরব নির্মমতার সাক্ষী কেবল নগর কলকাতাই নয়, সাঁওতাল পরগণার সেইসব উপনিবাস। কেবল যে জমিদার, ব্রিটিশ আমলা, কবি-সাহিত্যিক, পণ্ডিত বাঙালিরাই হারিয়ে গেছে তা নয়, চাকরি বা ব্যবসার জন্য যারা গিয়েছিলেন সাঁওতাল পরগণায়, তারাও সাঁওতাল পরগণার মাটিতে লীন হয়ে গেছে। বাঙালিদের স্মৃতিময় সেসব বাড়ি কালের করাল গ্রাস থেকে যা রক্ষা পেয়েছে, সে সবও হাত বদল হয়ে গেছে, কেয়ারটেকারগণই মালিক বনে গেছে। পুরাতন জীর্ণ বাড়ি ভেঙে যারা আধুনিক বাড়ি করেছে, আজকের বাঙালি তাদের অচেনা, অনাত্মীয়, পরজন এবং পরভাষী-বিভাষী।

সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয় এই, পরাধীন যুগের কলকাতায় বাঙালি অভিজাত শ্রেণীর যে সুখের দিন ছিল, সে দিন আজ স্বাধীন রাষ্ট্রের নগর কলকাতায় বলতে গেলে নেই। এই শহর এখন অবাঙালি ব্যবসায়ীদের মুঠোয়। আধুনিক স্থাপত্যকলার নিদর্শন নতুন নতুন বাড়ির মালিক অবাঙালিরা। অথচ শাসক ইংরেজ প্রভুর স্থপত্য কৌশলে মুগ্ধ বাঙালি কেবল চোখ নয়, হৃদয় দিয়েই অনুভব করেছিল কলকাতার বুকে গড়ে ওঠা ব্রিটিশ প্যাটার্নের বাড়িগুলোকে। মুগ্ধ হয়েছিল বাড়ির লনে বিদেশি ফুলের রূপরস গন্ধে। বাঙালি তাই গ্রিক স্থাপত্যে বাড়ি তৈরি করল, বিলেতের মতো লালরঙ ইটের নকল বাড়ি গড়ল সাঁওতাল পরগনায়। উপনিবেশের অহংকার নিজেদের অজান্তেই ফুটিয়ে তুলল প্রতিটি বাড়িতে। নগ্ননারীর পাথরের মূর্তি, হিংস্রজন্তুর রক্তনেশার মূর্তিতে আপন ইচ্ছা অর্থাৎ প্রভুর শাসিত হয়েও প্রভু হবার মাতাল নেশা পেয়ে বসেছিল বাঙালিকে।

স্বাধীনতার ভেতর দিয়ে বাঙালি অভিজাতগণ হারাল সাঁওতাল পরগনার উপনিবেশ। তাদের সাধের নাটমন্দির, দুর্গা মন্দির আজ রূপান্তরিত হয়েছে অবাঙালির দেবতা হনুমানজির মন্দিরে। আজ সেখানে কোন বাঙালি রমণী বিলেতে ব্যারিস্টারি পাঠরত সন্তানের মঙ্গল কামনায় সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে দেবতার কাছে মাথা নত করে না। দেবতার বদল হয়েছে। দুর্গা, তুলসী, কালী দেবীকে বিদায় করে জবরদখল করেছে রাম কিংবা হনুমান দেবতা। আসলে ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা নগরীর অভিজাত বাঙালির সুবর্ণ যুগের অবসান ঘটেছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজধানী দিল্লি সরে যাবার ভিতর দিয়ে, কলকাতাকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু কেমন সম্পর্ক ছিল আপন উপনিবেশের সঙ্গে বাঙালির? নিশ্চয়ই ঔপনিবেশিক প্রভু ইংরেজেরই মতো।

বাঙালি যা করেনি তা হচ্ছে শোষণ নির্যাতন; করার তার উপায়ও ছিল না। বাঙালিতো সাঁওতাল পরগনায় গেছে শরীরের রোগবালাই সারাতে, শরৎচন্দ্রের ভাষায়– 'চ্যাঞ্জে গিয়াছে'। সেই যাত্রা এবং বসবাস বাঙালিকে

দিয়েছে নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশ, সুন্দর-সুস্থ আবহাওয়া, অনাবিল প্রশান্তি। এত সস্তায় দরিদ্র সাঁওতালদের ভক্তি, ভয়, শ্রদ্ধা ও সেবা কোথায় পেত তারা? আর যেত তারা প্রশান্তির দিন কাটাতে। কেবল যে আজকের দিনে তা তো নয়, অতীতেও পারিবারিক জীবনটা বাঙালির শুরু থেকে শেষটা মোটেই অবিচ্ছিন্নভাবে শান্তিতে কাটেনি। তাই উনিশ-বিশ শতকের বাঙালিকে কিছুদিনের জন্য কিংবা জীবনের শেষপ্রান্তের অবশেষ সময়টা কাটাতে কলকাতা ছেড়ে যেতে হতো আপন উপনিবেশে। সেই সাম্রাজ্যহীন উপনিবেশ বাঙালিকে দান করত সংসার বৈরাগ্যসিক্ত প্রশান্তি। বিদ্যাসাগর এর দৃষ্টান্ত। পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি তো সাঁওতাল পরগনাতেই সবকিছু পেছনে ফেলে শেষ জীবনটা কাটিয়েছিলেন। একুশ শতকের রূপ গেছে বদলে। এখন যেতে হয় বাইরে, উপজীবিকা ও উপনিবাসের উদ্দেশ্যে। লন্ডন নিউইয়র্কে বাঙালির উপনিবেশ আছে। রাষ্ট্রহীন, সাম্রাজ্যহীন বাঙালি উপনিবাস। একুশ শতকের এসব বাঙালি উপনিবেশকে কেউ আর বাঙালি কলোনি বলতে চায় না, বলে বাংলা টাউন, চাইনিজরা যেমনি বলতে ভালোবাসে চায়না টাউন। ওই সব বাঙালি উপনিবেশে কি শাসক আছে? আছে কি রাজা? না, নেই। থাকার সুযোগ নেই। আছে কেবল প্রজা, কালো বর্ণের প্রজা। ওরা গতর খাটা মানুষ, শ্রম দেয় দৈনিক ১২/১৪ ঘণ্টা, ক্লান্ত শরীরে উপনিবেশে ফিরে আসে ঘুমের জন্য, প্রজননের তাগিদে। সেই পুরাতন ভৃত্য, প্রভুর দেশে, নতুন সাজে। পুরাতন ভৃত্যের নতুন পোশাক, নতুন প্রজন্ম।

বাংলাদেশ। নতুন দেশ। নতুন শ্রেণী। অভিজাত শ্রেণীটিও নতুন। চিরচেনার ভেতর যেন কত অচেনা। বাঙালি এই নতুন এলিট শ্রেণীর সঙ্গে তাদের উনিশ-বিশ শতকের পূর্বপুরুষের চিন্তাচেতনা জীবনযাপনে কোন মিলই নেই। অতীত শ্রেণীটির উদ্ভব ঘটেছিল পুরাতন ঔপনিবেশিক যুগে, প্রভু সাদা ইংরেজের পাশাপাশি থেকে। ওরা তাদের জন্য গড়েছিল ইংরেজি স্কুল আর বিশ্ববিদ্যালয়, অবশ্যই সংস্কৃত টোল আর আরবি মক্তব-মাদ্রাসার বদলে। আজ নতুন এলিটগণ নিজেরাই গড়ছে ইংরেজি মাধ্যমের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। টাকাটা অবৈধ কালো, কিন্তু পাঠ্য সিলেবাস বিশ্বায়ন। ব্যবসা বাণিজ্য, হোটেল সেবা, যোগাযোগ, শিক্ষা যেন এমন, মানুষকে সেবাদাস বানাও, মুনাফার শ্রমিক বানাও।

তাই আজ বাঙালি দেশের ভিতর তো বটেই, দূর দেশে চলে যাচ্ছে পুঁজি আর মুনাফার দাস সেজে সেবাদান করতে। গ্লোবাল অর্থনেতিক ম্যাজিকে যে শোষণ চলছে তার সহযোগী হতে গিয়ে এক শ্রেণীর বাঙালি সম্পদশালী হয়ে উঠেছে। প্রভু হবার এক অন্ধ বাসনা তাকে তাড়া করছে। রাজধানী শহরের বাইরে সে চায় আপন সাম্রাজ্য বিস্তার করতে। তাই তো ধনী বাঙালি উপনিবেশ গড়তে ছুটে যায় সমুদ্রদ্বীপে, সেন্টমার্টিন কিংবা কক্সবাজার কাপ্তাই। ওখানে ওরা জমি কিনে তৈরি করে সুরম্য প্রাসাদ। কেমন দেখতে সে সব

বাড়িঘর। ঠিক যেন প্রভুর চোখে দেখা, প্রভুর রুচিতে স্বপ্ন রচনা করা সে সব বাড়ি নিয়ে। ওই লন্ডন, নিউইয়র্কে প্রভুর স্থাপত্যকলা মুগ্ধ করেছে চোখ, অন্ত রে জাগিয়েছে প্রভু হবার বাসনা, তা পূর্ণ না হলে কি চলে?

বাংলাদেশের নব্য এলিট-ধনীরা বাংলা নয়, বিচিত্র সব ইংরেজি নামে উপনিবেশ তৈরি করছে রাজধানীর কাছাকাছি জয়দেবপুর, শ্রীপুর, পুবাইল ইত্যাদি জায়গায়। ১০/২০ বিঘার জমি ঘিরে স্বপ্নের সেই সাম্রাজ্য– রাজনগর। কী নেই সে সবে? ভোজনালয়, পানশালা, সভামঞ্চ, নৃত্যমঞ্চ, সুইমিংপুল, প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদি। উনিশ-বিশ শতকের বাঙালি অভিজাত শ্রেণীর উপনিবেশ ছিল সৃষ্টিশীল চর্চার স্থান, আর আজকের এসব উপনিবেশ বহুবিধ প্রয়োজন মেটায়। একদিকে চরম ভোগবাদী উচ্চ শ্রেণীর অবসর কেন্দ্র নয় ওসব, আরো অধিক। ব্যবসা-বাণিজ্য-রাজনীতি ইত্যাদিকে সামনে রেখে এসব উপনিবেশে বিদেশি মেহমানদের নিয়ে আসা হয় যেমনি, তেমনি উচ্চ শ্রেণীর পারিবারিক বা ব্যক্তিগত উৎসব অকল্পনীয় ব্যয়ের মধ্য দিয়ে সংগঠিত হয়ে থাকে। নগর সভ্যতার বাইরে গ্রাম্য পরিবেশে এ ধরনের উপনিবেশের অধিকারী হবে বাঙালি তা কি ভাবতে পারত ১৯৭১ সালের পূর্বে?

আজকের এই উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা-দীক্ষা তথা সাংস্কৃতিক মান নিয়ে প্রশ্ন তোলা থেকে বিরত থাকাই সংগত। কেননা এদের উদ্ভবের কাল ও স্থান বিশ্বপুঁজির আগ্রাসনের হিসাবটাই মূল বিবেচ্য বিষয়। এরা এসেছে যুদ্ধের ভিতর দিয়ে স্বাধীন হওয়া ক্ষত-বিক্ষত দেশের দরিদ্র সমাজ থেকে। মানুষের স্বপ্ন ভেঙে গেছে, স্বাধীনতার স্বপ্ন। গণতন্ত্র হয়েছে লুণ্ঠিত। স্বৈরাচারের বিজয় ঘটেছে। দেশ এখন সাম্রাজ্যবাদের পদানত হয়েছে, তা ঔপনিবেশিককালের চেয়েও যেমনি জটিল তেমনি ভয়ংকর। তাই আজকের বাঙালি নব্য ঔপনিবেশিক সাহেব বাবুরা মোটেই তাদের পূর্বপুরুষ বাবুর মতো স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য উপনিবেশে আসা-যাওয়া করে না। তাদের আসা-যাওয়া নিতান্ত ই ইন্দ্রিয় ভোগের কারণে। তাদের উপনিবেশকে ঘিরে যে দরিদ্র গ্রামের মানুষ তারা আদিবাসী সাঁওতাল নয়, বরং সমরক্তবাহী সমভাষী স্বধর্মী কৃষক সমাজ। কেমন সম্পর্ক হতে পারে তাদের সঙ্গে এসব অভিজাতদের? সম্পর্কটা অবশ্যই বন্ধুত্বের নয়। বরং বৈরী। দরিদ্র কৃষকগুলো জানে যে কোন দিন এরা হাত বাড়াবে তাদের চৌদ্দপুরুষের ভিটায়, ধানের জমিতে, সাধের মৎস্য খামার প্রকল্পের প্রত্যাশায়। তাই নীলকর সাহেবদের সঙ্গে স্থানীয় কৃষক বা নেটিভদের যে সম্পর্ক ছিল, বাংলাদেশী নব্য ধনী অভিজাতদের সঙ্গেও স্থানীয় বাঙালি দরিদ্র কৃষকদের বা নেটিভদের একই সম্পর্ক।

এই নব্য উপনিবেশবাদী বাঙালির সঙ্গে পুরাতন বাঙালি উপনিবেশবাদীদের যেমন মিল আছে, অমিলও আছে বেশ। মিলটা এই, উপনিবেশে আসে ওরা খুবই অল্প সময়ের জন্য এবং ফিরে যায় স্থায়ী নিবাসে দ্বার রক্ষকের কাছে চাবি বুঝিয়ে দিয়ে। যতই উপভোগ্য হোক উপনিবেশ

কিংবা উপনিবাস, বন্ধন ছিন্ন করতে পারে না ওরা নগর জীবনের। আগেই বলা হয়েছে অমিলটা সময় ও মেধা-মননে। যারা ছিল ইংরেজ শাসিত তাদের স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতা, যারা এখন স্বাধীন তাদের সে স্বপ্নটা নেই।

পুরাতনেরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করত বাঙালি বংশধারার ভেতর জনবিচ্ছিন্ন হয়ে কেমন করে ইংরেজ হওয়া যায়। আজকের অভিজাতদের কারো ইংরেজ হবার বাসনা নেই, বরং চেষ্টাটা চলে আমেরিকান হবার। পতিত সাম্রাজ্যবাদীর চেয়ে বিশ্বায়নের সর্দার বিশ্বের পরাশক্তি আমেরিকান হলেই যেন জীবন ধন্য। সন্তানদের মার্কিন নাগরিকত্ব, নিজের নিউইয়র্ক শহরে নিজস্ব এপার্টমেন্ট, এ যেন এক মাদক স্বপ্ন।

বাঙালি যে দূর দূরান্তের সাগর, পর্বত, প্রান্তর পাড়ি দিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করতে চেয়েছিল, এমন প্রমাণ ইতিহাসে নেই। তার সাম্রাজ্য বিজয়ও ঘটেনি, যা ঘটেছে তা হচ্ছে বাড়ির পাশের ক্ষুদ্র পরগণা বা অঞ্চল দখল, তাও আবার নিজেদেরই কাছ থেকে। অনেক কিছু পাল্টে গেলেও ভাববাদী আধ্যাত্ম জীবনকে পরিত্যাগের নজির কোথাও নেই। রাজানুগত্য রয়েছে জাতিটির রক্তে মিশে। বর্তমানকাল তো বাঙালির সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস আর আশ্রয়-আনুগত্যের কাল।

এই জাতি যদি অতীতে আপন দেশ সীমার বাইরে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করতে পারত, রক্তে যদি থাকত উদ্ভাবন-আবিষ্কার আর বহির্বাণিজ্যের ঐতিহ্য, তবে আজ স্বাধীন এই দেশটাকে তারা এই দুর্দশায় ঠেলে দিতে পারত না। মনে হয় স্বশাসক হতে গিয়ে এই জাতি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। যাদের অতীত ইতিহাস পূর্ণ হয়ে আছে জীবন নিরাসক্ত ব্যক্তিক ত্যাগ আর আত্মনিগ্রহে, তারাই আজ মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে আত্মভোগে। যে জাতির ঐতিহ্যে দুঃসাহস নেই, অভিযান নেই, রাজ্য জয় নেই, আছে কেবল আত্মবঞ্চনা, তার স্বপ্ন তো ঘূর্ণিপাক খেতেই থাকবে সাম্রাজ্যহীন উপনিবেশে। সেই উপনিবেশটা যেমনি তার রাষ্ট্রসীমার ভেতর তেমনি ব্যক্তির অন্তরের গোপন অন্ধকারে।

বাঙালির অন্তরে আর স্বপ্নে যে নিজস্ব উপনিবেশ তা তো সমাজবিচ্ছিন্ন এবং নিঃসঙ্গ একাকী। ব্যক্তির অন্তরের এই অবাস্তব-সংকীর্ণ ব্যক্তিক গণবিচ্ছিন্ন যে কাল্পনিক উপনিবেশ, সেই মনোজগৎ ভাঙতে না পারলে জাতির ভবিষ্যৎ নেই। ব্যক্তিরও বিকাশ নেই, মুক্তি তো দূরের গল্পকথা। প্রজার শারীরিক শ্রম এবং উৎপাদিত পণ্য যেমনি ঔপনিবেশিক প্রভু ইংরেজরা ভোগ করত সস্তায় বাঙালিরাও তাই করেছে সাঁওতাল পরগনায়। যদিও সাঁওতাল পরগনা বাঙালির সাম্রাজ্য ছিল না, সাঁওতালদের শাসন করার মতো ছিল না রাজনৈতিক ক্ষমতা, তবু ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য সাম্রাজ্য। ৫/১০ বিঘে জমিকে ঘিরে সে সব বাড়ি ছিল এক একটি রাজনগর। সঙ্গে আসা চাকর নফর সেবাদাসরা গমগম করত। প্রভুর আইন মান্য করা, সেবা করা, আনুগত্য বজায় রাখা ছিল ঔপনিবেশিক নেটিভ প্রজারই মতো।

যে বাঙালির রক্তে ঔপনিবেশিক শাসক হবার মতো নীলবর্ণ মাদক রসের মিশ্রণ নেই, সে কোথাও সাম্রাজ্য গড়তে জানে না। পর জাতির শাসক হওয়া দূরের কথা, অন্যের সহায়তায় প্রাপ্ত স্বাধীনতার ভেতর দিয়ে আপন জাতিরও শাসক হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। বিশ্ব আধিপত্যবাদী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে তারই আজ্ঞাবাহী চাকর-নফর শাসক সাজে তারা। আপন সাম্রাজ্যের ভেতর তার প্রকৃত রাষ্ট্রক্ষমতাও থাকে না, সেই প্রত্যাশার স্বাধীন রাষ্ট্রক্ষমতাও স্বাধীনতার নামাবলি গায়ে জড়িয়ে থাকে, ভেতরে-আড়ালে জীর্ণ অসাড় শরীর। শীতকালে ঢাকার রাজপথে ছেঁড়া প্ল্যাকার্ড, কাপড়ের কাট আউট, ব্যানার তুলে এনে গায়ে জড়িয়ে ড্রেনের দিকে মাথা রেখে গৃহহীন মানুষের ঘুমিয়ে থাকার মতো বাঙালির স্বাধীনতা-সম্ভোগ।

ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রাক্তন এই প্রজারা দুই পুরুষ শহরে কাটিয়েও গ্রাম আর মাটি ভুলত পারে না। সুযোগ পেলেই গ্রামে মাটি কেনে, জমি কিনে অনাবাদী রেখে দেয়। গৃহকোণ বিচ্ছিন্ন হতেই পারে না ওরা। জীবনের প্রয়োজনে উপনিবেশের মোহাচ্ছন্নতায় কেবল গড়ে উপনিবাস। অবসর-ক্লান্তি ভুলতে ক্ষণিকের জন্য ওরা ওখানে দিনযাপন করে। একদিন ফিরে আসে ঠিকানায়। বিশ শতক ধরে ওরা যে সফরে গেছে দেশসীমার ভেতরে, ফিরেও এসেছে।

একরাত্রি : মধ্যবিত্তের ঠিকানা

রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' গল্পে স্কুল শিক্ষকের আড়ালে যে মধ্যবিত্তকে আমরা পাই তার জন্ম গ্রামীণ সামন্ত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার অধীন। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক অধীন দেশে ওই মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটে সেই অধীন রাষ্ট্রেরই নগরে। শতবর্ষেরও অধিক সময়াধারে ওই গল্পটি রচিত (জ্যৈষ্ঠ ১২৯১)। আজকের সময়ের বিবেচনায় 'একরাত্রি'র সময়কাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর বিশ্লেষণের জন্য আজকের বিশ্বায়নের মধ্যবিত্ত আর ঔপনিবেশিককালের মধ্যবিত্ত আকারে ও প্রকারে ভিন্নমাত্রিক। আজকের মধ্যবিত্ত যেখানে নগরজাত, রবীন্দ্রনাথের মধ্যবিত্তরা ছিল গ্রামজাত। তাদের মানস জগৎও আলাদা। আর একথাও সত্য যে, একরাত্রির মধ্যবিত্তকে চিনতে পারলে রবীন্দ্রনাথের অপরাপর গল্প-উপন্যাসের মধ্যবিত্তরা আর অনাবিষ্কৃত থাকে না।

এক্ষেত্রে বারবার স্মরণ করতে হবে, একরাত্রি'র মধ্যবিত্তের সামনে বিশ্বযুদ্ধ কিংবা রুশ বিপ্লবের অভিঘাত ছিল না। বাস্তবতা ছিল ইউরোপে জাতীয় চেতনার উদ্ভব। পরাধীন বঙ্গেও তাই নব্যনাগরিক মধ্যবিত্তের চেতনা আশ্রয় করে ইতালির জাতীয়তাবাদী নেতা মাটসীনি গারিবাল্‌ডি। এই চেতনার ভেতর সত্যটি হচ্ছে ঔপনিবেশিক শেকল-বন্ধন থেকে মুক্তি। সে কারণেই আমরা রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি'র নায়কের ভেতর মাক্‌সবাদী সমাজ বিপ্লবের স্বপ্ন প্রত্যাশা করতে পারি না। সঙ্গতও নয়।

আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় ওই নায়কটির চেতনার জগৎ। নগর কলকাতায় প্রবেশের আগে যুবকটির জীবন আবর্তিত হতো উপনিবেশ অধীন অসুখী গ্রাম্য জীবনে। যার পিতা ইংরেজের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন সামন্ত জমিদারের নায়েব, তার তো সেই অর্থনৈতিক বাস্তবতার ভেতর পিতার ইচ্ছাটাই পরম সত্য ছিল– 'আমাকে জমিদারি-সেরেস্তার কাজ শিখাইয়া একটা কোথাও গোমস্তাগিরিতে প্রবৃত্ত করাইয়া দিবেন।' কেননা এখন প্রত্যাশার সময়-কালকে অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং রুশ বিপ্লব

বিশ্ব ব্যবস্থায় যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক, বিশেষ করে চিন্তার জগতে নতুন নতুন অভূতপূর্ব তত্ত্বের জন্ম দিয়ে মানব সভ্যতাকে সাংস্কৃতিক-দার্শনিক বাস্ত বতার দিকে ঠেলে দেয়, সেই অভিজ্ঞতা 'একরাত্রি' গল্পের সময়বৃত্তে ছিল না। একদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষার ভেতর দিয়ে গ্রাম্য অভিজাত শ্রেণীর নাগরিক মধ্যবিত্তে পরিণত হওয়ার প্রত্যাশাই ছিল তৎকালের সামাজিক বাস্তবতা।

রবীন্দ্রনাথ তার গল্পে সাক্ষ্য দিচ্ছেন 'নীলরতন যেমন কলিকাতায় পালাইয়া লেখাপড়া শিখিয়া কালেক্টার সাহেবের নাজির হইয়াছে' ঠিক তেমনি ইচ্ছা গল্পটির নায়কেরও। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, শিক্ষার জন্য গ্রাম্য যুবকের নগরযাত্রা অনেকটা অভিভাবকের ইচ্ছার বাইরে 'পালাইয়া লেখাপড়া' শিক্ষা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষাজাত। কী সেই প্রত্যাশা? 'কালেক্টারের নাজির না-হইতে পারি তো জজ-আদালতের হেডক্লার্ক হইব।' এখানেই মধ্যবিত্ত আর খোলসে লুকিয়ে থাকে না। তার স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে। সে ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের নাট-বলটু হতে চায়, শাসক শক্তির অংশ হতে চায়। কী ভয়ংকর প্রত্যাশা!

এর পেছনের যুক্তিটি কী? শোনা যাক নায়কের বয়ান থেকেই– ' আমার বাপ উক্ত আদালতজীবীদিগকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন... ইহারা আমাদের বাংলাদেশের পূজ্য দেবতা... বৈষয়িক সিদ্ধি লাভ সম্বন্ধে স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ...।' এই হচ্ছে মধ্যবিত্তের প্রত্যাশার কারণ। সে শাসকশ্রেণীর অংশ হতে চায়, গণমানুষের পূজা পেতে চায়, বৈষয়িক উন্নতি চায় ভোগের জন্য। তার শিক্ষার উদ্দেশ্য ভোগবাদী ও প্রভুত্ববাদী দর্শনের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এ কথাও চূড়ান্তভাবে সত্য যে, উপনিবেশ শাসিত দেশে নব্যমধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেতনার জগৎ কেবল যে ভোগ স্পৃহা দ্বারা চালিত তা নয়। তাদের চরিত্রে দ্বান্দ্বিক অবস্থানে চলে স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি। এই স্বদেশপ্রীতিও অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকেই জন্ম নেয়। দীর্ঘ পরাধীনতার জ্বালা থেকে উদ্ভব ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ যখন গল্পটি লেখেন তার আগেই এদেশে ঘটে গেছে সিপাহি বিদ্রোহ এবং তখনও চলছিল নীল বিদ্রোহ কিংবা এখানে-ওখানে কৃষক বিদ্রোহ। এসবের অভিঘাতেই জন্ম নেয় জাতীয় চেতনা। ইতিমধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরও জন্ম হয়ে গেছে। বোঝা যায় গল্পের নায়ক যুবকটি চলমান রাজনীতির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। তাই সে শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে পরাধীন 'দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণবিসর্জন করা যে আশু আবশ্যক' এমনটাই মনে করেছিল। এটাও বোঝা যায়, তৎকালের কংগ্রেসের ভেতর উদারবাদী অর্থাৎ গান্ধীবাদীদের বাইরে উগ্রজাতীয়তাবাদীদের রাজনীতিতেই মজেছিল গল্পের নায়ক, তাই সে বিপ্লবী গারিবাল্‌ডি হবারই স্বপ্ন দেখে। এক্ষেত্রে আমরা এই অঞ্চলের চল্লিশ, পঞ্চাশ এবং ষাট দশকের ছাত্র-যুব আন্দোলনের দিকে তাকাতে পারি। পাকিস্তানি তত্ত্বের স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গ এবং নতুন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সেই সময়াধারে ছিল বাস্তব সত্য।

এখানে এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু একমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আখ্যান ভাগটি তুলে ধরেননি, এতে তিনি রূপ দিয়েছেন বহুমাত্রিকতা। যে যুবক নগর কলকাতায় এসে গারিবাল্ডি হতে চায় তারও রয়েছে এক অদৃশ্য বন্ধন, বাল্যপ্রেম। কিশোরী সুরবালার সঙ্গে মনের বন্ধন। আমরা পাঠক হিসেবে চমকে উঠব সুরবালার সম্পর্কে এই যুবকের বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিজস্ব বোধের দিকে তাকালে। এই কৈশোরিক ভালবাসার সঙ্গে নায়কটির যে প্রভুত্ববাদী মনোভাবের পরিচয় মেলে তা স্পষ্ট হয় সুরবালার প্রতি তার অধিকারের প্রশ্নে 'অধিকার মদে মত্ত হইয়া তাহার প্রতি (সুরবালা) যে আমি শাসন এবং উপদ্রব না-করিতাম তাহা নহে।... আমি কেবল জানিতাম, সুরবালা আমারই প্রভুত্ব স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।'

রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছেন তার 'একরাত্রি'র নায়ক কী করে নগরে এসে শেকড়ছিন্ন হয়ে পড়ছে। গ্রাম নামে তার যে স্বদেশ এবং সুরবালা নামের যে শেকড়, তা ছিন্ন হয়ে গেছে শ্রেণীগত রাজনীতির উচ্চাভিলাষের কুহকে পড়ে। সুরবালার ভালাবাসাকে তাই সে অতি তুচ্ছ বিষয় বলে পরিত্যাগ করে। তার প্রতিজ্ঞা হচ্ছে 'আজীবন বিবাহ না করিয়া স্বদেশের জন্য মরিব... বিদ্যাভ্যাস সম্পূর্ণ সমাধা না করিয়া বিবাহ করিব না।'

অতি উত্তম কথা বটে। স্বদেশের জন্য তো চিরকালই জীবন দিয়ে গেল মধ্যবিত্ত। আজও হয়তো দেয়। কিন্তু ওই 'স্বদেশ' তো মধ্যবিত্তের নয়, বরং ধনীর। ধনীর 'স্বদেশের' জন্য মধ্যবিত্ত মরবে, মধ্যবিত্ত তার প্রেমিকাকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে ধনীর রচিত ইতিহাসে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত নিয়ে স্থান করে নেবে, এ তো তুচ্ছ কথা নয়! একরাত্রি'র নায়কেরও তাই হল। তার সুরবালাকে বৌ করে ঘরে তুলে নিয়ে যায় আর এক মধ্যবিত্ত। এই ভয়ংকর সংবাদ তো তার কাছে– 'পতিত ভারতের চাঁদা আদায়কার্যে ব্যস্ত ছিলাম, এ সংবাদ অত্যন্ত তুচ্ছবোধ হইল।'

কিন্তু এই বস্তুবিশ্বে একজন আত্মভোলা, সংসার দায়িত্ব-কর্তব্যশূন্য মধ্যবিত্তের আঘাতটা আসে কিন্তু বস্তুবিশ্ব থেকেই, অতিপ্রাকৃত জগৎ থেকে নয়। একেই বলে জীবন-বাস্তবতার ভেতর চরম বাস্তবতা। নায়কের পিতার অসময়ে মৃত্যু, শিক্ষাও অসমাপ্ত, সংসারে মা এবং দুই বোন। কী ভীষণ এক জটিল বাস্তবতা! যেন এক ভূকম্পন। মুহূর্তে সব বিলয়। স্বপ্ন-সাধ-প্রত্যাশার অপমৃত্যু। একে আমরা কী বলব? নিয়তি? না কি নিছক দুর্ঘটনা? যা-ই ধরা হোক, এটাই মধ্যবিত্তের চরম পরীক্ষা, অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের মহাপরীক্ষা। তবে পরাধীন দেশটাকে কারা বা কে উদ্ধার করবে? এখানেই আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যক্তি কীভাবে সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বড় থেকে আকারে ক্ষুদ্র হয়ে আত্মকেন্দ্রিকে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথ কি এখানে ব্যক্তির পরাজয় দেখাচ্ছেন? নিশ্চয় নয়। তিনি দেখাচ্ছেন মধ্যবিত্তের আবেগ কতটা যুক্তিহীন, কতটা ভঙ্গুর তার আদর্শ। তার রাজনীতিও অন্তঃসারশূন্য।

'আমাদের মতো প্রতিভাহীন লোক ঘরে বসিয়া নানারূপ কল্পনা, অবশেষে কার্যক্ষেত্রে নামিয়া ঘাড়ে লাঙল বহিয়া পশ্চাৎ হইতে ল্যাজমলা খাইয়া নতশিরে সহিষ্ণুভাবে প্রাত্যহিক মাটিভাঙার কাজ করিয়া সন্ধ্যাবেলায় একপেট জাবনা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে; লম্ফে-ঝম্পে আর উৎসাহ থাকে না।' কল্পনাবিলাসী মধ্যবিত্ত চিরকালই আচ্ছন্নতার ভেতর কাটায়। বাস্তব জগতের প্রতিঘাতও সহ্য করতে পারে না। পরিণতিতে জীবন-বাস্তবতার কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতেই হয়। বড় বড় স্বপ্ন তখন উধাও হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ এই মধ্যবিত্তকে এখানেই ছাড় দিতে রাজি নন। তিনি একরাত্রি'র নায়কের সামনে আরও নিষ্ঠুর, আরও তীব্র ঘন আঘাত আর মর্মান্তিক জগতকে তুলে ধরেন। জীবন যেখানে অপ্রাপ্তিতে পূর্ণ, আশা যেখানে শূন্য, সেখানে অভিঘাত দ্বৈত।

একদিকে গারিবাল্‌ডি না হতে পারা, অন্যদিকে সুরবালার সঙ্গে বিচ্ছেদ। আসলে এখানে এই বাস্তবতাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মধ্যবিত্তের নারীপ্রেম ও স্বদেশপ্রেমে কোনও গভীরতা নেই। আসলে মধ্যবিত্ত হচ্ছে আত্মপ্রেমিক। মধ্যবিত্তের কাছে নারী যেমনি পুরুষের প্রভুত্ব স্বীকারের জন্য পিতৃগৃহে জন্মে, তেমনি তার স্বদেশপ্রেমও প্রভুত্ববাদের মতোই, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ঊর্ধ্বে নয়। প্রাপ্তি বা অর্জনের ক্ষেত্র মাত্র।

'একরাত্রি' গল্পের ট্র্যাজেডি কিন্তু ঘনীভূত হয় অন্য জায়গায়। কাকতালীয়ভাবে সুরবালার স্বামীর সংসার আর ব্যর্থ নায়কের চাকরিস্থলকে পাশাপাশি স্থাপন না করলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে মধ্যবিত্ত মানসের জটিলতাকে উন্মোচন করা কঠিন হতো বৈকি। পরিস্থিতি সৃষ্টি করা দরকার ছিল। আইনজীবীর স্ত্রী হিসেবে ওই যে সুরবালার উপস্থিতি সেখানেও সে সেবাদাসী ভিন্ন কিছু নয়। 'যেদিন দুধে ধোঁয়ার গন্ধ হয় সেদিন সুরবালাকে তিরস্কার করে, যেদিন মন প্রসন্ন থাকে সেদিন সুরবালার জন্য গহনা গড়াইয়ে দেয়'— এই হচ্ছে মধ্যবিত্তের সঙ্গে স্ত্রীর (নারীর) সম্পর্ক। যদি গল্পের নায়কটির সঙ্গে সুরবালার বিয়ে হতো তবে এ ধরনের সম্পর্কের বাইরে যে সমমর্যাদার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতো, একথা একেবারেই সত্য নয়। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিয়েছেন স্বামীর অন্তঃপুরে বন্দি সুরবালা, পাশের ঘরে তার স্বামীর সঙ্গে আলাপমত্ত হারানো বাল্যসখা। সেই বাল্যসখার মনে সম্পদ হারানোর ঈর্ষাজনিত কষ্ট। সেই ব্যর্থ নায়কের 'মনের মধ্য হইতে উত্তর আসিল, তোমার সে সুরবালা কোথায় গেল?'

এখানে 'তোমার সে সুরবালা' ব্যক্তিগত সম্পদের বাইরে নয় বলেই গল্পটির মূল ট্র্যাজেডি সেই 'তোমার' মধ্যেই অগ্নিঝড় তোলে। 'আমি তো তাহাকে ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি।' অথবা 'সুরবালা আজ তোমার কেহই নয়, কিন্তু সুরবালা তোমার কীনা হইতে পারিত।' বারবার আমি, 'তোমার', 'আমার' পদগুলোর বঞ্চনা বা গূঢ়ার্থ যে কতটা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সৃষ্টি করে তা

ধরতে পারলেই মধ্যবিত্তের প্রাপ্তির সুখ আর অপ্রাপ্তির দুঃখকে বোঝা সহজ হয়। মধ্যবিত্ত জীবনের ট্র্যাজেডি তো ওখানেই লুকিয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ আরও ভয়ংকর এক সংবাদ দিচ্ছেন ওই আত্মপ্রেমিক মধ্যবিত্ত সম্পর্কে। 'রামলোচন (সুরবালার স্বামী) ... গোটাদুয়েক মুখস্থ মন্ত্র পড়িয়া সুরবালাকে পৃথিবীর আর সকলের (গল্পের নায়কের) নিকট হইতে এক মুহূর্তে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। ... আমি মানব সমাজে নতুন নীতি প্রচার করিতে বসি নাই, সমাজ ভাঙিতে আসি নাই; বন্ধন ছিঁড়িতে চাই না।'

কোন সেই মধ্যবিত্তকে আমরা পেলাম? মুখস্থ মন্ত্র (ধর্মের ফাঁদ) দ্বারা যে নারীকে দখল করে, সে-ই আবার সমাজবশ্য, সমাজ ভেঙে নতুন আদর্শ স্থাপনে অনাগ্রহী, সমাজে নতুন আদর্শ-নীতি প্রচারে বিমুখ। এখানে সেই সমাজ না-বদলানোর দলে যে আমরা গল্পের নায়ককে পেলাম তা নয়, বরং তার স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকেও পেলাম। নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য না দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক বিধি-বিধানে বশ্য অনড় যে ব্যবস্থা এবং বিবাহের নামে নারীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করার যে প্রাচীন রীতি পুরুষ তৈরি করেছে তা সে ভাঙবে কোন দুঃখে? নায়ক তো ওখানে অক্ষম। এ তার শ্রেণীবিরুদ্ধ।

এই যে মধ্যবিত্ত, তবে তার শেষ আশ্রয় ভূমিটা কোথায়? সেই ভূমি বহুদূরবর্তী। সে এক কুহকের জগৎ। সে হচ্ছে মধ্যবিত্তের সংস্কার, বিশ্বাস, অবৈজ্ঞানিক যুক্তি ও বুদ্ধির অদম্য অন্ধকার এক পৃথিবী। সেই পৃথিবীটা হচ্ছে 'রামলোচনের গৃহভিত্তির আড়ালে যে সুরবালা বিরাজ করিতেছিল সে যে রামলোচনের অপেক্ষাও বেশি করিয়া আমার।' নারী এখানে নিতান্তই ভোগের সম্পদ যার দু'পাশে দু'জন দাবিদার। একজন স্বামী অর্থে, অন্যজন প্রেমিক অর্থে। আশ্চর্য এই যে, গল্পের নায়ক জানে সুরবালাকে নিয়ে তার 'এরূপ চিন্তা নিতান্ত অসঙ্গত এবং অন্যায়।' আবার সে এটাও বিশ্বাস করে বিষয়টি 'অস্বাভাবিক নহে'।

এই যে মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের বিশ্ব, স্থিতি-সত্তার জগৎ, তা মোটেই সুশৃঙ্খল নয়, বরং অগোছালো, এলোমেলো। সেই জটিল রহস্যময় অস্তিত্ব বিশ্বের স্বরূপ উন্মোচন করেন রবীন্দ্রনাথ গল্পের পরিণতিতে। 'একরাত্রি' গল্পের উপসংহার অনুচ্ছেদটির ভেতরই এর মর্মার্থ যেমন আবিষ্কার করা যায়, তেমনি মধ্যবিত্তের শেষ আশ্রয়ের জটিল জগতটিরও সন্ধান মেলে। নায়কের কথনে শোনা যাক– 'আমি নাজিরও হই নাই, সেরেস্তাদারও হই নাই, গারিবাল্‌ডিও হই নাই, আমি এক ভাঙা স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার, আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্তরাত্রির উদয় হইয়াছিল– আমার পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটিমাত্র রাত্রিই অবসান তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।'

ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণীর দেশিয় সেবাদানের স্বপ্ন নিয়ে যে যুবক গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে শিক্ষাগ্রহণ করতে, শহর যাকে রাজনীতির গারিবাল্‌ডি

হওয়ার গোলকধাঁধায় নিক্ষেপ করে, জীবন-বাস্তবতা তাকেই বানায় ভাঙা স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার। এই হচ্ছে মধ্যবিত্তের অতিকল্পনার চরম পরিণতি। যে স্বপ্নতাড়িত মতিভ্রমে আচ্ছন্ন মধ্যবিত্তের কাছে ভালবাসার পাত্রী সুরবালার অন্যত্র বিয়ের সংবাদ 'অত্যন্ত তুচ্ছবোধ হইল', জীবন-বাস্তবতার কাছে ছিন্নভিন্ন হয়ে সেই মধ্যবিত্তই হারানোর জন্য একদিন হাহাকার করে। 'একরাতে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি'– এই যার উপলব্ধি তার অন্তহীন সুখ আর আনন্দ তো মিথ্যা কুহক মাত্র। আত্মপ্রতারণার অন্ধকার জগতের যুক্তিহীন বিশ্বাসমাত্র।

রবীন্দ্রযুগের মধ্যবিত্ত মানসকে নিয়ন্ত্রণ করত যে ঔপনিবেশিক আদর্শ, সেই জটিল দর্শনই মধ্যবিত্তকে করে দিয়েছিল অন্তঃসারশূন্য। বিগত যুগের মধ্যবিত্তের রাজনীতি এবং তার পরিণতি এখন ইতিহাসের উপাদান মাত্র। যারা সেদিন গারিবাল্‌ডি হতে চেয়েছিল তারা প্রায় সবাই হয় পরিণত হয়েছে 'গণশত্রুতে' নয়তো সর্বত্যাগী 'ঋষিতে'। আর আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে তারাই হয়ে গেছে চরম ভোগবাদী এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক। নারীর ভালবাসা আর মাতৃভূমি তাদের কাছে ব্যক্তিগত সম্পদ আর ভোগের উপাদান ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু পরিণতি হচ্ছে সেই অতিপ্রাকৃত জগৎ আর অধ্যাত্মবাদ।

ঔপনিবেশিক আর উত্তর-ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তের মিলটা এখানেই। ওদের সুখ-প্রশান্তির আশ্রয়ভূমিও পরিণতিতে একই স্থান। একদিকে ভোগবঞ্চনা, অন্যদিকে অনিয়ন্ত্রিত ভোগ পরিণতি তাদের সেই অলৌকিক কুহক প্রশান্তির জগতেই টেনে নেয়। এছাড়া তাদের অন্য কোনও জগৎ নেই, নেই ভিন্ন দুনিয়া। যদি থাকত তবে প্রাচীন ভারতীয় ধ্রুপদি দার্শনিক ঐতিহ্যের দুঃখ আর ত্যাগের ভেতর পরম সুখের গোলকধাঁধা সৃষ্টি হতো না। অতীতের মতো আজও তো ব্যর্থ বাঙালির আশ্রয়ভূমি ওই ত্যাগের তথাকথিত মহিমার কুয়াশার অন্ধকারে মিথ্যা সান্ত্বনায়। অতীত স্মৃতির আশ্রয়ে সুখ সন্ধান এবং জীবনের অপ্রাপ্তিকে প্রাপ্তির প্রতিকার ভাবার ভাববাদী দার্শনিকতায় মুক্তি খোঁজার মধ্যে বাঙালির শেষ আশ্রয় যে কবে হবে নিঃশেষ, কে জানে!

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের অর্জন

১৯৭১ সালের মধ্য এপ্রিলে ঢাকা শহরের অনতিদূরে আমি গ্রামের বাড়িতে অবস্থান নিই। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে কিন্তু বেগবান হয়নি তখনো। প্রাথমিক প্রতিরোধ চলছে। আমাদের ওদিকটায় পাকিস্তানি সেনা-আধাসেনাদের আনাগোনা তখনো শুরু হয়নি। আমাদের বাড়িটি সার-কারখানার জন্য অধিগ্রহণ করা হলে সীমানার বাইরে কারখানার মূল গেইট বরাবর (তখনো গেইট হয়নি) অবশিষ্ট জায়গায় নতুন করে বাড়ি বানানো হয়। সার-কারখানাটি তখনো উৎপাদনে যায়নি। কেননা জাপানিরা তখনো কাজ শেষ করতে পারেনি। সেটি ছিল অরক্ষিত। অর্থাৎ কারখানার পাঁচিল হয়নি। চারপাশ খোলা। দারুণ শংকার ভেতর দিন কাটত। কখন পাকসেনারা নির্মাণাধীন কারখানায় হানা দেয়। পাশেই তো আমাদের বাড়ি।

এক গভীর রাতে ঘরের বাইরের কিছু পতনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে টর্চ হাতে বাইরে বেরিয়ে এলাম। গাছের আড়ালে অন্ধকারে একটু তফাতে ফিস ফিস শব্দ শুনে অনেকটা ভয়ই পেলাম। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকি। পুনরায় পতনের শব্দ এবং অনুচ্চস্বরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা...' বাক্যটি কাউকে উচ্চারণ করে যেতে শুনলাম। ভয় খানিকটা কেটে গেলে মাত্র এক ঝলক টর্চ টিপে ধরে পলকে যা দেখলাম তাতে বিস্মিত হয়ে গেলাম। লুঙ্গিপরা দীর্ঘকায় একজন লোক জিন্না ক্যাপ মাথায় উল্টো দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। ৪/৫ জন লোক রড আর সিমেন্টের বস্তা ফেলছে লোকটি সামনে। কে? জানতে চাইলে আমার চোখে এক ঝলক টর্চের আলো ফেলে দীর্ঘকায় লোকটি ধমক এবং স্নেহ মেশানো স্বরে বললেন, 'দূর ব্যাটা, ঘুমাইতে যা, এইদিকে আসার দরকার নেই।' চেনা লোক বলেই অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। লোকটি কে? কী করছেন তিনি? দীর্ঘকায় লোকটি আমার স্কুল জীবনের শ্রদ্ধেয় ইংরেজি শিক্ষক। কেবল তাই নয়, তিনি এলাকার গণপ্রতিনিধিও বটে। লজ্জায়-বিস্ময়ে তবু নম্রস্বরে বললাম, 'স্যার, দিনকাল

খারাপ, এই মাল কি এইখানেই পইড়া থাকবো? ভোর হইলে আমরা বিপদে পরমু।'

আপদ-বিপদে আমাদের পড়তে হয়নি। ভোর হওয়ার পূর্বেই মালামাল হাওয়া হয়ে যায়। এসব রড-সিমেন্ট নির্মাণাধীন সারকারখানার। মিলিটারি আসার গুজবে বহু লোক তখন কারখানা ছেড়ে পালিয়ে যায়। যেসব দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ওখানে ছিল তারাই পাচারের কাজে লিপ্ত ছিল। অথচ মানুষ তখন মরছে চারদিকে। স্বাধীনতার জন্যে লড়ছে। আমার সেই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এসবে লিপ্ত হবেন, এ ছিল আমার কল্পনার অতীত। মানুষ দুর্নীতি করে, টাকা বানায়, কিন্তু তার তো একটা সময় আছে! একটি অনিশ্চিত সময়েও মানুষ কতটা ভয়ংকর হলে এসব করতে পারে, ভাবতে আজো অবাক লাগে।

আমার এই শ্রদ্ধেয় ইংরেজি শিক্ষকই একদিন সামান্য অপরাধের জন্যে ক্লাসে আমাকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়েছিলেন। শরীরের পেছনের এমন কোনও জায়গা ছিল না যেখানে মেহেদি কঞ্চির আঘাতের দাগ পড়েনি। অপরাধ ছিল ক্লাসে আমি হেসেছিলাম। বিনা কারণে হাসিনি আমি। নবম শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের এক সহপাঠী (বয়সে একটু বড়ই হবে) এই বয়সেই বিয়ে করে ফেলে। বউটি একই বাড়ির। চাচাত-জ্যাঠাত ভাই-বোন। বড় কথা হচ্ছে ওই মেয়েটিও একই ক্লাসের ছাত্রী। তো আমি বরাবরই অমনোযোগী ছাত্র ছিলাম। আমি দেখলাম আমার সহপাঠী তার নববধূর দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ খানিকটা হাঁ করা। এতে তার গোঁফের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গোঁফ গজালেই ছেলের বিয়ের বয়স হয়, এই ধারণা আমার ছিল বিধায় আমি সহপাঠীকে দেখতে দেখতে অজান্তেই নিজের গোঁফ পরখ করার জন্যে আঙুল ঘষছিলাম এবং এক পর্যায়ে হেসে উঠি।

অপরাধের তুলনায় সত্যি দণ্ডটা যে অধিক হয়ে গেছে, বোধ করি স্যার বুঝতে পেরেছিলেন এবং ঘণ্টা পড়লে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে, আমার উদ্দেশ্যে বললেন, 'যা, তুই ম্যাট্রিক পাস, কেউ পাস ঠেকাইতে পারব না।' তাতেও বোধকরি তিনি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। আমার প্রতি মমতা কিংবা বাবার প্রতি একধরনের শ্রদ্ধা ও ভয় ছিল মনে হয় তার। তাই আমার বাড়ি পৌছার আগেই তিনি সাইকেলে চেপে আমাদের বাড়ি পৌছে যান। পিতার একমাত্র আদুরে পুত্রকে কঠিন সাজা দেবার প্রতিক্রিয়ার কথা নিশ্চয়ই তার মনে পড়েছিল। কেননা আমার পিতা ছিলেন পোস্ট অফিসের সরকারি কর্মচারী এবং ভূসম্পদের মালিক, এলাকার খুবই প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাছাড়া তার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল ঘোড়াশালের জমিদার মিয়াবাড়ির লোকদের। সেই মিয়াদের রক্তে ছিল ব্রিটিশ আর পাকিস্তান যুগের মন্ত্রী আর এমএলএ (সংসদ সদস্য) দের গন্ধ। তো আমার শিক্ষক আমার অপরাধ এবং সাজার বর্ণনা দিয়ে বাবাকে বললেন, 'দাদা, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালও ভালো, আমার কোনও সন্তান নেই, দুঃখও নেই।' যদিও আমার সেই শিক্ষক দীর্ঘদিন নিঃসন্তান থেকে

বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় বিয়ে করে সর্বমোট সাতজন ছেলে-মেয়ের পিতা হয়েছিলেন।

সেই যে একাত্তর সাল, যুদ্ধের কাল, স্বাধীনতার কাল। সব মানুষই স্বাধীনতার ডাক পায়নি। অনেকে ছিল যারা স্বাধীনতা বা পরাধীনতার কোনও মানে বুঝতো না। তাই তাদের কাছে (আমাদের গ্রামের) বিষয়টি ছিল 'মজিবরের লগে ভুট্টোর কাইজা'। অথচ এই কাইজার বিষয়টি নিয়েই উদ্বিগ্ন ছিলাম। কোথা থেকে কোনও সংবাদ পাচ্ছিলাম না কী ঘটছে দেশে।

২২ মার্চের ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়ি গিয়ে আটকে গেলাম। সারাটা দিন আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকা আর ঘুরাঘুরি কিংবা গুজবের পেছনে ছোটা। আশা আর গৌরবটা ছিল একথা ভেবে যে, আমাদের এলাকার এমপি আমার পিতার প্রিয় 'তাজউদ্দিন উকিল' প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান। অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বাবা বা আমাদের পরিবার কোনওদিন তাজউদ্দিন আহমদের নৌকা মার্কায় ভোট দিইনি। আমাদের ভোট বাঁধা ছিল ঘোড়াশালের মিয়াবাড়ির 'বিলাত ফেরত পোলা' কুঁড়েঘর মার্কা আহমেদুল কবীর (মনুমিয়া) এর জন্যে। বাবার হিসেবে আহমেদুল কবীর হচ্ছেন মিয়াবাড়ির জমিদারের লন্ডন পাস পোলা যার রয়েছে মিল-কারখানা, চা বাগান, সংবাদ পত্রিকা এবং আত্মীয় স্বজনের ঘরে ইংরেজ 'ম্যাম বৌ'।

অন্যদিকে তাজউদ্দিন হচ্ছেন সরল-সহজ চাষার পুত্র উকিল। তো সেই উকিল মানুষটার কথাই ভাবি আর ঘোরের মধ্যে দিন কাটে। মাঝে-মধ্যে আক্ষেপ হতো, কেন যে সত্তুরের নির্বাচনে তাজউদ্দিনকে ভোটটা দিলাম না।

সেই আক্ষেপের ভেতর একদিন ঘুরাঘুরি করতে করতে হেঁটে হেঁটে চলে গেলাম পাশের পলাশ বাজারে। দেখলাম কাপড়ের দোকানে ভিড়। ভিড়ের ভেতর ক'জন রাশিয়ান নারী-পুরুষ। ওরা প্রকৌশলী। সারকারখানায় লাগোয়া ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজে এসেছে তারা।

আমাদের একাত্তরের যুদ্ধটা তাদেরও ভাবিয়ে তুলেছিল। আকাশে পাকিস্তানি জেট বিমান উড়লে দূরবীন দিয়ে পরখ করত তারা। নির্মাণাধীন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কাজ করতে এসে যে তারা দেশের এই অবস্থায় বিপাকে পড়েছে তা তাদের আচরণেই আমরা বুঝতে পারি। তো, দোকানে ওরা এসেছে কাপড় কিনতে। আর ভিড় জমিয়েছে যারা তারা এসেছে স্বল্পবসন পরিহিতা শ্বেতাঙ্গী রাশিয়ান দেখতে।

ভিড়ের ভেতর কোন ফাঁকে তাদের সঙ্গে বয়ে আনা ছোট ট্রানজিস্টারটা গায়েব হয়ে যায়। এটা ওরা বহন করছিল বাংলাদেশের যুদ্ধের ব্যাপারে রেডিও মস্কোর সংবাদ শোনার জন্য। রুশদের ধারণা জন্মে, হয়তো গরিব বাঙালিদের কেউ যুদ্ধের সংবাদ শোনার জন্যে না জানিয়েই রেডিওটা বাড়ি নিয়ে গেছে। তাই তারা দোকানির কাছে জানতে চায় লোকটি কখন এসে রেডিও ফেরত দিয়ে যাবে। লজ্জিত দোকানি জানায় ওটা আর ফেরত আসবে না, চুরি হয়ে

গেছে। বিস্মিত এক রুশ মহিলা জানতে চায় যুদ্ধের এই দুর্দিনে বাঙালিরা চুরি করে কেন? এর উত্তর না পাওয়া শ্বেতাঙ্গিনী তবু বিশ্বাসহারা হতে চায় না বলে দোকানির হাতে একখণ্ড কাগজ ধরিয়ে দিয়ে অনুরোধ করে, যদি যুদ্ধের সংবাদ শোনার পর লোকটি রেডিও ফেরত দিয়ে যায় তবে যেন দোকানি উল্লেখিত কোয়ার্টারে তা ফিরিয়ে দিয়ে আসে।

রুশ মহিলা সেই রেডিও কোনদিন আর ফিরে পায়নি। কেননা তখন সীমান্তে এক বাঙালি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ দেয়, অন্য বাঙালি অবরুদ্ধ দেশের ভেতর চুরি করে। কোনও কোনও বাঙালি প্রবল বিশ্বাসের ভেতর পাঞ্জাবি সেপাইয়ের ইতরামিতে অংশ নিয়ে তামাসা করে। তামাসাই বটে।

আমাদের সারকারখানার ভেতর পাকিস্তানী বালুচদের এক মিলিশিয়া ক্যাম্প বসে। ওরা গ্রামে ঢোকে না, কাউকে কিছু বলে না, পাহারা দেয় নির্মাণাধীন সারকারখানা। বিকেলে বাজার বসে কারখানার বাইরে। তখন স্থায়ী কোনও বাজার ছিল না কারখানায়। আমাদের গ্রামের স্বনামধন্য এক বৃদ্ধ। নাম তার কালা ভূঁইয়া। লাল টকটকে বর্ণ, দীর্ঘকায়। অথচ নাম কালা ভূঁইয়া। লোকটির প্রিয় খাদ্য রসগোল্লা। ধান বেচে ময়রার দোকানে ঢুকে রসগোল্লা খাওয়া লোকটির ঐতিহ্য। সেদিনও বাজারে আসে ঝাঁকায় ভরা ধান নিয়ে। বৃদ্ধ মানুষ। পরনে ফিনফিনে খয়েরি রং লুঙি, হাঁটুর ওপর। লোকটির ছিল একশিরা রোগ। উল্টো বাতাসে তার পাতলা লুঙ্গির ভেতর তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ফুটবলের মতো। একজন মিলিশিয়ার নজরে পড়ে তা। তার ধারণা লোকটি মুক্তিযোদ্ধাদের চর। তাই গোপনে লুঙ্গির নিচে বহন করছে ভয়ংকর বোমা। তাই সে ধমক দিয়ে থামায় তাকে। ভয় এবং সন্দেহে স্বহস্তে তদন্ত না করে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে চাইনিজ রাইফেলের নল দিয়ে ধীরে ধীরে লুঙ্গি উল্টাতে থাকে। রসিক বাঙালিরা তিন পাশ ঘিরে আছে দুর্দশায় পতিত একজন বুড়ো বাঙালির নাজেহাল অবস্থা দেখে আনন্দ পাবার জন্য। এক পর্যায়ে পাকা বাঙ্গি সদৃশ বস্তুটি বেরিয়ে এলে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ে মিলিশিয়াটি, 'শালা বুড্ডা! বোমা ন্যাহি কাপড়াভি অন্দরমে, ওসকো টাট্টু হ্যাঁয়।'

বাঙালিরা এমনি রসিকতা উপভোগ করছিল যখন ঠিক তখনই দূরের আকাশে ঘোড়াশাল জুট মিলে নরহত্যা আর ধ্বংসকাণ্ড চলছিল। আকাশের কালো ধোঁয়ায় চোখ ফেলে কিছু নির্বোধ বাঙালি কালা ভূঁইয়ার অণ্ডকোষের স্বপ্নে ডুবেছিল তখন। সেই অট্টহাসি আর মশকরার দিন যে ফুরিয়ে আসছে আমরা বুঝেছিলাম সেই রাতে। আচম্বিতে আমাদের এলাকায় প্রথম মুক্তিযোদ্ধাদের দল হানা দেয় সারকারখানায়।

ওখানে ছিল বিহারী এক দারোয়ান এবং তার বাঙালি বৌ। বালুচ মিলিশিয়াদের ক্যাম্প থেকে খানিক দূরে থাকত নিঃসন্তান এই দম্পতি। হাড়ে হাড়ে পাকিস্তানি। বিহারী তো বটেই তার বাঙালি বিবিজানও দালালিতে কম

যায় না। কারখানার বহুলোকের আপদ-বিপদ ঘটিয়েছিল ওরা। মুক্তিযোদ্ধারা এমনি কৌশলে তাদের ধরে নিয়ে আসে, একটি কাকপক্ষীও টের পায়নি। গ্রামের শেষে নির্জন বিলের ধারে গুলি খেয়ে মরে লোকটি। মহিলাটি হয় ধর্ষিতা এবং শেষে খুন। সবই আমরা মেনে নিয়েছিলাম কিন্তু মহিলার ধর্ষণের বিষয়টি মানা গেল না।

এর প্রতিক্রিয়া যা হবার তাই হলো। এক কাকডাকা ভোরে গ্রাম হলো আক্রান্ত। বাড়ি ছেড়ে আমরা পালালাম। পারলেন না মেজ কাকা। তিনি ধরা পড়লেন। কপাল ভালো হানাদারেরা যখন ঘরে ঘরে লুটপাট করছিল এই সুযোগে পালালেন তিনি। জানে বেঁচে গেলেন।

আমি দেখলাম বাড়িটি শূন্য করে যে যার মতো পালাচ্ছে, পড়ে থাকছে আমার ৮৫ বছর বয়সের বৃদ্ধা ঠাকুমা। 'আমারে বাঁচা', বুড়ির এই আকুতি আমার বুক কাঁপিয়ে দেয়। আর্মি তখন আমাদের উঠোনে। উত্তরে ঘরের বারান্দায় বুড়ি। জানবাজি রেখে আর্মির চোখ ফাঁকি দিয়ে ঠাকুমাকে আড়কোলা করে ছুটতে লাগলাম। মাথার ওপর দিয়ে, কানের ডান পাশ দিয়ে শাঁ শাঁ করে গুলি ছুটছে। আমি জঙ্গলে ঢুকে গেলাম। কিন্তু থামাথামি নেই। ছুট আর ছুট। উঁচু নিচু টিলা টেঙ্গর ভেঙে কেবলই ছুটে চলা।

বৃদ্ধা ঠাকুমার শরীরের ওজন কত ছিল আমি টের পাইনি। প্রবল উত্তেজনা, ভয়, আত্মরক্ষার উন্মাদ প্রেরণায় ডুবে গিয়ে বুঝতে পারিনি কী আসুরিক শক্তিতে ঠাকুমাকে বয়ে চলেছি। বহুদূর যাওয়ার পরও বুঝতে পারলাম আমি নিরাপদ নই। তা হলে মৃত্যুপথযাত্রী এই বৃদ্ধার জন্যে আমার সম্ভাবনাময় জীবনটা কি বিনাশ হবে? হঠাৎ ক্ষুদ্র স্বার্থপরতায় আচ্ছন্ন হয়ে ভাবলাম, বুড়িটাকে এখানেই পরিত্যাগ করে নিজের জান বাঁচাই।

আজো আমার ঠাকুমার সেই করুণ-অসহায়-ছল ছল ভয়ার্ত চোখ স্মৃতির ভেতর জীবন্ত হয়ে আছে। ঠাকুমাকে এক পর্যায়ে রাগে বলেছিলাম, 'বুইড়া হইছ, এস্ত বাঁচার শখ ক্যান তোমার? আমি পারমু না। তোমার লাইগা আমার জীবন যাইব।' ঠাকুমা উত্তর করেছিলেন, 'হ, তুই যা। দ্যাখ তোর বাপ-মা-কাকা-কাকিরা কৈ গেছে।' আমি ঠাকুমাকে উঁচু টিলার মতো ঘন ছনক্ষেতের ভেতর অযত্নে অবহেলায় ফেলে রেখে জান নিয়ে দৌড়াচ্ছি।

বেলা পড়ে এলে জানতে পারলাম মিলিটারিরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। বাড়ি-ঘর পুড়েছে। খুন করেছে। তবু মানুষ যে যার ঘরে ফিরছে। একে একে আমরাও সবাই বাড়ি ফিরে এলাম। ফেরেননি আমার ঠাকুমা। বাবা কাঁদতে লাগলেন তার হারানো মায়ের জন্য। আমি যে তাকে বয়ে নিয়ে গেছি এটা কেউ জানত না। আমি হতভম্ব হয়ে থাকলাম। কিছুতেই স্মরণে আসছে না কোথায় ঠাকুমাকে ফেলে এসেছি।

একসময় ঘটনাটি খুলে বলি আমি। এবার তার খোঁজার পালা। বেলাও পড়ে যাচ্ছে। বুড়িটা কি এতক্ষণ বেঁচে আছে? অপরাধবোধে আমি নুয়ে আসি।

বাবা ধমকাচ্ছিলেন, কেন আমি তার মাকে বাড়ি থেকে তুলে নিলাম। তার বিশ্বাস মিলিটারিরা বুড়োদের খুন করে না। শরীর কাঁপছে আমার। একটু একটু মনে পড়ছে যেখানে আমি তাকে পরিত্যাগ করেছিলাম তা একটি ছনক্ষেত। কিন্তু ছনক্ষেত তো কতই আছে। তবে কোন ছনক্ষেত?

আমি একটার পর একটা ছনক্ষেত মাড়িয়ে ছুটছি আর ঠাকুমাকে ডাকছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম ছনক্ষেতের আড়ালে শেয়ালের কান-মাথা। আমার আলামত পেয়ে পালাচ্ছে শেয়ালটা। দু'পা এগিয়ে গিয়ে দেখি আচ্ছন্নের মতো বসে আছেন ঠাকুমা। ভয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণায় বাক্যহারা। শেয়াল কোন উদ্দেশ্যে তার পাশাপাশি অবস্থান নিয়েছিল তা ভাবতেই শিউরে উঠি আমি। নিশ্চয়ই রাত নামার অপেক্ষায় ছিল।

তারপরই আমরা শরণার্থী হয়ে যাই। ফিরে এসে ওই দিন যে মহিলা গণ ধর্ষিতা হয়েছিল বলে কেবল অনুমান নয়, সাক্ষ্যও পেয়েছিলাম, তাদের কাছে ব্যাপারটি জানতে চাইলে তারা স্রেফ অস্বীকার করে। বিস্ময়ের বিষয় বটে। আমি আরো অবাক হয়েছিলাম একজন ধর্ষিতার স্বামীর গায়ে রাজাকারের পরিত্যক্ত কাল লম্বা শার্ট দেখতে পেয়ে। তিনি তা জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। অনুমান করতে পারি যুদ্ধের চূড়ান্ত ক্ষণে ঢাকার দিকে পলায়নরত কোনও রাজাকার আত্মরক্ষার জন্যে এটি জঙ্গলে ফেলে যায়। আমি মর্মাহত হই যখন গ্রামে ফিরে শুনতে পেলাম আমাদের গ্রামের প্রথম মুক্তিযোদ্ধা আমার স্কুলসহপাঠী ছাত্তারকে গুলি করে হত্যা করেছে তার দলের ছেলেরাই, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে। পরাধীন দেশে যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধার হাতে মুক্তিযোদ্ধা নিহত। সেই ছাত্তার যুদ্ধের সময় আমার কাছে টাকা দাবি করেছিল ডাকাতের হাত থেকে বাড়িটি রক্ষার জন্যে। কেননা তখন প্রতি রাতেই এখানে ওখানে ডাকাতি হচ্ছিল। ছাত্তার এসবের সঙ্গে জড়িত ছিল কিনা তা আমার জানা নেই। এমনটা আমি বিশ্বাসও করি না। তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। ভালোবাসি। সে আমার আমৃত্যু গৌরব। কিন্তু অবরুদ্ধ দেশে কেন সে খুন হয়েছিল আজো আমি সেই রহস্য ভেদ করতে পারিনি।

আমার ঠাকুমা আজ নেই। ১৯৭৩ সালে তার মৃত্যু ঘটেছে। আমৃত্যু তার বিশ্বাস ছিল আমি তার জীবনদাতা। তার পেটের সন্তানরা যখন তাকে পরিত্যাগ করেছিল তখন নাতি হয়ে আমি তাকে নবজীবন দিয়েছিলাম। আসলে তার সেই ধারণা ছিল ভুল। এক পর্যায়ে আমিও তাকে পরিত্যাগ করেছিলাম স্বার্থপরের মতো। তাই আজ ভাবি একাত্তরের যুদ্ধের কালটা কেবল আত্মত্যাগ আর নিঃস্বার্থ মহিমারই কাল ছিল না। সঙ্গে ছিল সংকীর্ণতা আর স্বার্থপরতার কাল। অন্যদিকে অবরুদ্ধ দেশে বাঙালির ঘর পাঞ্জাবিদের মতো বাঙালিরাও লুণ্ঠন করেছে এটা তো মিথ্যে নয়। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে পাঞ্জাবি হানাদার নিহত হওয়ার পাশাপাশি খুন হয়েছে সহযোদ্ধাও। এই যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আদর্শবর্জিত কিছু লোক মুক্তিযোদ্ধা সেজে অসহায় বাঙালির ঘরে ঘরে ডাকাতি করেছে, খুন করেছে সহযোদ্ধা, তার ধরাবাহিকতা চলছে আজো।

মুক্তিযুদ্ধের বীজের ভেতর নিশ্চয়ই দুষ্ট জীব-কোষ লুকিয়েছিল। তার বিকাশ আমরা দেখছি স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে আজ অবধি। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আমার গ্রামের প্রথম মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু ঘটে যুদ্ধকালীন দুঃসময়ে। স্বাধীনতা-উত্তর লুণ্ঠন-হত্যা-ক্ষমতার জন্যে রক্তপাতের গোপন ঈর্ষা তো মুক্তিযুদ্ধের বীজের মধ্যেই আত্মগোপন করে ছিল।

আমাদের সাহিত্যের ভাষারীতি

বাংলাদেশের সাহিত্যে ভাষা ব্যবহারে সাম্প্রতিক প্রবণতা কী? এ বিষয়ে প্রবেশের আগে আমাদের মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ হচ্ছে একমাত্র দেশ যার জাতীয় ভাষা বাংলা। তাই এদেশের কবি-সাহিত্যিকদের বিশ্বের অপরাপর বাংলা অঞ্চলের লিখিয়েদের চেয়েও ভাষাচর্চা বা সাহিত্যিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বেলায় অত্যন্ত সতর্ক ও গভীর সচেতনার পরিচয় দিতে হবে। ভাষা এমনি এক অতি স্পর্শকাতর ও রহস্যময় বিজ্ঞান, যাকে নিয়ে নৈরাজ্যের খেলা চলে না। ইতিহাস যে এ খেলা পছন্দ করে না, বরং নির্দয় পরিণতি নির্ধারণ করে তার প্রমাণ আমাদের বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন। ভাষার ইতিহাসে ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত ঘটনার কার্যকারণ এভাবেই তৈরি হয়।

মানুষের মুখের ভাষা আর সাহিত্যের ভাষা যে এক নয়, হতে পারে না, হয়ও না তার প্রমাণ কবিতা। মানুষ তার ভাবের আদান-প্রদানের বেলায় কবিতার অলংকার ছন্দ রীতি ব্যবহার করে না বা তা প্রায় সম্ভবও না। কবিতায় থাকে অলঙ্কার, চিত্রকল্প, শব্দের বহুমাত্রিক অর্থ বা ব্যঞ্জনা। নাটকের দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাবো পাত্র-পাত্রী ভাবের আদান-প্রদানের জন্য যে ডায়লগ বা ভাষা ব্যবহার করে তা প্রচলিত চলতি, প্রতিদিনের ব্যবহৃত ভাষা নয়। একজন শ্রমিক বা অশিক্ষিত কৃষকের মুখের ভাষাও সাহিত্যের ভেতর ঢুকে বদলে যায়। সেই বদলে যাওয়াটাই সাহিত্যের ভাষা। সেখানে থাকে বাচ্যের পরিমিতিবোধ, শব্দের গ্রহণ-বর্জন। অর্থাৎ কথা সাধারণ, কিন্তু ব্যঞ্জনার অর্থ সাধারণ নয় মোটেই, বরং অসাধারণ।

প্রাচীন বাংলায় কবিতার ভাষারীতি নিয়ে কবিদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল কিনা তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত। এমন নিদর্শন আজও আবিষ্কার হয়নি। অনুমান করা চলে তখন জাতিরাষ্ট্রের ভাবনা তৈরি হয়নি বলেই হয়তোবা এমন ভাষা বিতর্ক হয়নি। কবিরা ছিলেন আঞ্চলিক, তাই আঞ্চলিক কথ্যরীতি থেকেই তারা ভাষারীতি সংগ্রহ করতেন। আঞ্চলিক সমাজই ছিল

তাদের লক্ষ্য। অন্যদিকে চর্যাপদের কবিরা বাংলা অঞ্চলের একেক প্রান্ত থেকে এলেও আঞ্চলিক প্রভাবমুক্ত হয়ে চর্যায় ভাষারীতিকে প্রায় একই রকম রাখতে পেরেছিলেন বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিক সাধনরীতির কারণেই। তাছাড়া তারা তো আর বাংলা কবিতা বা সাহিত্যের কথা ভেবে কবিতা বা গান রচনা করেননি, উদ্দেশ্য ছিল গুহ্য সাধনা।

মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষারীতিও বৈষ্ণবীয় সাধনার অনুসারী। মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির কাব্য-ভাষার অনুকরণেই তো সৃষ্টি হয় মিশ্রভাষা ব্রজবুলি। তাই বলে কি মৈথিলীর লোকেরা ব্রজবুলির ভাষারীতি অনুসরণ করত তাদের প্রতিদিনের জীবনে? ব্রজবুলি কিংবা পদাবলীর ভাষারীতি তৈরির পেছনেও কাজ করেছে ওই ধর্মসাধনা বা তৎসম্পর্কিত শব্দ ও ব্যঞ্জনা। মধ্যযুগে মুসলমান কবিগণও কবিতায় আরবি-ফারসি-তুর্কি শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেখানেও ধর্মসাধনা এবং ঐতিহ্যের প্রভাব ছিল। বাংলাভাষার ব্যবহার নিয়ে তখন বিতর্ক থাকলেও প্রায়োগিক ভাষারীতি (বাংলা) নিয়ে তর্ক বাধেনি।

বাংলা সাহিত্যের ভাষারীতির বিতর্কটা তৈরি হয় লেখ্য গদ্যরীতি প্রচলনের সময়। দাবি ওঠে, কাব্যরীতির পাশাপাশি গদ্যরীতিও তৈরি করতে হবে, সর্বজনীন একটা রীতি চাই। 'সর্বজনীন' কথাটা উঠল এ কারণে যে, ঔপনিবেশিক ধারণা এবং জাতীয় সত্তার ধারণাটা ততদিনে বাঙালি জেনে যায়। ইংরেজি গদ্যরীতি সে ক্ষেত্রে তাদের পাথেয় হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রামরাম বসু, রামনারায়ণ তর্কালঙ্কারের এই রীতির ব্যাপারে বহু যুদ্ধ করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় এলেন রবীন্দ্রনাথ কিংবা প্রমথ নাথেরা। কিন্তু ভাষার ঐতিহাসিক ওই যে কার্যকারণ সম্পর্ক, প্রকৃতপক্ষে অলক্ষ্যে সাহিত্যের ভাষারীতি নির্মাণে সেই বাস্তবতাই কাজ করেছে। সেই কার্যকারণের সঙ্গে রয়েছে হাজার হাজার বছরের ঐতিহাসিক বাস্তবতা, যা বিবর্তনবাদের সূত্র ধরে অগ্রসরমান। আর সেখানেই ভাষাবিজ্ঞানের রহস্যও লুকিয়ে আছে।

কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা ক্ষুদ্রগোষ্ঠী বিশেষ ইচ্ছে করলেই যখন-তখন ওই ভাষারীতি বিবর্তনের সূত্রকে রাতারাতি বদলে দিতে পারে না। এমন চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেননা ভাষা একটি বিজ্ঞান, সেই বিজ্ঞান কোনোভাবেই নৈরাজ্যকে প্রশ্রয় দেয় না। এ ধরনের প্রচেষ্টাকে পাঠক বরং কৌতূহলের সঙ্গে দেখবে কিন্তু সাহিত্যের রীতি হিসেবে মেনে নেবে না। সেখানে বড়জোর চমক থাকতে পারে কিন্তু গ্রাহ্য হবে না। এটা সাহিত্যরীতির ঐতিহাসিক বিবর্তনের বাস্তব সত্য। সাহিত্যের ভাষা ইতিহাসের পালাবদলের অনুগামী, কারো চমক সৃষ্টির হাতিয়ার নয়।

কবিতার বেলায়ই আসা যাক। বিশেষ করে তরুণ লিখিয়েদের। লক্ষ্য করার মতো বিষয় এই যে, বাংলাদেশের কবিতার ভাষারীতির বিশেষ করে শব্দ ব্যবহারে একটি প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেটি হলো আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার

এবং ক্রিয়াপদের সাধু বা কথ্যরূপের আমদানি। তবে এমনটা দাবি করা যাবে না যে, কবিতার এই ভাষা উত্তরাধুনিক। কেননা উত্তরাধুনিকতা যতটা না স্থানিক শব্দ প্রয়োগ-নির্ভর তার চেয়ে অধিক তার দর্শনচর্চা। কবিতার দর্শন না বুঝে কেবল আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগে তা উৎকর্ষ লাভ করে না। আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগ দোষের নয়, বরং ক্ষেত্র বিশেষ এটি কাব্যগুণেরই অঙ্গ হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রয়োগের কলাকৌশলটা জানা চাই। তা না হলে ধ্বনি ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হবে কেমন করে?

অন্যদিকে বাংলাদেশের একেক অঞ্চলের লৌকিক শব্দ উচ্চারণ ভেদে এবং বানান রীতিতে অন্য অঞ্চল থেকে আলাদা। কবিতার সর্বজনীনতা এক্ষেত্রে প্রশ্নের সামনে এসে দাঁড়ায়। বাংলা ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের রীতির দিকে তাকালে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাই এক্ষেত্রে একই অর্থবহ শব্দ উচ্চারণ রীতিতে যদি হাজার রকম হয়, তবে কবিতা তো আঞ্চলিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। তাই আজ জরুরি হয়ে পড়েছে আঞ্চলিক শব্দগুলোর এবং ক্রিয়াপদের সুনির্দিষ্ট একটিমাত্র বানান বা উচ্চারণ রীতি গ্রহণ করার। একেক অঞ্চলের কবি একেক ভাষারীতি গ্রহণ করলে রীতির নৈরাজ্য সৃষ্টি হতে বাধ্য।

কথাসাহিত্যের তথা গদ্যের বেলায় আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ ইদানীং বৃদ্ধি পেয়েছে। লেখক-ভাষাটিও কেউ কেউ আঞ্চলিক উপভাষার দ্বারা তৈরি করছেন। এ কথা সঠিক নয় যে, আঞ্চলিক কথ্যভাষায় গল্প-উপন্যাস লিখলেই নতুন ফর্মের সৃষ্টি হয়। আসল কথা হচ্ছে ভাষার ইমেজ তৈরি করা। গল্পের ঘটনা ও পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে যদি উপভাষা বা অপভাষা যথার্থ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি না করতে পারে তবে সৃষ্টিটাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য কৃষক কিংবা কারখানার শ্রমিকের মুখের ভাষায় তার জীবনকথা বর্ণনা করলেই তা নতুন আঙ্গিকের বিস্ময়কর সাহিত্যকর্ম হয়ে ওঠে না। জীবন ও মনের অতলে প্রবেশ করতে না পারলে যে ভাষারীতিতেই গল্প-উপন্যাস লেখা হোক না কেন তা কালজয়ী হয় না। জীবন সমগ্রতা, চরিত্রের সমগ্রতা এবং মানব চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক অভিক্রিয়া যখন আঞ্চলিক-অপভাষায় ভাষারীতির জাদুময়তা সৃষ্টি করে তখন সাহিত্য হয়ে ওঠে অভিনব। তাই গল্প-উপন্যাসে উপভাষার প্রয়োগের ব্যাপারে লেখকদের আরো পরিশ্রম করতে হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা অতি আবশ্যক।

একটি বিষয় এখন অনিবার্য প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে গেছে যে, বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের লেখক-ভাষাটি কী হবে? আমরা কি হাজার বছরের ভাষা বিবর্তনের দ্বারা সৃষ্ট প্রচলিত গদ্যভাষাকে পরিত্যাগ করব? আমরা কি লেখালেখি করব যে যার আঞ্চলিক ভাষায়? যদি তাই হয় নিশ্চয় আমাদের কথাসাহিত্যের গদ্যের আর একটিমাত্র রীতি থাকছে না। ৬৪ জেলার ৬৪ রূপের বাংলা নিয়ে সাহিত্য এক নৈরাজ্যে পতিত হবে নাকি? জেলা বা অঞ্চলভিত্তিক মানুষের জন্য আলাদা আলাদা বাংলারীতিতে গল্প-

উপন্যাস লিখতে হবে কি? উপন্যাস এবং গল্পে এ ধরনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে ইদানীং।

তবে তো নোয়াখালী কিংবা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত উপন্যাস দেশের অপরাপর পাঠকের জন্য দুর্বোধ্যতার কারণে অপাঠ্য হতে বাধ্য। রাজশাহী, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুরের আঞ্চলিক ভাষার গল্প কি পাঠযোগ্য হবে কুমিল্লা, ঢাকা, নরসিংদীর পাঠকের? ওরা কি তা পাঠ করতে বাধ্য?

আসলে এমন দৃষ্টান্ত সাহিত্য-ভাষার নৈরাজ্য বৈ কিছু নয়। ঐক্যবদ্ধ সুনির্দিষ্ট বাংলাভাষার সাহিত্য রীতির ক্ষেত্রে এ হচ্ছে সাহিত্যিক আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদ। একই ভাষাভাষী একই রাষ্ট্রের ভেতর হাজার রকম আঞ্চলিক ভাষারীতি সাহিত্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক 'সাহিত্যরাষ্ট্র' বা 'সাহিত্য গোত্র'-এ বিভক্ত করে নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে নাকি?

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে স্ল্যাং বা অপভাষার ব্যবহারের বিষয়টি নতুন হলেও বিশ্বসাহিত্যে এটি সুপ্রাচীন ধারা। এ ভাষার সাহিত্যিক ব্যবহার অবশ্যই নতুন ফর্মের ক্ষেত্রে আবশ্যক। কিন্তু ব্যবহার হতে হবে সতর্ক, যেন সাহিত্য গালিগালাজের অভিধানে পরিণত না হয়। যারা অপভাষার অপশব্দ প্রয়োগ করবেন, চরিত্রের বচন-বাচনে তাদের অবশ্যই মানব চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটা অনুপুঙ্খ জেনে নিতে হবে। আরো জানতে হবে এই ভাষা বা শব্দগুলোর উদ্ভবগত নৃ-তাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক কার্যকারণ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনো নরগোষ্ঠীর ব্যবহৃত এসব শব্দ হাজার হাজার বছর ধরে আজও টিকে আছে, তাও বুঝতে হবে। আমাদের জানতে হবে আজ যেসব শব্দকে আমরা অশ্লীল বলে জানি সেসব শব্দ অজানা বিলুপ্ত ভাষারই অংশ ছিল। আধিপত্যকামী শক্তিশালী অন্য জাতিরা কীভাবে এসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকে ধ্বংস করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাষাও হারিয়ে গেছে, কিংবা টিকে থাকা শব্দগুলোকে নিষিদ্ধ করেছে, সে ইতিহাসটা আমাদের জানা দরকার। প্রতিটি অশ্লীল শব্দের তথাকথিত ভদ্র প্রতিশব্দ রয়েছে, আমাদের তথাকথিত ভদ্রতার মাপকাঠিও নির্ধারিত হয় ওই সব নিষিদ্ধ শব্দ প্রতিদিনের জীবনে ভাববিনিময়ের সময় ব্যবহার করা আর না করার ওপর।

তাই বলে আমরা যেমনি সুপ্রাচীন বিলুপ্ত সময়ে ফিরে যেতে পারি না, তেমনি পারি না যথেচ্ছ অপশব্দ সাহিত্যে আমদানি করতে। ব্যবহার অবশ্যই হবে সতর্ক। সেই সতর্কতাই সৃষ্টি করবে বাংলাভাষার অভিনব ব্যঞ্জনা। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে, আমরা ১৯৫২ সালে যে বাংলাভাষার মর্যাদার লড়াইটা করলাম সেই বাংলা কোন বাংলা? সেদিন ওই লড়াইয়ের সময় অবশ্য ভাবার অবকাশ ছিল না, আমরা কোন রীতির বাংলা ভাষার জন্য লড়ছি। এখন সময় এসেছে সুনির্দিষ্ট একটি ভাষারীতি বা সাহিত্যিক বাংলা নির্ধারণ করার। এ কথাও মনে রাখতে হবে, সাহিত্যের রীতি নির্মাণের ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহার নিয়ে নৈরাজ্য ইতিহাস মেনে নেয় না।

সাহিত্যে সাম্রাজ্য ও অশ্বখুরধ্বনি

পশ্চিমের ওদিকটায়ই নয় কেবল, আমাদের এদিকটায়ও উপমহাদেশের সাহিত্যে সাম্রাজ্যের অশ্বখুরধ্বনি স্পষ্ট শোনা যায়। সুপ্রাচীন ধূসর জগতের দিকে কান পাতলে আজো স্পষ্ট বাজে আয়ুধ আর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। মহাকাব্য রামায়ণ মহাভারত তো শব্দময় হয় ঘোড়ার পদশব্দ আর হ্রেষা কিংবা নররক্তের স্রোত কোলাহলের আবহে। আমরা আতংকিত, উল্লসিত, উত্তেজিত কিংবা শোকানলে জ্বলি। যুদ্ধগৌরবে পুলকিত হলেও ক্ষণমুহূর্তের জন্য আক্ষেপিতও হই। রোম সাম্রাজ্য ধ্বংসকারী হুন মহাবীর আতিলার অশ্বখুরের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হওয়া সবুজ প্রান্তরে শত বছর এটিকও তৃণ না জন্মাবার মীথ কি ম্লান করে না মাইকেল মধুসূদনের *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর লংকা পতনের ভয়ংকর দৃশ্য? কিংবা মীর মশাররফের *বিষাদ সিন্ধু* কাব্যের হোসেনের মস্তক ছেদনের দৃশ্য? কেন আমরা ভুলে যাই মধ্যযুগের পুঁথিসাহিত্যের *জঙ্গনামা* ধারার কাব্যিক বর্ণনাকে?

কেবল বাংলা মহাকাব্যধারার যুগের কবি মাইকেল মধুসূদন, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা কায়কোবাদ কেন, আমাদের এই আধুনিক যুগের এশিয়ার প্যালেস্টাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা আর একাত্তর কিংবা তৎপরবর্তী বাংলাদেশের কথাসাহিত্য কিংবা কাব্যসাহিত্যে কি অশ্বখুরধ্বনি নেই? এটা জোর দিয়েই বলা যায়, আধুনিক বাংলাদেশি কবিরা যত সংখ্যক যুদ্ধ কবিতা লিখেছেন, পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষায়ই এমনটা লিখিত হয়নি। সেই কবি আল মাহমুদ-শামসুর রাহমান থেকে শুরু হয়ে রফিক আজাদ, আবু হাসান শাহরিয়ার অবধি এক দীর্ঘ ইতিহাস। তাদের অনুজগণও প্রাণিত হয়েছে যুদ্ধ কবিতাকে ঋদ্ধ করতে। আজও তা অব্যাহত।

প্রাচীন অশ্ব ব্যবসায়ী আর আয়ুধ তৈরির কারিগরদের আধুনিক সংস্করণ হল যুদ্ধবিমান আর ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবসায়ী শ্রেণী। পৌরাণিক অস্ত্র যেমন এখন জাদুঘরের স্মৃতি মাত্র, তেমনি প্রাচীন মহাকাব্যও তাই। তাই বলে সাহিত্যের

সেই ঐতিহ্যকে অপ্রাসঙ্গিক বলা হচ্ছে না, বরং প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে, সাহিত্যের ডারউইনিয় ক্রমবিবর্তন ধারায় মহাকাব্য হচ্ছে সাহিত্যের জিনেটিক বিজ্ঞান ভূমি। মাইকেলের আয়ুধ কাব্য *মেঘনাদবধ কাব্য*, নবীন সেনের *পলাশীর যুদ্ধ* কিংবা *কুরুক্ষেত্র* নয়তো হেমচন্দ্রের *'বৃত্রসংহার'* কিংবা কায়কোবাদের *মহাশ্মশান* এই আধুনিক সময়াধারেও প্রাসঙ্গিক। মীর সাহেবের *বিষাদ সিন্ধু* পাঠ করে আজও বাঙালি চোখের পানি ফেলে।

আমরা কল্পনা করতে পারি উড়ন্ত অশ্ব বোরাককে। স্মরণ করতে পারি পৌরাণিক অগ্নিবাণ কিংবা আকাশে বিচরণকারী বায়ুরথকে। আমরা কি রূপকথার পঙ্খীরাজ ঘোড়াকে নিয়ে দাবি করতে পারি না সবকিছুর মূলেই সাম্রাজ্য কল্পনা? এসব কল্পনা পৌরাণিক কবি, চাইকি আধুনিক কবির কল্পনায় এল কী করে? এল এ কারণে যে, মানবজাতির উত্থান এবং আত্মবিকাশের প্রচণ্ড প্রবণতাই এর মূলে। আমাদের একাত্তর পর্বের কবিরা, তরুণ কি প্রবীণ, স্বপ্নিল হয়ে ওঠেন একাত্তরের আয়ুধে, তাদের কানের সুড়ঙ্গে রণরণিত হয় ওই যুদ্ধ। অবাক লাগে বইকি, যাদের জন্ম একাত্তর-উত্তর, তাদের কবিতায়ও বাঙালির অশ্বখুরধ্বনি বেজে ওঠে। যুদ্ধ ওরা দেখেনি, পূর্বসূরি কবি-লেখকদের পাঠ করে হিপটোমাইজিং হয়ে পড়ে, কাগজের ওপর কবিতা যেন পৌরাণিক যুদ্ধঅশ্বেও খুরধ্বনি তোলে কলমের ডগায়। এ যেন এক অনিবার্য দায়।

বাংলার কবিদের সাম্রাজ্য কিন্তু পররাজ্য দখল নয়, আপনরাজ্য পুনরুদ্ধার। তাদের অশ্বখুরধ্বনি নৃপতির পালিত ভাড়াটে যোদ্ধার অশ্বের পদধ্বনি নয়। কলম নিঙড়ানো শহীদের রক্তস্রোতের অভিঘর্ষণের শব্দমালা। তাই পৌরাণিক কবির অশ্বের চেয়েও মূল্যবান বাঙালির একাত্তরের সাম্রাজ্য আর অশ্বখুরধ্বনির প্লাবন। বাঙালি কবির একাত্তরের যুদ্ধ-অশ্বের মৃত্যু নেই, যদিও নবাব সিরাজের প্রিয় অশ্বের নিঃসঙ্গ মৃত্যু ঘটেছে। হাজার লক্ষ বছর পরও একাত্তর নিয়ে বাঙালি কবিরা কবিতা লিখলে তা মহাকাব্য যুগের পৌরাণিক অশ্বের রূপ নেবে না। এ অশ্ব কাল থেকে কালান্তরের। মহাকালের। এ মহাকাব্য লেখার অধিকার একমাত্র বাংলাদেশি বাঙালির, অন্য বাঙালির নয়। মুঘল সম্রাটেরা যেমনি আরবীয় অশ্ববিক্রেতাদের হটিয়ে সেই ব্যবসা তুলে দিয়েছিল পর্তুগিজ জলদস্যুদের হাতে, আমাদের কবিতা সেই অধিকার আপন হাতেই রাখবে চিরদিন-নিশিদিন। বাঙালি কবিরা জানেন আর্যশক্তি, হুন শক্তি, পাঠান-মুঘল-তুর্কি-আরব শক্তি অশ্ববলে বলীয়ান হয়েই লণ্ডভণ্ড করেছিল বঙ্গীয় ভূভাগ। জানেন বলেই একাত্তরের অশ্বকে অন্য কারও হাতে তুলে দিতে রাজি নন।

একাত্তরের অর্জন যতদিন বাঙালির দখলে থাকবে ততদিন অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্বের মতো পালাবে না তাদের কাব্যের অশ্ব। একাত্তরের অশ্বের খুরধ্বনিই বাঙালির কাব্যকে করে রাখবে চিরঞ্জীব বিশ্বাসে স্থির। কেননা পৌরাণিক মহাকাব্যের মতো কেবল বীররস কিংবা করুণ রসে সিক্ত নয় একাত্তরের কাব্য উচ্চারণ। এ কাব্যের অশ্বখুরধ্বনি স্বপ্ন দেখায় বিজয়-উত্তর সুবর্ণ গ্রামের।

ভালবাসা, আত্মবলিদান, বিশ্বাস, প্রজ্ঞা আর ত্রিকালদর্শিতা রয়েছে একাত্তরের কাব্য অশ্বখুরধ্বনির জগতে। এখানে নেই কোনও পৌরাণিক নৃপতি, নেই পৌরাণিক রাজ্য। কেবলই আছে জনগণ। পৌরাণিক দেবতাদের বদলে রয়েছে গণদেবতা।

ওই গণদেবতা অর্থাৎ গণের নিমিত্ত দেবতার বদলে এখানে রয়েছে গণই দেবতা। সেদিন তো গণমানুষই অস্ত্রহাতে দেবতা ইন্দ্র হয়ে গিয়েছিল। কবিতা যারা পাঠ করেন তারা প্রত্যেকেই জানেন একাত্তর ধারার কবিগণ কোন কাব্যে কোন কবিতায় কোন অশ্বখুরধ্বনি তুলেছেন। এখানে আমি কোনও কবিতার উদ্ধৃতি দিতে চাই না। এই কবিদের যে অহংকার, যে জাত্যাভিমান, যে ঋদ্ধতা তা কখনও পররাজ্যলোভী রাজাদের মতো নয়। নয় সাম্রাজ্য বিস্তার আর নররক্তে হাত রাঙানো হুন-মুঘল-তুর্কি-ইংরেজের মতো। বাঙালি কবি ইংরেজ কবির মতো উচ্চারণ করেনি পররাজ্য দখলের বীরগাথা। এখানেই বিশ্বকাব্যের সঙ্গে বাংলা কাব্যের পার্থক্য। ইউরোপের যুদ্ধ কিংবা প্রথম-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মিথ নিয়ে লেখা কবিতায় যেমনি উগ্র জাত্যভিমান মেলে, মহাদেশ বিজয়ের লালসায় শাসকশ্রেণীর সঙ্গে কবিরাও সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রতায় জ্বলে ওঠে স্বদেশ প্রেমের নামে, বাঙালি কবি সেখানে আপন মাতৃভূমির মহিমায়-সংকটে-বিপর্যয়ে কিংবা বিজয়ে কাব্যসিক্ত করে। বাঙালির যুদ্ধকবিতার এখানেই পরম মহিমা। এখানেই একক কর্তৃত্ব।

অশ্বখুরধ্বনিতে মহিমান্বিত হয়েছে প্রাচীন মহাকাব্য, বাংলার কবি সেই সাহিত্যিক সাম্রাজ্যবাদকে গ্রহণ করেনি বরং ঘৃণাই করেছে। মাইকেল শোকাহত হয়েছেন রামচন্দ্রের লংকা বিজয়ে। কায়কোবাদ *মহাশ্মশান* কাব্যে পরাজিত মারাঠা বালানাথের শোককে নিজের শোক করে নিয়েছেন। বাঙালি কবি ঘৃণা করে সাম্রাজ্যবাদকে, এটাও প্রত্যাশা করে না এই জাতি পররাজ্য বিজয়ী হোক। একাত্তরের কবিরা কিংবা উপনিবেশ যুগের কবিরা কখনও বলেননি ইংল্যান্ড কিংবা পিণ্ডি দখলের কথা, বলেছেন আপন স্বাধীনতার কথা। এমন দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্ব কবিতায় কোথাও পাওয়া যাবে না। ইংরেজি কাব্য উচ্চারণ 'ও ক্যাপটেইন মাই ক্যাপটেইনের' আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিজয়ের গোপন তৃষ্ণার মতো দৃষ্টান্ত বাঙালি কবি তৈরি করেনি।

বাংলা কবিতা হোক বা কথাসাহিত্য হোক, এই প্রবণতা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা প্রয়োজন। বাংলা কাব্যের অশ্বখুরধ্বনি যে সীমালংঘন করেনি এ কথাটি প্রমাণ করার প্রয়োজন ছিল বহু আগে। আরও প্রমাণ করতে হবে কী করে কবিরা একাত্তরের কবিতা বা খণ্ডকাব্যে মহাকাব্যের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। এখানে রাজা নেই, রাজ্য নেই বরং আছে দেশ। ব্যক্তি মহাবীর নেই, মহানায়ক নেই, বীর-নায়ক হচ্ছে সামষ্টিক জনগণ। তাই অশ্বখুরধ্বনির প্রকরণ নির্ধারণ খুবই জরুরি। এ না হলে বাংলাদেশের কবিতার গতিপ্রকৃতির পূর্ণাঙ্গ চিত্রটা মিলবে না। মেলানো যাবে না।

কার্ল মার্কসের কাছে ফেরা

গণমাধ্যম বিশ্বজনতাকে চমকে দিয়ে খবর পরিবেশন করেছে যে, মৃত কার্ল মার্কসের কবরের দিকে ছুটে যাচ্ছে সারা ইউরোপের রাষ্ট্রনায়ক থেকে শুরু করে পুঁজিবাদী অর্থনীতিক তাত্ত্বিক মহাতাত্ত্বিক তথা বুদ্ধিজীবীরা। উদ্দেশ্য, লোকটিকে শ্রদ্ধা জানাতে নয়, বরং অপাঙ্‌ক্তেয় মানুষটির সঙ্গে কথা বলতে। চোখের সামনে অবিনশ্বর বলে কথিত পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা প্রাণঘাতী রোগে মৃত্যুর বিছানায় শুয়ে পড়েছে। কোনো দাওয়াইয়েই কাজ হচ্ছে না। তাই পুঁজিবাদের রোগ শনাক্তকারী মার্ক্সের কাছে গিয়ে যদি কোনো নিরাময়ের সন্ধান মেলে! ইউরোপে হঠাৎ মার্কস নিয়ে এই আগ্রহের অর্থ এই নয় যে, ওরা মার্কস ব্যাখ্যায় সত্যের কাছে পৌছে যেতে চায়। তারা মার্কসের *ডাস ক্যাপিটাল* বইখানা খুঁটিয়ে দেখতে চায় রোগ নির্ণয়ের পাশাপাশি পুঁজিবাদের নিরাময়ের কোথাও কোনো ইঙ্গিত রয়েছে কি না। না, এমন কোনো ইঙ্গিত মার্কস দিয়ে যাননি, বরং তিনি পুঁজিবাদের মৃত্যুর ভেতর দিয়ে সমাজবাদের জন্মের কথা বলেছেন। মার্কস পুঁজিবাদের যে সঙ্কটের কথা বলেছেন তা অলঙ্ঘনীয়। এর কোনো দাওয়াই নেই। তারপরও এই সংবাদ অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ।

পুঁজিবাদকে রক্ষার সর্বশেষ যে দাওয়াই তারই নাম মুক্তবাজার অর্থনীতি। আজকের বিশ্ব এই মুক্তবাজার অর্থনীতির দানবের লুণ্ঠনের ফলে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। সারাবিশ্বে অর্থনীতির যে মহাসঙ্কট শুরু হয়েছে, দিন দিন তা গভীর থেকে গভীরে পতিত হয়েছে। পুঁজিবাদের রক্ষক খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক মহাবিপর্যয়ে পতিত হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক-বীমা সব পথে বসে যাচ্ছে একে একে। যে ব্যবসায়ী আর শিল্পপতিরা অর্থনীতির নিয়ামক, তারা পড়ে গেছে অন্ধকার গর্তে। কেবল নিজেরাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও তার জনগণ পড়েছে মহাবিপর্যয়ে। এই বিপর্যয়ের ঝড় এক ধাক্কায় আমেরিকাকে তছনছ করে ইউরোপ হয়ে এশিয়া-আফ্রিকায় আছড়ে পড়েছে।

এই যে মহাসঙ্কটে পড়েছে পুঁজিবাদ, নিশ্চয়ই এর কারণ রয়েছে। প্রথম কারণটি হচ্ছে অর্থনীতির বিশ্বায়ন। এই বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীর কোনো দেশেরই আজ অর্থনৈতিক সীমানা নেই। এমন শক্তি নেই যে কোনো দরিদ্র বা অনুন্নত দেশ নিজস্ব অর্থনীতিকে প্রোটেকশন দিয়ে রাখবে। শিল্প কারখানা নির্মাণের বদলে তাদের হতে হয়েছে আমদানিকারক। পুঁজি হয়েছে পাগলা ঘোড়ার মতো, সে নিয়ন্ত্রিত হতে চায় না, বিশ্বায়নের নামে সে দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটছে সব দুমড়ে মুচড়ে। তাছাড়া ব্যাংকিং খাত এতোটাই প্রাধান্য পেয়েছে, রাষ্ট্রশক্তির চেয়ে সেই খাত অধিক শক্তি অর্জন করে পুরো পুঁজিবাদী সিস্টেমটিকে নড়বড়ে করে দিয়েছে। এরই নাম বুঝি মুক্তবাজার অর্থনীতি!

উন্নত বিশ্বের অবস্থাটা এমন যে, অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক বাজারে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃত্ব সীমাকে লঙ্ঘন করে গেছে। মুনাফা যেন দৈত্যের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে অর্থবাজারে। ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বেড়েছে যত; ক্রেতা কমেছে তত। যে নীতি ছিল কৃষি শিল্পখাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র দেশগুলো আত্মরক্ষা করবে, তাদের বানানো হয়েছে ভোক্তা বা ক্রেতা। অথচ ক্রয়ক্ষমতাই নেই তাদের। শেয়ার বাজারের মতো অর্থনৈতিক ফটকাবাজার দেখা গেল পতিত হচ্ছে গভীর গর্তে। শিল্প-বাণিজ্যিকে স্বাভাবিক পথে চলতে না দিয়ে জুয়া খেলার অসৎ ফটকাপুঁজি শেয়ারবাজারকে একেবারে তলিয়ে দেয়।

এই পুঁজি নিয়ে যারা মুনাফায় নামে তারা হচ্ছে অর্থনীতির মাফিয়া। সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠছে যে, আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার মোড়ল এই দুঃসময়ে কী করছে? বিশ্ব ব্যাংক আর আইএমএফ নামের মোড়লরা আজ কোথায়? এটাও মিথ্যে নয় যে, এসব সংস্থার চালক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেখানে কাত হয়ে পড়েছে, সেখানে মোড়লদেরও অসহায় অবস্থা– ত্রাহি মধুসূদন।

আজকের এই সঙ্কটের মূলে বিশ্বব্যাপী আমেরিকার দাপিয়ে চলা। অর্থনীতি, সমরনীতি আর রাজনীতি সে তার ইচ্ছে মতোই চালাচ্ছে। কাউকেই পাত্তা দিচ্ছে না। তার এই উন্মাদ আচরণে বিশ্ব আজ ক্ষত-বিক্ষত। বিশ্বকে আপন বশে রাখতে গিয়ে নিজের মেরুদণ্ডে ক্ষত সৃষ্টি করেছে। ইরাক-আফগান যুদ্ধই নয় কেবল, সারা বিশ্বকে ঘিরে দানবীয় সামরিক ঘাঁটির পেছনে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার খসে যাচ্ছে তার। তাই আজ সে ক্লান্ত।

তবে এটাও মনে করার কারণ নেই যে, সহসাই এই দেশটি বিশ্বনেতৃত্ব হারিয়ে ফেলবে। এ কথাও সত্য নয় যে, আজ-কাল-পরশুর মধ্যেই পুঁজিবাদের পতন ঘটবেই। এটি এমনি এক সিস্টেম যার তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটে না, ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়। সারাবিশ্বই তো এই পুঁজিবাদী সিস্টেমে বন্দি। ক্ষয়টা হঠাৎ হবে না।

পুঁজিবাদ রক্ষার সর্বশেষ দাওয়াই ছিল ধর্ম। বিশ্ব-পুঁজিবাদ আপন আপন দেশসহ পৃথিবীর ঘরে ঘরে ধর্মের উন্মত্ততা আর বিদ্বেষকে জাগিয়ে তুলেছে।

বিশ্বনিয়ন্ত্রক পশ্চিমা দেশে দেশে ধর্মীয় খ্রিস্ট মৌলবাদ ক্ষমতা দখল করেছে। এশিয়া-আফ্রিকা এবং পূর্ব ইউরোপে সভ্যতা বিরোধী এই মৌলবাদকে উন্মাদ হিংস্র দানবে পরিণত করা হয়েছে। আফগান-ইরাক-পাকিস্তান পরিস্থিতি মানব সভ্যতাকে চমকে দিয়েছে। তারপরও পুঁজিবাদকে নিরাপদ রাখা গেল না। স্বৈরাচারী আরব বাদশারাও জ্বালানি তেল দিয়ে পুঁজিবাদকে রক্ষায় কোনো ভূমিকাই রাখতে পারল না। পুঁজিবাদের মৃত্যু নেই বলে যারা বিশ্বাস করত তাদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে আজ।

নব্য পুঁজিবাদী ভাঙা রাশিয়ার কথা না হয় বাদই গেল। মাও-সেতুংকে অস্বীকার করে পুঁজিবাদী হয়ে ওঠা চীনের অবস্থা আজ কী? মুনাফার লোভে বিষ মেশানো দুধ, খেলনা-খাদ্যদ্রব্য এমনকি টায়ার-মোবাইলের কভার ভোক্তাবিশ্বকে তো বটেই, নিজের দেশেরও সর্বনাশ করে ছেড়েছে। যত দ্রুত বিশ্ববাজারে নিষিদ্ধ হচ্ছে চীনা পণ্য, তত দ্রুত বন্ধ হচ্ছে হাজার হাজার কারখানা। প্রবৃদ্ধি এগারো থেকে নেমে এসেছে নয়-এ। দেশটির শেয়ারবাজার পঁয়ষট্টি শতাংশ মূল্য হারিয়েছে।

এটা কি ভাবা যায় যে, মহান নেতা মাও-এর দেশটি পুঁজির মুনাফার লোভে আপন দেশের কোটি কোটি শিশুর বিষাক্ত দুধের দ্বারা কিডনি ড্যামেজ করে দিয়েছে? পুঁজিবাদী পথে বিশ্বশক্তি হওয়ার মোহ আজ কোথায় নিয়ে গেছে চীনকে? এটা দেখেও কি ধনী হওয়ার স্বপ্নতাড়িত ভারতের শিক্ষা হচ্ছে না? পরমাণু চুক্তির নামে পতিত পুঁজিবাদের কাছে আত্ম-বিক্রি কোন পথে নিচ্ছে ভারতকে?

প্রশ্ন হচ্ছে কার্ল মার্কসের প্রতি অতি উৎসাহ কি মার্কসকে ব্ল্যাকমেইলিংয়ের অপকৌশল? পুঁজিবাদের অনুসারীরা মার্কসের কাছে তো সমাজ বিপ্লবের জন্য যাবে না, যাবে জীবনরক্ষাকারী দাওয়াই খুঁজতে। এই খোঁজাটাই এখন চলছে। আমরা এটাও জানি মার্কসের *ডাস ক্যাপিটাল* নিয়ে নতুন করে গবেষণা হবে, কেন, কোন কারণে মার্কস পুঁজিবাদের সঙ্কট ও পতনকে দেখতে পেয়েছিলেন তা নিয়ে হবে কোটি ডলার ব্যয়ে গবেষণা। এই আশায় হবে যে, যদি মেলে দাওয়াই।

কৌতূহলের ভেতর দিয়ে এটাও আমরা শুনছি আমাদের বাংলাদেশের মতো স্বল্পমেধার দক্ষিণপন্থী অর্থনীতিবিদরা নাকি পুরেনো বইয়ের দোকানে লোক পাঠাচ্ছে ক্যাপিটালের খোঁজে। মার্কসের এই বইখানা থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করার ক্ষমতা বা মেধা খুব একটা না থাকলেও আমরা অপেক্ষা করছি তাদের ব্যাখ্যাটা পত্রিকার পাতায় পাঠ করতে। অচিরেই আমরা হয়তো অসার বক্তব্যগুলো বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পাতায় কলামের চেহারায় দেখতে পাব। কেননা আমরা বিশ্বাস করি 'দারিদ্র্য-বেকারত্ব জাদুঘরে স্থান' পাওয়ার মতো পুরাতত্ত্বের প্রত্নুনিদর্শনের পাথুরে বা ধাতব নিদর্শন নয়; ওটা রাজপথে, গ্রামে-গঞ্জে দরিদ্রের মুখে, শরীরে, ঘরে-সংসারের জীবন্ত বাস্তবতা।

বাঙালির চোখ দিয়ে নয়, ইউরোপের চোখ দিয়ে। এটা এমন যে, রাজবাড়ির দাস-দাসীর চোখে প্রভু এবং তার জীবন দেখার মতো। এই ক্রীতদাস দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদেরকে পঙ্গু করে দিয়েছে। তাই তো সঙ্গীতের নামে, সাহিত্যের ছদ্মবেশে কিংবা শিল্প-সংস্কৃতির নামে বিদেশ থেকে যা-ই আসুক বাঙালি সে সবকে স্বাস্থ্যকর ভেবে আসলে সংক্রামক ব্যাধিকেই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে। এ বিষয়ে জাতিকে প্রেরণা যোগায় চলমান সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা।

আর ওই যে সমাজ পরিচালক শক্তি, সে তো বসে আছে রাজধানীতে। তার সঙ্গী-সাথী মুনাফাখোর প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া। ওরাই অশিল্পীকে শিল্পী বানায়, সাহিত্যের আবর্জনাকে রঙ মাখিয়ে হীরক বানিয়ে জনগণের সামনে তুলে ধরে। এই ভাইরাস ক্ষমতার দাপটে-কৌশলে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে গ্রামে-মফস্বলে। মফস্বল আর রাজধানীর শিল্প-সংস্কৃতির দ্বন্দ্বটাই স্পষ্ট সেখানে। এই দ্বন্দ্বে প্রতিনিয়ত হেরে চলেছে মফস্বল।

সেই হেরে যাবার প্রক্রিয়া বড়ই জটিল। 'তোমাকে খোঁজে বাংলাদেশ' কী করছে? গ্রাম-মফস্বল থেকে তরুণ প্রতিভা চিলের মাছ ধরার মতো ছোঁ মেরে তুলে নিচ্ছে। বানাচ্ছে মুনাফার পণ্য। ওই সব খুঁজে পাওয়া প্রতিভা (?) পুঁজির মুনাফার জন্য কাজ করে, মডেলিং করে। সঙ্গীতের নামে, নাটকে অভিনয়ের নামে, মিডিয়া শ্রমিকের নামে ওরা হয়ে যায় লুটেরা মুনাফার ক্রীতদাস।

এই যে নির্দয়, নিষ্ঠুর, নিকৃষ্ট, নির্লজ্জ, নিদারুণ বাস্তবতা তাঁর ভেতরই মফস্বল আত্ম অভিমান নিয়ে শিল্প-সংস্কৃতি চর্চা করছে। কঠিন বাস্তবতার ভিতর মফস্বল দেখছে কী করে কবি হতে, লেখক হতে, নাট্যকর্মী হতে, গায়ক হতে মিডিয়ার হাতছানিতে গ্রাম-মফস্বল ছেড়ে দলে দলে তরুণ-তরুণীরা ছুটে যাচ্ছে রাজধানীতে। যারা যেতে পারে না কিংবা যেতে রাজি নয়, তারাই পড়ে থাকছে মফস্বলে। মফস্বলের সংকীর্ণ বৃত্তের ভেতর ওরা গান গাইছে, কবিতা লিখছে, নাটক করছে, পত্র-পত্রিকা বের করছে। সেসব লিখিয়ের দরিদ্র পত্রিকা রাজধানীর রাজকবিদের, রাজশিল্পীদের কাছে অতি তুচ্ছ বস্তু। ও সব জমা হয় পত্র-পত্রিকা অফিসে, বুদ্ধিজীবীদের ড্রয়িংরুমের ছেঁড়া কাগজের বাস্কেটে। শেষে পৌঁছে যায় কাগজ ফেরিঅলার হাতে।

যারা মফস্বলের লিটল ম্যাগাজিন নিয়মিত পাঠ করেন কিংবা দায়ে পড়ে, নিদেনপক্ষে পাতা উল্টাতে বাধ্য হন তারা কী দেখতে পান? নিশ্চয়ই দেখতে পান রাজধানীর খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী এবং লেখক-কবি-শিল্পীদের অলৌকিক স্বর্গীয় বাণীতে ধন্য হয়েছে মফস্বলের দীন-হীন সাহিত্যপত্রটি। এটাও মিথ্যে নয় যে, মফস্বলের ছোট কাগজের সম্পাদকেরা রাজধানীর অভিজাত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তথাকথিত রাজকবি, রাজলেখক, রাজবুদ্ধিজীবীদের নিকৃষ্ট লেখাটি তাদের কাগজে গুরুত্বের সঙ্গে ছাপেন।

অথচ অনুসন্ধানে দেখা গেছে ওই লেখাগুলো আসলে বুদ্ধিজীবী লেখকদের কলম বা মেধার শ্রম নয়, বরং চায়ের টেবিলে বসে কিংবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে

আলাপচারিতার প্যাঁচাল। এ ধরনের কাজ থেকে অবশ্যই মফস্বলের পত্রিকা সম্পাদকদের বিরত থাকতে হবে। এতে রক্ষা পাবে ব্যক্তি হিসেবে আত্মমর্যাদা এবং ঘটবে সম্পাদক হিসেবে বুদ্ধিজীবীদের তৈরি আবর্জনা মুদ্রণের অপরাধ থেকে মুক্তি।

আমরা এটাও জানি আমাদের রাজধানীতে বসবাসকারী শাসকশ্রেণী এবং এককেন্দ্রিক রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতির নিয়ামক সেই রাজধানী মোটেই পেট্রোনাইজ করতে রাজি নয় মফস্বলের শিল্প-সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডকে। এর একটি বাস্তব অবস্থা দেখা যায় মফস্বল শহর থেকে মুদ্রিত দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর চেহারায় ফুটে ওঠা দুর্দশা দেখে। সরকারি-বেসরকারি বিজ্ঞাপন বঞ্চিত এসব পত্রিকা ব্যক্তিক বা আঞ্চলিক উদ্যোগে কতদূর বা এগিয়ে যেতে পারে? যেখানে রাজধানীর সাহিত্য-শিল্পের অভিভাবক হচ্ছে শাসকশ্রেণী, সেখানে মফস্বলের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি তো বাপ-মা হারা এতিমের মতো।

অথচ বাঙালির যে আত্মপরিচয়, জাতিসত্তার শেকড়, শিল্প-সংস্কৃতির উৎপাদনভূমি তা নগর-রাজধানী নয়, বরং গ্রাম-মফস্বল। সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সংগীত, তথা জাতীয় সংস্কৃতির ষোল আনাই লোকজ। প্রাচীন-মধ্য-আধুনিক শিল্প-সাহিত্য তো এখান থেকেই প্রাণরস সংগ্রহ করে বিকশিত হয়েছে। এখনো হচ্ছে।

নির্মম সত্য এই, বাংলাদেশের রাজধানীর শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার নামে যে মুনাফার কারখানা তৈরি হয়েছে, তার উপনিবেশিক বাজার হচ্ছে সারা বাংলার গ্রাম আর মফস্বল। উপনিবেশিক শোষকের মতো রাজধানী সস্তায় শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ করছে এই গ্রাম থেকেই। আমাদের কবিতা, উপন্যাস, সংগীত, নাটক এর উদাহরণ। এসবই আবার বাণিজ্যিক পণ্য হয়ে চলে আসছে গ্রাম-মফস্বল শহরে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে। কৃষি গবেষণাগারে জিন পরিবর্তিত অধিক ফলনশীল খাদ্যশস্যের বীজ বা হাইব্রিড যেমনি আমাদের কৃষির সনাতন ঐতিহ্যকে ধ্বংস করেছে, ঠিক তেমনি রাজধানীজাত সাহিত্য, সংগীত তথা সংস্কৃতির হাইব্রিড ধ্বংস করে দিচ্ছে বাঙালির শিল্প-সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে।

একটা কথা মফস্বলের শিল্প-সাহিত্য চর্চাকারীদের মনে রাখতে হবে, তারা যেন রাজধানী-নগরীর সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুগামী, অনুকরণকারী প্রতিযোগী না হয়। তাদের হতে হবে প্রতিরোধকারী ও ঐতিহ্যরক্ষাকারী শক্তি। রাজধানীর করুণাপ্রার্থী সংস্কৃতির সেবক হবার চেষ্টা অবশ্যই সাংস্কৃতিক অপরাধ। আমাদের সংস্কৃতির প্রতিটি উপাদানের উৎপাদনভূমি হচ্ছে গ্রাম-মফস্বল। এই ভূমি যদি নাগরিক পঙ্গপাল দ্বারা আক্রান্ত হয়, যে পঙ্গপালের জন্মদাতা সাম্রাজ্যবাদ, তাহলে সবই শেষ।

সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির লালিত রাজধানীর অপসংস্কৃতি যদি দখল করে নেয় মফস্বল তবে আমরা সংস্কৃতি পরিচয়হারা জাতিতে পরিণত হব।

সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক রফতানি করা তথাকথিত সাইন্স ফিকশন বা বিজ্ঞান কল্পকথা কীভাবে আমাদের শিশু সাহিত্যকে মহামারীর কবলে ফেলে দিয়েছে তা এখন জাতি টের পাচ্ছে।

আজকের সাহিত্যকে যেভাবে বাণিজ্যপুঁজি আর লুণ্ঠনের মুনাফার হাতিয়ারে পরিণত করেছে অর্থলোভী আর খ্যাতিলোভী একটি চক্র বইমেলার নামে, তাকে ক্রয়-বর্জন প্রতিরোধের দায়িত্ব নিতে হবে গ্রাম-মফস্বলের শিল্প-সংস্কৃতির কর্মীদের। এটা না করে তারা যদি সাহিত্যের মুনাফার ক্রেতায় পরিণত হয় তবে একদিকে মেধাসৃষ্টি যেমনি থেমে যাবে, তেমনি হারিয়ে যাবে জাতির মনন চর্চা।

রাজধানীর সঙ্গে মফস্বলের আজকের দ্বন্দ্বটা যে কেবল অর্থনৈতিক-রাজনৈতিকই নয়, বরং সংস্কৃতির, তা বুঝতে হবে। সেই দ্বন্দ্বটাকে জনগণের কাছে স্পষ্ট করে, আরো তীব্র করে তুলে নব নব সৃষ্টির ভিতর দিয়ে যদি এগিয়ে নেয়া সম্ভব হয় তবেই বাঙালি বাঁচবে, তার হাজার বছরের সভ্যতাও টিকে থাকবে, ঘুচে যাবে রাজধানীর শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বাণিজ্যের হীন প্রবণতা।

বাংলা ভাষার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র

আমার লেখাটির শিরোনাম পড়ে পাঠক হয়তো চমকে উঠবেন। না, অভয় দিয়ে বলছি, তেমন কিছু নয় । সেসব পরে আসছি । জানিয়ে রাখা দরকার 'ভাষা সাম্রাজ্যবাদ' বলে আমাদের দেশিয় বামপন্থীদের মুখের একটি বুলি আছে। হ্যাঁ, বাম বুদ্ধিজীবী । সারা বিশ্বে ইংরেজি ভাষার মহাদৌরাত্ম্য দেখে তারা উচ্চরবে এই শব্দটি উচ্চারণ করেন। এ কথা সত্য, যেসব বুদ্ধিজীবীর ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানের গভীরতা বিস্ময়করভাবে কম, তারাই এটি নিয়ে বেশি হৈচৈ করেন। আমাদের পণ্ডিত সমাজে এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাদের ইংরেজি ভাষার জ্ঞান কোনো ইংরেজের চেয়ে কম নয় বরং গ্রামারের দিক দিয়ে অধিক বললেও বাড়তি বলা চলে না। বহু ইংরেজি জানা পণ্ডিত সমাজের ব্যক্তির মধ্যে আমি এমন একজন ব্যক্তির কথা জানি যিনি এই ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও পোশাকে বাঙাল ভাষায়ও বাঙাল। অমি কোনোদিন তাঁর মুখে কথোপকথনের সময় অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনে দু'একটি ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ ভিন্ন সম্পূর্ণ একটি বাক্য উচ্চারণ করতে শুনিনি। তিনি হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য ইংরেজি অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত বিপুল রচনাবলি বাংলা ভাষাবিদদের গৌরবকে ম্লান করে দেয়। 'শেক্সপীয়রের মেয়েরা' যারা পাঠ করেছেন তারাই জানেন শেক্সপীয়রের জটিল চরিত্র এবং ভাষা সম্পর্কে কতখানি দক্ষতা থাকলে এমন একটি বাংলা বই লেখা যায়।

আমি বলতে চাচ্ছি আজকের তথাকথিত বিশ্বায়নের যুগে রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক কারণে পৃথিবীর হাজার হাজার ভাষাকে যেভাবে গিলে খাচ্ছে ইংরেজি ভাষা, তা থেকে উদ্ধারের আপাতত কোনো পথ নেই । জাত্যাভিমানী জার্মান, ফ্র্যান্স, জাপানি, চায়নাসহ অপরাপর শ্রেষ্ঠ জাতিগুলোও আজ বাধ্য হচ্ছে ইংরেজি শিখতে। জোর করে তা ইংরেজরা শেখায় না, যে যার অস্তিত্বের তাগিদেই শিখতে বাধ্য হচ্ছে। এই যে কদিন আগে জাতিসংঘের ইউনেস্কো

আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিল অবশ্যই এতে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতো দীর্ঘ সময় পর জাতিসংঘ এ বিষয়ে কেন হঠাৎ সদয় হয়ে উঠল এটি বড় কথা নয়। আমাদের গ্যাসের প্রয়োজনে ওরা বাঙালিদের 'গ্যাস' দিল কিনা এটাও বড় বিষয় নয়। আসল বিষয় হচ্ছে ওরা আমাদের ভাষা নিয়ে রাজনীতি করার একটা সুযোগ এনে দিল। অন্তত মার্চ মাস পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত। ইতিমধ্যে এর আলামত রাস্তাঘাটে বেতারে-টিভিতে টের পাচ্ছি। আমরা বাঙালি, আমাদের মুখের ভাষা বাংলা। পৃথিবীর অপরাপর ভাষাভাষীর মতো আমরাও এই ভাষা নিয়ে গৌরব অনুভব করি। অথচ আমাদের এই ভাষার কতখানি রয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষমতা তা নিয়ে ভাবি না।

একথা দুঃখের সঙ্গে, কষ্টের সঙ্গে হলেও স্বীকার করতে হয়, জীবনের উন্নয়নের দিকে এগোতে গেলে বাংলা ভাষাকে নীরবে পরিত্যাগ করে নয়, পাশে নিয়ে আমাদের ভাষান্তরিত হতে হবেই। বাঁচার হাতিয়ার হিসেবে ইংরেজিকে গ্রহণ করতে হবে। কেবল তাই নয়, আমাদেও শিল্প-সাহিত্যের বেলায়ও তাই । আমারা কী গান গাই, কোন নাটক, কবিতা, উপন্যাস লিখি তা জানার কোনো আগ্রহ বা প্রয়োজন ইংরেজের নেই। আমরাই আমাদের মাতৃভাষা পরিত্যাগ করে ইংরেজিতে অনুবাদ করে তা তাদের সামনে হাজির করতে বাধ্য থাকি যদি 'বুকার' বা 'নোবেল' প্রাইজ কপালে জুটে যায়! এই হচ্ছে আমাদের ভাগ্য। মন্দ ভাগ্য হচ্ছে, আমেরিকান একটি গ্রীনকর্ডের জন্য আমরা যত দ্রুত আমাদের মাতৃভাষা পরিত্যাগ করতে পারি ততই যেন মঙ্গল। কেন না ওই দেশে আমরা বাংলা ভাষাকে আপন শরীরে ক্যানসারের ভয়ঙ্কর সেলের মতোই মনে করে দ্রুত তা পরিত্যাগ করতে চাই টাকার জন্য। কি মহাপতন!

অন্যদিকে আজ কী ঘটছে? অতি গোপনে সবার অজান্তে বাঙালিকে শিক্ষিত, মার্জিত আর ভদ্রলোক বানানোর দায়িত্ব নিয়েছে পশ্চিম বাংলার ছোট একটি জেলা নদীয়া। রবীন্দ্রনাথ আর প্রমথ চৌধুরীর বদৌলতে বাঙালি ভদ্র শিষ্ট হওয়ার জন্য নদীয়া-শান্তিপুরী বাংলাকে আদর্শ বাংলা হিসেবে গ্রহণ করেছে। 'খাচ্ছি কচ্ছি' না বললে আজ আর শিষ্ট বাঙালি হওয়া যায় না। ইংরেজ শাসকের সহায়তায় তৎকালীন অভিজাত কলকাতাবাসী বাঙালির চেষ্টায় আজ আমরা এই 'বিশুদ্ধ বাংলাভাষা' পেলাম। প্রশ্ন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের কত ভাগ লোক এই বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলে? খুবই ছোট একটি অংশ। নাগরিক বা শহুরে এই বাংলা ভাষা পশ্চিমবঙ্গের শহর-বন্দর ছাড়া সব স্থানেই অচল। ক্রমে ক্রমে তা সারা পশ্চিমবঙ্গকে গ্রাস করছে। বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মালদা, দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ির গ্রামের মানুষ কোন বাংলায় কথা বলে? নিশ্চয়ই শান্তিপুরী ভাষায় নয়। প্রত্যেক

জেলায় আলাদা আলাদা বাংলা ভাষা রয়েছে। সেসব বাংলাকে 'আঞ্চলিক' বাংলার গামছা পরিধান করিয়ে অচ্ছুৎ করে রাখা হয়েছে। আমাদের বেলায়ও তাই ঘটেছে।

সেই মতে বাংলাদেশের সব অঞ্চলের ভাষাই আঞ্চলিক বা অচ্ছুৎ। আমরা রাজধানী শহর ঢাকা এসেই অভিজাত বাঙালি হতে চাই। তাই চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সিলেট, রংপুর থেকে শুরু করে সব জেলার লোকই ভদ্র হওয়ার জন্য অতি দ্রুত পরিত্যাগ করছে নিজ এলাকার ভাষা। ঢাকা শহরে জন্ম নেয়া আমাদের সন্তানরা গ্রামের আত্মীয়দের অপছন্দ করার অন্যসব কারণের মধ্যে তথাকথিত আঞ্চলিক ভাষাও একটি। দেখেশুনে মনে হচ্ছে নগরায়নের কুফল ভোগের দিকে আমরা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের বাংলাদেশের অসংখ্য আঞ্চলিক ভাষা (প্রকৃত মাতৃভাষা) দ্রুত লোপ পাচ্ছে। এমন একদিন আসছে যেদিন আমরা গবেষণা করতে বাধ্য হবো বিলুপ্ত পাখি, মাছ, পশুর মতো আমাদের হারিয়ে যাওয়া প্রকৃত মাতৃভাষা নিয়ে। এ বিষয়ে আমার একটি মজার গল্প মনে পড়ছে।

আমরা স্ত্রী সিলেটি। যদিও জন্ম ঢাকা শহরে। তবু তার মাতৃভাষা অসমিয়া আর বাংলার সংশ্রিমণে সৃষ্ট একটি উপভাষা। বিয়ের পর সে আমাদের গ্রামের বাড়ি বেড়াতে যায়। এক সকালে আমার মা, যার মাতৃভাষা প্রকৃত অর্থেই একটি, আমাদের মতো তথাকথিত শুদ্ধ আর আঞ্চলিক নামক দুটি নয়, তিনি আমার ঘরে ঢুকে পুত্রবধূর উদ্দেশ্যে বলেন, 'বৌমা হাছুন কই? 'হাছুন' যে কী বস্তু আমার নববধূটি তা জানে না বিধায় ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকায়। আমি ওর দুর্দশাকে বাড়ানোর জন্য আঙুল দিয়ে নিজের কপাল নির্দেশ করলাম। একদিকে নিজে নববধূ, অন্যদিকে শাশুড়ির প্রশ্ন, বেচারী ঘেমে ওঠে। শেষে আমি আমার বইয়ের রেকের পাশে ঝাড়ুটি নির্দেশ করে বললাম ওটা মা খুঁজছেন।' মা ঝাড়ু হাতে চলে গেলে আমার স্ত্রী আমাকে 'বেঙ্গলী' বলে খোটা দিয়ে লাজুক হাসি হাসে। উল্লেখ্য, সিলেটবাসীরা এককালে আসামের অংশ থাকায় তারা আজো সিলেটের বাইরের লোকদের 'বেঙ্গলী' বলেই জানে।

প্রশ্ন হচ্ছে কেবল কি ইংরেজি ভাষাই সাম্রাজ্য বিস্তার করছে? ভদ্র শিক্ষিত বাঙালির ভাষা হিসেবে 'বিশুদ্ধ বাংলা' কি গ্রাস করছে না আমাদের সব আঞ্চলিক বাংলাকে? এই শান্তিপুরী বাংলা সারা পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, আসাম ও বিহারের কতিপয় ক্ষুদ্র অংশকে গ্রাস করছে না কি? সে কি ভাষাসম্রাট সেজে তার সুবিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করছে না? এই ভাষা সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক শক্তি কারা? শিক্ষিত বাঙালিরা। আমরা কি কখনো ভেবেছি বাংলা ভাষার এই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র আমাদের লোকজ জীবন এবং

সংস্কৃতিকে কিভাবে গ্রাস করছে? সব দোষ আমরা বিদেশ আর বিদেশি ভাষার কাঁধে চাপাতে চাই। তবে এর জন্য কি যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে? অসম্ভব। কেননা বিষয়টি এমন যে, ইচ্ছে থাকলেও বাংলা ভাষার এই সাম্রাজ্যবাদী আধিপাত্য থেকে রক্ষা পাওয়ার আপাতত কোনো পথ নেই। আমি এই যে লিখছি তা কোন বাংলা? তা কি আমার মাতৃভাষা বাংলা, নাকি সাম্রাজ্যবাদী বাংলা?

২০০০

আমাদের সাহিত্যের আগামী দিন

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের আগামী দিনগুলো নিরাপদ নয়। বিশ্ব-সমাজব্যবস্থায় সমাজতন্ত্র প্রশ্নবোধক হতে হতে একদিন দৈব-দুর্বিপাকের মতো তার মূলোচ্ছেদ ঘটলে অভিঘাত এসে পড়ে আমাদের সংস্কৃতি তথা সাহিত্যেও। ধনী অথবা উন্নত পুঁজিবাদী দেশে সেই অভিঘাতটি চোখে পড়ে না সঙ্গত কারণেই। কেননা, এক ধরনের গণতন্ত্রী বা মানবতাবাদী সাহিত্যের অবস্থান সেসব দেশে পূর্বে যে স্থানে ছিল আজও তাই রয়েছে। উলট-পালট যা ঘটার তা ঘটছে দরিদ্র দেশগুলোতে। স্বপ্ন ভেঙে গেছে কবির চোখের, লেখক বা নাট্যকারগণ চমকে উঠেছেন, থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন। কেন লিখবেন, কী লিখবেন এবং কাদের জন্য লেখালেখি– এই প্রশ্ন নতুন করে দেখা দিতে বাধ্য হয়েছে। পুরাতন উদ্দেশ্য এলোমেলো হয়ে গেছে। হঠাৎ ধেয়ে আসা অন্ধকারটা এমন যে আলোর অস্তিত্ব কোন পাশে তা ঠাউরে ওঠা কঠিন।

আমি বিশ্বাস করি কালটা এখন দ্বন্দ্বের-সংঘাতের। দ্বন্দ্ব-সংঘাত যতখানি সমাজ-রাজনীতির বিরুদ্ধে, তারচেয়ে নিজের সঙ্গে নিজের। কেননা, পুরেনো প্রস্তুতি ভেস্তে গেছে। নতুন প্রস্তুতির মাল-মসলা কী, কোথা থেকে হবে সৃষ্টি, এই নিয়ে সৃজনশীল শিল্পীর চরম আত্মদ্বন্দ্ব চলছে। পুরেনো বিশ্বাসে স্থিত থাকা কতটুকু যুক্তিযুক্ত এ দ্বন্দ্ব যেমনি আছে, ঠিক তেমনি রয়েছে সরে গিয়ে দাঁড়ানোর ভূমিকা কী বা কোথায়? যদি ধরে নেওয়া যায় সৃজনশীল লেখকগণ পর্যবেক্ষণ করছেন এবং ঔচিত্য বোধে বিদ্ধ হয়ে নিজেকে তৈরি করছেন আগামী দিনের জন্য, তবে প্রশ্ন উঠবে সেই আগামী দিনটি কী? দিনটি কি পুঁজিবাদের প্রথম স্তরের মানবিক আবেদন, নাকি সমাজবাদের নতুন ব্যাখ্যা? সহজ কথায় এর উত্তর জটিল। প্রশ্নটি অবশ্য সোভিয়েত পতনের পূর্বযুগের সৃজনশীল লেখকদের জন্য। অথচ সময় দ্রুত বদলাচ্ছে। যারা বা যেসব তরুণ সোভিয়েত বিপ্লব পরবর্তী যুগে বসবাস করেনি বা তার পতনের দিনগুলোর

উত্তাপ প্রত্যক্ষ করেনি বয়সের কারণে, তারাই আজ লেখালেখিতে আসছে যথানিয়মে। সেসব তরুণ-তাজা প্রাণ সাহিত্য-কারিগরগণ আদর্শ হিসেবে কোনটি গ্রহণ করবে? তাদের দুপাশের দুটো পথই পুরাতন। পথ দুটো পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ। অথচ নতুন কোনো আদর্শ তাদের সামনে নেই। থাকলেও অনাবিষ্কৃত কিংবা ভ্রূণায়িত।

তরুণ কবি-লেখক-নাট্যকার বা চারুকলা শিল্পীর সামনে আজ রয়েছে একটি শীতল লাশকাটা ঘর। সে ঘরে পাশাপাশি শুয়ে আছে প্রাচীন সামন্ত বাদের লাশ, প্রাচীন পুঁজিবাদের লাশ এবং অকাল-অল্প বয়সে মৃত্যুবরণকারী সমাজবাদের লাশ। হয়তো তরুণরা সেই লাশঘরে গবেষণা চালাতে পারে মৃতদের গলিত শরীর নিয়ে। কিছু মিলতেও পারে বা বিফলও হতে পারে গবেষণা। যারা লাশকাটা ঘরে ঢুকবে না তারা কী পাবে? তারা পাবে এমন এক নতুন পুঁজিবাদী বিশ্ব, যেখানে তথ্যপ্রযুক্তি, বিশ্বায়ন, বাজার অর্থনীতি, মহাকাশ গবেষণা, হিউম্যান ক্লোনিং বা কোটি কোটি জিনের মিশ্রণে প্রাণ সৃষ্টির বিস্ময়কর জগত। বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি তাই আজ এমন এক গোলকধাঁধা সৃষ্টি করেছে, যেখানে মানুষের কাছে পুরেনো সমাজব্যবস্থা, পারিবারিক ব্যবস্থা, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, পিতা-পুত্র-কন্যা সম্পর্কে লালন করা পুরোনো ধারণাগুলো উল্টে-পাল্টে যাওয়ার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এমনি অবস্থায় প্রচলিত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র কোনোটাই মানুষের চাহিদা পূর্ণ করতে পারছে না। আজকের এই যুগটাকে সন্ধিকাল বলা না গেলেও তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যেতে পারে। যদি তাই হয়, আজ লেখকগণ কী লিখবেন?

যারা সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টি করে না বা করতে অক্ষম, তাদের পথটা সহজ অন্তত বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে। ইংরেজি বা ইউরোপের নানা ভাষায় চলছে স্যাটেলাইট সাহিত্য তথা মুভি, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী। ইংরেজি ভাষাটা রপ্ত করতে পারলে বাংলা ভাষায় তার রূপান্তর করে নিজেদের করে নেওয়ার হাজার পথ রয়েছে। কিন্তু যারা লিখতে চায় সৃজনশীল সাহিত্য তাদের জন্য বিশ্বে আজ সহায়ক (উন্নত ভূমি ও ভাষা) তেমন কিছু কি আছে? মনোযোগী পাঠক কষ্ট ও ধৈর্য ধরে উন্নত বিশ্বের প্রচারমাধ্যমের প্রতারক বাণীকে স্বীকার করেও বিশ্বসাহিত্য পাঠ করলে চমকে উঠতে বাধ্য। বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে খুবই সতর্ক বিচার-বিবেচনায় মহাচাতুর্যের সঙ্গে যেসব সাহিত্যকে আজকাল পুলিতজার, বুকার বা নোবেল দেওয়া হচ্ছে এবং বিশ্ববাসীকে তথ্যপ্রযুক্তির বিভ্রান্তিতে গেলানো হচ্ছে রাজনৈতিক বা বেনিয়া উদ্দেশ্যে, সেসব কি সাহিত্য? যারা আজ এসব সাহিত্যকে পুরস্কৃত করছে এবং তা জায়েজ করার জন্য কল্পিত তত্ত্ব-তথ্য খাড়া করছে তাদের পূর্বপুরুষরা কিন্তু ২০/২৫ বছর পূর্বেও এমনি ছলাকলা পারতপক্ষে করত না। আজ বিশ্বমানের তাবৎ পুরস্কার অত্যন্ত কৌশলে সেসব সাহিত্যকে দেওয়া হচ্ছে, যেগুলো প্রকৃত অর্থে কোনো সাহিত্যই নয়।

কেন পেল এই পুরস্কার? এই ব্যাখ্যাটি সংশ্লিষ্ট সাহিত্য সম্পর্কে এমনি উপস্থাপন করা হচ্ছে যেখানে সাহিত্যের গুণাগুণ ব্যাখ্যার প্রবাহের ফলে সেসব তথাকথিত নোবেলজয়ী সাহিত্য তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের তরুণ প্রজন্ম গোগ্রাসে গিলতে থাকে। এর কুফল জাতীয় সাহিত্যে পড়তে বাধ্য। কেননা, জাতি হিসেবে আমরা প্ররোচিত, প্রভাবিত এবং বিচার-বিবেচনা না করেই অন্যের মতামতকে গিলতে আগ্রহী। বিশ্বের মাতব্বর-প্রধান-মোড়লরা যাকে সাইজ করে ফিট করে আমাদের সামনে তুলে ধরবে তাকে নিয়েই বগল বাজাতে থাকি। তাই সৃজনশীল তরুণ লেখক-কবি-শিল্পীদের আজ জরুরি হয়ে পড়েছে ক্রমাগত বিচার করা এবং অনুসন্ধান চালানো। পুরস্কৃত সাহিত্যটি প্রকৃত অর্থে সাহিত্যের পদবাচ্য কিনা তা খুঁটিয়ে বিচার করতে হবে। তা না করে নোবেল কমিটি কর্তৃক মিথ্যে মিথ সৃষ্টির পেছনে ছুটে বেড়িয়ে এবং অন্ধ অনুকরণের চেষ্টার দ্বারা আত্মহননের পথ বেছে নিলে সর্বনাশ বিনে কিছু নেই।

সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, কলকাতায় আজ যে সাহিত্যের মড়ক চলছে তা ঢাকার অনেকেই বিশ্বাস করে না। এর পেছনেও রয়েছে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তির চাতুরতা। কলকাতায় বাংলা সাহিত্য চর্চা বলতে গেলে বন্ধ্যাকালীন দীর্ঘ সংকটে পতিত হয়েছে। সে স্থান দখল করে নিয়েছে ভারতীয় অপরাপর প্রাদেশিক সাহিত্য। তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, কানাড়ি, হিন্দি, উর্দু, অহমিয়া, মণিপুরী ইত্যাদি ভাষার সাহিত্যগুলো আজ বাংলা সাহিত্যকে কেবল পেছনেই নয়, ঝেঁটিয়ে বিদায় করছে সর্বভারতীয় সৃজনশীল সাহিত্যের আসর থেকে। তাই আজ পশ্চিমবঙ্গের সৃজনশীল পাঠকরা অনুবাদ করা প্রাদেশিক সাহিত্যের দিকেই ঝুঁকে পড়েছে।

হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের ঘাড়ে একতরফা দোষ চাপালে পাড় মিলবে, সত্য মিলবে না। যা খাঁটি তা হচ্ছে কলকাতার বাংলা সাহিত্য সেই প্রদেশটির অর্থনৈতিক দুর্দশার মতোই ভয়াবহভাবে সংকটে নিপতিত। সেই সুযোগটা নিয়েছে হিন্দি ভাষা ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ।এন্টিথিসিস হিসেবে এটিই বাস্ত বতা। বাংলা সাহিত্যের এই সংকটকালকে অতিক্রম করার দায়িত্ব আজ এসে পড়েছে ঢাকার (সমগ্র বাংলাদেশ) তরুণদের ওপর। সেসব তরুণরাই মত ও পথ নির্ধারণ করবে, যারা স্বচক্ষে সমাজতান্ত্রিক যুগ দেখেনি এবং তার মহাপতনের বিগত বছরগুলোর উত্তাপও শরীরে গ্রহণ করেনি।

তরুণদের অবশ্যই বর্জন করতে হবে দুটো শ্লোগানকে। 'সাহিত্য সমাজ বদলের হাতিয়ার' এবং 'শিল্পের জন্য শিল্প'। সাহিত্য যেমনি রক্তাক্ত বিপ্লব নয়, তেমনি জীবন-নিরপেক্ষ স্বপ্নলোকের অবাস্তব সৌন্দর্যও নয়। মনে রাখতে হবে– বিশ্ব আজ এমনি এক অজ্ঞাত দার্শনিক পরিমণ্ডলের দিকে এগুচ্ছে, যা নিকট অতীতেও ছিল না। আগামী দিনের মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রিক সম্পর্ক কী হবে তা বলা সহজ নয়। ব্যক্তির কাছে সমাজ এবং সমাজের কাছে ব্যক্তি কতটুকু দায়বদ্ধ থাকবে, তা পূর্বের মীমাংসাকে অস্বীকার করছে

আজকের বিজ্ঞান সভ্যতা। তাই নতুন মাত্রা যোগ হতে তৈরি হচ্ছে বিশ্ব সভ্যতা। এই অবস্থায় বাংলা তথা বাঙালি জাতির সাহিত্য কি স্বতন্ত্র পথ ধরে চলবে, নাকি বিশ্বায়নে বিলীন হয়ে যাবে? এর উত্তর খুঁজেতে হবে ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্যসেবীদের।

বাংলাদেশের সাহিত্য যে মোটেই নিরাপদ নয়, তা দেশটির অর্থনৈতিক অবকাঠামোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। উন্নত বিশ্বের একজন লেখকের চারপাশে তার রাষ্ট্র ও সমাজ স্থিতিশীল পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে থাকে। তাই সেসব দেশের লেখকদের কলম বা কম্পিউটার ক্ষুধার্ত বা বেকার চরিত্রের অন্তর্লোকে আগামী মিথ্যা স্বপ্নলোক তৈরি করে না। আমরা করি, করতে বাধ্য। আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক কাঠামো লণ্ডভণ্ড, বেদিশা। জীবন আমাদের অস্থিতিশীল এবং প্রতিনিয়ত ভাঙছে। গড়ার যে স্বপ্নটা আমরা দেখব সাহিত্যে তার রূপ কী হবে? পথ তো একটি ছিল আমাদের। সেই সমাজবাদ। তা তো আজ নেই।

আমার বিশ্বাস, আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে। মানব মুক্তির ইউটোপীয় তত্ত্ব দিয়ে সাহিত্যের শরীর সৃষ্টির প্রয়োজনের কাল ফুরিয়েছে। আজ আমাদের জরুরি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে উন্নত বিশ্বের চালান করা বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা, প্রযুক্তি এবং ব্যক্তিমানুষের অফুরান ভোগস্পৃহাকে সতর্ক অবলোকন করা। উন্নত বিশ্বের প্রযুক্তির অভিঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়া পরিবার বা রাষ্ট্র জীবনে দিশেহারা মানুষের মানসিক জটিল জগতকে সাহিত্যে রূপ দেওয়াই সাহিত্যকর্মী হিসেবে আমাদের আজকের অন্যতম কর্তব্য। অর্থনৈতিক মুক্তির নামে একজন মানুষের জীবনসংগ্রাম আজ আর এককভাবে সাহিত্যের বিষয় নয়।

নতুন নতুন প্রযুক্তির অভিঘাতে আন্দোলিত মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা এবং আচরণ তার অনভিজ্ঞ জীবনের ভেতর যাপিত কালকে শিল্পায়িত করাই তরুণ লিখিয়েদের কাজ। এ ক্ষেত্রে লেখক হবেন ঈশ্বরের মতো নিঃসঙ্গ অথচ স্রষ্টা। সমাজের কাছে তিনি দায়বদ্ধ নন। তিনি স্বাধীন এবং একাকী। তিনি শিল্পের কাছে দায়বদ্ধ নন। তিনি স্বয়ম্ভু। তিনি তত্ত্বনিরপেক্ষ কালান্তর যাত্রী। তার সৃষ্টি হতে পারে নিষ্ঠুর কিংবা পাপক্লিষ্ট সমকালের দৃষ্টিতে। অথচ তিনিই আগামী দিনের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। মহেশ্বর। সমকাল তার দেহ, আগামী হচ্ছে আত্মা।

–২০০০

বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের সাহিত্য চর্চা

পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাত্তরে বাংলাদেশ সৃষ্টির মধ্যদিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশাল নতুন অংশটির উত্থান ঘটে। নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উত্তরণের গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে গেলেও আজো তা অব্যাহত রয়েছে। সেই নব্য মধ্যবিত্তের ইচ্ছা পূরণ কিংবা লালিত স্বপ্নের বাস্তবতা হচ্ছে আজকের বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অবস্থা। স্বপ্ন তাড়িত, উদভ্রান্ত, অস্থির চিত্ত, স্থূল মেধা, খেঁউড় প্রিয়, ভোগবাদী এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই তাদের প্রয়োজন মিটাতে আজকের বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্যকে এই স্তরে নামিয়ে এনেছে। কী ধরনের সাহিত্য এই শ্রেণীটির ক্ষুধা মেটায়, কী ধরনের বিনোদন অনুষ্ঠান তাদের চিত্তে প্রশান্তি ঘটায় তার নমুনা বাংলাদেশের সাহিত্যের বাজার আর আকাশ সংস্কৃতি, ব্যান্ড সংগীতের জনপ্রিয়তা আর বাজারী সাহিত্যের জনপ্রিয়তা মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। এসব স্থূল সাহিত্য, চলচ্চিত্র, বিদেশি চ্যানেলের নকল টক শো, সো বিচ ইত্যাদির অব্যাহত বিকাশ কারো ব্যক্তিগত ক্ষমতার ফল নয়। এসব স্থূল আনন্দের মূলে রয়েছে একদিকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য অন্যদিকে মধ্যবিত্তের বিকৃত ক্ষুধা।

গভীরভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে এসব শিল্প-সাহিত্য, কাব্য-কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটক-নাট্যকলা, স্যাটেলাইট টিভি প্রোগ্রামের জন্মস্থান একই ভূমি। মধ্যবিত্তের উদরের চাহিদার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে তাদের মনের ক্ষুধার। ভোগ্য পণ্যের ব্যবসায়ীরা বিষয়টি যতখানি বুঝে, সাহিত্যের ব্যবসায়ীরাও ঠিক ততটাই বুঝে। কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, ব্যক্তিগতভাবে আমি এসব স্থূল, অসার, শিল্প মূল্যহীন সাহিত্যের বিরোধিতা করছি। ক্ষেত্র ও সময় বিশেষে বরং আমি তা সমর্থন করি। সমর্থনটা এই কারণে যে, আমরা সবাই সমাজের মানুষ। এমন এক সমাজের সদস্য, যে সমাজ পিছিয়ে আছে। এখানে প্রাগ্রসর উন্নত রুচিশীল সমাজের অংশটি এখনো গড়ে ওঠেনি। সাধারণ স্থূল

চিন্তার অধিকারী স্বল্প মেধার বৃহৎ জনসংখ্যার বিনোদনের জন্য অবশ্যই কবিতা দরকার, উপন্যাস, নাটক, গান দরকার। এটি যেমনি তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার তেমনি এসব যারা সৃষ্টি করে তাদেরও রয়েছে লেখালেখিতে মৌলিক অধিকার। অন্যদিকে অন্ধকারটাও চাই, না হলে আলোর মূল্য কী?

বাংলাদেশের সাহিত্য স্রষ্টা, ভোক্তা আর বিপণনকারীরা এই শ্রেণীভুক্ত। সব্বাই মধ্যবিত্ত। মধ্যবিত্ত লিখে, মধ্যবিত্ত ছাপে এবং মধ্যবিত্ত কেনে। শ্রেণী চরিত্রের মহামিলনের ফলে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বটা তীব্র নয়। একই ধরনের চেতনার অধিকারী বলেই নির্দ্বন্দ্বের ভিতর চলছে সাহিত্যের দিনকাল। এখনকার লেখক বা প্রকাশকদের শোষক শ্রেণী বলা যাবে না। যদি কেউ শখ করে বলেই বসেন, তবে এতে লেখক-প্রকাশকের মানহানির বদলে সম্মান বৃদ্ধি হয়েছে বলেই ধরে নিতে হবে। যেমন ঋণ খেলাপী বাংলাদেশী বুর্জোয়াদের 'বুর্জোয়া' বলে গাল দিলে তারা মহানন্দে ন্যাজ আছড়ায়।

এ দেশের প্রকাশনা শিল্প এখনো জাতে ওঠেনি। প্রকাশকগণ দৈন্যদশার মধ্যদিয়েই দিন কাটায়। বাংলাবাজারের দু একজন নোট বই ব্যবসায়ী ভিন্ন কারো অবস্থা সুখকর নয়। মোটকথা এই যে, মধ্যবিত্ত লেখক, প্রকাশক এবং পাঠক মিলে মেলবন্ধনটা গড়ে উঠেছে। এটি বাংলাদেশের সমাজ আর অর্থব্যবস্থার বাস্তবতারই ফল। এই তিন উপশ্রেণীর মধ্যে রয়েছে স্বপ্ন পূরণের ইচ্ছে, স্বপ্ন ভঙ্গ, জীবনের নানা গ্লানি আর হতাশা। লেখকগণ এসবই লিখছেন, প্রকাশক ছাপছেন, পাঠক কিনছেন। লেখক লিখছেন তার নিজেরই কথা, প্রকাশক নিজেদের ছায়া দেখতে পান ঐ সব লেখায় এবং পাঠক বইয়ের পাতায় পাতায় পাত্র-পাত্রী হিসেবে নিজেরাই নীরবে বিচরণ করে। পাঠকের এই বিচরণ এক ধরনের আত্মরতি মাত্র।

আমাদের দেশে যেমন রয়েছে সাপ্তাহিক, মাসিক আর ত্রৈমাসিক পত্রিকা, আমেরিকা তথা উন্নত বিশ্বে রয়েছে সাপ্তাহিক, মাসিক উপন্যাস। আমেরিকার বড় বড় (সুপার) মার্কেট থেকে ফাস্টফুড সপ, স্ন্যাক্স সপ, লিকার স্টোরে পাওয়া যায় এসব উপন্যাস। ২ থেকে ৫ ডলার মূল্য সেসব উপন্যাসের। আমেরিকায় রয়েছে শত শত প্রচ্ছদ, মডেল। সুদর্শন এসব যুবক-যুবতীরা বিভিন্ন পোজ দেয় ক্যামেরার সামনে এবং ঐসব উপন্যাসের কভারে সগৌরবে ছাপা হয়। বিক্রি হয় দেদার। সাপ্লাই কোম্পানির লোকরা বিপণন কেন্দ্রগুলোতে ৭ দিন বা ১ মাস অন্তর অন্তর এসে বিক্রি হয়ে যাওয়া বইয়ের দাম নিয়ে যায় এবং অবিক্রিত বইগুলো ধারেকাছের বিশাল ডাস্টবিনে নির্দয়ের মতো ফেলে দিয়ে যায়। সহজ-সরল ইংরেজিতে মজাদার ঘটনা বা কাহিনীতে ঠাসা থাকে ওসব বই। টিন এজ এমন কী বৃদ্ধরাও শপিং সেন্টারে এসে রুটি-তরকারি-মাংসের প্যাকেটের সঙ্গে তাক থেকে এক দু'খানা উপন্যাস বেছে নিয়ে হ্যান্ড ট্রলিতে চাপিয়ে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যায়। আমি এটাকে মোটেই কুনজরে দেখছি না। বরং খুশি হই এই

ভেবে যে, আধুনিক পাঠক উদরের খাদ্যের সঙ্গে আজ মগজের খাদ্যকে একাকার করে নিতে পেরেছে।

এটি মোটেই গালগপ্পো নয়, আ্যমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। স্বল্প পুঁজিতে আমি একটি 'নিউজ স্ট্যান্ড এন্ড ক্যান্ডি সপ' চালাতাম আমেরিকার একটি বড় শহরে। পত্রপত্রিকা, সিগারেট, ক্যান্ডি (চকলেট) এবং পটেটো চিপ্‌স-এর সঙ্গে বিক্রি করতাম এসব উপন্যাস। ইউকএনডের পূর্বে অর্থাৎ বৃহঃ/শুক্রবারে দেদার বিক্রি করতাম 'মার্লবরো 'পার্লিয়াম্যান্ট', 'নিউপোর্ট' সিগারেটের সঙ্গে একখানা 'লেট মি হুট' কিংবা 'ক্যাসিনো সেক্সি গার্ল' জাতীয় উপন্যাস। তো এসব নিন্দনীয় নয় পঠন বা লিখন। দরকার আছে।

সমাজের সব মানুষ বোদ্ধা নয়, নয় মেধাবী সৃজনশীল পাঠক। সৃজনশীল পাঠক শিল্প সন্ধানী, সাধারণ পাঠক চটুল আনন্দ সন্ধানী। ঐ যে সাধারণ পাঠক তারাই সংখ্যায় অধিক, সৃজনশীলেরা চিরকালই সংখ্যালঘু। বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা বাড়ছে, শিক্ষার হার বাড়ছে। এই সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণী বাড়ছে বলেই তাদের মনোলোকের স্বপ্ন পূরণের জন্যও জরুরি হয়ে পড়েছে ক্রেতাদের মতো উপন্যাসের এবং কবিতার। বিষয়টি সাহিত্যের নয়, শিল্পের নয়– নব্য মধ্যবিত্ত, নব্য স্থুল মেধার বিনোদন সন্ধানী স্কুল-কলেজগামী পাঠকের বিষয়। আমি এমনি অবস্থাকে সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে, এই অস্থির সমাজ-বিশ্বে মানুষের ক্ষণকালের জন্যও কোথাও না কোথাও আশ্রয়ের দরকার আছে। সৃজনশীল লেখার মধ্যে যে পাঠক আনন্দ পায় না, সে যাবে কোথায়? সেই আনন্দটা গ্রহণের অধিকার তার মৌলিক। অবশ্যই।

অন্যদিকে বাংলাদেশের সৃজনশীল পাঠকরা বিপন্ন, এমনটা আমি মনে করি না। সৃজনশীল পাঠকের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের কোনো সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব চলছে, এমনটাও আমার মনে হয় না। যখন বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য তাদের মনের চাহিদাকে পূরণ করতে পারছে না, তখন তারা হাত বাড়িয়ে নিচ্ছে ইংরেজি সাহিত্যে। তাদের দুয়ার খোলা বিশ্বময়।

কিন্তু সাধারণ পাঠকের ভাষাজ্ঞানের অভাবে এই দুয়ার দিয়ে প্রবেশ অসম্ভব বলেই তারা মাতৃভাষার ভিতরই নিজেদের স্বপ্নকে খোঁজে। সেই স্বপ্ন যতই স্থুল হোক। বাংলাদেশে যারা নিয়মিত পাঠক তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, এখানে প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টাটাই সবচে বড়। যেসব তরুণরা পত্রপত্রিকায় গল্প-কবিতা লিখছে তাদের চেষ্টাটা মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির দিকে। প্রতিনিয়ত তারা চেষ্টা করে যাচ্ছে ভাল একটি কবিতা বা গল্প লেখার।

অনেকের অভিযোগ এরা বড় মিডিয়াপ্রেমিক। আমি এটা স্বীকার করি না। এরা জন্মেছে উন্নত প্রযুক্তির যুগে। নিজের লেখাটিকে অন্যের কাছে পৌছে দেয়ার উন্নত প্রযুক্তির কাছে অবশ্যই যেতে হবে। স্যাটেলাইট যুগে রবীন্দ্র-নজরুলের জন্ম হলে তাঁরা কী করতেন? তরুণদের এই প্রবণতাকে অবশ্যই

আমি খ্যাতির অন্ধ মোহ বলবো না। এটি হচ্ছে আত্ম বিকাশের ক্ষেত্রে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এটিই স্বাভাবিক। হাতের কাছে এতো প্রযুক্তি, যা রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যেই জোটেনি, তাকে কেন তরুণ সমাজ ব্যবহার করবে না? তবে সাবধান হতে হবে অপব্যবহারের ক্ষেত্রে। পর্নো, আধাপর্নো, বা বিনোদনমূলক পত্রপত্রিকায় যেসব তরুণরা লিখছে তাদের প্রতি আমার কোনো ক্ষোভ নেই, আছে করুণা। করুণাটা এই কারণে যে, ওরা সৃজনশীলতার কষ্টসাধ্য চাষাবাদ থেকে বঞ্চিত।

খ্যাতির বিষয়েও সতর্ক থাকতে হয় লেখকদের। খ্যাতি কখনো আসে না, কষ্ট করে, ধৈর্য ধরে তাকে অর্জন করতে হয়। মডেলিং খ্যাতি বা ফুটবল-ক্রিকেট বলের খ্যাতির সঙ্গে সাহিত্যের খ্যাতি কোটি কিলোমিটার দূরে। সাহিত্যের খ্যাতির জন্য বৃদ্ধ হতে হয়, খেলা বা অভিনয়ের খ্যাতির জন্য যৌবন রক্ষা করতে হয়। মনে রাখতে হবে খাঁটি লেখকরা বুড়ো হতে হতে সুন্দর হয় আর বারোয়ারী লেখকরা বুড়ো হতে হতে কুৎসিত হয়।

একজন খাঁটি লেখক শিল্প সাহিত্যের মডেল, মোটেই বাণিজ্যিক পণ্যের নয়। সে বিষয়টিকে মাথায় রেখেই বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহিত্যিককে এগিয়ে যেতে হবে। মধ্যবিত্তের টানাপোড়েনের ভিতরে থেকেই সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। মাথায় রাখতে হবে বিশ্বায়নের বিষয়টি। ক্ষুদ্র একটি দেশ নিয়ে যে সংকীর্ণ জাতীয়তা তা আজ ভেঙে পড়েছে।

আজ যা লেখক খিলবেন তা হতে হবে আঞ্চলিক সাহিত্যের উর্ধ্বে, তাকে হয়ে উঠতে হবে আন্তর্জাতিক মাপের। যদিও সাহিত্যের বিষয়বস্তু হবে আঞ্চলিক কিন্তু তার কলা-কৌশল এবং দৃষ্টিভঙ্গি হতেই হবে আন্তর্জাতিক মাপের। এমন প্রত্যাশা বা প্রচেষ্টা যার মধ্যে নেই তার লেখালেখিতে কাজ নেই, তার জন্য রয়েছে অন্য কাজ। কেননা একটি ক্ষুদ্র দেশে জাতীয় ভিত্তিতে কে কী করল তাতে বিশাল বিশ্বটার কিছুই আসে যায় না। তারা এসবের খবরও জানে না।

বাংলাদেশের বিখ্যাত যেকোনো কবি-লেখক-শিল্পী উন্নত বিশ্বে পা রাখলেই বুঝতে পারবেন তিনি কতখানি অজ্ঞাতকুলশীল। তিনি কত ক্ষুদ্র। ওখানে তাঁর দাঁড়াবার স্থান নেই। বুঝতে পারবেন সারা জীবন লিখে ঝাঁকা ভরতি জাতীয় পুরস্কার পেলেন বটে। প্রকৃত অর্থে তিনি সামান্যই লিখেছেন নিজের জাতির জন্য, বিশ্ব-সমাজের জন্য।

-২০০০

বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের বাস্তবতা

আজ বিশ্বে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো বিশ্বায়নের প্রবল চাপের মধ্যে পড়ে তাদের কাঠামো নড়বড়ে করে ফেলেছে। জাতিসংঘ যতই এদের নিয়ে গালভরা কথা বলুক, বাস্তবতা ভিন্ন কথা বলে। দূরে নয়, বাংলাদেশের পার্বত্য বা সীমান্ত এলাকার ক্ষুদ্র জাতি বা জনগোষ্ঠী আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় আজ গভীর সংকটে পতিত। একদিকে বিদেশি শ্বেতাঙ্গ ভিন্ন সংস্কৃতির অধিকারী মিশনারিগুলো দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের বানাচ্ছে খ্রিস্টান। এর ফলে তাদের সংস্কৃতির দ্রুত ভাঙন সৃষ্টি হচ্ছে। ভাষা বা জীবনাচরণ বদলে যাচ্ছে। অন্যদিকে ভূমির উপর ব্যাপক চাপ সামলাতে বাংলাদেশের উদ্বৃত্ত জনগোষ্ঠী উপজাতি এলাকায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। রাষ্ট্রের শাসকরা এই জঘন্য কাজটির সহায়ক। ইজরাইলরা যে কাজ পরিকল্পিতভাবে করছে ফিলিস্তিনে। ওরা কেবল তাদের উচ্ছেদই করছে না– ভূমি গিলছে, ভাষা গিলছে, সংস্কৃতি গিলছে এমন কি বিয়ে-শাদির নামে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে জাতিসত্তার বিলোপ ঘটাচ্ছে।

যদিও কথাটি অগণতান্ত্রিক শোনায় তবু বাস্তবতা হচ্ছে, একটি আইন হওয়া দরকার উপজাতিদের দারিদ্র্যে সুযোগ নিয়ে ধর্মান্তকরণ এবং সাংস্কৃতির রূপান্তর নিষিদ্ধকরণ। 'ধর্ম ও সংস্কৃতির বিনিময়ে খাদ্য'–এটি বর্বরতারই নামান্তর। উপজাতির ধর্মবিশ্বাস আর সাংস্কৃতিক আচরণে আঘাত না করে অর্থনৈতিকভাবে তাদের আলোকিত করার চেষ্টাই হচ্ছে সভ্যতা বা সভ্য আচরণ, যা বাস্তবে নেই।

বাংলাদেশী বাঙালিরাও এমন একটি জাতিসত্তা যারা ক্ষুদ্রও নয়, বৃহৎও নয়। প্রাচীন বা মধ্যযুগের সাংস্কৃতি সংঘাত ও রূপান্তরকে না হয় বাদই দেয়া গেল, পাকিস্তান সৃষ্টি ও রক্ষার নামে বা বর্তমানে মৌলবাদের উত্থানের নামে এখানে অব্যাহতভাবে চলছে সাংস্কৃতিক অভিঘাত। আঘাতটা আসছে হাজার বছর আগে প্রাকৃতিক ধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মিশ্রণে তৈরি

বাঙালির সংস্কৃতির ওপর। এটাকেও আমরা খুব বড় করে দেখছি না, উদ্বেগের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করছি না। সবচেয়ে উদ্বেগের কারণ হচ্ছে বিশ্বায়ন। বিশ্বায়নের সাংস্কৃতিক দানবটা হচ্ছে পুঁজিবাদী ইউরোপীয় সংস্কৃতি। পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে– কথাটা বাজে শ্লোগান। সাম্রাজ্যবাদী আপ্তবাক্য। পৃথিবীর আকার যা আছে তাই থাকছে, হয়তো প্রাকৃতিক কারণে জল ও স্থলভাগের বিবর্তন ঘটছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শোষণও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে চন্দ্রগ্রহণের মতো ধীরে ধীরে বিশ্বায়নের পেটে চলে যাচ্ছে পৃথিবী। তাই আকারটা ছোট হয়ে গেছে বলেই লোকদের শেখানো হচ্ছে পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে। এই আগ্রাসনের ফলে বাংলাদেশের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি আগের তুলনায় বর্তমানে মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। ইংরেজি নববর্ষ, ভ্যালেনটাইন ডে, হিন্দি স্যাটেলাইট (ইংরেজির নকল) বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মেরেছে। মনে হচ্ছে সামনের দিন আরো ভয়াবহ।

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের স্বীকৃতিতে অন্ধ বাঙালির চোখের মণিও গলে গেছে। আমরা জানি আজকের বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক শ্রমদিবস, শিশুদিবস, মাতৃদিবস, নারী দিবস ইত্যাদি দিবসের পেছনে ঘটনাবহুল ইতিহাস আছে। কিন্তু খেয়াল করলে দেখা যাবে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ খুবই প্রতারণার কৌশলে এসব দিবস সারা বিশ্বের সাধারণ মানুষ আর শোষিত জাতিগুলোর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। যারা সারাবিশ্বে ভাষা-নির্যাতন চালাচ্ছে, সাংস্কৃতিক নিপীড়ন চালাচ্ছে তারাই উচ্চকণ্ঠে এসবের পক্ষে বলছে। শ্রমিক নির্যাতনকারী, শিশু নির্যাতনকারী বা নারী নির্যাতনকারী শ্রেণী শোষণের পণ্য হিসেবে এসব থেকে লাভ তুলে নিচ্ছে। তাই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্থান নির্ধারণে এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের বাংলা ভাষাভাষী জনগণের কিছু আসে-যায় না। এতে বাংলাদেশী বাঙালি বা ভারতীয় বাঙালির লাফালাফি ফালাফালিতে বুকের দম বা শরীরের ঘাম নামানো ছাড়া অন্য কোনো উপকার নেই।

এ সবই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। ধর্মের পরিচয়ে বিশ্বকে খণ্ড-বিখণ্ড করার মতোই ভাষার পরিচয়ে অখণ্ড মানব সমাজকে বিচ্ছিন্ন করাই এর উদ্দেশ্য। যারা এসব উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে বাঙালিকে নাচায় তারা কিন্তু বাঙালি হয়েও বাংলা ভাষাকে জীবনযাপনের গুরুত্বপূর্ণ বাহন বলে মনে করে না। তাদের বেডরুম থেকে কিচেন হয়ে গ্যারেজ পর্যন্ত ইংরেজি। তাদের টেলিফোনের ভাষা ইংরেজি। তারা টেলিফোনে কথা কয় না, 'টক-টকিং' করে।

ঢাকা শহরের অলিতে-গলিতে প্রাইভেট ইউনিভারসিটি আছে। পত্রিকার বিজ্ঞাপনে দেখা যায় মার্কিন-ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসই নয়, ওখানকার শিক্ষক ভাড়া করে এনে ইংরেজি ভাষায় বাঙালিকে বিদ্যাশিক্ষা দেয়া হচ্ছে। বাঙালি ঘরের কিশোর-কিশোরীদের হাতে তাদের বাবা-মা তুলে দিয়েছে ইন্টারনেট। ঘরের দরজা এঁটে তারা ইন্টারনেট পর্নো ছবি দেখছে। বাবা-

মা ভাবছে তাদের ছেলেমেয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞানী হয়ে অচিরেই বিশ্বজয় করবে।

ইংরেজি খাদ্যের ঠেলায় অভিজাত পরিবারের ঘরের ছেলেমেয়েরা ভাত খাওয়া ভুলে গেছে। শুনেছি ভাত দেখলে বা ভাতের গন্ধ পেলে নাকি তাদের বমি আসে। আজ তাদের হাণ্ডি-পাতিল উধাও হয়ে গেছে, দখল করেছে ফরাসি ক্রোকারিজ। অন্যের কথা বাদ দিলাম। আমার নিজের কথাই বলি। বাংলা সাহিত্যের একজন লেখক হিসেবে আমি কত অসহায়। আমার মেয়েটা আমার বাঙাল বাচনভঙ্গিতে কথাবার্তায় আপত্তি জানায়। প্রথম প্রথম ছেলেটি আক্ষেপ করে জানাত, কেন আমি তাকে ইংরেজির বদলে বাংলা মাধ্যমের স্কুলে পড়িয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সমস্যা হচ্ছে। আমি জানি একদিন সে উড়াল দেবে ইংরেজি ভাষাভাষীর দেশে। আমার কিছু করার নেই। আমার মতো এমনি অসহায় অবস্থায় আছে এদেশের শ্রমিক-চাষা সাধারণ জনগণ। তাদের একটিই মাত্র মাতৃভাষা তা হচ্ছে আঞ্চলিক বাংলা। ভদ্রলোকদের মাতৃভাষা কলকাতাকেন্দ্রিক চলিত বাংলা আর পিতৃভাষা হচ্ছে ইংরেজি। যতই অক্ষেপ করা হোক, যতই চেষ্টা করা হোক সর্বগ্রাসী ইংরেজি ভাষা থেকে বাঙালির বাঁচার উপায় নেই। জাপানিরা যেখানে হার মেনেছে এতো টাকাকড়ি আর বিদ্যাবুদ্ধি থাকার পরও, সেখানে বাঙালি তো ন্যাংটিপরা আদমি।

ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! যে জনগোষ্ঠী ভাষাকে কেন্দ্র করে স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্ম দিতে গিয়ে এতো ত্যাগ স্বীকার করল, সেই জাতিই তার মাতৃভাষা বাংলাকে পরিত্যাগের জন্য ব্যাকুল। তারা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখছে মাতৃভাষা বাংলা হচ্ছে আত্মত্যাগের ভাষা, মোটেই আত্মভোগের ভাষা নয়। আত্মভোগ আত্মোন্নয়ন ঘটাতে হলে প্রয়োজন ইংরেজি। মহাজ্ঞানী, মহাজনেরা একুশকে সামনে রেখে যতই বেতার-টিভিতে বকবক করুক, সংবাদপত্রে কলমে গুঁতাগুঁতি করে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখুক, সবই আজ কবন্ধ অর্থাৎ গলাকাটা ভূত। পিছিয়ে পড়া জাতি হিসেবে টিকে থাকতে হলে বাঙালির জন্য ইংরেজি ভাষার বিকল্প নেই– এই হচ্ছে আজকের বাস্তবতা।

এই কঠিন ও বেদনাদায়ক বাস্তবতা আমাদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে এই যে, কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস যত কিছুই আমরা রচনা করি না কেন, ভাষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা অকার্যকর। বাংলা ভাষার রচিত বহু সাহিত্যকর্ম আছে যা আন্তর্জাতিক মাপের। কিন্তু ভাষার সীমাবদ্ধতার জন্য সেসব ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতরই আবদ্ধ হয়ে আছে। হালের লাতিন আমেরিকান বা আফ্রিকান লেখক-কবিরা ইংরেজি মাধ্যমে লিখেই জগতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেসব দেশের কবি-লেখকদেরও মাতৃভাষা পরিত্যাগ করে আশ্রয় নিতে হচ্ছে ইংরেজি ভাষার ভেতর।

তাই বাস্তবতা হচ্ছে, আমরা সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞতাবশত কিন্তু নিজেদের বিদেশি ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষুধার খাদ্য হিসেবেই তৈরি করছি। দেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রেই বিশ্বায়ন অর্থাৎ ইংরেজি

সংস্কৃতির দাপট। একে রোধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাইরে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন কোনো গ্রহ নয়। তাই সেই পরিবারের ক্ষুদ্র-দরিদ্র-নির্বল সদস্য হিসেবে আমাদের অস্তিত্বও সেখানেই এবং সেই ভূমিতে শেড়ক পুঁতে রয়েছে। যত দিন যাবে শেকড়টা আরো গভীরে প্রবেশ করবে। এটি কোনো হতাশার চিত্র নয়, একেবারে বাস্তব সত্য।

-২০০১

শিল্পীর সংযোগহীনতা

শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নির্মাতার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে বস্তু-ভাব-বিষয় বা কার্যকারণের সঙ্গে গভীর সংযোগ স্থাপন। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো কবি বা লেখক সেই সংযোগ স্থাপন করতে না পারছেন ততক্ষণ তাঁর নির্মাণকর্মে ফাঁকটা থেকেই যাবে। রূপনিরীক্ষার ক্ষেত্রে একজন কবির কাছে প্রকৃতিজগৎ তাৎপর্যপূর্ণ, লেখকের কাছে বৃহৎ সমাজ থেকে অনুব্যক্তি। প্রকৃতি বহুবর্ণিল, অনুব্যক্তির অন্তর্লোকও তাই। শিল্পের উৎস কেবল বস্তুবিশ্বই নয়, শিল্পীর অনুভব এবং অনুভবের চিন্তাকর্ষণ বর্ণনা। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় অতি আধুনিক জটিল জীবন ও সময় শিল্পীকে তার পর্যবেক্ষণের জগৎ বা বস্তুজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। শিল্পীসত্তা আপন নির্মাণের প্রতি গভীর মনোযোগী হতে পারছে না, হতে পারছে না শ্রমশীল। এক ধরনের ক্লান্তিবোধ বা ঔদাসীন্য শিল্পীর অজান্তে নির্মাণকাজে মিশে যাচ্ছে। আমরা তাকাতে পারি নাগরিকতাঋদ্ধ গদ্য বা কবিতায়, তাকাতে পারি গ্রাম বা আঞ্চলিক সাহিত্যে। এর জন্য আমার বিশ্বাস– যতটা দায়ী শিল্পী, ঠিক ততটা দায়ী বিশৃঙ্খল সময় বা কাল। নগরজীবনে শিল্পী নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য থাকেন নষ্ট সময়ের দ্বারা। সময় শিল্পীকে উৎপাটিত করে বোধের ভূমি থেকে, সৃষ্টির শেকড় ছিন্ন করে দেয় মনোযোগী শ্রম থেকে।

খুব সহজ করে ধরা যায় ঢাকার বিক্রয়কেন্দ্রগুলোতে আসা গ্রামকেন্দ্রিক ছোট শহরের উৎপাদিত লিটল ম্যাগাজিনগুলোর পাতা উল্টালে। ওসবে যারা লেখালেখি করে বয়সে তারা তরুণ, জীবনের অভিজ্ঞতায় অপক্ব। কিন্তু জীবনীশক্তিতে সেসব তরুণরাই প্রবল উচ্ছ্বাসপূর্ণ। কাঁচা হাতে তৈরি হলেও লেখাগুলো যে পরিশ্রমীও মনোযোগী তা ধরা যায়। শিল্পের অন্তর্গূঢ় এবং জীবনের বহুমুখী সত্যকে অধ্যয়নরত সেসব তরুণেরা দুচোখে যা দেখে তাকেই শিল্পরূপ দিতে গিয়ে বড় কিছু করতে পারে না সত্য, কিন্তু তাদের চেষ্টায় কোনো খাদ নেই। এদেরই একদল পরবর্তীতে রাজধানী শহর ঢাকা

আসে। এবং ধীরে ধীরে শেকড়ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন অর্জন করে জীবন ও শিল্পের তত্ত্বগত সত্যকে, কিন্তু হারিয়ে ফেলে শ্রমশীলতা ও মনোযোগিতা। যারা থাকে শ্রমশীল এবং জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে শিল্প জিজ্ঞাসার সংযোগ ঘটায়, তারাই ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে কবি বা লেখক। এমন কেউ কেউ আছে যারা ঢাকা শহরে পা দিয়ে অল্প দিনের ভিতরই তাদের দু'চারটে লেখা দিয়ে পাঠককে মুগ্ধ করে ফেলে ধীরে ধীরে শ্রমবিমুখ হয়ে গেছে। এর মূল কারণ. নগরজীবনের মোহাচ্ছন্নতা, পূর্ব অভিজ্ঞতাহীন জীবন-স্বপ্ন ও গ্রামবিচ্ছিন্নতা। অথবা উন্মুলিত নগরজীবন।

আমরা যারা দীর্ঘদিন ধরে এই শহরে বসবাস করছি কিংবা জন্মেছি এই শহরে, তাদের সংকট আরো প্রকট। এমনি শিল্পীরা না-নাগরিক, না-গেঁয়ো। চেতনাজগৎ আচ্ছন্ন হয়ে আছে গ্রামীণ অলসতা এবং নাগরিক সংকীর্ণতায়। সবেচেয়ে আপত্তিজনক কথাটি আজকাল কবি-লেখকদের মধ্যে বেশ শোনা যায়। কথায় কথায় তাঁরা বলেন, মানুষের পাঠাভ্যাস দ্রুত কমে যাচ্ছে। এখন কোনো পাঠক যদি প্রশ্ন করেন, আপনারা কবি-লেখকরা দিনের কয় মিনিট অন্যের লেখাটির পেছনে ব্যয় করেন? পরম সত্য, শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে পাঠের অভ্যাস পাঠকদের তুলনায় কমে গেছে। নিজের ছাপা লেখাটি ছাড়া কেউ আর অন্যের লেখার পেছনে সময় দিতে রাজি নন। দিন দিন লেখকগণ যে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছেন তার অন্যতম কারণ পাঠে অমনোযোগিতা। আমি যদি অন্যের লেখাটি না-ই পড়লাম তবে নিজের ঘাটতিটা বুঝবো কেমন করে? লেখা পাঠ মানে তো গপ্পো করতে করতে চোখ বুলানো নয়। অন্যের কবিতা বা গল্পটি নিয়ে একান্তে ভাবার অর্থ হচ্ছে নিজের শিল্পপাঠ গ্রহণ করা। পাঠে এই যে সংযোগহীনতা, তার দায়ভাগ লেখকদেরই বহন করতে হয়।

কোনো কোনো লেখকের মধ্যে এমন প্রবণতা রয়েছে, তারা নিজের ঘরের লেখাটি তুচ্ছ করে পাশের বাড়ির বা দূর গাঁয়ের ভিন্ন ভাষা বা অনুবাদ লেখাটি উৎসাহ নিয়ে পাঠ করেন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সেই লেখা তারা আত্মস্থ করতে পারেন না, মুখস্থ করেন। এর প্রমাণ মিলে কবিতার ক্ষেত্রেঃ এমন একটি শব্দ, উপমা কিংবা চিত্রকল্প আঁকা হয়, যা আমাদের চারপাশে নেই, জীবনযাপনের অনুষঙ্গ নয়।

শিল্প কেবল আত্মরতির সাধনা নয়, কষ্ট-যন্ত্রণা-সীমাহীন মানস শ্রমের ফল। এমনটা না হলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মানদীর মাঝির কপিলাকে আঁকতে পারতেন না। পদ্মার জেলেদের হাঁড়ির ভাত খেতে হয়েছিল তাঁকে। পরবর্তী কমিউনিস্ট মানিককে কলকাতার বস্তি আর হাওড়ার শ্রমিক বস্তিতে রাত কাটাতে হয়েছিল। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে ধূর্ত মধ্যবিত্তের জীবন ছেড়ে সস্ত্রীক বস্তিতে ঠাঁই নিয়ে কবিতার চাষাবাদ করতে হয়। ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে সাহিত্যের মানুষগুলোর আত্মার সংযোগ না ঘটলে সাহিত্য হয় না, কেউ

কোনোদিন পারেনি। শিল্পবস্তুর সঙ্গে এভাবে সংযোগবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি আমরা। তাই ৫- ১০ বছর পূর্বে গ্রাম ছেড়ে এসে শহরে বসে স্মৃতি থেকে যে গ্রাম নিয়ে লেখালেখি, তার ফাঁকটা ধরা পড়বেই। কিংবা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে বেড়াতে গিয়ে গ্রাম দেখে এসে, দুচারজন গ্রাম্য লোকের সঙ্গে আলাপচারিতা করে সংবাদপত্রে রিপোর্ট করা যায়, শিল্প বানানো যায় না। শিলাইদহের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ না ঘটলে রবীন্দ্রনাথ কখনো 'রতন'-কে খুঁজে পেতেন না, সোনার ধানে ভরা সোনারতরীও চোখে দেখতে পেতেন না জোড়াসাঁকোর দু'তলায় বসে। তলস্তয় বা গোর্কি কেবল চোখ দিয়ে দেখেননি মস্কো বা লেনিনগ্রাদ শহরকে, অন্তরের সংযোগ ঘটিয়ে তবেই দেখেছিলেন। তাই যে ঢাকা শহরে আমরা বসবাস করছি তার সঙ্গে কি আমাদের আত্মার বা বোধের সংযোগ আছে? এই শহর থেকে আমরা অর্থ উপার্জন করছি এবং এখানেই ব্যয় করছি। এর বাইরে ঢাকা শহরের আত্মার সন্ধান আমরা করিনি। যদি খুঁজে পেতাম তবে কেউ না কেউ কালজয়ী কোনো শিল্প তৈরি করতে পারতেন এই নগরজীবনের সামগ্রিকতাকে নিয়ে।

এই নগর ঢাকার সঙ্গে একজন ব্যক্তি-লেখকের যে সূক্ষ্ম-সুগভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে সেই রূপের সাহিত্যটি কোথায়? আমাদের প্রপীড়িত আধুনিক নগরজীবনে নিশ্চিহ্ন হতে থাকা অস্তিত্বকে অন্তর্লোকের আলোকসম্পাত করে কোনো সাহিত্য কি তৈরি হয়েছে? হয়নি যে এর কারণ বংশপরম্পরায় বা সুদীর্ঘ কাল এই নগরে বসবাস করেও আমরা অন্তরে উদ্বাস্তু। এই শহরে আমাদের দেহসংযোগ ঘটছে, মনসংযোগ নয়। আত্মরতি-আত্মবিকার ঘটছে প্রতি মুহূর্তে, আত্মার সংযোগ ঘটছে না।

যদি গ্রাম ফিরে যাই? ১৫-২০ বছর পূর্বে ফেলে-আসা গ্রামটি কি আজ আছে? সবাই জানি নেই, বদলে গেছে। কী হয়েছে বদলে? বিদেশি গাছগাছালি, হাইব্রিড ধান, পাকা প্রাইমারি স্কুল, পাকা সড়ক, টিভি ইত্যাদি চোখে পড়বে আমাদের। আজ আর উদোম গায়ের কৃষক খুব একটা চোখে পড়বে না। বদলটা কি এই পর্যন্ত, গ্রামের মৃত্তিকার কম্পন, অন্তর্লীন স্রোত কি চোখে পড়ে? পড়বে না, ওটা চোখের দেখার বিষয় নয়, অন্তরের হিসাবের জিনিস। তাই আজকের লেখকেরা গ্রাম নিয়ে লিখতে চায় অ্যানথ্রোপলজি বা নৃবিজ্ঞান। গ্রামে বিকৃত পুঁজিবাদের বিকাশ, গ্রাম উন্নয়নের নামে বিশ্বপুঁজির আগ্রাসন এবং গ্রাম্য মানুষের চরিত্রে কৃষিবিজ্ঞানের নামে আত্মশক্তি আর মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংসের ষড়যন্ত্র ক'জন লেখকের চোখে পড়ে? ওটা কিন্তু বিজ্ঞানেরও কথা আর দর্শনেরও। শ্রম ও মেধার পর্যবেক্ষণ শক্তি ছাড়া সেই বদলে যাওয়া গ্রামকে দেখা যাবে না।

ঠিক এমনি একটি গ্রামকে নিয়ে গল্প লিখতে বসেছিলাম। ভেবেছিলাম গ্রামে যখন ধনবাদের বিকাশ ঘটছে, নাগরিক সন্ত্রাস ঢুকে গেছে, বুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্যবাদী ভয়ঙ্কর নায়কেরও আবির্ভাব ঘটে গেছে, তখন নগরের মতো

ব্যক্তি-নায়ক তো সৃষ্টি করতে পারব। কিন্তু লিখতে গিয়ে সেই ভয়ঙ্কর গ্রাম্য নিষ্ঠুর নায়কের অন্তর্নিঃসহায় অবস্থাটা আবিষ্কার করে ফেলি। এর পরিণাম এই দাঁড়ায়– গল্পটা আর লিখতেই পারলাম না। এর ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। কিন্তু এতটুকু বুঝি গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে দীর্ঘ সংযোগহীনতার ফলে আমি নিজেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছি। যতদিন এর ব্যাখ্যা না পাচ্ছি ততদিন লেখাটাও হচ্ছে না, এটা আমি জানি।

আমাদের সাহিত্যে রূপরীতি বা গঠনশৈলীরও বিবর্তন ঘটছে না। বিশেষ করে গদ্যভাষার অভিনতুন রূপ তৈরি হচ্ছে না। হচ্ছে না এই কারণে যে, আজ অনেকেই শব্দ বা বাক্য নিয়ে শ্রমসাধ্য সাধনায় মনোযোগী হচ্ছে না। নিজস্ব অভিনব ভাষাশৈলী তৈরি না করে, নতুন নতুন বিষয়ভাবনার গল্প তৈরি হয় না। কোনো লেখকের ভাষা বা রূপরীতি সম্পর্কে প্রস্তুতি না থাকলে বিষয়ের ক্ষেত্রে যত বৈচিত্র্যই আসুক, তা কখনো উৎকৃষ্ট শিল্প হয়ে ওঠে না। ভাষার দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে, ভাবভঙ্গির অভিনব কারিগরি বিদ্যাটা জানা না থাকলে কোনো যুক্তিতেই নিজের অক্ষমতার দায় থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। এটি যেমনি সময়ের দাবি তেমনি সাহিত্যের রূপরীতির বিবর্তন ধর্মেরও বাস্তবতা। যাঁরা লেখালেখি প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন কিংবা নিজের মৌলিক লেখাটি না লিখে এখানে ওখানে এটা সেটা লিখছেন, তাঁরা নিজেদের সমস্যাটা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। এভাবে মূলধারা থেকে সরে যাবার কারণটাও সহজেই বোঝা যায়। জীবিত অবস্থায় অক্ষমতার এই পরিণতি একজন শিল্পীর জীবনে অভিশাপের মতো। শিল্পের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে এবং নিজের সাধনার সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেই এমনটা ঘটে। সৃষ্টিশীল আপন ক্ষমতার ভূমিস্তর থেকে যদি প্রাণের শিকড় ছিন্ন হয়ে যায় তখন শিল্পপ্রাণের মৃত্যু অবধারিত। এমনি অপমৃত্যুর দায় সমাজের জন্য ক্ষতিকর নিশ্চয়ই।

সাহিত্য-শিল্প মোটেই আয়াসসাধ্য বিষয় নয়। অথচ অনেকে মনে করেন এর চেয়ে সহজ কাজ বোধকরি পৃথিবীতে অন্য কিছু নেই। তাই দেখা যায় একুশের বইমেলা এলেই ওরা ছুটে আসে প্রবাস থেকে পকেটে ডলার নিয়ে। মাত্র শত দুই ডলার খরচা করে একশ কপি কবিতার বই ছাপিয়ে টুক করে ঢুকে যায় বইমেলায়। দৈনিক পত্রিকার ২-৪ টা প্রেমের কবিতা পাঠের বাইরে যার কোনো কাব্য সম্পর্কে ধারণাই নেই, সে হতে চায় কবি।

কবিতা কি এতই সহজ? হতেও পারে। হলে না আমাদের সমাজে গদ্য বাদ দিয়ে এত লোক কবিতা লিখেন কেন? কেউ যদি মনে করেন কবিতা অর্থাৎ ছন্দহীন গদ্যকবিতা লিখলেই কবি হওয়া যায়, তবে এর চেয়ে হাস্যকর আর কী হতে পারে? মাত্র পাঁচ মিনিট সময় ব্যয় করে পঞ্চাশটি শব্দ দিয়ে লাইন সাজালেই কি কবিতা হয়? গদ্য লিখতে গিয়ে শ্রমসাধনার ভয়ে যারা পালিয়ে গিয়ে কবিতা লিখতে চায়, প্রকৃত বিচারে তাদের লেখালেখি বৃথা। কেননা কবিতার ক্ষেত্রেও তারা থাকে শ্রমবিমুখ। আর যা হোক, সাহিত্য

জিনিসটাই হচ্ছে শ্রমের বিষয়। গদ্য হোক বা কবিতা হোক, শ্রমের বিকল্প নেই। জীবনের সমগ্রতার সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিক বা রূপসমগ্রতা নিজের আয়ত্তে না এলে সাহিত্য হয় না। একজন শিল্পীকে শিল্পের বস্তু-অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় চলমান জীবন থেকে। তাই জীবনের সঙ্গে গভীর সংযোগ না ঘটলে শিল্প হয়ে ওঠে না। অন্যদিকে নান্দনিক বিষয়টিকে শৃঙ্খলায়িত করতে হলে শব্দ নিয়ে, বাক্য নিয়ে রীতিমতো কঠিন শ্রমসাধ্য সাধনা করতে হয় দিনের পর দিন। শিল্পের দুর্মর তৃষ্ণা অন্তরে জাগিয়ে তুলতে না পারলে রূপও তৈরি হয় না, ছায়াও নয়। একজন কবি বা লেখকের মধ্যে সেই তৃষ্ণা জাগাবার কৌশলটি হচ্ছে অন্যের লেখা পাঠ এবং কলাকৌশল বুঝে নেওয়া। তারপর নিজের লেখার মধ্যে যন্ত্রবিজ্ঞানীর মতো অভিনব নকশাটি তৈরি করা। এসবের জন্য প্রয়োজন পড়ে সময় ব্যয় এবং মেধাচর্চার সুযোগ করে নেওয়ার বিষয়টি।

সাহিত্য মোটেই অলসের আত্মমৈথুন নয়। মহৎ সৃষ্টির জন্য আত্মত্যাগ স্বীকারে রীতিমতো তৈরি থাকতে হয়। সেই ছাত্রজীবন থেকেই ইলিয়াস স্যারকে (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস) দেখতাম কী মনোযোগ দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় ব্যয় করে অন্যের লেখাটি পড়তেন এবং এ নিয়ে সুযোগ পেলেই আলোচনা করতেন। প্রতি সপ্তাহে কোন কাগজে (তখন অবশ্য কাগজ কম ছিল) কার লেখা ছাপা হয়েছে এবং কেমন হয়েছে তা জানা-পড়া ছিল তার রুটিনের মধ্যে। এই যে জানাজানি এটা প্রতিটি লেখকের জন্যই জরুরি কাজ। আজকাল তো আর সাহিত্যের আড্ডা হয় না, হয় কেবল আত্মমৈথুন আর পরনিন্দাচর্চা। দলাদলি। গোষ্ঠী তৈরি। ইলিয়াস স্যারেরও গোষ্ঠী ছিল, আড্ডা ছিল। সেই 'লেখক শিবির'। ওখানে তিনি চর্চা করতেন মার্কসীয় রাজনীতি, যদিও তিনি মার্কসবাদী ছিলেন না। মার্কসবাদ তাঁকে চর্চা করতে হতো নিজের সাহিত্যের জন্য, বিপ্লবের জন্য নয়। সেই সংযোগটাই ছিল তাঁর সাহিত্য তৈরির অন্যতম হাতিয়ার। তাই দেখা যাচ্ছে অন্যের লেখার সঙ্গে যোগাযোগটাই বড়। আমি কলকাতার একজন তরুণ গল্পকারের ডায়রি দেখে অবাক হয়ে যাই। প্রতিদিনই সে কারোর না কারোর লেখা পড়ছে। যার লেখা পড়ছে তার লেখাটির নাম মন্তব্য সহযোগে নোট করা আছে প্রতিটি পৃষ্ঠায়। এভাবেই সে তৈরি হচ্ছে লেখালেখিতে।

তবে আমরা করব কী? শ্রমের ভয়ে গদ্য থেকে পালিয়ে কবিতায় আশ্রয় নেব? কবিতার জটিল রূপরীতির ভয়ে পালিয়ে ঠাঁই নেব গদ্যকবিতার নামে শ্রীহীন কথামালায়? আমাদের পরিশ্রমী হতে হবে জটিল সমাজকে জানার জন্য। জীবনের চারপাশে যে জটিল সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বস্তুবিশ্ব, তার সঙ্গে লড়াই করেই আপন শিল্পের ভুবনটি তৈরি করতে হবে। জীবন সম্পর্কে অমনোযোগিতা, উদাসীনতা ও ক্লান্তিবোধ থেকে মুক্তি পেতেই হবে। যে রাষ্ট্র ও সমাজ আমাদের বোধের জগতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে এবং বিচ্ছিন্ন করেছে শ্রমসাধ্য শিল্পসাধনা থেকে, তার হাতে পরাভব মানা যায় না।

যে দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রসমাজ শিল্পীর সত্তায় হতাশা সৃষ্টি করে পলায়নপরতায় প্রেরণা দেয়, অলস ক্লীব হতে উৎসাহিত করে, প্রতিভা চর্চার ব্যাঘাত ঘটায়, তার সঙ্গে শিল্পীর আপস চলে না। জীবনের অন্তর্গূঢ় সত্যের সন্ধানী হতেই হবে আমাদের। অলস বুর্জোয়া শ্রেণী দ্বারা বিনাশ্রমে অল্প সময়ে কোটি কোটি অর্থ অর্জন সম্ভব হলেও জীবনের সঙ্গে সংযোগহীন শ্রমভীতু শিল্পীর দ্বারা কোনো অর্জনই সম্ভব নয়।

–২০০১

সাহিত্যের ময়না তদন্ত

সাহিত্যের ক্ষেত্রে ময়নাতদন্ত বা পোস্টমর্টেম শব্দটি ব্যবহারে কোনো আপত্তি দেখি না। ছাপার অক্ষরে কাগজে সাহিত্যের অবস্থান মৃতদেহেরই মতো। পাঠক যখন তা পাঠ করে তখন তা মর্গে কাটা-ছেঁড়া দেহের পর্যায়ে পড়ে। দেহের মৃত্যু কী কারণে ঘটল তা অনুসন্ধান চালায় একজন চিকিৎসক। হতে পারে সে মৃত্যু হত্যা, আত্মহত্যা বা স্বাভাবিক। এই অনুসন্ধানের বেলায়ও সত্যকে জানতে হয়। অর্থাৎ মৃতদেহে চলে সত্যানুসন্ধান। কিন্তু বিজ্ঞানীর কাজ ভিন্ন। তিনি মৃত মানব দেহে অনুসন্ধান করেন যে কারণে মৃত্যু ঘটল তাকে রোধ করার অজ্ঞাত জ্ঞানকে করায়ত্তের জন্য। একজন পাঠক নিছক মর্গের ডোমের মতো নির্দয়ভাবে মৃতদেহ কেটে-ছিঁড়ে নিজের দায়িত্ব পালন করেন না। পাঠক সাহিত্যের সত্যকে প্রত্যক্ষ করেন। তার কৌতূহলী জিজ্ঞাসা অনেকটা মানবদেহ নিয়ে অনুসন্ধানী বিজ্ঞানীর মতো।

সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে নতুন একটি লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, সাহিত্য কি একমাত্র বিনোদনের বস্তুসামগ্রী? কেবল প্রশ্নই নয়, বিনোদনের বস্তু হিসেবে পাঠক ধীরে ধীরে সাহিত্যাঙ্গন থেকে কেটে পড়ছে। আরো কম শ্রমে আরো উচ্চ প্রযুক্তির বিনোদনের মাধ্যমে ক্যাবল টিভি, অন লাইন বা এ ধরনের মাধ্যমের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। আমার বিশ্বাস– বিনোদন সাহিত্য অদূর ভবিষ্যতে বড় সংকটে পতিত হবে। বিনোদন সাহিত্যের পাঠকের জন্য যেমনি মস্তিষ্কের জটিল স্নায়ু কোষের প্রয়োজন পড়ে না, চোখ আর হালকা চিত্তটাই যথেষ্ট, তেমনি আনন্দ সম্ভোগের জন্য টিভি বা ইন্টারনেটের চেয়ে বই পুস্তক গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে ইদানিং তারা মনে করছে।

আমার মনে হয় বিনোদন সাহিত্যের লেখক বা ব্যবসায়ীরা বিষয়টি বুঝতে পারছেন না। বুঝতে পারলে নিশ্চয়ই তারা হিসাব করতেন এই ঢাকা শহর থেকে প্রতি সপ্তাহে শুক্রবারের সাহিত্যের পাতায় কী পরিমাণ গল্প-উপন্যাস বা

কবিতা ছাপা হচ্ছে। এ-সবের মিলিত সংখ্যাটি কত? প্রতি বছর ঈদ উপলক্ষে কত 'হাজার' গল্প-উপন্যাস এবং কত 'বিলিয়ন' কবিতা ছাপা হচ্ছে? এসব পত্র-পত্রিকার মালিকেরা নিশ্চয়ই জানেন যদি বিজ্ঞাপন না পেতেন, কেবল পাঠক-ক্রেতার দিকে তাকিয়ে থাকতেন, তবে আমসহ ছালা তো যেতই, চাল চুলোও যেত। আমি শঙ্কিত কবিতার দিকে তাকিয়ে। ঈদ সংখ্যায় হাজার হাজার অপাঠ্য কবিতার ভিড়ে শিল্পিত মূল্যবান কবিতাও হারাতে বসেছে। প্রতিটি সংখ্যায় উত্তম কবিতাগুলোকে খুঁজে পেতে গলগ্রহ হতে হয় পাঠককে। প্রকৃত পাঠক কবির নাম দেখে কবিতা পড়ে না, আগাগোড়া সব পড়তে হয় তাদের। অপাঠ্য কবিতাগুলো রীতিমতো পাঠকের স্নায়ুতে নিষ্ঠুর নির্যাতন চালায়। অপাঠ্য গল্প বা উপন্যাস থেকে পাঠকের পরিত্রাণের পথ আছে। লেখার শুরুটা আর শেষটায় চোখ হাঁটালেই ভেতরের খবরটা আঁচ করে তাকে পরিত্যাগ করা যায়। কিন্তু কবিতার বেলায় তা অসম্ভব। কেননা কবিতায় শব্দ এতো কম যে, শেষ লাইনের শেষ শব্দটিও পাঠ করতে হয়। একটি ১০ লাইনের কবিতায় দেখা যায় ৯ লাইন রীতিমতো ক্লান্তিকর কিন্তু শেষ লাইনের শেষ দু'টি শব্দের কারণে কবিতাটি বিস্ময়করভাবে মহাকাব্য হয়ে ওঠে। তাই অনুসন্ধানী পাঠককে লেখকদের চেয়ে কবিরাই বেশি কষ্ট দেন অন্তত ঈদ সাহিত্যে। রীতিমতো মেন্টাল টর্চার বটে।

প্রবন্ধের শুরুতে আমি ময়নাতদন্তের কথা বলেছি। হ্যাঁ, আজ এটির জরুরি প্রয়োজন। বিশেষ করে প্রয়োজন ৫০/৬০/৭০ দশকের কবি সাহিত্যিকদের বেলায়। এদের সাহিত্য বা কাব্যকথা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে বা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ গবেষকদের দিয়ে গবেষণাও করানো হয়েছে বা হচ্ছে, বই বের হচ্ছে অভিসন্দর্ভ নামে। কিন্তু এসবের বিপুল অংশই একপেশে। সাহিত্য সমালোচকগণ কি লেখকদের ভয় পান? তবে কেন সত্যকে ঢেকে রাখার চেষ্টা? সাহিত্যের আলোচনা পাঠ করলে পাওয়া যায় পাতার পর পাত প্রশংসা কেবলই। প্রশংসা তো করতেই হবে পরিশ্রমী লেখকের শ্রমকে, মেধাকে। তাই বলে সীমাবদ্ধতাকে এড়িয়ে যাওয়া কেন? সাহিত্যের ময়নাতদন্তের বেলায় হতে হয় নিষ্ঠুর নির্দয় মর্গের ডোম-চণ্ডালদের মতো। ডোমেরা যেমনি ছুরি চালিয়ে হাতুড়ি পেটানোর শব্দতুলে লাশ খণ্ড-বিখণ্ড করে, সাহিত্যেও সমালোচকদেও তেমনি হতে হয়। পাঠক যদি চলতি বাজারের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করেন কিংবা লেখক অভিধান পাঠ করেন, তবেই বুঝতে পারবেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক কবিরা কীভাবে জন্মগ্রহণ করছেন এই দেশে হাজারে-বিজারে। লেখক অভিধানে বর্ণিত তাদের বৈশিষ্ট্য চমকে দেওয়ার মতো নয় কি?

১৯৪৭ উত্তর লেখকদের লেখার ময়নাতদন্ত করলে অবাক হতে হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠান স্বপ্নের মধ্যে যে দোষ আছে, চালাকিটা লুকিয়ে আছে, তারা তা ধরতেই পারেন নি। তাই তাদের নায়ক-নায়িকারা নতুন দেশের স্বপ্নই

দেখে, ইনিয়ে বিনিয়ে প্রেমের যে কথা হয়, তা নায়কও বুঝে না, নায়িকা তো নয়ই। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন ঘটে গেলেও সেই স্বপ্নের দোষ আর কাটতে চায় না। ১৯৭১ সালের যুদ্ধটা কি মুক্তিযুদ্ধ নাকি স্বাধীনতা যুদ্ধ, ৬০ দশকের লেখকেরা বুঝার চেষ্টাই করেন না। তাই তাঁরা যুদ্ধের নামে লিখলেন অ্যাকশন চলচ্চিত্রের কাহিনী। নারীধর্ষণ আর নরহত্যার অতিরিক্ত যে ছিল যুদ্ধটা, তা তাদের মাথায়ই ঢুকল না। যুদ্ধ, সংগ্রাম, প্রতিরোধ বা বিপ্লবের ঘটনা বর্ণনায় ভাষার আলাদা ইমেজ প্রয়োজন পড়ে, সে বিষয়টি অনেক লেখক ভাবার সময়ই পাননি। সস্তা প্রেমের গল্পের নায়ক-নায়িকার অন্তর্লোকের ভাষা আর একজন প্রতিরোধ যোদ্ধার ভাষার শব্দব্যঞ্জনার মধ্যে যে তফাৎ, তা বুঝা না গেলে মুক্তিযুদ্ধের নামে শিশুদের থ্রিলার লেখা যায়, সাহিত্য হয় না। ৭০/৮০/৯০ দশকের লেখকদের বিপুল অংশই আত্মঘাতী কাজ করে বসে আছেন পূর্বসূরিদের শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ করতে গিয়ে।

ময়নাতদন্ত চালালে ৪০ দশক থেকে আজ অবধি– সবচেয়ে বেশি সাহসী, স্পষ্টবাদী এবং বিষয়গত নিরীক্ষাধর্মী লেখকদের পাওয়া যায় ৮০ এবং ৯০ দশকে। আবার হুজুগে মাতোয়ারা হবার প্রবণতাও তাদের মধ্যেই বেশি। তথাকথিত উত্তর আধুনিকতার বিভ্রান্তিকর পথে ওরা ছুটতে চায় অনেকটা বুঝে না বুঝে। বয়সে তরুণ বলেই সাম্রাজ্যবাদী সুচতুর সাহিত্যতত্ত্বের গোলক ধাঁধায় তারাই বেশি পিছলে পড়ে।

একথা বলার সাহস *রাখতে হবে যে, আজ ৬০ এবং ৭০ দশকের লেখকেরাই সবচেয়ে বেশি দর্শনগত শূন্যতায় ভুগছেন। একথা* লেখকদেও বেশির ভাগই সমাজতন্ত্রেও প্রশ্নবোধক হবার কারণেই এমনটা ঘটেছে। কেননা লেখকদের বেশির ভাগই সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নন। তারা মানবতাবাদী। তাদের বিশ্বাসের পুঁজিবাদী মানবতাবাদের বিপর্যয় এবং বিশ্বায়নের অভিঘাতে নিজস্ব শিল্প চেতনা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। তাই তারা যেমনি পারছেন না পুঁজিবাদী স্বপ্নের গণতান্ত্রিক সমাজ চিত্রণ করতে, তেমনি পারছেন না ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী নায়কের চিত্র আঁকতে। তাদের শিল্প প্রচেষ্টাটা তাই ফাঁপা বেলুনের মতো। এ ক্ষেত্রে তারা হতাশাবাদী বা নৈরাশ্যবাদী। বৈজ্ঞানিক আজগুবি কল্প কাহিনীর ভেতর কেউ কেউ স্বপ্ন নিয়ে বিচরণ করতে চান, আশ্রয় চান। কিন্তু কর্মটা যেহেতু পাশ্চাত্যের তাই অনুবাদ বা অনুকরণই শেষ আশ্রয়। রাজনৈতিক দর্শনের এই সঙ্কট তারা পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে।

আমাদের বাংলাদেশের সাহিত্যের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত ময়নাতদন্ত চালালে দেখা যাবে, লেখকদের বিপুল অংশই রাজনৈতিক দর্শন বুঝতে পারেন নি অথবা বুঝার চেষ্টা না করে অন্ধকারে বিচরণ করেছেন। সত্যেন সেন, শহীদুল্লাহ কায়সার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এবং আরো কেউ কেউ আপন শ্রেণীকে ধরতে পেরেছিলেন বলেই তাঁদের মধ্যে কপটতা ছিল না। অন্যদিকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তো অবিনাশী এক শিল্প চৈতন্যের নাম। তাছাড়া বিপুল

লেখকদেরই সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তারা আপসকামী, আপন পচনশীল দুশ্চরিত্র শ্রেণীর ভেতর সুখ সন্ধানী। নিজেদের কালের পাকিস্তানী বা বাংলাদেশী শাসক-শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের সাহিত্য উচ্চারণ খুবই নগণ্য। তারা শাসক শ্রেণীর অনুগত থেকেছেন, সুবিধা গ্রহণ করেছেন। তাদের সাহিত্যকর্মে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নেই, ঘৃণা নেই। বরং তারা চালাকি করেছেন বা এখনো করছেন।

কোনো রাজনৈতিক দলের শাসনকালে তারা তাদের সেবা করেছেন, সুযোগ নিয়েছেন। কিন্তু সেই দলটির পতন ঘটামাত্র সুর পাল্টে তাদের কুৎসা নিয়ে সাহিত্য রচনার চেষ্টা করে চলমান বা ক্ষমতাবানদের নেক নজরে আসার চেষ্টা করেছেন। এর ফলে তাদের রচিত সাহিত্যে স্পষ্ট ধরা পড়ে ফাঁকটা, কৌশলটা। তাই সেসব আর সাহিত্য হয়ে ওঠে না, হয়ে ওঠে স্থূল কাহিনীর ঠাসা স্থূল ভাষার ব্যর্থ প্রয়াস।

আমার বিশ্বাস আমাদের সাহিত্যের গত ৫০ বছরের সৃষ্টিগুলোর ময়নাতদন্ত হওয়া দরকার দক্ষ নিরপেক্ষ তদন্তকারী দল দ্বারা। এটা হলে তরুণরা বুঝতে পারবে তাদের পূর্বসূরিদের ব্যর্থতা, কপটতা আর অপকৌশলের দিকগুলো। আমি এটা দাবি করব না রাজনৈতিক দর্শন বলতে কেবল বামধারাকেই বুঝায়। কেননা বুর্জোয়া দর্শনে বিশ্বাসী মানবতাবাদী লেখকগণ বিশ্বে আজো শিল্পে সাহিত্যের অভিভাবক। তারা যেমনি জন্ম দিয়েছেন উপন্যাস আর ছোটগল্পের, ঠিক তেমনি নব নব নিরীক্ষায় যেসব সাহিত্যকে বিচিত্রগামী করে তুলেছেন। সেই খাঁটি বুর্জোয়া আদর্শের সন্ধান পেতে ব্যর্থ আমাদের বুর্জোয়া লেখকেরা। তাই স্বজ্ঞানে-অজ্ঞানে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যর্থ সাহিত্যের চর্চা করেই গেলেন তারা। তাদের দ্বারা সম্ভব হয়নি সে কারণেই বিশ্বমাপের সাহিত্য নির্মাণ।

ধরা যাক আমাদের আজকের রাষ্ট্রের সংকট। এখানে মানবতা চরমভাবে পদদলিত, ন্যায়-নীতির বালাই নেই। মিথ্যাচার দুর্নীতিতে আকণ্ঠ ডুবে আছে শাসনব্যবস্থা। কিন্তু সাহিত্যে এসব আসছে না কেন? রয়েছে কি সামাজিক সুবিধা হারানোর ভয়? সত্যে এত ভীতি কেন ? চলমান রাজনীতি, রাষ্ট্র এবং শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস না থাকলে, কলমে জোর না থাকলে, লেখক সত্যের কাছে অপরাধী, নিজের কাছেই তুচ্ছ। লাঞ্ছিত মানবতার পক্ষে থাকার সাহস পায় না যে লেখক তার দ্বারা কখনো খাঁটি সাহিত্য নির্মাণ করা সম্ভব নয়। আমাদের বহু জীবিত ব্যর্থ সাহিত্যিকের অবসর জীবনে চলে যাবার কারণ যে দর্শনশূন্যতা, তা তাদের সাহিত্য অনুসন্ধান করলেই মিলবে। চিত্তের সংকীর্ণতা, উদারমানবতা-শক্তির অপূর্ণতা, আধুনিক বিজ্ঞান এবং মানবজাতির অব্যাহত গতিধর্মের প্রতি অমনোযোগিতার প্রমাণ এসব লেখকদের লেখালেখিতে পাওয়া যাবে অনুসন্ধান করলে। তাই ময়নাতদন্তটা আবশ্যক। এ না হলে আমরা সাহিত্যের ঐতিহ্যের অহংকার করব কোন মুখে! মনে রাখতে

হবে চিন্তার অনগ্রসরতা, অতীত-কুয়াশাচ্ছন্নতা এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনাশূন্য সাহিত্য কখনো আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্য হতে পারে না।

ময়নাতদন্তের ক্ষেত্রে অন্য একটি বিষয়েও দৃষ্টি দিতে হবে। তদন্ত করে দেখতে হবে পাঠক বৃদ্ধির হার। বৃদ্ধি পেলে জানতে হবে তাদের পাঠ্য তালিকায় রয়েছে কোন শ্রেণীর বই। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি, আধুনিক প্রকাশনা, বিপণন, বিজ্ঞাপন বা বিতরণের সুযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক রয়েছে কিনা। পাঠকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির হিসাবটাও ধরতে হবে। তা হলেই পাঠক বৃদ্ধির শুভংকরের ফাঁকিটা ধরা পড়বে। রাষ্ট্র যেহেতু শিল্পনিরপেক্ষ নয়, তাই বিবেচনায় আনতে হবে কোন ধরনের সাহিত্যকে রাষ্ট্র উৎসাহিত করছে তার মিডিয়ায়। কেন বা কোন উদ্দেশ্যে করছে তাও ভাবতে হবে। মোটকথা, যে দেশ তার জাতীয়তা নিয়ে আজো বিতর্ক করে, সংশয় প্রকাশ করে, স্থির সিদ্ধান্তে আসতে ব্যর্থ হয়, সেই দেশের লেখক মানসও সেই বিতর্ক দ্বারা বিভক্ত নিশ্চয়। দোদুল্যমান সমাজে তাই সাহিত্যের পোস্টমর্টেম অত্যাবশ্যক। আজই। এখনই।

-২০০২

সাহিত্যের নয়া জামানার জন্য

জিন গবেষণার ফলে মানুষের অর্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রটিতে ইতিমধ্যে যে বিপ্লব ঘটেছে তাতে করে জীবনের ব্যাখ্যা পাল্টে যাচ্ছে। নিকট ভবিষ্যতে এমন কিছু ঘটতে চলেছে যাতে করে পুরাতন বা চলমীন বিশ্বাস, বোধ ও প্রথাকে আর স্বীকৃতি দেয়া যাবে না। তাই আজই সাহিত্যকে ভেঙে বিচূর্ণ করে পুনরায় গড়তে হবে। প্রেক্ষিতটা সেখানেই লুকিয়ে রয়েছে বলেই আজ নন্দনতত্ত্বও নতুন ব্যাখ্যা দাবি করছে। পুরাতন ধারণা দিয়ে সাহিত্যকে বিচার করা সঙ্গত কিনা, সেই প্রশ্নও উঠে আসতে বাধ্য। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি এমনি এক ক্রমাগ্রসরমান শক্তি যে, সেখানে আত্মতৃপ্তি বা শেষ কথা বলে কিছু নেই। অতীতে বিজ্ঞান নির্মাণ করেছিল মার্কসের শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব। অথচ দ্রুত অগ্রসরমান বিজ্ঞান-প্রযুক্তি তার গর্ভজাত সন্তানকে সংস্কার করতে চাইছে, মার্কসবাদের নব রূপায়ন প্রত্যাশা করছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আজ সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী এবং চলমান সমাজবাদী সূত্র অনেকটা অকার্যকর হয়ে পড়েছে। গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, সংগীত, চিত্রকলা, নৃত্যকলা, চলচ্চিত্র নতুন রূপ ধারণ করতে চাইছে। পুরাতন সূত্র দিয়ে তাদের ব্যাখ্যা চলছে না। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও চলিত আঙ্গিক বাতিল হতে বাধ্য। বিষয়বস্তু বা আঙ্গিক বলতে সাহিত্যে আজ অবধি যা বোঝানো হচ্ছে সেই সূত্রকে ভেঙে ফেলা একজন বিজ্ঞানবাদী কথাশিল্পীর নৈতিক-আদর্শিক আর শৈল্পিক দায়দায়িত্ব। অতীতে যারা সাহিত্যতত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন তারাও যুগে যুগে সেসব তত্ত্বকে বাতিল বা সংস্কার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাছাড়া আজকের দিনের প্রযুক্তির বিস্ময়কর জগৎ ছিল তাঁদের কাছে অজ্ঞাত। তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই বৈপ্লবিক যুগে বসে পুরোনো সাহিত্যতত্ত্ব মেনে নেয়া যায় না।

আজ এবং আগামীকালের সাহিত্যের জন্য জরুরি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে নতুন নান্দনিক তত্ত্ব। ক্যানসার, এইডস নিরাময়ের জন্য, প্রাণসৃষ্টির জন্য,

মহাশূন্য বিজয়ের জন্য বিজ্ঞানের গবেষণাগারে যেমনি বিরামহীন চেষ্টা চলেছে, তেমনি জিনবাদী বা নতুন জীবন ব্যাখ্যার সাহিত্যের জন্য অবশ্যই আবিষ্কার করতে হবে নতুন সাহিত্যতত্ত্ব। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে শব্দভাণ্ডারের আকার বৃদ্ধি ঘটাতে হবে। প্রচলিত পুরাতন শব্দের ব্যঞ্জনা দিয়ে নতুন সাহিত্যের শরীর নির্মাণ চলবে না। অতীতের সাম্রাজ্য বিস্তারের কারণে আরবি, ফারসি, তুর্কি, ইংরেজি এবং অপরাপর ভাষার শব্দ যেমনি বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে পূর্ণতা দান করেছিল, আজও তার প্রয়োজন রয়েছে। আজ বাংলাভাষাভাষীরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা রপ্ত করছে সেসব দেশের ভাষা। বিদেশগমনের জন্য পৃথিবীর নানা ভাষার অভিধান বাংলায় উচ্চারণসহ আজকাল ঢাকায় ছাপা হচ্ছে। অতি সহজেই আমরা এভাবে আমাদের শব্দের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারি। ইংরেজি হয়েও ব্রিটেনের ভাষা থেকে আমেরিকার ভাষা আলাদা হয়ে গেছে শব্দভাণ্ডার আর বাচনভঙ্গির কারণে। ইউরোপের নানা ভাষার শব্দমূল ইংরেজির সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে বিশ্ববাসী আজ কেবল বলায়-কথায় নয়, সাহিত্যে আমেরিকান ইংরেজিকে সর্বোচ্চ স্থান দিচ্ছে। এভাবে আমরাও বাংলা শব্দভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে পারি। 'আন্দেলে/আন্দলে' শব্দটি স্প্যানিশ। আজ এটি আমেরিকান ইংরেজি ভাষার অধিকারে। এর অর্থ 'হারিআপ' বা বাংলায় 'জলদি'। কেবল শব্দভাণ্ডার নয়, আমাদের বাক্যবিন্যাসও নতুন করে নির্মাণ করতে পারি।

আজ সময় এসেছে তরুণদের আপন সত্তা আবিষ্কারের। তরুণ শিল্পীদের মনে রাখা প্রয়োজন সাহিত্যে পীর বা গুরুবাদ বলে কিছু নেই। কোনো রাজনৈতিক অন্ধ মতবাদও তাদের দর্শন নয়। অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতি শিল্পসত্তার বন্ধু নয়। অন্ধ রাজনীতি লেখকের প্রতিভাকে বিভ্রান্ত করে, শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেয়। সরাসরি রাজনীতি করতে গিয়ে আজ অবধি কত শিল্পপ্রতিভা যে প্রতারিত হয়েছে, স্বাভাবিক জীবন থেকে ছিটকে পড়ে সম্ভাবনাময় শক্তি বা মেধাকে বিনষ্ট করেছে, তার হিসাব কে করবে? বিভ্রান্ত রাজনৈতিক তত্ত্ব হচ্ছে এক ধরনের মোহাচ্ছন্নতা।

মনে রাখতে হবে লেখক স্বয়ম্ভু, নিজেই নিজের স্রষ্টা। তার কোনো স্রষ্টা নেই, দীক্ষাগুরু নেই। কেবল রাজনীতিই নয়, একজন নবীন শিল্পীর ডানে-বামে-পেছনে-সামনে এমন কোনো কবি বা লেখক নেই যাকে তিনি পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। তিনি ঠিক অবতারের মতো, যিনি এসে তার পূর্ববর্তী অবতারদের বাতিল করে দিয়ে নতুন দর্শন প্রতিষ্ঠিত করেন। তেমনি পূর্ববর্তী শিল্পসাহিত্যকে ধ্বংস করেই তরুণদের নয়া সাহিত্যের জামানা সৃষ্টি করতে হবে। প্রকৃত লেখক কোনোদিনই পুনঃনির্মাণ করেন না। তিনি আবিষ্কার করেন, নতুন সৃষ্টি করেন। যে কবিতা বা গল্পটি স্বদেশী তো বটেই, বিদেশি কোনো শিল্পী কখনো লিখননি, তা লিখতে সাহস ও শক্তি অর্জন করতে হবে।

আজকের বাংলা সাহিত্যে অনুকরণ করার মতো বিস্ময়কর কালজয়ী কোনো সাহিত্যকর্ম তরুণদের সামনে নেই। এ বিশ্বাসে দৃঢ় থেকেই নিজের লেখাটি লিখতে হবে। তবে বিশ্বসাহিত্য বা জাতীয় সাহিত্য অবশ্যই পাঠ্য। পাঠ্য এ কারণে যে, তখনই তারা বুঝতে পারবেন পূর্ববর্তীগণ কী লিখতে পারেননি এবং বর্তমানে নিজেদের কী লিখতে হবে। এটা যারা ধরতে পারবেন তাদের সামনেই জিনতত্ত্বের রহস্যের মতো সাহিত্যের রহস্যটিও উন্মোচিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ ধরা সম্ভব হবে প্রবীণ লেখকের কাছে সাহিত্যের কোন রহস্যটি এতদিন অজ্ঞাত ছিল, অনাবিষ্কৃত ছিল। সরল কথায় পূর্ববর্তীদের কাছে অজ্ঞাত নান্দনিক লেখাটিকেই লিখতে হবে নবীনদের। আরো সহজ কথায় বলা যায় সে বিষয়টিকে, যে কারণে প্যারিচাঁদ মিত্রকে লিখলেন না বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ লিখলেন না বঙ্কিমচন্দ্রকে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন না রবীন্দ্রনাথকে। প্রকৃত স্বাধীন সত্তার তরুণেরা কোনো প্রকারেই দায়বদ্ধ বা ঋণগ্রহীতা নন মৃত অথবা জীবিত অগ্রজ কোনো লেখকের লেখার কাছে। অগ্রজগণ যা লিখেছেন তা তো বাসি হয়ে গেছে, আবিষ্কার হয়ে গেছে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন আর কোনো বিজ্ঞানীর প্রয়োজন নেই নিউটন কিংবা আইনস্টাইন হবার। প্রয়োজনটা কেবল খুঁজে বের করা কোথায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে অগ্রজ বিজ্ঞানীগণের। তাই নবীন শিল্পীদের প্রশ্ন করতে হবে নিজেকে। কোন সেই প্রশ্ন? কেন তিনি অন্যের ভাষারীতি, কাহিনীবিন্যাস বা চরিত্রচিত্রণ পুনরায় লিখবেন? অবতারের বাণীকে যেমনি অবিনশ্বর, শাশ্বত, অভ্রান্ত, অপরিবর্তনীয় বিশ্বাসে শিষ্যরা যুগ যুগ ঘরে জনগণের উপর চাপিয়ে দেয় এবং রক্ষা করে, প্রকৃত সাহিত্যকের দায়িত্ব তা নয়। তার দায়িত্ব উল্টো। একেবারে বিপরীত। তাঁর লেখাটা হবে পূর্ববর্তী লেখাকে অস্বীকার করে, বাতিল করে।

আর একটি কথা না বললেই নয়। কারো কারো দুঃখ আর আফসোস, এত বড় 'মুক্তিযুদ্ধ' হলো, অথচ বিষয়টি নিয়ে এ যাবৎ কোনো 'সার্থক' উপন্যাস হলো না। এ ধরনের প্রত্যাশা বা আফসোসের সঙ্গে আমি একমত নই। কেননা যুদ্ধ, স্বাধীনতা যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ, বিপ্লব শব্দগুলো সমার্থক নয়। '৭১-এর যে যুদ্ধ, তা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত ভূখণ্ড লাভের লড়াই। রাজনীতি বা লড়াইয়ের কৌশলগত কারণে 'শোষণমুক্ত সমাজের' কথাটা যুক্ত ছিল মাত্র। পাঞ্জাবি শোষকশ্রেণীর পরাজয়ের পর স্বাধীন ভূখাণ্ড কারা নতুন শোষক হিসেবে আবির্ভূত হবে, এ বিষয়টি ছিল আড়ালে। মোটকথা যুদ্ধটা ছিল জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্বে, 'স্বাধীনতা যুদ্ধ'–মোটেই 'মুক্তিযুদ্ধ' নয়। মুক্তিযুদ্ধ করে সমাজবাদী বা মার্কসবাদীরা। এক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী এই স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে মহাকাব্যিক উপন্যাস প্রত্যাশা কত দূর করা যায়? আমাদের স্মরণ করতে হবে শেখ মুজিবুর রহমানের সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি,– 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার

সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।' শেখ সাহেব কেন 'স্বাধীনতা' এবং 'মুক্তি' শব্দ দুটি আলাদাভাবে উচ্চারণ করেছিলেন, তা ভাবতে হবে।

আজ সবচে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে অস্তিত্ব রক্ষা এবং আত্মবিকাশের। বিশ্বায়ন বা ভুবনিকরণ এক কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে আমাদেও সামনে। একদিকে টিকে থাকার চ্যালেঞ্জ, অন্যদিকে আত্মবিকাশের চ্যালেঞ্জ। তাই আজ আমাদেও এমন এক নতুন আঙ্গিক আবিষ্কার করতে হবে যা বাংলা ভাষায় তো নয়ই, পৃথিবীর কোনো ভাষায়ই নেই। আমেরিকার প্রবল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চাপের ভেতর থেকেই লাতিন আমেরিকার দরিদ্র সমাজ তা করতে পেরেছে।

বিজ্ঞান যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং জীবনের নব নব জিজ্ঞাসার জন্ম দিতে পারে, সাহিত্যকেও তা পারতে হবে। তা না হলে বাংলা সাহিত্যের আজকের যে রূপটা আছে তা দ্রুত অগ্রসরমান বিজ্ঞানমনস্ক পাঠক বাতিল করে দূরে নিক্ষেপ করবে এবং সাহিত্য বলে যে জিনিসটা রয়েছে তাকে সমাজের জঞ্জাল হিসেবে পরিত্যাগ করবে। স্যাটেলাইট সংস্কৃতির দিকে তাকালে কিছুটা এর আলামত পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্য আজ পুরাতন আঙ্গিক, বিষয়বস্তু বা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নিয়ে চলতে পারছে না, তা সচেতন পাঠকমাত্রই অনুভব করছেন। আজ চাই বাংলা ভাষার নব রূপায়ন। সেই নতুন ভাষা নিয়েই নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি করতে হবে সাহিত্যের। শিল্পের ভিতর একই অপরিবর্তিত স্থবির শিল্পীকে বারবার পেতে মোটেই বাধ্য নয় অগ্রসর পাঠকসমাজ।

শিল্পীর সঙ্গে পাঠকের সম্পর্কে হচ্ছে বহুরূপীর মতো। একবার মনে হবে চেনা, আবার মনে হবে অচেনা। শিল্পী লুকোচুরি খেলবেন পাঠকের সঙ্গে। একটি গল্পে পাঠক যেভাবে তাঁকে শনাক্ত করবে, পরবর্তী গল্পে পাঠকের কাছে তিনি রীতিমতো অচেনা হয়ে যাবেন। এভাবেই সাহিত্যের নান্দনিক খেলাটা জমে ওঠে পাঠক আর লেখকে। তাই অজ্ঞাতসারে যে অচেনা নতুন বিজ্ঞান-বিশ্ব আমাদের সামনে আজ হাজির হয়েছে তাকে গ্রহণ করতে হবে। জানতে হবে। আত্মার সঙ্গী করতে হবে। এটা করলেই একজন নবীন শিল্পী বুঝতে পারবেন তিনি কী লিখবেন এবং কেমন করে লিখবেন। কেননা আজকের যুগটা মোটেই সাহিত্যের সেবক হবার যুগ নয়, সাহিত্য-বিজ্ঞানী হবার যুগ।

সাহিত্য আজ সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞানের মতোই নান্দনিক বিজ্ঞান বা সাহিত্য-বিজ্ঞান। এ নিয়ে বিতর্ক হওয়া দরকার, মহাবিতর্ক। বিতর্কটা এ কারণে যে গবেষণাগারে আজ জিনের মানচিত্র বা জিন ম্যাপিং হয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিক মানুষ ব্যাখ্যা করেছেন– মানুষই নতুন ডিজাইন করা মানুষ তৈরি করতে পারবে। পারবে কৃত্রিম প্রাণ সৃষ্টি করতে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন আজকের ধারার মানুষের বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে দীর্ঘজীবী বা মৃত্যুঞ্জয়ী

মানুষের উদ্ভব ঘটবে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানী আজ যা পারল অর্থাৎ জীবনের নতুন ব্যাখ্যা আবিষ্কার করতে, তো সাহিত্য-বিজ্ঞানীরা সাহিত্যের নতুন ব্যাখ্যাটা দিতে পারবে না কেন? সাহিত্য যদি জীবনের জন্যই হয়ে থাকে তবে নতুন ব্যাখ্যা দিতে হবে। ব্যর্থ হবার পথ নেই।

–২০০১

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর রাজনৈতিক প্রবন্ধের গদ্যশৈলী

রাজনৈতিক প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠক মননে শ্রেণী শাসিত সমাজ সম্পর্কে কৌতূহল সৃষ্টি করা। যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে পাঠক বসবাস করে সেই সমাজ সম্পর্কে এক ধরনের অজ্ঞতা, অস্পষ্টতা বা অমনোযোগিতায় আচ্ছন্ন থাকে তারা। রাজনৈতিক প্রবন্ধ সমাজের গতি-প্রকৃতির স্বরূপটি উদঘাটন করে পাঠকের সামনে তুলে ধরে এবং সে সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠককে তাদের সামাজিক দায়-দায়িত্ব বোধের আলোর সামনে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। রাজনীতি অবশ্যই একটি জটিল বিষয়। তাই এ বিষয়টিকে পাঠকের সামনে বিশ্লেষণ করতে গেলে কেবল তত্ত্ব নির্মাণই প্রধান কাজ নয়, লেখকের ভাষা বা গদ্যশৈলীটিও হতে হবে শিল্পগুণে অম্বিত। জটিল শব্দ চয়ন, বাক্য বিন্যাস কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব দ্বারা বিষয়বস্তুকে দুর্বোধ্য করে তুললে রচনার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। গদ্যের জটিলতার কারণে যদি বিষয়বস্তুর ভেতর পাঠক প্রবেশ করতে না পারল, তবে লেখক নিজের জন্য তো নয়, পাঠকের জন্যও কোনো সুসংবাদ বহন করতে পারেন না। যেহেতু রাজনৈতিক প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নিছক জ্ঞানের চাষাবাদ নয়, শ্রেণী বিভাজিত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করে রাজনীতির সঠিক পথটিকে নির্দেশ করা, সেহেতু সেখানে রচয়িতার গদ্যরীতি ও প্রাঞ্জলতা দাবি করে। প্রাঞ্জলতার অর্থ এই নয়, তা জলো বা শ্রীহীন গদ্যকলাকৌশল।

বাংলাদেশের সাহিত্যে রাজনৈতিক ধারার প্রবন্ধ তথা প্রগতিশীল রাজনৈতিক প্রবন্ধের ইতিহাস খুব বেশি পুরাতন নয়। যদিও এর সূত্রপাত অবিভক্ত বাংলায় তবু নিজস্ব ধারাটি তৈরি হয়েছে পঞ্চাশের দশকের ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে। প্রকৃত অর্থে এর চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে স্বাধীনতা-উত্তরকালে। কলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধি চর্চার ধারা থেকে ঢাকা কেন্দ্রিক বুদ্ধি চর্চার ধারাটি যে স্বতন্ত্র তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ষাটের দশকের শেষ দিকে। কেননা পশ্চিমবঙ্গে দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসন এবং পূর্ববঙ্গ (বাংলাদেশ) পাকিস্তানি শাসনে

থাকার ফলে বাংলার দুটি অংশেরই সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপরীতির পরিবর্তন ঘটে। কেবল রাজনৈতিক বাস্তবতা নয়, সাংস্কৃতিক তথা বাংলাভাষার সাহিত্যের বিষয় এবং রূপগত স্বতন্ত্রধারাটিও স্পষ্ট হয়ে পড়ে সে সময়। রাজনৈতিক ধারার প্রবন্ধের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে গোপাল হালদার, বিনয় ঘোষ, আবু সায়ীদ আইয়ুব এবং আরো অনেকে বিষয়-ভাবনা এবং রূপরীতির বিবর্তন ঘটিয়েছেন। কিন্তু বাঙালি জাতির আলাদা রাষ্ট্রের দীর্ঘ জন্ম-যন্ত্রণা এবং জন্মের ধারাবাহিক কম্পন-প্রকম্পনের মধ্য দিয়েই নতুন অভিযাত্রার স্বতন্ত্র রূপ রাজনৈতিক ধারাটি প্রবন্ধ সাহিত্যে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে স্মরণ করা যায় ড. আহমদ শরীফ, বদরুদ্দীন উমর, রণেশ দাশগুপ্ত, সরদার ফজলুল করীম, দেবেন শিকদার, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবুল কাসেম ফজলুল হক এবং পরবর্তীতে ফরহাদ মজহার, আহমদ ছফা এবং আরো অনেককে। আমার লেখার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ধারার লেখা-লেখির বিষয় ভাবনা নয়, রূপরীতি তথা গদ্য স্টাইলটি। তবে এটিও সত্য, সাহিত্যের রূপরীতি শূন্য আকাশের মেঘের মতো ভাসমান কিছু নয়, বিষয় ভাবনাকে আশ্রয় করেই তার বিকাশ ঘটে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারার প্রবন্ধের প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রে কতকগুলো লক্ষণ স্পষ্ট। বিপুলসংখ্যক লেখাই দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট, নিরস, কুহকী এবং অলংকারবর্জিত অসুন্দর গদ্যে তৈরি। কারো কারো গদ্যরীতিটি আক্রমণাত্মক। এর ফরে গদ্য হয়ে পড়েছে সৌন্দর্যহীন, কর্কশ এবং স্থুল। দু'একজনের গদ্যরীতি মিসট্রিকতায় আক্রান্ত বা পাণ্ডিত্যের ভারে গম্ভীর থাকায় পাঠকের জন্য পাঠন-পঠনে দূরতিক্রম্য। এমন বহু রচনাই পাওয়া যায়, সে সবের রচয়িতাগণের উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু নিজেদের অভ্যাস হেতু রচনা হয়ে ওঠে উদাসীন গদ্য বা ক্লান্ত গদ্যের রূপ। বিষয় ভাবনা অপূর্ব হওয়া সত্ত্বেও বহু রচনার গদ্যের রূপরীতি কুয়াশাচ্ছন্ন ভাববাদ প্রচারের গদ্যরীতিতে আক্রান্ত। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, পাঠক শ্রেণী বুঝতে পারেন না প্রবন্ধকার কী বলতে চাচ্ছেন। বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়েও ব্যক্তিবাদের অহংবোধ আক্রান্ত গদ্যরীতির প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে পাঠককে লেখক থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেয়। রাজনীতি তথা প্রগতিবাদের কথা বলতে গিয়ে চাতুর্যপূর্ণ বাকভঙ্গি প্রয়োগ করে বাংলাদেশে কেউ কেউ তরুণ পাঠক শ্রেণীকে বিভ্রান্ত করে চলেছেন।

এই যে চারপাশে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা সেসব অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গেই অতিক্রম করতে পেরেছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। আমার পক্ষে তাঁর সম্পর্কে লেখা অনেকটা দুঃসাধ্য। কেননা তাঁর সাহিত্যচিন্তা, সমাজচিন্তা এমনকি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ থেকেও রাজনীতিকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব। ভাষা যে জীবন বিচ্ছিন্ন নয়, রাজনীতি নিরপেক্ষ নয়, তা টের পাওয়া যায় সিরাজুল ইস্লাম চৌধুরীর প্রবন্ধ পাঠ করলে। আর এই যে রাজনীতির জীবন কথক,

তাঁর গদ্যরীতিটিও একেবারেই আলাদা এবং নিজস্ব। কথাসাহিত্যের ভুবনে তার বিচরণের অভিজ্ঞতা রয়েছে বলেই অথবা দীর্ঘদিনের গদ্যচর্চার ফলে নিজের জন্য আলাদা একটি গদ্যের ভুবন বা রূপরীতি তিনি আবিষ্কার করে নিয়েছেন। গদ্যটি তাঁর পরিপাটি বলেই জটিলতামুক্ত। জটিল শব্দ চয়ন বা বাক্য বন্ধন তাঁর স্বভাবে নেই। ইংরেজি সাহিত্যের মেধাবী অধ্যাপক হিসেবে তাঁর গদ্যে ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু তা ঘটেনি। এমনকি প্রচলিত তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার এবং সংস্কৃত প্রত্যয় বা ধাতুজাত শব্দও তিনি যথাসম্ভব পরিহার করেছেন। ব্যাকরণের শব্দতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা অবাক করার বিষয়। কেননা তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন না।

সমাজবাদী দর্শনের আলোকে প্রবন্ধ রচনা অত্যন্ত জটিল সাহিত্যকর্ম। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের জটিল প্রক্রিয়ায় সমাজ ও রাষ্ট্রকে পূর্বে শনাক্ত করতে হয়, তারপর শুরু নিজের লেখাটি। কাজটি অনেকটা নিষ্কাম সাধনার মতো। কাজ করা কিন্তু ভোগের তৃষ্ণাকে দমন করা। খ্যাতির মোহ সেখানে অদৃশ্য। কেননা সমাজবাদী রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা নিজের জন্য বা আত্মরতির জন্য সাহিত্য রচনা করেন না, উদ্দেশ্যটা হচ্ছে সমাজ। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী জানেন তাঁর লেখালেখির উদ্দেশ্য পাঠকের স্নায়ুতে মাদক রস কিংবা আমোদ-প্রমোদ রস প্রবেশ করানো নয়, পাঠকের চিন্তার অনুশীলন দ্বারা সামাজিক সত্যের সামনে দাঁড় করানো। আমার মনে হয় সামাজিক সেই সত্যকে জনগণের মধ্যে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই তিনি সাহিত্য জীবনের শুরুতে কথাসাহিত্যের নির্মাণ কাজে হাত দিয়েও সরে আসেন প্রবন্ধ সাহিত্যে। কারণ, তাঁর চোখের সামনে তখন পঞ্চাশের আর ষাটের দশক। এ দেশের মানুষের মুক্তি প্রত্যাশা প্রকাশের পরিপক্ব কাল। এমনি কালে তৃণমূল মানুষ ও নতুন তৈরি হতে থাকা দুর্বল মধ্যবিত্তের জন্য রাজনীতির সঠিক পথের আবশ্যকতাই ছিল জরুরি, কবিতা কিংবা গল্পের চেয়ে। আর সেই পথটা হলো সমাজব্যাখ্যা। সেই উদ্দেশ্য থেকেই বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা, পরিশীলিত রুচি এবং ধারালো যুক্তিকে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর শিল্প নির্মাণের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেন।

একটু মনোযোগ দিয়ে পাঠক যদি তার রচনা পাঠ করেন তবেই লেখকের শিল্প কৌশলটি ধরতে পারবেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সূত্র-উপসূত্র এবং অনুগামী সূত্রগুলোকে তিনি প্রথমেই ছড়িয়ে দেন চলমান সমাজ জীবন ও রাজনীতিতে। তারপর গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন সমাজস্থিত শ্রেণীগুলোর আচরণ ও গতি-প্রকৃতি। নিরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণের পর বিশ্লেষণের কাজে হাত দেন তিনি। এমনকি রাজনৈতিক ব্যক্তির কাজকর্ম ও জীবনকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেন মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বমূলক কৌশল এবং শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করে। 'তাজউদ্দিন আহমদের অবস্থান', 'জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক

ভূমিকা' 'শেখ মুজিবের অঙ্গীকার', 'বিদ্যাসাগরের কাজ', 'আমার পিতার মুখ' ইত্যাদি প্রবন্ধ তার দৃষ্টান্ত।

যেকোনো লেখাই (প্রবন্ধ) যখন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লিখতে বসেন তখন তাঁর গদ্য রূপটি হয়ে ওঠে একের ভেতর বহুর রূপ। কখনো গল্পের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় কিংবা কখনো কবিতার শব্দ ও ছন্দের অনিবার্য বিন্যাসে সমাজের স্বপ্ন ও আগামী কল্পনার রূপকে নিজের করে নিয়ে তিনি পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। তাঁর রচনায় 'উত্তম পুরুষ' রীতিতে বলা গদ্য এবং 'সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ' থেকে বলা গদ্যগুলো পাঠ করলে বোঝা যায়, গদ্যরীতিটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের জন্যই উপযুক্ত। তাই মনোযোগী এবং কৌতূহলী পাঠক ভুলে যান তিনি গদ্য কবিতা নাকি গল্প নয়তো প্রবন্ধ পাঠ করছেন। প্রবন্ধের গঠনরীতির যে মন্ময় বা তন্ময় উপবিভাগ রয়েছে, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর গদ্যের ভিতর তা মিলেমিশে একাকার হয়ে সম্পূর্ণ আলাদা রীতিতে পরিণত হয়। সেই গদ্যরীতিটিই তাঁর নিজস্ব কণ্ঠস্বর। তাঁর এই গদ্যশৈলীর পেছনে কাজ করে নিজস্ব গভীর শ্রেণীজ্ঞান বা শ্রেণী চেতনা। সেই জ্ঞানে ঋদ্ধ বলেই তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উঠে আসা পাঠক শ্রেণী এবং সাধারণ মানুষের বোধ বা অনুভবের ভাষাকে বুঝতে পারেন। ঠিক এমনি জনগণের অনুভবের ভাষাকে বুঝতে পারতেন দুই বিপরীত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবুর রহমান। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সে কারণেই 'কুমু'কে বুঝতে পারতেন, তার ভাষাকেও বুঝতে পারতেন এবং নির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছেন, কোথায় কুমুর বন্ধন। মোটকথা শ্রেণীটা যত সত্য, ঠিক ততটাই জরুরি সেই শ্রেণী বিশ্লেষণের জন্য উপযুক্ত গদ্যরীতি। তাঁর গদ্য পাঠ করলে বুঝতে কঠিন হয় না যে, কেবল বিষয় ভাবনায়ই নয়, গদ্যেও শিল্পরীতির সঙ্গে ক্রমাগত দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে প্রচলিত গদ্যের রূপান্তর ঘটিয়ে নিজের কৌশলটি আত্মস্থ করেছেন লেখক শ্রম ও মেধায়।

আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করার মতো। বাংলাদেশে তো বটেই, পশ্চিম বাংলায়ও এক শ্রেণীর পাঠক আছেন যারা সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর রাজনৈতিক দর্শনে অনাগ্রহী কিন্তু তাঁর গদ্যের মুগ্ধ পাঠক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত খ্যাতিমান অধ্যাপক অমলেন্দু দে'র মন্তব্য হচ্ছে, 'দ্যাখো, মি. চৌধুরীর গদ্য বলার ঢঙটি কিন্তু চমৎকার। রাজনীতির শুকনো কথাগুলোকে তিনি কী করে যেন খাঁটি শিল্প বানিয়ে ফেলেন। আজকাল অমনটা কলকাতায়ও খুব একটা দেখা যায় না।'

ওই শিল্পের সঙ্গেই সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর বোঝাপড়া। আমার মনে হয় বাংলাদেশের মার্কসীয় রাজনৈতিক সাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের গভীর সম্পর্ক গড়ে না ওঠা কিংবা ক্রমাগত দূরত্ব সৃষ্টি হবার পেছনে অন্য বহু কারণের সঙ্গে শিল্প না হয়ে ওঠা গদ্যও অনেকটা দায়ী। পার্টি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তত্ত্বীয় সাহিত্যগুলোর পাতা উল্টালে তা সহজেই অনুমান করা চলে। সেসব নিরস

গদ্য তরুণকর্মীর হৃদয়ে পাঠাভ্যাসের প্রেরণা যোগায় না। আর একটি বিষয়ে পাঠক মাত্রই কৌতূহল প্রকাশ করবেন। সেটি হচ্ছে শাসক-শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধিদের শিল্প চর্চা। বাংলাদেশের বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা সুখপাঠ্য উল্লেখ করার মতো কোনো বই-পুস্তক অতীতেও লিখতে পারেননি, বর্তমানেও নয়। বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী বিশ্বের দিকে তাকালে অবাক হতে হয় যে, সেসব দেশ মেধাবী, রুচিশীল, সংস্কৃতিবান, পরিশ্রমী বুদ্ধিজীবী জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে যারা স্বশ্রেণীর স্বার্থে উচ্চাঙ্গের রাজনৈতিক পুস্তক লিখেছেন এবং লিখছেন। শাসনের উচ্চাসনে বসেও এ কাজটি তারা অনেকেই পরিশ্রমের সঙ্গে করেছেন। অন্যদিকে আমাদের মেধাশূন্য, অর্ধশিক্ষিত, অসংস্কৃত শাসক-শোষক শ্রেণী শিল্পচর্চার এই শূন্যতা পূর্ণ করছে পেশিশক্তির চর্চার দ্বারা। এরই মধ্যে নানা কলাকৌশলে ছাপানো যে দু'চারটে পুস্তক বাজারে দেখা যায় সে-সবের গদ্য কেবল অশিষ্টই নয়, রীতিমতো অবিশ্বাস্য মূর্খতায় পূর্ণ। ক্লান্ত রাজনীতিবিদ কিংবা অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের কেউ কেউ ইংরেজির বাংলায় পুস্তক রচনা করছেন। এ সবের ভাষা অত্যন্ত দুর্বল।

এই প্রত্যাশাটা আমরা করতে পারি বাম রাজনীতিবিদদের কাছে। জনগণের মুক্তির ভাষাটি তাদেরই জানার কথা। কিন্তু সেখানেও তেমন একটা আশার আলো দেখা যায় না। তাঁরা যতটা করেন রাজনীতির চর্চা ঠিক ততটা করেন না রাজনৈতিক সাহিত্যের চর্চা। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সাহিত্য চর্চার বিষয়টি ঐতিহ্য হিসেবে গড়ে ওঠেনি। এ বিষয়ে তারা অমনোযোগী। ব্যতিক্রম কেবল মার্কস্‌বাদী হায়দার আকবর খান রনো মার্ক্সবাদী এই শিল্প চর্চার বিষয়টিতে অন্য অনেকের সঙ্গে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর রয়েছে পার্থক্য। তিনি প্রতিনিয়ত যে চর্চা করেন তার প্রমাণ তার ক্রমবিকাশমান গদ্যশৈলী। কেবল কবিতা বা গল্পের ক্ষেত্রেই নয়, প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও অভিধানের মৃত শব্দের শিলাস্তূপ থেকে শব্দ বাছাই করে নিয়ে একজন সৃষ্টিশীল প্রবন্ধকারকেও গদ্যদেহে প্রাণ সঞ্চার করতে হয়।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী চলমান রাজনীতির বহুমুখী সত্যকে নিছক জ্ঞানের বিষয় না করে ভাষার সঙ্গে বিষয় মিশিয়ে রস সৃষ্টিতে সক্ষম। তাঁর প্রবন্ধের গদ্যশৈলী কবিতার মতো অলংকার বহুল। চিন্তার সঙ্গে যুক্তি ও সূক্ষ্ম অনুভবের সঙ্গে যুক্ত করে কৌতূহল। 'দুই বাঙালির লাহোর যাত্রা' প্রবন্ধে পাকিস্তান প্রস্তাবের বিষয়টি লেখক এভাবে বর্ণনা করছেন, 'হক সাহেবের প্রস্তাবটি তাঁর নিজের ছিল না। ধারণা নয়, ভাষাও নয়, সবই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর। মঞ্চে ওঠার আগে প্রস্তাবটি হক সাহেব দেখেনওনি, তিনি তৈরি প্রস্তাব পড়ে দিয়েছিলেন শুধু। বলা তাই সম্ভব যে তিনি এটি উপস্থাপন করেননি, তাঁকে দিয়ে উত্থাপন করিয়ে দেয়া হয়েছে, কণ্ঠ তাঁর, স্বর অন্যের।' (*নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ:* পৃ. ৪৪)। এই গদ্য পাঠক চিত্তে যেমনি কৌতূহল সৃষ্টি করে তেমনি করে কৌতুক। অন্যদিকে 'কণ্ঠ' এবং 'স্বর' শব্দ দুটির গভীর ব্যঞ্জনা

কবিতার মতো হয়ে ওঠে। লেখক গদ্যের শরীরের চিত্রকল্পের আবহ নির্মাণ করে কাব্যের কৌতুক রস পরিবেশনের ভিতর দিয়ে তীব্র শ্লেষ সৃষ্টিতেও দক্ষ। যেমন–'মুসলমান সমাজে মাকড়সার জাল বোনা অনেকটাই চলল; শাস্ত্র নিয়ে তর্ক হলো। পুঁথি সাহিত্যের চর্চা হলো। কিন্তু বুর্জোয়া বিকাশের উদার আলো তেমন দেখা গেল না।' (বেকনের মৌমাছিরা: *নির্বাচিত প্রবন্ধ:* পৃ. ১৬২)

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী যখন দূর বা নিকট অতীতের ইতিহাসের কথা লেখেন তখন তিনি নিছক তথ্য সন্ধানী ঐতিহাসিক ব্যক্তি হয়ে ওঠেন না। নিরাসক্তভাবে সমাজের চালচিত্রও রূপায়ন করেন না। নিষ্পাপ দর্শকের মতো কেবল চোখ ভরে দেখেই যান না। ক্ষুধাতুরের মতো শুধু ইতিহাসের আস্বাদ গ্রহণ করেন না। তিনি ঘটনা বা তার কার্যকারণের উপর আলোকসম্পাৎ করে পাঠককে নিজের বোধের অংশীদার করে নেন। যেমন– ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের কথা তিনি এভাবে বাণীবন্ধন করেন, 'আমি উৎপাটিত নই, আমি বেড়ে উঠবো বৃক্ষের মতো, শেকড় প্রোথিত থাকবে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ভূমিতে, আকাঙ্ক্ষা ছিল এটাও।' (বায়ান্নর আন্দোলন: *নিঃ রাজনৈতিক প্র.* পৃ. ৪১)। গদ্যের এই বাণীভঙ্গিটি আবেগাত্মক অথচ প্রত্যয় দৃঢ় বাণীর মিশ্রণে তৈরি হয়েছে। পাঠকের স্বপ্ন ও উত্তেজনা সত্তার সঙ্গে একাকার হয়ে যায় এই কারণে যে, বিষয়বস্তুর সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিত্বও মিশে একাকার হয়ে গেছে। রচনার সঙ্গে লেখক ব্যক্তিত্বের মেলবন্ধনের বিষয়টি সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর প্রতিটি প্রবন্ধে ছড়িয়ে আছে।

'লেলিন কেন জরুরি' প্রবন্ধে তাঁকে পাওয়া যায় কী অসীম বিশ্বাসে দৃঢ়। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় লেখক চিত্তে ক্ষোভ দুঃখ সৃষ্টি হয় কিন্তু আপন বিশ্বাসকে, ব্যক্তিত্বকে বিপর্যয়ে ঠেলে দেন না তিনি। তিনি লিখলেন, 'যতদিন পৃথিবীতে শোষণ থাকবে ততদিন তিনি থাকবেন। মূর্তি ভাঙলেও তিনি অমর হয়ে রইবেন।....পৃথিবী যদি শোষণশূন্য হয় কখনো, লেনিন তখনও থাকবেন। তখন থাকবেন ইতিহাসের অন্তর্গত হয়ে।' (*নির্বাচিত প্রবন্ধ,* পৃ. ২৭৬)। বাক্যটিতে বা অনুচ্ছেদটিতে কোথাও আবেগের উচ্ছ্বাস নেই, নাটকীয় বাণীবিন্যাসও নেই, রোমান্টিক অলীক স্বপ্নও নেই। আছে বিশ্ববাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে দূরদর্শী মানুষের চূড়ান্ত ব্যক্তিত্বের হিসাব। এই ব্যক্তিত্বই সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে দাঁড় করিয়ে দেয় তাঁর শিল্প মানসে। তাই তাঁর গদ্য হয়ে ওঠে জনগণের শিল্প-সম্পত্তি।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর গদ্যের মধ্যে যে শব্দ ব্যঞ্জনা, সেখানে তাঁর শিল্পের বহুমাত্রিকতা ধরা পড়ে। 'বামদের পারা না-পারা' প্রবন্ধে তিনি এভাবেই সাজান তাঁর বাক্যকে অসাধারণ শব্দ ব্যঞ্জনায়'– উপমাহাদেশের 'বিজ্ঞান' তেমন এগুতে পারেনি। যন্ত্র এসেছে, বিজ্ঞান ততটা আসেনি। তার কারণ গভীরভাবে প্রোথিত ভাববাদ।'(*নিঃরাজঃপ্র,*পৃ.৯৯। বাক্যস্থিত 'যন্ত্র'এবং বিজ্ঞান শব্দ দু'টির বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা পাঠককে গভীর তাৎপর্যের দিকে টেনে

নিয়ে যায়। 'যন্ত্র' আর্থিক উন্নয়ন ঘটায় আর 'বিজ্ঞান' ঘটায় আত্মার উন্নতি। ছোট একটি বাক্য এবং ক্ষুদ্র দুটি শব্দ মিলে লেখক যেভাবে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেন তা কেবল তাঁর শিল্প মেধারই পরিচয় নয়, গভীর জীবন ও সমাজ প্রজ্ঞারও পরিচয়। লেখকের শিল্পের মাধ্যম এই নিজস্ব গদ্য স্টাইলটি ছড়িয়ে আছে তাঁর অপরাপর রাজনৈতিক ধারার প্রবন্ধে। 'বাঙালিকে কে বাঁচাবে', 'দ্বিজাতিতত্ত্বের সত্যমিথ্যা' 'জাতীয়তাবাদের স্বভাব চরিত্র', 'বাইরে বুর্জোয়া ভেতরে সামন্ত', 'সাতচল্লিশের স্বাধীনতা' ইত্যাদি অসংখ্য প্রবন্ধের শিল্প-পোশাক এই গদ্যশৈলী। প্রবন্ধের শিরোনাম নির্বাচনেও লেখককে পাই আমরা অলংকার শাস্ত্রের ঋদ্ধ শিল্পী হিসেবে। 'স্বাধীনতার স্বপ্ন', 'সাম্যের ভয়', 'নোরা, তুমি যাবে কোথায়' বা 'বেকনের মৌমাছি।' –প্রবন্ধের এ ধরনের কাব্যিক নামকরণ অবশ্যই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের নতুন মাত্রা।

রচনার স্টাইল রচয়িতার মানস-ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। সেই ব্যক্তিত্বের কারণেই রচনা হয়ে ওঠে ব্যাকরণ শুদ্ধ, ভাষায় গভীর, বুদ্ধিতে সূক্ষ্ম, চিন্তায় পরিচ্ছন্ন, প্রকাশভঙ্গিতে স্নিগ্ধ। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর রাজনৈতিক ধারার গদ্যের ভাষাটি তাঁর অর্জিত ব্যক্তিত্বেরই প্রতিফলন। সেই ব্যক্তিত্বের কারণেই তিনি তাঁর গদ্যের নির্মাণক্ষেত্রে কারিগরি বিদ্যাটি অর্জন্ করেছেন। তাই তিনি রাষ্ট্র আর সমাজকে নিজস্ব যে কৌশলে পর্যবেক্ষণ করেন, পাঠককেও দেখবার আর বুঝবার সেই ভঙ্গিটি শিখিয়ে দেন। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধকারদের মতো তিনি অর্জিত পাণ্ডিত্য, মেধা, জ্ঞান নিয়ে জনগণের শ্রদ্ধা আর ভক্তির পাত্র সেজে আত্মজ্ঞানের প্রচারক হয়ে নিজেকে অসামান্য করে মানুষের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারেন না। অন্যদিকে ভাবনিষ্ঠ প্রবন্ধকারদের মতো লঘুকল্পনা আর হাস্যরসের রসিকজনও সাজেন না। উভয়ের সংমিশ্রণে তিনি হয়ে ওঠেন আপন ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়ে সৃষ্টিশীল গদ্যের রূপকার। পাঠকের একেবারে চেনা মানুষ। আপন মানুষ। বুর্জোয়া নন, উদারবাদী বুর্জোয়া নন; সামাজিক ন্যায় ও ঔচিত্যবোধের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গণতন্ত্রী অতি কাছের মানুষ।

–২০০১

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : বিকল্প গদ্যের কারিগর

গদ্যের শত্রু-মিত্রের বৃত্তটি রচিত হয় লেখকের নিজস্ব ভাষাশৈলীর কারণে। একজন গদ্য লেখক যখন আপন যাপিত জটিল জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর শিল্পের পটভূমির মানুষের কুয়াশাচ্ছন্ন জীবনকে মিশিয়ে দেন তখন তাঁর গদ্য অভিনতুন রূপ নেয়। তিনি হয়ে ওঠেন বিকল্প গদ্যের কারিগর। সে কারণেই ষাটের দশকের জ্যোতিপ্রকাশ দত্তকে চল্লিশ বৎসর পর আলাদা করার প্রয়োজন পড়ে। সুদীর্ঘ প্রবাস জীবন এবং বিশ্বসাহিত্যের জগতে নিমগ্নতা তাঁকে ষাটের দশকের গদ্য থেকে সরিয়ে এনেছে। বাস্তবে স্বভূমি বিচ্ছিন্নতায় তিনি ক্রমশ শিল্পের পুরাতন দ্বীপকে ক্ষয় করেছেন। কিন্তু অতলান্তিক সমুদ্রে বিলীন হবার পরিবর্তে নতুন দ্বীপভূমি সৃষ্টি করেছেন আপন শিল্পের নতুন আবাসের জন্য। স্বাভাবিক কারণেই নতুন শিল্প-দ্বীপটির গঠনশৈলী জটিল এবং শ্রমসাধ্য। সেই জটিল গদ্যকেই আমি 'বিকল্প গদ্য' বলছি। জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের এই বিকল্প গদ্য সাধারণ পাঠকের কাছে অজানা। বোদ্ধা পাঠক ছাড়া তাঁর গদ্য থেকে 'আনন্দরস' সংগ্রহ প্রায় অসম্ভব। তাই এই বিকল্প গদ্যরীতি বৃহৎ পাঠক সমাজে 'শত্রু-গদ্য' হিসেবে বিবেচিত অনেকটা। এমনটা অতীতে কমলকুমার মজুমদারের বেলায় ঘটেছিল। যদিও কমলকুমারীয় গদ্যের মাত্রা ভিন্ন, জ্যোতিপ্রকাশ থেকে।

আমার অক্ষেপ এই কারণে যে, জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের গদ্যরীতি নিয়ে তেমন কিছু আলোচনা হয়নি। যদি তা হতো তবে নিশ্চয়ই পাঠক সমাজ সেই বিকল্প গদ্যের ভিতর বিস্ময়কর শিল্পের সন্ধান পেতেন। আমি এই প্রবন্ধে একজন পাঠক হিসেবে সামান্য কিছু মন্তব্য করতে চাই। আমি তাঁর অতি সম্প্রতি প্রকাশিত গল্প সঙ্কলন *'প্লাবন ভূমি', 'ফিরে যাও জ্যোৎস্নায়'* ইত্যাদির গদ্যশৈলী বিবেচনা করতে চাই। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি লেখক তাঁর বিকল্প গদ্যের জন্য বিকল্প শব্দও তৈরি করেছেন। এসব বিকল্প শব্দ তৈরিতে তাঁর কারিগরি দক্ষতা অসামান্য। 'দিগ্বলয়হীন জলদ', 'মসীকৃষ্ণ তরল,'

'দিগন্তের কৃষ্ণসীমা', 'ছায়াহীন অতীত', 'কৃষ্ণস্রোত ঘূর্ণি', 'হলুদের সহস্র বিন্দু', 'জ্যোৎস্না চূর্ণ পূর্ণিমা', 'জলবাগান', 'শব্দহীন আর্তনাদ', 'জলপ্রপাতাক্রান্ত' (প্লাবন ভূমি), 'শ্বেতঘূর্ণি', 'নিরালম্ব অনুভব', (ফিরে যাও জ্যোৎস্নায়)– এ ধরনের পদ বা শব্দ লেখকের প্রায় প্রতিটি গল্পেই ছিড়িয়ে আছে। বিস্ময়কর এই যে, এ ধরনের শব্দ বিদেশের পটভূমিকায় লেখা গল্পে খুব একটা পাওয়া যায় না। এখানেই ভাববার বিষয়। আমাদের বিশ্বাস স্বভূমিবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমানুষের শিল্পসত্তা কখনো পরভূমে প্রোথিত হয় না। নিজবাস আর পরবাসের তীব্র বৈরী দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত লেখকের ঠাঁই প্রকৃত অর্থেই জন্মভূমিতে। তাই দেখা যায় সেসব গল্পে লেখকের আত্মসমগ্রতা বার বার ফিরে আসতে চায় গদ্যের ফাঁক দিয়ে। তেমনিভাবে প্রবাস জীবনঘনিষ্ঠ গল্পগুলোতে লেখক নিজের বোধকে আড়াল করতে পারেন না।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের বহু গল্পই স্মৃতিতাড়িত এবং ক্ষত-বিক্ষত চেতনা দ্বারা আক্রান্ত। হারানো মাটির মমতায় আক্ষেপে তাঁর পদতল কাঁটার খোঁচায় রক্তাক্ত হয়েছে। তাঁর বাক্যগঠন চিত্রকল্প নির্মাণ বা উপমা প্রতীকগুলো এভাবেই নতুন গদ্যশৈলী সৃষ্টি করেছে। সেখানে তাঁর ষাটের দশকের গদ্যরীতি যে স্বতন্ত্র লেখক-অন্তর্দ্রষ্টা হিসেবে, তা বোঝা যায়। আমরা লক্ষ্য করি গদ্য কখনো কখনো সাংকেতিক রূপ ধারণ করেছে। আবার কখনো কবিতার মিসট্রিকিজমে ডুবে যেতে চাইছে। মনে হয় একজন নিঃসঙ্গ শিল্পী যেন পথ হাঁটছেন যাঁর চারপাশ অসীম শূণ্যতা এবং নৈঃশব্দতায় পূর্ণ। এ নৈঃশব্দ বিচরণকারী শিল্পীর জন্য তাই আলাদা গদ্যের প্রয়োজন পড়ে– সেকথা আমরা স্মরণ করতে পারি।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের কিছু গদ্যের নমুনা স্থাপন করা যেতে পারে। (ক) ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবশিষ্ট গ্রামবাসীর কেউ তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করেছিল, সে যায়নি। অবশেষে হাওয়ার সঙ্গে অলৌকিক মানুষের শূন্য ভিটের চারপাশে ঘোরার খবর ভিন্নগ্রামে পৌঁছে যায়–(নামহীন ফিরিবে সে নীল জ্যোৎস্নায়) (খ) সুখস্মৃতি কি গ্লানি, হোক দ্রুতপসারী অথবা ধীরগামী, প্রাজ্ঞজন স্থির জানেন, সম্মুখে চিহ্ন রেখে যায় না সর্বদা। কিছু যদি থাকে ফেলে আসা নানা কোঠায়, থাকুক– (দিক চিহ্নহীন); (গ) তার দু'চোখের কোনায় তখন অনেক কথা জমে ওঠে। উঠুক। বলুক সে তার কথা। তারই কথা– (হিমজীবন); (ঘ) বাঁয়ে ঘোলাটে আকাশের গায়ে মহাশূন্য দিয়ে উড়ে যাচ্ছে পারাপারের সেতু- (ছায়া দাও); (ঙ) নিজ বক্ষের সব শিখা নিভে গেছে। সে যদি পারে জ্বালাক। খরস্রোতা নদীর শেষ মাথায় দগ্ধাবশেষ কুটিরটিতে সে যদি ফিরতে চায় ফিরুক- (ফিনিক্স); (চ) কিন্তু ঐ গভীর রাত্রিতে কাকে কী জিজ্ঞাসা করব আমি? কাছে গিয়ে কীইবা দেখার আছে? কাকে বলবো আমি কে?–(নীলরাত্রি)

এ-ধরনের বাক্য তৈরির মূলে রয়েছে লেখকের বিশ্বপ্রসারী দৃষ্টি। পাঠক হিসেবে বিশ্বসাহিত্যের শিল্পরীতি দ্বারা লেখক তাড়িত, অনুপ্রাণিত। কেননা

বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত গদ্যরীতির সঙ্গে লেখকের বিচিত্র পথ বিচরণ একটি দ্বন্দ্বময় অবস্থান সৃষ্টি করেছে। দেখা যাবে গল্পগুলোর ঘটনার বাস্তবতা, চরিত্রের বাস্তবতা আমাদের চেনাজানা হলেও লেখকের রূপসমগ্রতা একেবারেই আলাদা। বোধকরি আলাদা বলেই প্রান্তিক জনজীবন নিয়ে গল্প বানাতে গিয়ে তিনি রাজনৈতিক তত্ত্বকথার কাছে অসেন না। তাঁর গল্পে রাজনীতি জড়াজড়ি করে থাকে জীবনের উপলব্ধির সঙ্গে। পাঠককে তিনি ধরা দেন না, খুঁজে নিতে হয় মননের দ্বারা। জ্যোতিপ্রকাশের গল্পে ক্ষুধার কথা আছে, জীবনসংগ্রামের কথা আছে, শরীরী আবেদনের বিষয়ও আছে, কিন্তু মাত্রা ভিন্ন। এই ভিন্নতা সৃষ্টি করেছে তাঁর বিকল্প গদ্যরীতি। তাঁর গল্পে 'জ্যোৎস্না' শব্দটির বারবার ব্যবহার ইঙ্গিত করে অজানা রহস্যের কৌতূহল। জ্যোৎস্না অবশ্যই আলো। কিন্তু সে সূর্যের আলো নয়। সূর্যের আলো দিবসের কোলাহল সৃষ্টি করে কিন্তু জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে দেয় রাতের নির্জন স্তব্ধতা। সেই স্তব্ধতায় অন্ধকার নেই অথচ থাকে লৌকিকতার ভাঁজে ভাঁজে অলৌকিকতা। জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের গল্পে গদ্যও তেমনি জ্যোৎস্নাময়ী এবং লৌকিকের ভেতর অলৌকিকতার ভিন্ন ব্যঞ্জনা। গদ্যের এই রহস্যময়তাই সাধারণ পাঠকের কাছে 'শক্ত-গদ্য' বলে বিবেচিত।

প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, লেখক কেন এ ধরনের গদ্যে আশ্রয় নিলেন? এর উত্তর পাওয়া যায় 'প্লাবন ভূমি' গল্প সংকলনের ফ্ল্যাপে। 'আমি ব্যাখ্যা ছড়িয়ে রাখব কাহিনীর আর কিছু আভাস-ইঙ্গিত গল্পের, পাঠকের দায় এখন গল্পটি নির্মাণ করে নেয়া'– যদি এটি লেখকের জবানী হয় তবে প্রশ্ন উঠতে পারে পাঠক কি লেখকের কাছে দায়বদ্ধ? আমরা জানি গল্পের পাঠক তার বোধের বৃত্তের ভেতরই লেখকের গল্পটিকে নিজের করে নেন। পাঠক নিশ্চয়ই কাহিনী বা অস্পষ্ট কাহিনীর ভিতর থেকে কোনো না কোনো সত্য খুঁজে পান। সেই সত্যের কাছে পৌঁছার সিঁড়ি হচ্ছে গদ্য।

গদ্যের পথ হতে পারে আঁকা-বাঁকা বা বন্ধুর। পাঠকের প্রাপ্তি কেবল সত্যের কাছে পৌঁছাই নয়। তিনি যখন হাঁটেন তখন চারপাশের পরিবেশকেও দেখেন এবং কৌতূহল অনুভব করেন। গদ্যের কাজ হচ্ছে কৌতূহল সৃষ্টি। সেই কৌতূহলের সিঁড়ি মাড়িয়ে কাহিনীর মানুষ, তার মন, ইতিহাস, যাপিত জীবনের ভেতর প্রবেশ করা পাঠকের দায়। আমাদের মনে হয় এমন দায়িত্বভার বহনের মতো মেধাবী বোদ্ধা পাঠকশ্রেণী এখনো এ দেশে তৈরি হয়নি। কমলকুমার মজুমদারের জন্যও তাঁর স্বকাল তৈরি ছিল না। নিজের কালের চেয়ে তিনি অগ্রগামী ছিলেন বটে। জ্যোতিপ্রকাশের বেলায়ও এমনটা বলা যায়। তাঁর গল্পে মুক্তিযুদ্ধ আছে, সমকালীন মানুষের সুখ-দুঃখের কথা আছে। আছে দারিদ্র্যের পীড়নচিত্র। কিন্তু সেগুলো কাহিনীর আকার নিয়ে আসে না, আসে ইংগিতে গদ্যের বিকল্প শব্দ বা বাক্যের মধ্য দিয়ে। সেই শব্দ, বাক্য, উপমা, চিত্রকল্প ধরতে না পারলে জ্যোতিপ্রকাশের জগতে পৌঁছা কঠিন।

আমার মনে হয় এক ধরনের বেদনাবোধ জ্যোতিপ্রকাশের মধ্যে লুকোচুরি খেলে। দীর্ঘ প্রবাস জীবন, জন্ম মাটি থেকে শেকড় উৎপাটন, পূর্ব ও পশ্চিমের সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব তাঁকে গোপনে ক্ষত-বিক্ষত করে। তাই তিনি শেকড় প্রোথিত করতে চান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মাটির সঙ্গে। নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্ব, সমাজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব তাঁকে বিচলিত করে। দীর্ঘ প্রবাস জীবনকে অতিক্রম করে মাটির কাছে ফিরে আসতে চান তিনি। কিন্তু পারছেন না। তাঁর আত্মকথনমূলক গল্পগুলো তারই প্রমাণ। এ সবকিছু মিলিয়েই তিনি জটিল দ্বন্দ্বের দ্বারা বিক্ষত হন প্রতিনিয়ত। তাঁর গদ্যের রহস্যটি সেখানেই রয়েছে লুকিয়ে। ঠিক যখন নস্টালজিয়ার সুরে কথা বলেন তখন বেদনায় আপ্লুত হন তিনি, গদ্যও সেখানে আক্রান্ত হয়ে ভিন্ন মাত্রা নেয়। নিজের নস্টালজিয়াকে লেখক অন্তরালবর্তী করে রাখেন খুলে বলেন না। সেই দায়টা তিনি ঠেলে দেন পাঠকের কাছে। অন্তর্ভেদী পাঠকের কাছে তিনি মোটেই দুর্জ্ঞেয় নন। তখন সেসব পাঠকের সঙ্গে তাঁর সখ্য হয় সেই জটিল গদ্যের পথ ধরেই। বিকল্প গদ্যে তাই তিনি কথা বলতে চান পাঠকের সঙ্গে। স্বর অনুচ্চ কিন্তু গম্ভীর।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের গদ্য ধারণ করে যে সমাজ ও তার মানুষ, তারা আমাদের অপরিচিত নন। কিন্তু তাদের মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধিকে চেনা যায় না বলেই লেখক সেই জটিল বিষয়টিকে তুলে আনেন ভিন্নমাত্রার শিল্পে। লেখক সরাসরি না দেখে অনেকটা উঁকি দিয়ে দেখেন সার্চলাইটের আলো ফেলে। ঠিক এই কৌশলের কারণেই খোলা মাঠে গাছ দেখার বদলে গভীর সমুদ্রে অনুসন্ধানী ডুবুরির আলোর মতো রহস্যময় হয়ে ওঠে লেখকের গদ্য। এ ধরনের একটি গদ্যের উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে, 'ঠিক তখনই দ্বিতীয়ার চাঁদ মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। স্পষ্ট দেখে সে হাতের ডাইনে মাঠভরা বিবর্ণ রবিশস্য, সামনে আবার বালিয়াড়ির নকশা, সে কেবল মুহূর্তমাত্র, তারপরে মাটির দেয়ালের দিকে মুখ করে পড়তে থাকে'– (ফিরে যাও জ্যোৎস্নায়)। গল্পের ঘটনার ভেতর অনুঘটন, চরিত্রের অনুভূতির গন্তব্যের আরো অজানা গভীরে বর্ণনাটি পাঠককে পথ দেখিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলে। মেঘের আড়াল থেকে চাঁদের আত্মপ্রকাশ, মাঠের বিবর্ণ রবিশস্য, মাটির দেয়ালের দিকে মুখ– এসব অনুবাক্য লেখকের বর্ণনা কৌশলকে রিয়েলিজমের ভেতর অদৃশ্য মিস্ট্রিকিজমে টেনে নিয়ে পাঠককে অন্তর্প্রতিক্রিয়ায় ফেলে দেন। সেই জগতে লেখক নিঃসঙ্গ পথিক থাকতে চান না বলেই পাঠককে সঙ্গী করেই স্বদেশ ও তার জনজীবনের ঠিকানায় ফিরতে চান। যদি না ফেরা যায় এমনি সংশয় ফুটে ওঠে তাঁর বিকল্প গদ্যের মিস্ট্রিক ব্যঞ্জনায়।

পাঠক হিসেবে আমরা প্রত্যাশা করি জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের বিকল্প গদ্যের পাঠকবৃত্ত বৃদ্ধির। এটি এ কারণে অপরিহার্য যে, বাংলা গদ্যের ঐতিহ্য স্রোত বেগবান নয়। ভাষা ব্যঞ্জনার বিশ্বায়নের এই যুগে আমাদের গদ্যের অস্তিত্বের অধিকার এর ফলে আরো সাহসী হয়ে উঠবে। এ না হলে বাংলা গদ্য পিছিয়ে

পড়বে। কাহিনীর রূপকথাটুকুই থাকবে, গদ্য থাকবে না। অথচ গদ্য না থাকলে গল্প হয়ে যায় গপ্পো, সাহিত্য হয় না। সাহিত্য তখনই হয় যেমন– 'ফিরে যাও জ্যোৎস্নায়' গল্পের উদ্ধৃতাংশটির আরো গভীরে ঢুকে যাই যদি তা হলে আর একটি জগতের সাক্ষাত পাই। পুরো গল্পটিকে বাদ দিয়ে যদি কেবল আমরা উদ্ধৃতাংশের দিকে মনোযোগী হই তবে জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের সূক্ষ্ম জটিল কারিগরি বিদ্যাকে ধরতে পারব। মাত্র দুটো বাক্যের গভীরে লুকিয়ে আছে একটি অনুগল্প বা তার ভ্রূণ। এখানে একটি মানব চরিত্র আছে। আছে প্রকৃতি এবং মানবটির মনস্তত্ত্বের বিকার। এ সবকিছু রয়েছে মানবদেহের জটিল কোষ বিভাজনের মতো পরস্পর জড়াজড়ি করে। আর এই জটিল কোষ গ্রন্থিটি সৃষ্টি হয়েছে লেখকের গদ্য প্রকৌশল বিদ্যার দ্বারা। দেখা যাবে ঘটনাংশের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে তার অন্তর্গত ভাবসূত্র।

মানুষের বহির্জীবনকে ফুটিয়ে তুলে অন্তর্জীবনের ভেতর প্রবেশ করা বাংলা গল্পের প্রচলিত রীতি। অথচ জ্যোতিপ্রকাশ সে পথে হাঁটেন না। তাঁর কৌশল হচ্ছে তিনি গল্পের ঘটনা বা চরিত্রের অন্তর্জীবনে প্রবেশ করেন কলম হাতে নিয়েই। তারপর সেই অন্তর্জীবনের অনুগামী করে দেন বহির্জীবনকে। আমার মনে হয় তাঁর বিকল্প গদ্যের জন্য এটিই প্রকৃত পথ। কিংবা ওই গদ্যটি ভিন্ন বিকল্প শব্দপ্রযুক্তিও অসম্ভব। ব্যঞ্জনা সৃষ্টি তো নয়ই।

–২০০২

বাঙালির সাহিত্যে সমুদ্র

যেকোনো জাতির মতো বাঙালির ভূগোল তার জনগোষ্ঠীর ইতিহাসকেও প্রভাবিত করেছে। পললভূমি, শস্যভূমি, বনভূমি, ইত্যাদি শব্দরাজি যেমনি জাতিটির জীবনের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়েছে তেমনি তার সংস্কার-সংস্কৃতিতে উদ্ভব ঘটেছে ভূমিদেবতা, শস্যদেবতা ইত্যাদি দেবদেবী। অন্যদিকে নদীমাতৃক, নদী মেখলা ইত্যাদি শব্দগুলোতে জাতিটির ইতিহাসকেই নিয়ন্ত্রণ করেছে। নদী কখনো এসেছে মাতৃস্নেহের রূপ নিয়ে, কখনো প্রিয়ার কটিভূষণ (মেখলা) হয়ে। বাঙালি চিরকাল প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে খুঁজেছে শান্ত নদীর স্রোতে, পদ্ম-শাপলার বিল-ঝিলে, ঋতু প্রভাবিত শস্যক্ষেতে কিংবা বসন্তের অরণ্যে। দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতমালা অথবা অপার সমুদ্র বাঙালির চিন্তভাবনায় স্থান পায়নি। বাঙালির ভূগোল সমুদ্র বেষ্টিত দ্বীপভূমি না হলেও বদ্বীপ বা সমুদ্রশায়ী নব্যভূমির অংশ। তবু কেন তার দৃষ্টি পর্বত বা সমুদ্রের দিকে প্রসারিত হলো না তা রহস্যময়। কেন সে চিরকাল সমুদ্র কিংবা পর্বতকে ভয় পেয়েছে সে বিষয়টিও চমকপ্রদ।

সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাঙালি সাহিত্য সৃষ্টি করে এসেছে। চর্যাপদের দিকে তাকালে আমরা যে উঁচু ভূমির দেখা পাই তা আসলে ক্ষুদ্র টিলা বা পাহাড়। ওখানে সমুদ্র নেই। মহাসাগর নেই। সেই শবরী বালিকা পুষ্পিত টিলা চেনে। সে চেনে না দুর্গম পর্বত কিংবা গর্জনশীল সমুদ্র। তার গলায় গুঞ্জার (কুঁচফল) দ্বারা তৈরি মালা শোভা পেলেও সাগর ঝিনুকের অলংকার নেই। পদাবলির রাধা যে যমুনা পাড়ি দেয় তা আসলে খাল। চর্যাপদে তো নৌকা-নদী আছে, সাগর নেই।

লোকসাহিত্য নিয়ে বাঙালির রয়েছে বাড়াবাড়ি রকমের অহংবোধ। সেই লোকসাহিত্যে যে সমুদ্র, সমুদ্দুর, সাগর, সায়র বা দরিয়াকে পাই তা বর্ষা প্লাবিত নদী বা হাওড় বৈই কিছু নয়। ময়মনসিংহ গীতিকার জলযাত্রার বিবরণ পাঠ করলে এই ধারণাই জন্মে। তাই বাঙালির রূপকথার দৈত্য বেরিয়ে আসে

জঙ্গল থেকে। সে মোটেই উত্থিত হয় না সমুদ্র-মহাসমুদ্র কিংবা অজানা কোনো দ্বীপ থেকে। গ্রিক তথা ইউরোপিয় প্রাচীন মহাকাব্য বা সাহিত্য তৈরি হয়েছে সমুদ্রকে নিয়ে। ওখানে রয়েছে সমুদ্রদেবতা। দানবও উঠে আসে সমুদ্র থেকে কিংবা ভয়ংকর কোনো দ্বীপ থেকে। সেই সমুদ্রকে কেন্দ্র করে যে যুদ্ধ সেখানে মেলে জাহাজের কথা। আমাদের আছে কেবল ছোট নৌকা। সর্বকালেই ইউরোপ বা আমেরিকান সাহিত্যে সমুদ্রই নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। আমাদের সাহিত্যে আমরা ক্ষুদ্র জলাশয়ে চণ্ডিদাসকে বড়শি নিয়ে অপেক্ষা করতে দেখি রজকিনীর প্রত্যাশায়। কিন্তু পাই না আরনেস্ট হেমিংওয়ের সেই বৃদ্ধ মৎস্য শিকারীকে দুর্জয় সাহসে যে অসীম সমুদ্রে বিহার করে।

বিবেচনা করা যেতে পারে ঔপনিবেশিকতার বিষয়টি। বাঙালি তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বড়জোর গ্রামান্তর হয়েছে কিংবা শান্ত নদী পাড়ি দিয়ে দেশান্তরের নামে ১০/২০ মাইল দূরে চলে গেছে। তাই তার সাহিত্যে রবিনসন ক্রুশোরা থাকে না। সমুদ্র-যুদ্ধ থাকে না। দ্বীপভূমি বিজয়ের কথা থাকে না। মহাদেশ আবিষ্কারের কথা তো ভাবাই যায় না। একই কারণে বাঙালির মহাকাব্য নেই। আছে কেবল গীতিকাব্য। মাইকেলের রাম-রাবণ তো বাঙালির নয়। তাও তাঁর কাব্য আধুনিক কালের রচনা। ভাষাটাই কেবল বাঙালির।

সেন রাজাদের স্মৃতিশাসন থেকেই বাঙালির সর্বনাশের যাত্রা শুরু। আজকের এই অতি আধুনিক যুগে মৌলবাদের শেকড় তো ওই স্মৃতি আর শাস্ত্রশাসন যুগেরই ধারাবাহিকতা। সেই স্মৃতিশাসনেই বাঙালির জন্য ধর্মমতে নিষিদ্ধ হয় সমুদ্রযাত্রা। এর ধারাবাহিকতা চলে ইংরেজ যুগ পর্যন্ত। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্মে আশ্রয় না নিলে ঠাকুর পরিবারের সন্তানেরা কি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিলেত যেতে পারতেন? রবীন্দ্রনাথের কথাই বলি কেন, রামকৃষ্ণের অনুসারী না হলে বিবেকানন্দকে সমুদ্র পাড়ি দিতে দেখা যেত কি?

বাংলার প্রাচীন যে তান্ত্রিক মতবাদ, সেখানে আছে এক ধূসর জগৎ। তন্ত্রশাস্ত্রে অগ্নিভীতি, রাজভীতি, প্রেতভীতি, মৃত্যুভীতি ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে পাওয়া যায় 'সমুদ্রভীতি' শব্দটি। পালি-সংস্কৃত সাহিত্যের জাতকের কাহিনীতে সমুদ্র যাত্রার কথা আছে। বাংলার প্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্তি থেকে সুবর্ণদ্বীপ বা সিংহল যাত্রার কথা পাওয়া যায়। পর্যটক ফাহিয়েনের বর্ণনায়ও সমুদ্র যাত্রার কথা মিলে। পরবর্তীকালে বাঙালির মঙ্গল কাব্যের বাণিজ্য যাত্রা তো অতীতের পুটুনি বনিকদের খাল-নদী পথে হাট-বাজার যাত্রা, নিজেদের ছোট গয়না নৌকায় স্মৃতি মাত্র। বাংলার প্রাচীন বন্দরের সঙ্গে বাঙালির কতটা সংস্রব ছিল এবং বাণিজ্য জাহাজের নাবিক-পেশা তারা গ্রহণ করেছিল কিনা এটিও বিবেচনার বিষয়। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধপেশা, বৈশ্যের ব্যবসা যেখানে ব্রাহ্মণের পেশার

তুলনায় ছিল নিকৃষ্ট সেখানে বাঙালির সমুদ্রযাত্রা বা যুদ্ধযাত্রাও অগৌরবের। বাঙালি রাজারা বড়জোর পার্শ্ববর্তী রাজ্য (ক্ষুদ্র) জয় করেছে, সমুদ্র পাড়ি দেবার চেষ্টা করেনি। তারা মৃগয়ায় গেছে কিন্তু পর্বত অতিক্রম করেনি। দিগ্বিজয় বাঙালির রক্তে ছিলনা বলেই মনে হয়।

কৃষিনির্ভর গ্রামকেন্দ্রিক জীবনচর্চায় বাঙালি ছিল আবদ্ধ। উর্বর ভূমির সন্ধান করেছে তারা নিস্তরঙ্গ নদী বা জলাশয়ের তীরে। চারদিকে শস্যভূমি, মধ্যে উঁচুভূমিতে বাঙালি বানিয়েছে আবাসভূমি। কৃষিক্ষেত্র বেষ্টিত অনড় জীবন বাঙালিকে করেনি সাহসী, বানায়নি দূরদৃষ্টির অধিকারী। তাই তারা কখনো ঔপনিবেশিক জাতিতে পরিণত হতে পারেনি। উপনিবেশের জন্য প্রয়োজন যে নৌযান বা সমুদ্র তার সঙ্গে বাঙালি পরিচিত হয়নি। তাই বাঙালির কাছে বাহিরাগত শক্তি ছিল যাবনিক, রাক্ষস কিংবা দেবতা; মানুষ্য নয়। সাহিত্য যে এসব বস্তুবিষয়কে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। বাঙালির জীবন ছিল এসব অভিজ্ঞতার বাইরে। বাঙালির নাগালে ছিল যে উপসাগর তার প্রতিও আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না। চাটিগাঁ বন্দর তো চিরকালই প্রভাবে রেখেছে বহিরাগত বণিকেরা।

ওই যে নব্যভূমি জেগে ওঠে দক্ষিণের উপসাগর (সমুদ্র/মহাসাগর নয়) তীর ধরে পলি জমে, তার সংবাদ বাঙালির বহু পূর্বেই জানত বিদেশি বণিকেরা। সাগরপাড়ে বাঙালি গেল কৃষিভূমির সন্ধানে তখনই, যখন ভূমির অভাবে পতিত হলো তারা। বাঙালি সাগরতীরে গিয়ে নৌযান বানাল না, গাছ কেটে বানাল লাঙল। সাগরের বিশালত্ব, গর্জনশীল ঢেউ, অনন্তপ্রসারী স্রোত বাঙালিকে ভয় দেখিয়েছে। তাই তারা তাকে ভক্তি করতে শিখল, জয় করতে নয়।

ইউরোপের সাহিত্য তো গড়ে উঠেছে সমুদ্রকে নিয়ে। আজো, কি কাব্য কি কথা সাহিত্য, সমুদ্র হচ্ছে শিল্পভূমি। ইউরোপীয়রা সমুদ্র জয় করেই উপনিবেশ গড়েছে এবং বাণিজ্য সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার করেছে। বাঙালির কাছে চিরকালই সমুদ্র থেকেছে অজ্ঞাতে। সমুদ্রের বিশালত্বের সঙ্গে বাঙালির মৈত্রী গড়ে ওঠেনি বলে তার চিত্তের প্রসার ঘটেনি। প্রাচীন বা মধ্যযুগ আড়ালেই থাকল, আধুনিক যুগের আদি পর্বে এসেও এই জাতি সমুদ্রকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করল না। তাই বাংলা সাহিত্যে সমুদ্রযুদ্ধের কাহিনী নেই, সমুদ্র অভিযাত্রার নায়ক নেই।

উর্বর শস্যভূমির রহস্য, ছয়টি ঋতুর মোহাচ্ছন্নতা বাঙালিকে বারবার টেনে নিয়েছে রাধার বিরহের হাহাকারের কাছে, বাউলের নিরাসক্ত জীবনবোধের কুয়াশায়। তাই এটা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যে জাতি অনন্তপ্রসারী সমুদ্র পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করেনি, দুর্গম গিরিশৃংগের সীমানা অতিক্রম করেনি নতুন

অভিবাসনের সন্ধানে, যে জাতি উচ্চতর সাহিত্যও নির্মাণে বঞ্চিত থেকেছে। তাই আমরা পাই *অন্নদামঙ্গল কাব্যের* ঈশ্বরী পাটনিকে। সেই পাটনি তো অলৌকিক শক্তির দেবীর আশীর্বাদ চায়। দেবীর পদ স্পর্শে তুচ্ছ কাঠকে সেউতিকে সুবর্ণে রূপান্তরের স্বপ্ন দেখে। আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অজানা দ্বীপে হীরক খনির সন্ধান পায় না তাই ঈশ্বরী পাটনি। সে পাটনি হয়ে থাকে, নাবিক হতে পারে না। ওটা সাহসের বিষয়। মৃত্যুকে তুচ্ছ করে বৈরিতার বিরুদ্ধে বিজয়ী হবার উচ্চতর মানবিক গুণের বিষয় বটে।

যিনি আমাদের উপন্যাস লিখতে শিখিয়েছেন তিনিই হচ্ছেন বঙ্কিমচন্দ্র। সুন্দরবনের উপকূল নিয়ে তিনি নায়ক বানালেন নবকুমারকে। নবকুমার সমুদ্র বিজয়ী নয়, তীর্থযাত্রী। গঙ্গাসাগর অবশ্যই সাগরের তীরবর্তী কিন্তু তা উত্তাল নয়। নবকুমার সমুদ্রস্নানের ভেতর পুণ্য খোঁজে, সমুদ্রকে জয় করতে জানে না। তাই জোয়ারের অপেক্ষায় থাকে। সেই জোয়ারের কারণেই সহযাত্রীদের হারায়। উপকূলে দাঁড়িয়ে সে যে সমুদ্রকে দেখে তা বিস্ময়ের, রহস্যের, ভয়ের, ভক্তির। শরৎচন্দ্রের বার্মাযাত্রার কাহিনীতে গভীর সমুদ্র নেই। উপসমুদ্র। উপকূল মাত্র। সেই যে জাহাজ তাও ইংরেজের। যাত্রীরা চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত। রবীন্দ্রনাথের কবিতার বা পত্রাবলিতে যে সমুদ্র আছে তাও ভক্তির, বিস্ময়ের আর দুর্জ্ঞেয় দর্শনের।

বোধকরি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমুদ্রকে একটু ভিন্ন মাত্রায় দেখতে চেয়েছেন। তাঁর 'পদ্মা নদীর মাঝি'র হোসেন মিঞা বাংলা সাহিত্যের ভিন্নধর্মী চরিত্র এককভাবে। এই হোসেন মিঞার দূরবীণ আছে, বহুদূরে দেখতে পায় সে। তার ময়নাদ্বীপ আছে। সে উপনিবেশবাদী। তার চরিত্রে উপনিবেশবাদের কূটচাল আছে। সে অনেক কিছু বুঝে। কিন্তু তার স্বার্থটাও নিখাঁদ পুঁজিবাদী বাণিজ্যিক স্বার্থ নয়; সামন্তবাদী। কেননা সে ময়নাদ্বীপে শস্যভূমি (উর্বর) উদ্ধার করতে আগ্রহী। অর্থাৎ নয়া জমিদার হতে চায় সে। তা ছাড়া তার সমুদ্র যাত্রাও গভীর নয়, উপকূলের অদূরবর্তী কোনো ছোট্ট জনবসতিশূন্য দ্বীপ। শহীদুল্লা কায়সারের 'সারেং বৌ' প্রকৃত অর্থে কদম সারেং-এর স্ত্রী নবিতুনের শূন্যতা ও অস্তিত্বভীতির কথকতা। নবিতুন ভূমিসংলগ্ন নারী। তার স্বামী নাবিক। কিন্তু সেই কদম তো অন্যের জাহাজে শ্রম দেয়, অর্থ পায়। সে দুঃসাহসী রবিনসন ক্রুশো হতে পারে না। প্রকৃত অর্থে লেখক মনোযোগী ছিলেন নবিতুনের প্রতি, তাই অজ্ঞাতেই থেকে যায় কদমের সমুদ্র সম্ভোগের ইতিহাস। তাছাড়া দক্ষিণবঙ্গের উপকূল অঞ্চল বা ক্ষুদে দ্বীপ নিয়ে সেলিনা হোসেন, আবুবকর সিদ্দিক এবং আরো অনেকে লিখেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রস্থানভূমি মহাসাগর নয়। অর্থনৈতিক কঠিন সংগ্রাম বা ভূমিসংলগ্নতা যা

বাঙালির রক্তে ছড়িয়ে আছে; তারই মর্ম উদঘাটন এসব সাহিত্যে উদ্দেশ্য। অবশ্যই সে সব সাহিত্য মহৎ। শিল্পীর মহৎ চেষ্টা।

আধুনিক বাঙালির চট্টগ্রামের মত আন্তর্জাতিক নৌবন্দর থাকলেও পুঁজি নেই, জাহাজ নেই, অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটানোর মধ্যে পণ্যও নেই। বাঙালি অন্যের জাহাজে শ্রম ভাড়া দেয়। অন্যের জাহাজ ভাড়া করে পণ্য আমদানি করে। গভীর সমুদ্রে তলদেশের তেল গ্যাস বা অপরাপর সম্পদের খবর জানে না। জানার উপায় নেই। ভিনদেশী সমুদ্র বিজ্ঞানীদের বিস্ময়কর আবিষ্কার বা অভিজ্ঞতা তারা অলস বিছানায় শুয়ে উপভোগ করে টিভির রিমোট টিপে। তাই তার সাহিত্যে মহাসমুদ্রের গর্জন নেই। সমুদ্র বিজয়ী মহানায়ক নেই। এই ব্যর্থতা, এই শূন্যতার জন্য দায়ি কবিরা নয়। লেখকরা নয়। অবশই দায়ি তার ভূগোল। সেই ভূগোল যে নিয়ন্ত্রণ করে সাংস্কৃতিক জীবন। সেই ভূগোল তো বাঙালির দিগ্বিজয়ের ইতিহাস গড়তে দেয়নি। উর্বর শস্যভূমি, শান্ত নদী, বসন্ত -হেমন্ত ঋতু বাঙালিকে সংসার নিরাসক্ত বাউল বানায়, তান্ত্রিক বানায়। পদাবলি, ভাটিয়ালি, মারফতি, কীর্তন গানের সুর ও কথায় জীবনের প্রতি অমনোযোগী হয় বাঙালি। উপকূলীয় নদী বা সমুদ্রের ভাঙনে সব হারিয়ে ভয়ার্ত বাঙালি পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে চায় দুর্গম অরণ্যের পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন অন্ধকারে। দূরবর্তী দ্বীপের সংগ্রামী জীবনের উপনিবেশের চেয়ে বাঙালি খোঁজে পার্বত্য অরণ্যের নিরাপদ জীবন। তাই তার সমুদ্র সম্ভোগের সাহিত্য নেই। নাটক নেই। কাব্য নেই। চিত্রকলাও নেই।

বাঙালির বিজ্ঞান এগোয়নি। রাজনীতিও নয়। ভূতের পেছনে হাঁটার মতো হাঁটে বাঙালি। ইহজাগতিকতা বুঝি জাতিটির রক্তে নেই। চিত্তে নেই। চিন্তায় নেই। বাঙালি, সে অতীতমুখী। অতীতের অন্ধকারে, প্রতিক্রিয়াশীলতার বিবরে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চায়। তাই সে জীবনবিমুখ হতাশাবাদী। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ অজ্ঞাত বাঙালি অধ্যাত্মবাদের ভেতর মুক্তি খোঁজে। আধুনিকতা, ইহজাগতিকতা, বিজ্ঞানমনস্কতার সঙ্গে যে ভোগবাদী জীবনের সম্পর্কটা আকাশ-পাতাল তার বিপুল অংশ মানুষই ধরতে অক্ষম। বাঙালি-চিত্তের এই দারিদ্র্য যেন বহু শতাব্দীর ধারাবাহিকতা।

যদি বাঙালি-জীবনের সঙ্গে সমুদ্র-মহাসমুদ্রের সংযোগ ঘটত, যদি বাঙালি উপনিবেশিক শক্তিতে বিকশিত হবার মতো জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উত্তরাধিকারী হতো তবে আজ তার সাহিত্যভাণ্ডারের রূপও থাকত ভিন্নতর। অন্তহীন মহাসমুদ্র, অতলান্তিক জলধারা কিংবা তুষার আবৃত শৈলমালার পাশে দাঁড়ালে মানুষের মনে শিল্পসৃষ্টির যে আনন্দ-বেদনা সৃষ্টি হয়, বাঙালি তার সঙ্গে পরিচিত নয়। চারদিকে সমুদ্রের গর্জন, মাথার ওপর প্রচণ্ড তুষারঝড়, এই যে কঠিন নিষ্ঠুর বৈরি প্রকৃতি তার বিরুদ্ধে অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বাঙালির

নেই। প্রকৃতিকে জয় করার মধ্য দিয়ে যে আত্মশক্তি আর বিশ্বাস লাভ করে মানুষ, সেই শক্তি থেকে এই জাতি বঞ্চিত। তাই তার সাহিত্যে ইংরেজদের শেকসপীয়রের ক্যালিবান, এরিয়েল বা প্রসপেরোর মতো চরিত্র মিলে না। তাই উর্বর সমতল শস্যভূমির মাটিতে জন্মে না ডারউইনের মতো যুক্তিবাদী সমুদ্র তথা জীববিজ্ঞানী। জন্মে না ইডিপাসের মতো অভিশপ্ত ভাগ্যবিড়ম্বিত অসুখী নায়ক।

যে জাতি মহাসমুদ্রকে চেনে না সে জাতির সাহিত্যভাণ্ডারে কী করে সঞ্চিত হবে মহাকাব্যের যুগ, পৌরাণিক কাহিনীর যুগ। সে জাতিকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় মঙ্গল কাব্যের যুগকে নিয়ে। মহাসমুদ্রহীন ভৌগোলিক এই বঞ্চনায় প্রবঞ্চিত বাঙালি কী কোনো দিন পাবে অপার অথৈ সমুদ্রের মতো অনন্তপ্রসারী শিল্পের সন্ধান?

মিথ-পার্শ্বক্রিয়া : সমাজ ও সাহিত্যে

ইংরেজি অভিধানে Mith সম্পর্কে বলা হয়েছে a story from ancient times (early history) something that many people believe but that does not exist or is false. অথবা সমার্থক Legend সম্পর্কে বলা হয় a story from ancient times about people and events, that may or may not be true. অন্যদিকে মিথ যাদের ওপর আরোপ করা হয় তারা হতে পারে heroes of myth অথবা mythical beats.

দৃষ্টির অগম্য বহুদূরবর্তী কুজঝটিকায় আচ্ছন্ন থাকে সেই মিথের জগৎ। সেই যে মিথের ধূসর রাজ্য সেখানে বুঝি ইতিহাসের শুরু নেই। শেষও নেই। পৌরাণিক কল্পকাহিনীর সেই মানস জগৎ বা রহস্যকে কিন্তু বিজ্ঞান কিংবা অবিজ্ঞান কোনো প্রান্তেই ঠেলে দেয়া যায় না। বহুদূরের রহস্য ঘেরা প্রত্নিদর্শন নগর সভ্যতা কিংবা আদিম অরণ্যসমাজ থেকে আজকের অতি আধুনিক সমাজ পর্যন্ত মিথের একটা যোগসূত্র পাওয়া যায়। হ্যাঁ, সেই কল্পনা। মানুষের কল্পনার জগৎ। আদি মানুষ বিজ্ঞান চিনল না কিন্তু কল্পনা করতে শিখল। সেই কল্পনাই অলৌকিক বিশ্বাসের সৃষ্টিভূমি। তা না হলে কেমন করে আসে উড়োজাহাজের বদলে আকাশ-রথ, পৌরাণিক উড়ন্ত অশ্ব, ডানাওলা পরী কিংবা পাতালের নাগরাজত্ব? সেখানে বিজ্ঞানের যুক্তি নেই, বুদ্ধি নেই। অবশ্যই ছিল কল্পনা। অনেকটা আজকের বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর মতো।

এই কল্পবিজ্ঞান তো পৌরাণিক মিথেরই নতুন প্রজন্ম। প্রাচীন গ্রিকদের দেবদেবী আর ভারতীয় পুরাণের দেবদেবীরা কিংবা মিশরীয় দেবতারাও তো একই পরিবারভুক্ত। মানুষের কল্পনা, বিস্ময়কর ক্ষমতার কল্পনা, কৌতূহল, অদম্য ইচ্ছা বাসনার তাড়না কিংবা মনের জটিল রহস্য থেকেই এসব মিথের জন্ম। মানুষ দেবতা হতে চায়। অবিশ্বাস্য অলৌকিক শক্তির অধিকারী হতে চায়। অচিন্তনীয় ক্ষমতা লাভ করতে চায়। তারই ফসল পৌরাণিক মিথগুলো।

সমাজবিজ্ঞানও প্রমাণ করে মিথগুলোর অসীম ক্ষমতাকে। এক এক গোত্রের জনগোষ্ঠীর এক এক রকম মিথ রয়েছে। মনে হয় মিথগুলো বিকাশ লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে এক এক গোত্র এক একটি মিথকে কেন্দ্র করে বিভক্তির মধ্য দিয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা আপন আপন কল্পনাশক্তির বৃত্তের ভেতর সৃষ্টি করে নেয় দেবতা, ঈশ্বর, দানব, দৈত্য ইত্যাদি ধারণাগুলো। দেখা যাবে অনেক সময় গোত্রপ্রধান দেবতা হয়ে উঠেছে। ওদের নিয়ে মিথ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ভারতীয় পুরাণের কামধেনু (স্বর্গীয় গাভী) মাতৃভূমি (মাতৃস্নেহের প্রতীক), ভূমি দেবতা, শস্য দেবতা, বৃষ্টির দেবতা; এ সবই হচ্ছে মানুষের ইচ্ছাপূরণের কল্পনা। এভাবে একজন রাজা বা শাসকও দেবতা হয়ে যায় রামচন্দ্রের মতো। গোত্রের সবচেয়ে মেধাবী মানুষটির ওপর একইভাবে দেবত্ব বা দৈবশক্তি আরোপ করা হয়। কেননা আদি অসহায় মানুষ একটা আশ্রয় পেতে চাইত ভিন্নশক্তির মানুষের কাছে। রোগ, মৃত্যু প্রাকৃতিক আর সামাজিক বিপর্যয়ের ভেতর। সেখান থেকেই উদ্ভব ঘটেছে অবতারবাদের। যেমন–যদুবংশের শ্রীকৃষ্ণ।

আধুনিক সমাজে মিথ মাত্রা পেয়েছে ভিন্ন আঙ্গিকে। সমাজ সমষ্টির পাশাপাশি ব্যক্তি তার কর্ম বা সৃষ্টিশীল সাধনার ভেতর মিথের জগৎ তৈরি করে নেয়। রাজনৈতিক ব্যক্তি জনতার ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও বাসনার ভেতর খুঁজে পান অসীম শক্তির এক কল্পজগত। জনতাও নেতার ভেতর দেখতে পায় লৌকিকের ভেতর অলৌকিক ক্ষমতা। শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করে জনতার প্রত্যাশা আর হতাশার বিষয়টি স্মরণীয়। বিজ্ঞানীও দুর্জ্ঞেয় বিজ্ঞানের ভেতর এমনটাই দেখতে পান। দার্শনিক বা কবিও তার সাধনার ভেতর কল্পিত রক্তমাংসের অথচ অদৃশ্য অস্পর্শ দেবী বা দেবতা কিংবা সৌন্দর্য দেখতে পান। তারই ভেতর অতিন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে মিশ্রণ ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর 'মানস সুন্দরী, বা 'কাব্যলক্ষ্মী, নজরুলকে দেখা যায় কালাপাহাড়, কামালপাশা, লেনিন, সান ইয়াৎসিনের শক্তি আর সাহসের ভেতর মিথ তৈরি করতে। জীবনানন্দের মিথ সেভাবেই হয়ে যায় বনলতা সেন।

আমাদের জিজ্ঞাসার জগৎ সেই মিথের মধ্যে নয়। এই যে জটিল কুটিল আধুনিক জীবন, রাজনীতি ও সংস্কৃতি তার ভেতর বেড়ে ওঠা মিথের ভয়াবহ অপপ্রয়োগ নিয়েই আমাদের নানা প্রশ্ন। আধুনিক সমাজে মিথের ভিন্ন মাত্রা বা বহুমাত্রার বিচিত্র রূপ দেখা যায়। এখানে মিথ তৈরি হয় না; তৈরি করে দেয়া হয়। এখন মিথ আসে ভিন্ন পোশাকে. রূপ পাল্টে। রাজনীতির ক্ষেত্রে কোনো আদর্শ বা ব্যক্তির শক্তি, সততা, দেশপ্রেম, চরিত্র ইত্যাদি মিথের পোশাক পরে 'দেবত্ব', 'অলৌকিকত্ব', বা 'দৈববাণী', হয়ে ওঠে বা করে দেয়া হয়। ধনবাদী

সমাজ তো বটেই, সমাজবাদী সমাজেও এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অতীতে ও বর্তমানে।

প্রাচীন দার্শনিক, সমাজসেবী, পণ্ডিত, তত্ত্বনির্মাতারা এভাবেই দেবতা হয়ে উঠেছেন এবং আজো নতুন নতুন দেবতার আবির্ভাব ঘটানো হচ্ছে। এভাবেই সক্রেটিস, প্ল্যাটো থেকে শুরু করে কার্লমার্কস, লেনিন, মাও সে তুং কিংবা হবস, লক, হ্যাগেল, আইনস্টাইন, আব্রাহাম লিংকন, আরো বহুজন মিথের বাসিন্দা হয়ে ওঠেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে শেক্সপিয়র, সফোক্লেস, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলকেও এক এক সময় এক এক সমাজ তার প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য মিথবাসী করে তোলে। এ বড় ভয়ংকর খেলা!

আজকের সর্বগ্রাসী ধনবাদ, বাজার-অর্থনীতি তার লুণ্ঠনকর্মকে দীর্ঘস্থায়ী ও নিরাপদ করতে যেয়ে সারাবিশ্বে অতিআধুনিক 'বিকল্প মিথ' তৈরিতে সচেষ্ট; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে একক বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়ে ক্ষমতা এবং প্রয়োগের দক্ষতায় নিজেকে নিজেই 'Mythical beats' কিংবা 'horoes of Mith' এ পরিণত করেছে। সেই রাষ্ট্রটি এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার প্রতিটি সমাজকে অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে মিথের জগতে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টায় রত। শোষণ ও শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখা হচ্ছে বলেই এসব দেশের জনগণ ক্ষত-বিক্ষত, ছিন্ন-ভিন্ন এবং ক্লান্ত। এই বিধ্বস্ত সমাজের সামনে পতন ঘটানো হয়েছে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের। গণতন্ত্রের মিথের মিথ্যে কল্পলোক তৈরি করে হতাশ মানুষকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে। তাদের সামনে রেখেছে ভবিষ্যৎ বলতে নকল স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রের কল্পবিজ্ঞানের মতো অবাস্তবতা যা কিনা প্রাচীন রূপকথার বহু দূরবর্তী নতুন প্রজন্ম। তারই মধ্যে আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য করা হচ্ছে উন্নত আর অনুন্নত বিশ্বকে।

আমরা দেখেছি নিকট অতীতে সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা মার্কস-লেনিনের সমাজ আর রাষ্ট্রচিন্তায় প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে লাতিন ও আফ্রিকান সাহিত্যে মিথের প্লাবনকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। বিপ্লববাদের স্বপ্নিল মানুষগুলোকে প্রাচীন মিথের ঠিকানাহীন স্রোতে ঠেলে দেয়ার কত না চেষ্টা ধনবাদের। ভয়ংকর মৌলবাদকে পুনরুত্থানের ভিতর দিয়ে দাঁড় করানো হচ্ছে সারাবিশ্বে আজ। মৌলবাদের প্রাণভ্রমর তো মিথের মেরুদণ্ড ভিন্ন দাঁড়াতেই অক্ষম। প্রাচীন কবর খোঁড়া হচ্ছে পৃথিবীর দেশে দেশে অন্ধ ধর্মীয় মিথগুলোকে জাগিয়ে তোলার জন্য। বিশ্বের জাতিগুলোর মধ্যে নিজস্ব ঐতিহ্য অনুসন্ধানের নামে কবরের কংকাল বা ফসিলে প্রাণসঞ্চারের বিচিত্র চেষ্টা চলছে। নিজস্ব সংস্কৃতির নামে যতসব পশ্চাৎপদতা এবং মধ্যযুগের কুয়াশা সৃষ্টি করার কত না কলাকৌশল।

আমাদের জাতীয় জীবন আরো গভীর মহাসংকটে পতিত। এখানে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা হচ্ছে গণবিরোধী রাজনৈতিক আদর্শের নামে এবং ব্যক্তির নামে।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ওপর বিস্ময়করভাবে এমন সব অদৃশ্য বৈশিষ্ট্য সুকৌশলে আরোপ করা হয় যার ফলে সাধারণ মানুষ প্রতারিত হচ্ছে এবং দ্বন্দ্বে লিপ্ত হচ্ছে। এই দ্বন্দ্ব মাঝে মধ্যে এতটাই তীব্র হচ্ছে যে জনগণ তাদের মৌলিক অধিকারের কথা ভুলেই যাচ্ছে। সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য সবক্ষেত্রেই এই ভয়ংকর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাল্পনিক-অবাস্তব মিথ তৈরি যেকোনো দেশের শোষক সরকারের একটি হাতিয়ার। গণতন্ত্র বিরোধী শোষক শ্রেণী সর্বদা তাদের শোষণ (রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক) জারি রাখার জন্য শিল্প-সাহিত্য বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মিথ তৈরি করে। তারা জাতীয় শিল্পী, জাতীয় ধর্ম, জাতীয় লেখক ইত্যাদি তৈরি করে দেশে দেশে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়। শিল্পীদের নামের সঙ্গে অদ্ভুত বিশেষণ যুক্ত করে দিয়ে তাদের দুর্বল অথবা ব্যর্থ শিল্পকর্মকে 'দৈব' হিসেবে জনগণের মনে পুঁতে দিতে চায়। বিবেচনা করলে দেখা যাবে সেসব সাহিত্য বা শিল্পকর্ম শোষকশ্রেণীর শোষণব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। নোবেল পুরস্কারের বেলায় দেখা যায় এমন সব ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে যারা বিশ্বশান্তি অথবা বিশ্বসাহিত্যে খুবই তুচ্ছ অবদান রেখেছেন। সারাবিশ্বের মিডিয়াগুলো যেখানে সাম্রাজ্যবাদ দখল করে আছে সেখানে তাদের স্বার্থের অনুকূল সাহিত্যকর্মকেই তারা কল্পিত মিথ তৈরি করে প্রচার করছে এবং জনগণকে বিশ্বাস করতে এবং গিলাতে বাধ্য করেছে। তখন সেসব সাহিত্যকর্ম বা ব্যক্তির কল্পিত অসাধারণত্ব (দেবত্ব) জনগণ গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না।

বাংলাদেশসহ এশিয়ার অপরাপর ধনতান্ত্রিক দেশে ক্ষমতাধর রাজনৈতিক দলের গৃহপালিত লেখক-কবিদের সম্পর্কে মিডিয়ার মাধ্যমে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে মিথ বা কল্পকাহিনী তৈরি করা হয়। এর বাইরেও কাজটা চলে। যাদের রচনা শ্রেণী শোষণের বিপক্ষে নয়, তথাকথিত 'শিল্পের জন্য শিল্প' তত্ত্বের পক্ষে তাদেরকে গর্ত থেকে টেনে আকাশে তোলার চেষ্টা করা হয়। তৃতীয় বিশ্বের ধনবাদী দেশে এমন কিছু শিল্প তৈরি হয় যা রাজনীতি নিরপেক্ষ এবং তথাকথিত 'সামাজিক বাস্তবতা' নাম নিয়ে পাঠকের সামনে হাজির হয়। ধনবাদী শ্রেণী সেসব শিল্পের মহিমাকে (?) এমনিভাবে প্রচার করে যে, বঞ্চিত শ্রেণী ভাবে এ সবই হচ্ছে তাদের নিজস্ব জীবনকথা। সেসব শিল্প-সাহিত্য এবং কবি-সাহিত্যিককে তারা জনগণের সম্পদ, জাতীয় সম্পদ এবং মাটি ও মানুষের শিল্প বলে মিথ তৈরি করে পাঠককে বিভ্রান্ত করে। এরা কারা? এটি বোঝার জন্য মাথা ঘামাতে হয় না। দেখা যায় এসব খাঁটি(?) শিল্পীদের সঙ্গে শোষক শ্রেণী এবং শোষক রাষ্ট্রযন্ত্রের কোনো বিরোধ-সংঘাত তৈরি হয় না। তারা রাষ্ট্র থেকে সর্বপ্রকার সুবিধা ভোগ করে থাকে এবং

বিভিন্ন শ্রেণীর বিরুদ্ধে নকল গলায় মাঝে মাঝে নকল প্রতিবাদী কণ্ঠের ক্যাসেট বাজায়।

বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের সেবক শ্রেণী তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে এ ধরনের শিল্পীদের বিভিন্ন পুরস্কার দিয়ে হাইলাইট করে। ইংরেজি ভাষার বাঙালি লেখিকা অরুন্ধতীকে একই উদ্দেশ্যে পুরস্কৃত করা হয়। সেই লেখিকার তথাকথিত সেই মহান লেখাটি তো যৌনতা আর কেরেলার কমিউনিস্ট শাসনকে কলংকিত করার কল্পকাহিনীতে পূর্ণ। অরুন্ধতীর মিথ ভাইরাসের মতো এবং জীবাণু অস্ত্রের মতো বাংলাভাষী পাঠকদের চিন্তাচেতনাকে বিনষ্ট করেছে এসব সাহিত্য। খেয়াল করলে দেখা যাবে এসব সাহিত্য আর রচয়িতাদের সম্পর্কে প্রচার করা হয় নানা রকম গায়েবি শব্দমালা। অভূতপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি শব্দজালে আটকে পাঠকের সামনে হাজির করা হয় এসব সাহিত্য। কাহিনী বা শিল্পগুণ নিয়ে এতটাই উচ্চস্বরে কথা বলা হয় যে, পাঠক তখন রূপকথার জগতে হারিয়ে যায়। শিল্প বা শিল্পীকে নিয়ে এসব কল্পকথা প্রকৃত অর্থে মহৎ শিল্পেরও ক্ষতি করে। শিল্প উচ্চাঙ্গের হতে পারে। কিন্তু তা সীমাতীত নয়। অলৌকিক নয়। সময় শিল্পকে ভাঙে এবং ভেঙে ভেঙে এগিয়ে যায়। কোনো শিল্পই অবিনশ্বর নয়। কোনো শিল্পীই দেবতা নন। বৈষ্ণবীয় ভাবলুতা সর্বনাশ ঘটায় বলেই কবি জয়দেব বা বিদ্যাপতি কবি থেকে আরাধ্য দেবতা হয়ে ওঠেন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে। ঋষি, গুরু, আচার্য্য পদবিতে যে মিথের সংযোগ ঘটে এটা অবশ্যই আত্মপ্রতারণার কৌশল। কিংবা ঘাতকের নিষ্ঠুরতা।

ধনবাদের দানবেরা হতে পারে দেশি কিংবা বিদেশি. তাদের উদ্দেশ্যটা শোষণ। শোষকেরাই শিল্পীকে বানায় দেবতা এবং তার সৃষ্টিতে আরোপ করে দৈবশক্তি। এই বাংলাদেশের সাহিত্যের ঐতিহ্যসন্ধানীদের মধ্যে এমন একদল চতুর-মতলবাজ রয়েছে যাদের ওপর দেবত্ব আরোপ করে রেখেছে রাষ্ট্রযন্ত্র। তারাই গণতন্ত্রের কথা বলে স্বৈরাচারের সেবা করে আর উচ্ছিষ্ট চেটে খায়। এই শ্রেণী ক্ষুদ্র হলেও ক্ষমতাধর। এমনও দেখা যায় তারা নিজেদের সমাজবাদী বা জনগণের মুক্তির পক্ষের লোক বলে পরিচয় লাভ করে আহলাদ অনুভব করে। তারা বাংলাদেশের সাহিত্যের ঐতিহ্য খোঁজে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ভেতর। সেই যে জগৎ যেখানে অন্ধকার রহস্যময় মিথ ছড়িয়ে আছে। তারা সেখানেই টেনে নিতে চায় দেশের জনগণকে। প্রগতিশীলতার আড়ালে ভয়ংকর দৈত্যটাকে জনগণ ধরতে পারে না এসব তথাকথিত অগ্রগামী চিন্তানায়কদের ভেতর। তারা মধ্যযুগের কুয়াশাকে টেনে তুলতে সর্বদা সচেষ্ট ভাঙা কবর-গুহা থেকে। এ বিষয়টিও জনগণ বুঝতে পারে না।

সামনে এগিয়ে চলাই সমাজের রীতি। শিল্পের রীতি। এই রীতিবিরুদ্ধতার নামই প্রতিক্রিয়াশীলতা। প্রতিক্রিয়ার সাহিত্য থাকে রঙ-বেরঙের। কখনো সে পোশাক পরে প্রগতির। কখনো নকল ঐতিহ্যের। সেখানে থাকে অদৃশ্য মিথের জগৎ। আজকের সমাজে শিল্প-সাহিত্যে ধনবাদ এমনি মিথের মধ্যদিয়ে তৈরি করে চলেছে heroes of myth অথবা mythical beats। হতে পারে তা কোনো ব্যক্তি কিংবা তার কোনো সৃষ্টি। এই আধুনিক যুগে মিথ তো কেবল পৌরাণিক অন্ধকারেই আটকে নেই। বিজ্ঞানালোকিত ভুবনেও বৈজ্ঞানিক কৌশলে মিথ এবং নব নব মিথ তৈরি করা হচ্ছে শিল্প-সাহিত্যে। প্রতিটি উন্নত বা পিছিয়ে পড়া ধনবাদী সমাজে এই মিথ পার্শ্বক্রিয়ার ফল ভয়বাহ। এতেই থাকে নির্বীজ্যকরণের কলা-কৌশল। পাঠক সমাজকে এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। এর অন্যথা হলে দুর্নীতিবাজ শোষক রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট অলৌকিক বীর আর তাদের ঐশ্বীবাণীর যাদুর স্পর্শে অন্ধত্ববরণের বিকল্পটাও থাকবে না।